তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বাদশ কল্পের দ্বিতীয় ভাগের সূচীপত্র

বৈশাখ ৫৩৭ সংখ্যা।

নব-বর্ষ ১
সমাজের বিষম সমস্যা ৩
ঈশ্বর লাভ ৬
প্রেরিত ৯
শান্তিনিকেতন ১১
ভক্ত প্রহ্লাদ ১৪
ঈশ্বর অসীম ১৬

জ্যৈষ্ঠ ৫৩৮ সংখ্যা।

আত্মার অমায়িক সহজ ভাব ১৭
বর্ষশেষ উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজ ২২
নববর্ষ উপলক্ষে গাজিপুরে ব্রহ্মোপাসনা ২৬
যে শাখায় উপবেশন সেই শাখার মূলোচ্ছেদন ২৭
শিক্ষা ৩০
আলোচনা ৩৫

আষাঢ় ৫৩৯ সংখ্যা।

আত্মা এবং পরমাত্মা ৩৭
মাসিক ব্রাহ্মসমাজ ৪০
বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞান ৪৪
ব্রাহ্মের আদর্শ ৪৮
দ্বৈতাদ্বৈত বাদ ৪৯
ঐশ্বরিক প্রেম ৪৯
সাধু পার্কারের ধর্ম্ম ৪৯
প্রার্থনা ৫০
ভক্ত প্রহ্লাদ ৫১
বিবিধ ৫৪
পত্র ৫৪

শ্রাবণ ৫৪০ সংখ্যা।

ভবানীপুর ষট্‌ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ৫৭
বাক্যামৃতকণা ৬১
দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব ৬২
আত্মা ও পরমাত্মা ৬৮
ধার্ম্মিকতার পরীক্ষা ৭০
মৃত্যু ৭১
ব্যাখ্যানমঞ্জরী ৭৩

ভাদ্র ৫৪১ সংখ্যা।

দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব ৭৭
অধিকার ৮৮
নীতি ৯১

আশ্বিন ৫৪২ সংখ্যা।

আত্মশক্তি ৯৯
নীতি ১০১
দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব ১০৫
মৌন ব্রতের প্রকৃত তাৎপর্য্য ১১৪

কার্ত্তিক ৫৪৩ সংখ্যা।

মানবীকরণই বটে ১১৭
ব্যাখ্যানমঞ্জরী ১৩৪
সমালোচনা ১৩৫

অগ্রহায়ণ ৫৪৪ সংখ্যা।

মানবীকরণই বটে ১৩৭
কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত দর্শন ... ১৫৬
শান্তিনিকেতন ১৬৩

পৌষ ৫৪৫ সংখ্যা।

কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত দর্শন ... ১৬৫
বেহালা পঞ্চত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ১৭৭

মাঘ ৫৪৬ সংখ্যা।

কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত দর্শন ... ১৮১
উপদেশ ১৯৪
ব্যাখ্যানমঞ্জরী ১৯৯
পত্র ২০০

ফাল্গুন ৫৪৭ সংখ্যা।

ঊনষষ্টি সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ... ২০১

চৈত্র ৫৪৮ সংখ্যা।

বালি ধর্ম্ম সভা ২১৭
আস্তিক বুদ্ধি ২২২
কালনা ব্রাহ্মসমাজ ২২৮
দেবগৃহে সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব ... ২৩০

অকারাদি বর্ণক্রমে দ্বাদশ কল্পের দ্বিতীয়-ভাগের সূচীপত্র

	সংখ্যা		পৃষ্ঠা
অধিকার	৫৪১	…	৮৮
আত্মার অমায়িক সহজ ভাব	৫৩৮	…	১৭
আত্মা এবং পরমাত্মা	৫৩৯	…	৩৭
আত্মা ও পরমাত্মা	৫৪০	…	৬৮
আত্মশক্তি	৫৪২	…	৯৭
আলোচনা	৫৩৮	…	৩৫
আস্তিক বুদ্ধি	৫৪৮	…	২২২
ঈশ্বর লাভ	৫৩৭	…	৬
ঈশ্বর অসীম	৫৩৭	…	১৬
উপদেশ	৫৪৬	…	১৯৪
ঊনষষ্টি সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	৫৪৭	…	২০১
ঐশ্বরিক প্রেম	৫৩৯	…	৪৯
কালনা ব্রাহ্মসমাজ	৫৪৮	…	২২৮
কান্টের দর্শন এবং বেদান্ত দর্শন	৫৪৪	…	১৪৬
কান্টের দর্শন এবং বেদান্ত দর্শন	৫৪৫	…	১৬৫
কান্টের দর্শন এবং বেদান্ত দর্শন	৫৪৬	…	১৮১
দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব	৫৪০	…	৬২
দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব	৫৪১	…	৭৭
দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব	৫৪২	…	১০৫
দেবগৃহে সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব	৫৪৮	…	২৩০
দ্বৈতাদ্বৈতবাদ	৫৩৯	…	৪৯
ধার্ম্মিকতার পরীক্ষা	৫৪০	…	৭০
নব-বর্ষ	৫৩৭	…	১
নববর্ষ উপলক্ষে গাজিপুরে ব্রহ্মোপাসনা	৫৩৮	…	২৬
নিবৃত্তি	৫৪২	…	৯৯
নীতি	৫৪১	…	৯১
নীতি	৫৪২	…	১০১
পত্র	৫৩৯	…	৫৪
পত্র	৫৪৬	…	২০০

	সংখ্যা		পৃষ্ঠা
প্রার্থনা	৫৩৯	…	৫০
প্রেরিত	৫৩৭	…	৯
বর্ষশেষ উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজ	৫৩৮	…	২২
বাক্যামৃতকণা	৫৪০	…	৬১
বালি ধর্ম্ম সভা	৫৪৮	…	২১৭
ব্যাখ্যানমঞ্জরী	৫৪০	…	৭৩
ব্যাখ্যানমঞ্জরী	৫৪৩	…	১৩৪
ব্যাখ্যানমঞ্জরী	৫৪৬	…	১৯৯
বিবিধ	৫৩৯	…	৫৪
বেহালা পঞ্চত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	৫৪৫	…	১৭৭
ব্রাহ্মের আদর্শ	৫৩৯	…	৪৮
বৈদান্তিক-ব্রহ্মজ্ঞান	৫৩৯	…	৪৪
ভক্ত প্রহ্লাদ	৫৩৭	…	১৪
ভক্ত প্রহ্লাদ	৫৩৯	…	৫১
ভবানীপুর ষট্‌ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	৫৪০	…	৫৭
মানবীকরণই বটে	৫৪৩	…	১১৭
মানবীকরণই বটে	৫৪৪	…	১৩৭
মাসিক ব্রাহ্মসমাজ	৫৩৯	…	৪০
মৌন ব্রতের প্রকৃত তাৎপর্য্য	৫৪২	…	১১৪
মৃত্যু	৫৪০	…	৭১
যে শাখায় উপবেশন সেই শাখার মূলোচ্ছেদন	৫৩৮	…	২৭
শান্তিনিকেতন	৫৩৭	…	১১
শান্তিনিকেতন	৫৪৪	…	১৬৩
শিক্ষা	৫৩৮	…	৩০
সমাজের বিষম সমস্যা	৫৩৭	…	৩
সমালোচনা	৫৫৩	…	১৩৫
সাধু পার্কারের ধর্ম্ম	৫৩৯	…	৪৯

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
বৈশাখ ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯।

৫৩৭ সংখ্যা — ১৮১০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

নব-বর্ষ।

পূর্ব্বে কেবল এক মহাশূন্য ছিল। এই মহাশূন্যকে স্বীয় কুক্ষি মধ্যে রাখিয়া এক অবাতস্পন্দিত মহাপ্রাণ জাগিতেছিলেন। তখন এই সমস্ত নামরূপ কিছুই ছিল না কেবল এক নিবিড় অন্ধকার। মনুষ্যের কল্পনায় ইহাই সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা। যখন নাম রূপ কিছুই ছিল না তখন সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মের প্রেমের বিকাস হয়। এই প্রেম হইতেই এই সমস্ত ব্যক্ত হইয়া পড়ে। ইহাই সৃষ্টি। সৃষ্টির মূলে কেবল একমাত্র ব্রহ্মের প্রেম বিরাজ করিতেছে। ফলত প্রেমেই সৃষ্টি এবং প্রেমই স্থিতি। ঐ দেখ তরুণ সূর্য্য জীবন ও জ্যোতি বিস্তার করিবার জন্য কেবল সেই প্রেমে আরক্ত হইয়াছে। এই সুমন্দ প্রাভাতিক বায়ুহিল্লোল সেই প্রেমেই সুস্নিগ্ধ। এই সকল বৃক্ষ ও পুষ্প চতুর্দিকে সেই প্রেমের সৌন্দর্য্য ও সৌরভ বিস্তার করিতেছে। স্রোতস্বতী অত্যুচ্চ শৈলশিখর হইতে সেই প্রেম প্রবাহিত করিয়া মহারবে সমুদ্রের বক্ষে গিয়া মিশিতেছে। ফলত যে দিকে দৃষ্টিপাত কর সৃষ্টির সর্ব্বত্রই এইরূপ প্রেমের ব্যাপার। কিন্তু সৃষ্টের মধ্যে কেবল মনুষ্যই ইহা বুঝিতে পারে। মনুষ্যসৃষ্টি ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির পরাকাষ্ঠা। ভৌতিক তম যেমন তাহাকে আবরণে নিক্ষেপ করিতেছে আধ্যাত্মিক সত্ত্ব তেমনি তাহাকে প্রকাশে আনিতেছে। এমন বিরোধী বিচিত্র সৃষ্টি আর কিছুই নাই। এই আধ্যাত্মিক সত্ত্বের উদ্রেকই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। এবং ইহাতেই সৃষ্টির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু আমরা এই মনুষ্যজন্মে যদি কেবল রূপ রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয় লইয়া কালক্ষেপ করি তবে তো ভৌতিক তমেরই জয়জয়কার হয়। অতএব প্রত্যেকেরই এই আধ্যাত্মিক সত্ত্বগুণের উদ্রেকের জন্য যত্ন করিতে হইবে। তম প্রকৃতির হস্তে কেবল অন্ধভাবে ভোগ আর এই সত্ত্বের হস্তে পরীক্ষা। ইহা আমাদিগকে বিষয়ের মূল প্রদেশে লইয়া যায় এবং সৃষ্টিতত্ত্বে কেবলই ব্রহ্মের একমাত্র প্রেমের বিলাস দেখাইয়া নিরস্ত হয়। তখন বাহ্য বিষয়ে আর আমাদিগের প্রীতি থাকে না। আমরা অন্তঃস্ফূর্ত্ত বাক্যে বলিয়া উঠি, তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ

অন্তরতরং যদয়মাত্মা। যাঁর সৃষ্টির মূলে এত প্রেম, যিনি কেবল আমাদিগকেই সুখী করিবার জন্য এই ভূতভৌতিকের মধ্যে নানা রূপ নানা রস নানা গন্ধের যোজনা করিয়াছেন, না জানি তিনি আমাদের কতই না প্রেমের বস্তু। তখন আমরা ইতর জন্তুর ন্যায় বিষয়রাজ্যে আর বদ্ধ থাকি না। তাহার অতীত প্রদেশে গিয়া প্রেম স্থাপন করি এবং তখনই বলিতে পারি তিনি পুত্র হইতে প্রিয় বিত্ত হইতে প্রিয় এবং আর আর সকল হইতে প্রিয়।

এই প্রেম সাধনই ধর্ম্ম সাধন। এই সংসারে প্রীতিস্থাপন করিলে বিচ্ছেদের যন্ত্রণাকে পরিহার করিতে পারে। পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ আসিয়া হৃদয়ের উত্থান ও পতন অবশ্যই সাধন করিবে। কারণ অনিত্য বস্তুতে আসক্তি এই রূপেই পরিণত হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে একমাত্র অপরিবর্ত্তনীয় তাঁহার প্রতি প্রীতি কখনই মরণশীল হয় না। তবে কি কজ্জল লাগিবার ভয়ে কজ্জলের গৃহ এককালে পরিত্যাগ করা আবশ্যক। না। যদি তোমার প্রীতি সংসার হইতে প্রত্যাহৃত ও ব্রহ্মে স্থাপিত হয় কিন্তু তুমি যে সমস্ত বস্তুতে অহর্নিশি পরিবৃত আছ তৎকালে সে সকল যে কেবল তোমার অগ্রাহ্য পরিহার্য্য হইবে এরূপ ভাবিও না। এই সংসার প্রেমময়ের অধিষ্ঠানেই প্রেমাস্পদ। এই সূত্রে তোমার চক্ষু ইহাতে আবার আকৃষ্ট হইবে এবং তোমার প্রীতি ব্রহ্মস্পর্শে পবিত্র যেন অগ্নিপরিশোধিত হইয়া ইহাতে পড়িবে। তখন ভোগ্যের মধ্যে অবশ্যই তোমার ভোক্তৃত্ব সম্বন্ধ স্থাপিত হইল কিন্তু তোমার চিত্ত সমস্ত অধ্রুবের হস্ত এড়াইয়া একমাত্র ধ্রুব প্রেমে বিশ্রান্তি লাভ করিতেছে সুতরাং ইহা তোমার পক্ষে অনাসক্তের বিষয়ভোগ। এইরূপে তোমার সকল সাংসারিক ব্যবহার নিষ্পত্তি হইবে এবং ইহার প্রত্যেক মূল শাখা পত্রে এক চির প্রেম জাগরূক দেখিয়া তোমার প্রীতি শতধা বহুধা হইয়া পড়িবে। ইহাই প্রীতির সম্প্রসারণ। মনুষ্যের মধ্যে যিনি এই বিশ্বপ্রেম লাভ করিতে পারেন তিনিই ধন্য।

এই সংসার যেমন সেই চির প্রেমের অধিষ্ঠানে প্রেমাস্পদ সেইরূপ সেই চির সত্তার অধিষ্ঠানেই ইহা সৎ। আমরা যে অণুকটাহের অন্তর্গত ইহার সত্তা আপেক্ষিক সত্তা। ইহার একটী পরমাণু আর একটী পরমাণুকে একটী দ্ব্যনুক আর একটী দ্ব্যনুককে একটী ত্রসরেণু আর একটী ত্রসরেণুকে এবং একটী পিণ্ড আর একটী পিণ্ডকে স্বীয় স্থিতি লাভের জন্য অপেক্ষা করে। এইরূপে এক সৌর জগৎ আর এক সৌর জগৎকে আশ্রয় করিয়া স্থিতি লাভ করিতেছে। যদি কাহারও এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যবেক্ষণের শক্তি থাকে তবে তিনি দেখিতে পাইবেন সকলেরই স্থিতি এইরূপ আপেক্ষিক স্থিতি। এখন দেখ, যদি সূর্য্য না থাকিলে পৃথিবী না থাকে তখন তো পৃথিবী কিছুই নয় সূর্য্যই তো সব। এই রূপ সকলের স্থিতি যে মূল সত্তায় গিয়া সকল অপেক্ষার পরিসমাপ্তি করিতেছে তিনিই তো সব, অন্যান্যটা তো তাঁর নিকট কিছুই না। এই মূল নিত্য সত্তাই ব্রহ্ম। ফলত তিনি না থাকিলে ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই থাকে না। যিনি এইরূপ চরম জ্ঞানে উপনীত হইয়াছেন তিনিই জলস্থলশূন্য সমস্ততেই এক পরমাত্মার স্ফূর্ত্তি দেখিতে পান। ফলত ইহাই জ্ঞানের সম্প্রসারণ। বিশ্বের এই বিকারের মধ্যে যিনি জ্ঞানে এইরূপে সেই অবিকৃতকে দেখিতে পান তিনিই ধন্য।

ব্রাহ্মগণ। এইরূপে জ্ঞান ও প্রীতিকে প্রসারিত কর তাহা হইলেই অনাসক্তিতে তোমার সংসারভোগ হইবে। যতটুকু সংসারে আসক্তি সেই পরিমাণে স্বীয় নামযশের প্রতি দৃষ্টি থাকে। ইহাতে সংসারের কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। আর যে পরিমাণে অনাসক্তি সেই পরিমাণে সাংসারিক সমস্ত পবিত্র ব্যবহার ব্রহ্মে অর্পণ করিতে তোমার মনে বল আইসে। ফলত ইহাই ধর্ম্মসাধন। আজ নববর্ষের প্রথম প্রাতঃকাল। আমাদের মধ্যে অনেকেরই শ্যাম কেশ শ্বেত হইয়াছে। দন্ত স্খলিত ও তুণ্ড গলিত হইয়াছে। আমাদের এই পার্থিব জীবন তো অবসান হইয়া আসিল। আজ যে বর্ষের প্রথম প্রাতঃকাল হয় তো ইহাই অনেকের শেষ বর্ষ হইবে। আজ এই কদলীদলমণ্ডিত মণ্ডপের মুক্ত বায়ুতে যাতি যূথি মল্লিকার মনোমুগ্ধকর সৌরভে যাঁহাদের সহিত ব্রহ্মোপাসনা করিয়া নববর্ষের প্রাতঃকাল পবিত্র করিলাম, হায়! হয় তো আগামী বর্ষে তাঁহাদের সহিত এই আনন্দ আর ভোগ করিতে পাইব না। জীবন এইরূপই চঞ্চল। নলিনী-দল-গত-জলবৎ চঞ্চল। সংসারের সমস্তই চঞ্চল। আইস এই সমস্ত চঞ্চল অধ্রুবের বিনিময়ে সেই ধ্রুব পদার্থকে লাভ করিবার জন্য আজ হইতে চেষ্টা করি। এই পৃথিবীতে এখনও যে কএকটা দিন থাকিব যদি তার মধ্যে অন্তত একটী দিনও সেই প্রাণসখারে প্রাণ খুলিয়া প্রাণ ভরিয়া একবারও ডাকিতে পারি তাহলেও আমাদের জন্ম সফল। অন্তর্যামী! তুমি সকলই জানিতেছ। তোমাকে আর আমরা কি জনাইব। তুমি আমাদের এই সাধু কামনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সমাজের বিষম সমস্যা।

বিদ্যা-বুদ্ধির বিস্তার সমাজের একটি প্রধান উন্নতির চিহ্ন তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু বিদ্যা-বুদ্ধির ফল যদি হিতে বিপরীত হয়—যদি এরূপ হয় যে, বিদ্যা-বুদ্ধির প্রভাবে সমাজের বন্ধন শিথিল হইয়া যথেচ্ছাচারের পথ উন্মুক্ত হইয়া যাইতেছে; কোন দুই ব্যক্তির মধ্যে মনের ঐক্য নাই—ধর্ম্মের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত সংশয়াপন্ন; তবে তাহাতে কি প্রকাশ পায়? এই প্রকাশ পায় যে, যাহা বিদ্যা-বুদ্ধি বলিয়া গৃহীত হইতেছে তাহা প্রকৃত বিদ্যা-বুদ্ধি নহে। তবে কি আমরা বিদ্যা-বুদ্ধিতে জলাঞ্জলি দিয়া পুরাতন কুসংস্কারকেই সার করিব? তাহাই বা কিরূপে করি। যে ব্যক্তি বিদ্যার কিঞ্চিৎ আস্বাদ পাইয়াছে—সে আর তাহার চরম পর্য্যন্ত না গিয়া কোন ক্রমেই ফিরিতে পারে না; যত কিছু বিভীষিকা সমস্তই মাঝের পথে—একটু বেশী অগ্রসর হইলে আর কোন ভয় নাই। যাঁহারা ঘোরতর স্থিতিশীল তাঁহারা বলেন "দূর কর তোমার বিদ্যা-বুদ্ধি—ফিরিয়া যাও!" যাঁহারা ঘোরতর গতিশীল তাঁহারা বলেন "পশ্চাৎ পানে ফিরিয়া দেখিও না সম্মুখে অগ্রসর হও।" স্থিতি-শীলও যেমন—গতি-শীলও তেমনি; এ বলে আমায় দ্যাখ্—ও-বলে আমায় দ্যাখ্! স্থিতি-শীল ভবিষ্যৎ বাদ দিয়া অতীতে প্রবিষ্ট হন, গতিশীল অতীত বাদ দিয়া ভবিষ্যতে ধাবমান হ'ন; ইহাতে স্থিতিশীল জড়বৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া যা'ন—গতি-শীল ক্রমাগতই হোঁচট্ খাইতে থাকেন। সমাজের এই এক বিষম সমস্যা। এখন উপায় কি?

উপায় আর কিছুই নয়—প্রকৃত বিদ্যা-বুদ্ধি; এক কথায় ধর্ম্ম-বুদ্ধি। নীরস বিদ্যা-

বুদ্ধি নহে কিন্তু শ্রদ্ধা-ভক্তি-পূর্ণ—সৌজন্য-পূর্ণ—সরস বিদ্যা-বুদ্ধি। আশ্চর্য্য এই যে, যে-সকল গতিশীলেরা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগের অত্যাচারের প্রতি খড়্গ-হস্ত তাঁহাদের মনের ভিতরে যদি তল্লাইয়া দেখা যায় তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য অত্যাচার নিবারণ করা নহে কিন্তু অত্যাচার করা। এখনকার কোন শূদ্র যদি ইংরাজি পুঁথিকে সহায় করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করে, তবে নিশ্চয় জানিও যে, ব্রাহ্মণদের অত্যাচার-নিবারণ তাহার উদ্দেশ্য নহে—ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অত্যাচার করাই তাহার উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণেরা কবে কোন্ জন্মে শূদ্রের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল—এখন তাহার নাম-গন্ধও নাই,—এখন-কার রাজ-নিয়মের সমক্ষেই যে, কেবল ব্রাহ্মণ-শূদ্র সমান তাহা নহে; ব্রাহ্মণেরা আপনারাই শুদ্ধাচার ও শাস্ত্র-চর্চার প্রভাবে অনেক দিন হইতে বিশিষ্টরূপে সাত্ত্বিক ভাবের আধার হইয়া আসিতেছেন—তাঁহারা বিশিষ্ট-রূপে বুদ্ধিজীবী ও ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক; তাহা বলিয়া কি দাম্ভিক কুলীন ব্রাহ্মণ নাই? আছে—কিন্তু কে তাহাদিগকে ভাল বলে? শূদ্রের মধ্যেও এমন অনেক দাম্ভিক ব্যক্তি আছে যাহাদের মাটিতে পা পড়ে না; এ সকল অকাল-কুষ্মাণ্ডের কথা ছাড়িয়া দেও। এখন-কার শূদ্র অনত্যাচারী ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার নিবারণের জন্য কখনও কখনও যে, অগ্নি-মূর্ত্তি ধারণ করেন, তাহার অর্থ আর কিছু নয়—"আমরা ব্রাহ্মণের দাস হইব কেন—ব্রাহ্মণেরা আমাদের দাস হইবে;" এই রূপ আর একটি কথা এই যে, "স্ত্রী স্বামীকে পূজা করিবে কেন—স্বামী স্ত্রীকে পূজা করিবে;"—ইহাতে দোষের সংশোধন হওয়া দূরে থাকুক্—দোষের কেবল পার্শ্বপরিবর্ত্তন হয় এই মাত্র; পূর্ব্বে নয় পতি ও ব্রাহ্মণের আধিপত্য ছিল—এখন নয় স্ত্রী ও শূদ্রের আধিপত্য হইল; ইহাতে মন্দ বই ভাল কি হইল—তাহা তো বুঝিতে পারা যায় না। ফরাসীস্ বিদ্রোহের সময় সাধারণ লোকেরা কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের অত্যাচার নিবারণ করিতে গিয়া লাভের মধ্যে আপনারা শত সহস্র গুণ অত্যাচারী হইয়া সমাজকে ছার খার করিয়া ফেলিল। বিদ্রোহীরা যদি ধর্ম্ম-ভাবে চালিত হইত তাহা হইলে উপরের লোকদিগের অত্যাচার নিবারণ পর্য্যন্তই তাহাদের চরম উদ্দেশ্য হইত, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য আর-একরূপ; তাহাদের মনের কথা এই যে, "উহারা আমাদের উপর অত্যাচার করিবে কেন—আমরা উহাদের উপর অত্যাচার করিব;" অত্যাচার-মাত্রই যে, অন্যায়, এ জ্ঞান তাহাদের নাই; তাহাদের জ্ঞানের দৌড় কেবল এই পর্য্যন্ত যে, "অন্যেরা আমাদের প্রতি অত্যাচার করিলেই তাহা অন্যায়—আমরা অন্যের প্রতি অত্যাচার করিলে তাহা খুবই ন্যায্য।" এই সকল নিম্ন-শ্রেণীর লোক যাহারা "অধিকাংশ" বলিয়া পরিগণিত হয় ও যাহাদের মত না লইয়া কোন কার্য্য হয় না—তাহারা কুচক্রী সিন্নার (Cinna) অপরাধে সচ্ছন্দে কবি সিন্নাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল। আসল কথা এই যে, যাঁহারা অনেক কাল হইতে সমাজের শিরঃস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা বাস্তবিকই বিদ্যা-বুদ্ধি এবং রসজ্ঞতায় সমাজের নিম্ন-শ্রেণী অপেক্ষা উন্নত, আর নিম্ন-শ্রেণীরা বিদ্যা-বুদ্ধি এবং আত্ম-সংযমে যে, কত হীন, তাহা উপরে দেখা গেল। এরূপ অবস্থায়, নিম্ন-শ্রেণীরা যে, উচ্চ শ্রেণীদিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া কোন উন্নতি লাভ করিবে তাহা হইতেই পারে

না। সারথী অশ্বকে পীড়ন করিলে, অশ্ব ক্ষেপিয়া উঠিয়া সারথীকে ভূতলে নিক্ষেপ করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া অশ্ব কখনই সারথী হইতে পারে না। অধিকাংশের মত কেবল একটা কথার কথা মাত্র, একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির মত শত কোটি যে-সে ব্যক্তির মত অপেক্ষা শত গুণে মূল্যবান্। অতএব সমাজের যত কিছু উন্নতি সমস্তই উচ্চ-শ্রেণীদিগের হস্তে নির্ভর করিতেছে। উচ্চ শ্রেণী অর্থাৎ কুলে শীলে বিদ্যাতে বুদ্ধিতে যাঁহারা উচ্চ।

যাঁহারা সমাজের শিরস্থানীয় তাঁহারা কাজে কাজেই স্থিতি-শীলতার পক্ষপাতী; কেননা সমাজে ভাঙন ধরিলে তাঁহাদের তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। সমাজে যখন স্থিতি-শীলতার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হয় তখন কাষ্ঠ-হাসি, কাষ্ঠ-কান্না কাষ্ঠ-লৌকিকতা, কাষ্ঠ-সভ্যতা, এমনকি কাষ্ঠ-ধর্ম্ম এই সকলের প্রাদুর্ভাবে সমাজ নিতান্তই কাষ্ঠ বনিয়া যায়। এরূপ সমাজের স্বপক্ষে এক যা বলিবার আছে তাহা শুদ্ধ কেবল এই যে, অসভ্যতা অপেক্ষা কাষ্ঠ সভ্যতা ভাল—অধর্ম্ম অপেক্ষা কাষ্ঠ ধর্ম্ম ভাল—ইত্যাদি; কিন্তু এরূপ কথায় কাহারো মন ভুলিতে পারে না। অতএব সমাজের স্থিতি-রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গতির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখা স্থিতি-শীলদিগের নিতান্তই কর্ত্তব্য। তেমনি আবার, যাঁহারা সমাজের পদস্থানীয় তাঁহারা কাজে কাজেই গতি-শীলতার পক্ষপাতী; কেননা সমাজে ভাঙন ধরিলে তাঁহারা স্ব স্ব অবস্থার উন্নতি-সাধন করিতে সুযোগ পা'ন। সমাজে গতি-শীলতার আত্যন্তিক বাড়াবাড়ি হইলে সমাজ একেবারেই আগুণ মূর্ত্তি ধারণ করে; কিন্তু সে আগুণ খড়ের আগুণ—দেখিতে দেখিতে ধূমে পরিণত হইয়া যায়। অতএব গতি-শীলদিগের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা সমাজের স্থিতির কোন প্রকার ব্যাঘাত না করিয়া সাবধানে গম্য পথে অগ্রসর হ'ন।

ভাঙন এবং গড়ন এ দুয়ের সন্ধিস্থলে পৃথিবীতে মহৎ ব্যক্তিগণের আবির্ভাব হয়। সেই সকল মহৎ ব্যক্তি দ্বারা সমাজের গঠন কার্য্যের মূল প্রতিষ্ঠিত হয়; তাহার পরে যাঁহারা আইসেন, তাঁহারা উঁহাদেরই প্রদর্শিত পথের অনুগামী হ'ন,—ইঁহাদের বীজ মন্ত্র এই যে, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা;" ইঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে স্থিতি-শীল; পূর্ব্বোক্ত মহদ্ব্যক্তিরা সৃষ্টি-শীল নামেরই যোগ্য। যাঁহারা সৃষ্টি-শীল তাঁহারা ভাঙন এবং গড়ন দুয়েরই মর্ম্মজ্ঞ। সৃষ্টি-শীল ব্যক্তি ধর্ম্মবুদ্ধিকে—শ্রদ্ধাভক্তি-পূর্ণ সরস শুভবুদ্ধিকে—সহায় করিয়া এমন একটি মধ্য-ভূমিতে দণ্ডায়মান হ'ন—যেখানে বিবাদ-বিসম্বাদ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; তিনি সমস্ত বিবাদ-বিসম্বাদকে প্রেমাগ্নিতে গালাইয়া নূতন এক উপাদানে পরিণত করেন। তিনি ব্রাহ্মণকেও শূদ্রের পদানত করিতে যা'ননা—শূদ্রকেও ব্রাহ্মণের পদানত করিতে যা'ন না,—পরন্তু ব্রাহ্মণ যাহাতে সদ্ব্রাহ্মণ হয় ও শূদ্র যাহাতে সৎশূদ্র হয়—তাহাই তাঁহার লক্ষ্য। ব্রাহ্মণ সৎ হইলে স্বভাবতই সদ্ব্রাহ্মণ হয়—শূদ্র সৎ হইলে স্বভাবতই সৎশূদ্র হয়; পতি সৎ হইলে স্বভাবতই সৎপতি হয়, পত্নী সৎ হইলে স্বভাবতই সৎপত্নী হয়। এইরূপ যখন ব্রাহ্মণ শূদ্র—পতী পত্নী—ধনী দরিদ্র—সবল দুর্ব্বল—সমস্তের মধ্য হইতে সদ্ভাব উদ্গীরিত হইয়া উঠে—যখন দ্বন্দ্ব বিবাদ তিরোহিত হইয়া যায়, তখনই সমাজ নিম্ন সোপান হইতে উচ্চ সোপানে পদ-নিক্ষেপ করে। এরূপ ঘটনা যখন তখন ঘটিতে পারে না—ইহা সময়ের পরিপক্কতাকে

অপেক্ষা করে। এখনকার কালে কেবল বিবাদ-বিসম্বাদেরই প্রাদুর্ভাব—ধর্ম্মের গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালাই এখনকার কালের ধর্ম্ম; ইহার কুফল সমাজে যতই দেখা দিবে ততই লোকের চক্ষু ফুটিবে—ক্রমে ঈশ্বর-প্রসাদে ধর্ম্ম-সূর্য্য মোহ-কুজ্ঝটিকা অপসারিত করিয়া অমায়িক শোভন মূর্ত্তিতে লোক-সমাজে অভ্যুদিত হইবে।

ঈশ্বর লাভ।

ঈশ্বর যেমন জড়জগতের রাজা, আধ্যাত্মিক জগতের তেমনই তিনি একমাত্র অধীশ্বর। কার্য্যকারণ শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহ্যজগত একই নিয়মে চলিয়া আসিতেছে, পৃথিবীর শৈশবাবস্থায় যে নিয়ম কার্য্যকরী ছিল, এখনও তাহার সত্তা বর্ত্তমান। এখানকার কোন বস্তুই সেই অক্ষর পুরুষের শাসন অতিক্রম করিয়া চলিতেছে না। তিনি একবার ইহাকে যে সুন্দর নিয়মের অনুবর্ত্তী করিয়া দিয়া স্বয়ং সাক্ষী স্বরূপে তাহা অবলোকন করিতেছেন, যতদিন না তাঁহার ইচ্ছার বিরাম হইবে ততদিন একই ভাবে চলিতে থাকিবে, কিছুতেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা সমন্বিত এই সুবিশাল ভূমণ্ডল ইহার প্রত্যেক পদার্থ রহস্যে বিজড়িত হইয়াও আমারদের বিস্ময়ের উদ্দীপন করিতে পারে না, স্রষ্টার অনুপম কৌশল স্মরণ করিয়া দেয় না, ইহার একমাত্র কারণ জড়জগতের নিয়ম সকলের সমতা। ভূমিষ্ঠ হইবার সময় যে সূর্য্য পৃথিবীর অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া পূর্ব্ব আকাশে উদিত হইয়াছিল, যৌবনে সেই কালে সেই স্থানে তাহার প্রকাশ দেখিতেছি, বার্দ্ধক্যে আবার তাহাই দৈখিব। পূর্ব্বে তমিস্রা ও চন্দ্রালোকের পর্য্যায়ক্রমে যে উদয়াস্ত দেখিয়াছি, কখনই আর তাহার বৈষম্য দেখিতে হইবে না। ঐ প্রকৃতির সাম্যভাব সেই, জন্যই অপেক্ষাকৃত স্থূলদর্শীদিগের চিত্তকে বিমোহিত করিতে পারে না। কিন্তু পরক্ষণে যখন আবার ঝঞ্ঝাতরঙ্গের অভ্যুদয়ে পৃথিবীর মুখচ্ছবি বিকৃত হইয়া যায়, অগ্ন্যুৎপাত বা জলপ্লাবনের ঘোর উৎপাতে গ্রাম ও নগরের বিলয়দশা উপস্থিত হয়, গ্রহণ বা ধূমকেতুর প্রকাশে ধরাপৃষ্ঠে নূতন দৃশ্য সংঘটিত হয়, তখনই মনুষ্যের অন্তরে এক নূতন ভাবের সঞ্চার হইতে থাকে। সমতল দেশবাসী মনুষ্যকে হিমালয়ের মহান দৃশ্য দর্শন করাও, সাগরের গম্ভীর নির্ঘোষী তরঙ্গ নিচয়ের মধ্যে অর্ণবযানযোগে লইয়া চল, দেখিবে তাহার হৃদয়ের জড়তা অপসারিত হইয়া গিয়া কার্য্যকারণ পরম্পরার উপর তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। পৃথিবীর উপরে নিমেষে নিমেষে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যে সকল অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা অনবরত ঘটিতেছে, তাহার এক একটিই মনুষ্যের লৌহ কবাটাচ্ছন্ন হৃদয়কে সজীব করিয়া তুলিতে পারে, অন্তর্দৃষ্টিকে প্রখর করিয়া দিতে পারে, কেবল মনুষ্য সস্পৃহ ভাবে দেখে না, শুনে না সেই জন্যই সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাকে দেখিয়া আপ্তকাম হইতে পারে না। মনুষ্যের সহিত বাহ্য জগতের যতটুকু সম্পর্ক, তাহা হইতে মনুষ্যের মন যে সহজে কার্য্য হইতে কারণের দিকে সৃষ্টি হইতে স্রষ্টার দিকে অগ্রসর হইতে পারে না, সে কেবল আপনার দোষে। তিনি ত সমুদয় জগতকে ইহার অনুকূল করিয়া দিয়াছেন, কেমন জড়তা আসিয়া আমাদিগকে তাঁহার নিকটে যাইতে দেয় না। তিনি ত প্রতি সূর্য্যের উদয়াস্তে, পক্ষমাস ঋতু সম্বৎসরের আবর্ত্তনে কত রহস্য দেখাইতেছেন, আমরা মূঢ়জীব, একভাব একই দৃশ্য দেখিয়া হৃদয়ের সস্পৃহ ভাবকে নির্ব্বান

করিয়া ফেলিয়াছি, এইজন্যই তিনি ধরা দিলে আপনার মোহে তাঁহাকে ধরিতে পারি না। তিনিত স্বয়ংপ্রকাশ, তথাপি আমরা তাঁহাকে সৃষ্টির মধ্যে অনুভব করিতে পারি না।

আমরা দেখিতেছি, শরীরের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাহ্য জগতের যতটুকু যোগ, তাহা হইতে সহজে ঈশ্বরের অস্তিত্বে উপস্থিত হইবার একটু গোলযোগ রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ যে সকল উপাদান বুদ্ধির সমক্ষে আনয়ন করে ও বুদ্ধি যাহা কিছু নৈসর্গিক ক্ষমতা প্রভাবে উহাদিগকে রোমন্থন করে, তাহার মূলে কার্য্যকারণের স্বাভাবিকত্ব অন্যতম। আজকাল ঊনবিংশ শতাব্দির জ্ঞানগরিমাপূর্ণ আস্ফালনের মধ্যেও সহজজ্ঞানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহই বিশিষ্টরূপে সন্দিহান হইতে পারেন নাই। বাহ্যজগতের অস্তিত্ব, কার্য্য কারণের অস্তিত্ব এইরূপ কয়েকটি সর্ব্বজনস্বীকৃত স্বতঃসিদ্ধের ভিত্তির উপর বিজ্ঞান দর্শনের সুপ্রকাণ্ড অট্টালিকা বিনির্ম্মিত রহিয়াছে। কার্য্য থাকিলে অবশ্যই তাহার কারণ আছে, এ বিষয়ে আর কার সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু এই একটী সামান্য মূল সত্যের উপর দুর্গম বিজ্ঞান শাস্ত্রের অর্দ্ধেক বা ততোধিক তত্ত্ব নির্ভর করিতেছে। বুদ্ধি যতই আলোচনা করিতে থাকে, সৃষ্টি কৌশলের সূক্ষ্মতত্ত্ব যতই অন্বেষণ করিতে থাকে, আপনাকে ও আপনার নিয়তি যতই তাহার আন্দোলনের বিষয় হয় ততই সে ঈশ্বর হইতে আর দূরে থাকিতে পারে না। সে তাঁহার অস্তিত্বে সকল রহস্যের বিশদ মীমাংসা দেখিতে পায়। সকল কূট প্রশ্নের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে থাকে। সে তখন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে যে তাঁহাকে ছাড়িলে পৃথিবী লক্ষ্যশূন্য, অর্থশূন্য, ভ্রম প্রমাদ পরিপূর্ণ এক প্রকাণ্ড প্রহেলিকা।

জ্ঞানের মীমাংসা পরিমিত হইতে পরিমিত পদার্থে (যেমন "মনুষ্য মাত্রেই মরণশীল, শ্যাম মনুষ্য, অতএব শ্যাম মরণশীল")। দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তরে, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মর্ম্ম অবগত হইতে হইলে অবশ্যই দর্শনশাস্ত্রের সাহায্য আবশ্যক। কিন্তু যখন পরিমিত হইতে অনন্তের তত্ত্ব অবগত হইতে হইবে তখন আর দর্শন শাস্ত্র কি করিবে? দর্শন শাস্ত্রের সকল কৌশলই ব্যর্থ হইয়া গেল। তাহার কি সাধ্য সে তাহাকে অনন্তের সমীপস্থ করে। বরং দর্শন শাস্ত্রের উপর অযথা নির্ভর করিলে, বুদ্ধির বিকৃতি উপস্থিত হয়। দর্শন ও ব্যবহারিক শাস্ত্র এইই প্রতিপন্ন করে যে সেই অমৃতময় অনন্তদেবের রাগও আছে, দ্বেষ ও আছে, পক্ষপাতিতা আছে, তাঁহার সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করিতে হইলে মধ্যবর্ত্তিতার প্রয়োজন হয়, তাঁহার সঙ্গে একেবারে সাক্ষাৎকার লাভ করা মনুষ্যের পক্ষে যারপর নাই অসম্ভব। এইরূপে যখনই মনুষ্য আপনার বুদ্ধির উপর অন্যায্য নির্ভর স্থাপন করিতে যায়, তখনই আপনার চক্রে আপনি পতিত হইয়া শোচনীয় অবস্থায়, নিরাশার কূপে এককালে নিমজ্জিত হয়। উদ্ধারের আর কোন উপায় থাকে না।

এইরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে শরীর বা ইন্দ্রিয় মন বা বুদ্ধি ইহারদের মধ্যে কেহই ঈশ্বরের পথের সুপটু নিয়ামক নহে। ইহারা কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে থাকে। প্রত্যুত তাঁহার সমীপবর্ত্তী করিতে পারে না।

তাঁহাকে জানিতে হইলে ইন্দ্রিয়গণকে রিপুকুলকে সুশাসিত করিতে হইবে, মন হইতে পাপচিন্তাকে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে। রাগাদি বিষয় ব্যাপার হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলে, তবে

আত্মার জ্যোতি প্রবল হইবে। সেই নিষ্কলঙ্ক পরিশুদ্ধ পবিত্র আত্মাই পরমাত্মার উন্নততম রত্নবেদী। সেই আত্মাতে পবিত্র পরমেশ্বরের মুখজ্যোতি, যেমন সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় এমন আর কিছুতে নহে। বাহ্যজগত যেমন ইন্দ্রিয়ের বিষয়, বিষয়জ্ঞান যেমন বুদ্ধির বিষয়, ঈশ্বর তেমনি আত্মার বিষয়। আত্মাদ্বারা তিনি যেমন সুস্পষ্ট রূপে গ্রাহ্য হয়েন এমন আর কিছুতে নহে। বিষয় ব্যাপারে মনুষ্যের ইন্দ্রিয় ও মন উন্মত্ত, এমন একটু অবসর নাই যে আত্মা ঈশ্বরচিন্তা করিয়া বল লাভ করে, সেই জন্যই মনুষ্যের মধ্যে অনেকেই তাঁহার প্রতি উদাসীন। শরীরের স্ফূর্ত্তি ও বৃদ্ধির জন্য যেমন ব্যায়াম আবশ্যক, বুদ্ধির প্রাখর্য্য জন্য যেমন চিন্তা ও অধ্যয়ন আবশ্যক, আত্মার জীবন রক্ষা ও উন্নতি লাভের জন্য তেমনই ঈশ্বরের আবশ্যক। ঈশ্বর আত্মার প্রাণ। সূর্য্যের আলোকের অভাবে যেমন ওষধি বনস্পতি হীনবীর্য্য হইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেই রূপ সেই প্রেমসূর্য্যের অভাবে আধ্যাত্মিক বল একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়।

অসভ্যাবস্থায় বহির্জগতই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব। প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্যই তাহার সকল তৃপ্তির স্থল। সে অবস্থায় মানসিক বা ঐশ্বরিক চিন্তার সময় তাহার নিকট অতিশয় অল্প। আপনার উদারান্ন সংগ্রহই তাহার একমাত্র উপজীবিকা ও জীবনের লক্ষ্য। ক্রমে যখন জীবিকা নির্ব্বাহের সহজ উপায় অবলম্বিত হয়, যখন কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি হইতে থাকে তখন হইতেই মনুষ্য চিন্তাপ্রবণ হইতে থাকেন। কিন্তু সে চিন্তা আপনার সুখ ঐশ্বর্য্যলাভের চিন্তা। সে চিন্তা আপনাকে লইয়া, বিষয় ব্যাপারের উপরিতন স্তরে উঠিতে সমর্থ হয় না। এইরূপে ক্রমে যখন ইন্দ্রিয়ের উপর বুদ্ধির আধিপত্য স্থাপিত হয়, তখন হইতেই নিকৃষ্ট আমোদ প্রমোদে মনুষ্য নিস্পৃহ হইতে থাকে। ক্রমে বিজ্ঞান সাহিত্য তাহার তৃপ্তিপ্রদ হইতে থাকে।

কিন্তু এ অবস্থাও মনুষ্যের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা নহে। উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভের এখনও বিলম্ব রহিয়াছে। জীবনের অনিত্যতা, কৃষি বিজ্ঞানের অনিত্যতা, ধনজন পরিজনের অস্থিরতা ক্রমে তাহার আত্মার ভাবকে প্রজ্বলিত করিয়া তুলিতে থাকে। তখন মনুষ্য বুঝিতে থাকে যে ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ লাভই মনুষ্যের সকল লাভের চরমসীমা। তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলে মনুষ্যের আর অন্য কোন অভাব থাকে না।

ঈশ্বর আমারদের আত্মার অন্তরাত্মা। মানবাত্মা তাঁহারই সাদৃশ্যে গঠিত। ঈশ্বরবিষয়ক আস্তিক বুদ্ধি তাঁহার অনুপম পিতৃভাব অসদৃশ মাতৃস্নেহ, আত্মাই বিশদরূপে অনুভব করিতে পারে। "নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া" এই মতি তর্ক দ্বারা প্রাপনীয় নহে। তিনি আমারদের প্রত্যেকের আরাধ্য দেবতা প্রত্যেকেরই নিজস্ব ধন। কৃপণের ধনের ন্যায় তাঁহাকে আত্মার অভ্যন্তরে অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিতে হইবে। তিনি সাধনের ধন। ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধি তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রতিনিবৃত্ত হইলে তবে আত্মার বলে সাধনার বলে তাঁহার আত্মস্বরূপ আমারদের নিকট প্রতিভাত হয়।

মনুষ্যবিশেষের ন্যায় মনুষ্য সমাজেরও বাল্য, যৌবন ও পরিণতির অবস্থা আছে। মনুষ্য সমাজের ন্যায় মনুষ্য—যখন বাল্যাবস্থায় প্রবিষ্ট হয়, তখন আহার বিহার লইয়াই সে নিকৃষ্ট সুখ চরিতার্থ করিতে ব্যস্ত থাকে। তখন চিন্তা বা ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা সে কিছুই অবগত নহে। ক্রমে যখন

যৌবন উপস্থিত হয় জনসমাজে শিল্প বাণিজ্য সাহিত্য বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি হয়; মনুষ্যও উহার চর্চ্চায় আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। প্রভূত বলবিক্রম লাভ করিয়া বীরবিক্রমে চতুর্দ্দিক কম্পিত করিতে থাকে। সংসারের অনিত্যতা, সাংসারিক সুখের অস্থিরতা বুঝিতে পারে না। ক্রমে সাধন তপস্যায় তাহার অন্তর্দৃষ্টি প্রখর হয়। এ অবস্থা মনুষ্য বা সমাজের পরিণতির অবস্থা। যৌবনে যে কিছু সত্য সঞ্চয় করে, যে কিছু জ্ঞান উপার্জ্জন করে, যৌবন-সুলভ চপলতার অপগমে মনুষ্য তাহা ভোগ করিতে থাকে। যে অক্ষয় ধনে ধনী হইতে পারিলে নির্ভয় হওয়া যায়, মনুষ্য তাহারই অন্বেষণে কৃতসঙ্কল্প হয়। আত্মা এই অবসরে নিজ কন্দরে ঈশ্বরের সংমোহন মূর্ত্তি প্রতিফলিত করে। মনুষ্য তাহা দেখিয়া আর নয়ন ফিরাইতে পারে না। সংসারের দিকে আর দীপ্তশিরা হইয়া ধাবিত হয় না। বলিতে থাকে "সংসারের সুখ যাহা জানি তা, কাজ নাই সে সুখে সে ধনে"। এই অবস্থা জনসমাজের বা মনুষ্যের পক্ষে পরম সম্পদের অবস্থা। এই অবস্থায় উঠিতে পারিলে আর স্খলিতপদ হইতে হয় না। তিনিই যথার্থ ভাগ্যবান পুরুষ যিনি সংসার-মৃগতৃষ্ণিকায় প্রতারিত হইবার পূর্ব্বে অক্ষয় ব্রহ্মপদ দেখিতে পান। যিনি শরীর মন আত্মার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াও আত্মার অনন্ত ক্ষেত্র ও অনন্ত অধিকার ক্ষণমাত্র বিস্মৃত নহেন।

ব্রহ্মসাধন অতি কঠোর সাধন, শরীর মন আত্মা নিয়োজিত কর, প্রার্থনা কর, প্রার্থনা তাঁহার দ্বারের একমাত্র কুঞ্চিকা। তিনি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, মনেরও গ্রাহ্য নহেন। তিনি কেবল আত্মারই গ্রাহ্য। "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা"। তিনি বাক্য, মন ও চক্ষুর গোচর নহেন। যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়।

প্রেরিত।

ব্রাহ্মসমাজে অশান্তি।

(এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মের লেখার উপর আর এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মের মন্তব্য প্রকাশ)

বৃদ্ধ ব্রাহ্ম মহাশয় লিখিয়াছেন যে আধ্যাত্মিকতার অভাবই ব্রাহ্মসমাজের অশান্তির কারণ। ইহা অতি যথার্থ কথা কিন্তু আমাদিগের মতে সকল আধ্যাত্মিক গুণের মধ্যে ঔদার্য্য গুণের অভাবই এই অশান্তির বিশেষ কারণ। আমাদিগের কাহারও সঙ্গে একটু মত বিভেদ হইলেই আমাদিগের মনে তাহার প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষের উদয় হয় কিন্তু আমরা বিবেচনা করি না যে মনুষ্যের মুখশ্রী যেমন ভিন্ন ভিন্ন তেমনি ধর্ম্মমতও ভিন্ন ভিন্ন। আসল বিষয়ে যদি আমাদিগের মতের ঐক্য থাকে তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মতের অনৈক্যে কি আইসে যায়? শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের গত সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সময় তিনি ব্রাহ্মদিগকে যে অমূল্য উপদেশ দেন তাহাতে এবিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। "তোমরা সকলে এক-হৃদয় এক-বাক্য হইয়া চল—বেদবচনে তোমাদিগের প্রতি এই যে আমার স্নেহের আশীর্ব্বাদ ও হিত কামনা প্রকাশ করিলাম, এই বিবাদ কলহের মধ্যে তাহার প্রতি তোমাদিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ইহার জন্য যদি তোমরা এই পদ্ধতিটি অবলম্বন কর তবে ইহাতে সিদ্ধকাম হইবে। পদ্ধতিটি এই আমরা আদি ব্রাহ্ম, সাধারণ ব্রাহ্ম বা মন্ত্রগ্রাহী ব্রাহ্ম বা অন্য কোন রূপ

ব্রাহ্ম, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব বিস্মৃত হইয়া, আমরা ব্রাহ্ম এক ঈশ্বরের উপাসক, এক পিতার পুত্র, মনুষ্য আমাদিগের ভ্রাতা, এই মহৎ ভাবটির প্রতি আত্মার সমস্ত ঝোঁক সমর্পণ করি। এই পদ্ধতিই সম্মিলনের পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অবলম্বন করিলে তোমাদিগের মধ্য হইতে সকল বিবাদ চলিয়া যাইবে, শান্তির অভ্যুদয় হইবে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে।" বাঙ্গালীর দোষ-দর্শন-বৃত্তি প্রবল। এই প্রবলতা হেতু এই জাতি উচ্ছিন্ন যাইবার উপক্রম হইয়াছে। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে রাজনৈতিক বিষয়ে বঙ্গদেশ অপেক্ষা অনেক ঐক্য আছে। তাহার কারণ এই যে ঐ সকল দেশের লোকের দোষ-দর্শন-বৃত্তি এত প্রবল নহে। বঙ্গদেশে এই দোষ দর্শন বৃত্তির প্রবলতা রাজনৈতিক বিষয়ে যেমন অনৈক্য ও বিবাদের হেতু তেমনি ধর্ম্ম বিষয়েও অনৈক্য ও বিবাদের হেতু। মনুষ্যের দোষের ভাগ অপেক্ষা গুণের ভাগ দেখা কর্ত্তব্য। এই দোষ দর্শন প্রবৃত্তির প্রবলতার কারণ ঔদার্য্যের অভাব। ব্রাহ্মসমাজে অশান্তির আর এক কারণ প্রাধান্যের ইচ্ছা। ব্রাহ্মসমাজের লোক মুষ্টিমেয় লোক। এই মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে বিরোধ কলহের প্রবলতা দেখিয়া বাহিরের লোকে অবাক্ হয়। এই মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সকলেরই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রাধান্য স্থাপন করিবার ইচ্ছা। কিন্তু আমরা বিবেচনা করি না যে, যে প্রাধান্য চায় সে প্রাধান্য পায় না; যে প্রাধান্য চায় না সে প্রাধান্য পায়। যাহাকে ঈশ্বর প্রধান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন সে প্রধান হইতে চেষ্টাবান হউক বা না হউক সে প্রধান হইবেই। আর সকলই যদি প্রধান হইবেক তবে নিকৃষ্ট হইবেক কে? ব্রাহ্মসমাজের সকলেরই এক একটি নূতন নূতন মত, একটি একটি নূতন দল, স্থাপন করিয়া বাহাদুরি দেখাইবার ইচ্ছা। ইহাতে কেবল বিরোধ কলহই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদিগের সমাজের মহা বাক্য বৈচিত্র্যের ভিতর ঐক্য। আসল বিষয় ঐক্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় অনৈক্য অতএব নূতন দল স্থাপন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। নূতন দল স্থাপনের একমাত্র মূল প্রাধান্যের ইচ্ছা এবং নম্রতা ও ঔদার্য্যের অভাব। কোন মহাত্মা ঔদার্য্যের গুণ যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহার মারমর্ম্ম আমরা দিতেছি। "যদ্যপি দেবতার ন্যায় আমার বক্তৃতা-শক্তি থাকে, যদ্যপি আমার ভবিষৎ বিষয়ে দিব্য জ্ঞান থাকে, যদ্যপি গুপ্ত অগুপ্ত সকল বিদ্যা আমার আয়ত্ত থাকে, যদ্যপি ঈশ্বরে আমার খুব বিশ্বাস থাকে, যদ্যপি আমি আমার সর্ব্বস্ব দরিদ্রকে দিই কিন্তু যদি আমার ঔদার্য্য গুণ না থাকে তাহা হইলে তাহাতে কোন উপকারই হইবে না। ঔদার্য্য অনেক সহ্য করে, ঔদার্য্য সদাই সদয়। ঔদার্য্য ঈর্ষা করে না, ঔদার্য্য গর্ব্ব করে না, ঔদার্য্য স্ফীত হয় না, ঔদার্য্য অভদ্র ব্যবহার করে না। ঔদার্য্য স্বার্থ খুজে না, ঔদার্য্য শীঘ্র রুষ্ট হয় না, ঔদার্য্য কু ভাবে না। ঔদার্য্য সকল বহন করে, সকল বিশ্বাস করে, সকল আশা করে, সকল সহ্য করে। ঔদার্য্য কখন অসিদ্ধ হয় না। ভবিষৎ দৃষ্টি অসিদ্ধ হয়, বক্তৃতাশক্তি অসিদ্ধ হয়, বিদ্যা অসিদ্ধ হয়। কিন্তু ঔদার্য্য কখন অসিদ্ধ হয় না।" এই ঔদার্য্য গুণ যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবল হইবে তখন ব্রাহ্মসমাজের এক নূতন শ্রী হইবে।

কোন ইংরাজ খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচারক কাশীর দণ্ডী ও পরমহংসদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে তাঁহাদিগের মনের শান্তি অত্যন্ত ও তাঁহাদিগের চিত্ত সদাই আত্মপ্রসন্নতা দ্বারা

জ্যোতিষ্মান। "great tranquility of mind and radiant happiness of temper" কিন্তু ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ইহার বিপরীত দেখা যায়। ইঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি সদাই চঞ্চল, সদাই আবেগপূর্ণ, সদাই অসন্তুষ্ট, সদাই দোষানুসন্ধানে তৎপর। প্রাচীন ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন যে 'সম্যক প্রশান্ত চিত্তায় সমান্বিতায় প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্ম বিদ্যাং।' সম্যক প্রশান্তচিত্ত ও সমান্বিত ব্যক্তিকেই ব্রহ্মজ্ঞান দিবে। আমরা তাঁহাদিগের উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া কি এই শাস্তি ভোগ করিতেছি? ইহা গভীর আলোচনার বিষয়।

শান্তিনিকেতন।

মহর্ষি মনু কহিয়াছেন যে স্থলে অনেকানেক স্থানের ভগবদ্ভক্ত সাধুলোক সকল আসিয়া আশ্রয় লন তাহাই তীর্থ এবং তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণেই তৎতৎ স্থান পবিত্র স্থান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ফলত তীর্থস্থান থাকাতে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিশেষ উদ্দেশ্য ও উপকার সাধিত হয়। সংসারের অনেক পাপ তাপ জ্বালা যন্ত্রণা। কিছুদিনের জন্য ইহার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ ও সাধুসঙ্গ করিলে মনের নির্বৃতিলাভ হয় এবং সংসার তাপ অনেকটা ঘুচিয়া যায়। এই সাধু উদ্দেশে আজও অনেকে তীর্থ পর্য্যটন করিয়া সাধুসঙ্গে ও সৎ প্রসঙ্গে নবজীবন লাভ করিয়া থাকে। আমরা অতি আহ্লাদের সহিত ব্রাহ্ম সাধারণকে জানাইতেছি যে তাঁহাদের জন্য ঐরূপ একটী পবিত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। ইহা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বীরভূমের অন্তর্গত বোলপুরের সুপ্রসিদ্ধ শান্তিনিকেতন। তিনি ব্রাহ্মদিগের উপকারার্থ ঐস্থান উৎসর্গ করিলেন। ব্রহ্মসন্তান সকল ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থে ঐ স্থানে যাইবেন। উহা ব্রহ্মবিৎ সাধু লোকের আশ্রয়-ভূমি হইয়া রহিল। যাঁহারা সাংসারিক উৎপীড়নে কাতর হইয়া মনের শান্তি হারাইয়াছেন তাঁহারা ঐ শান্তিনিকেতনে যাত্রা করুন। উহা সাধু সমাগমে সততই পবিত্র। তথায় যাইলে জ্ঞানবল ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইতে পারিবেন। ঐ স্থানে বর্ষে বর্ষে একটী সাধু সজ্জনের মেলা হইবে। দেশ দেশান্তরের জ্ঞানী ও সাধুর সমাগম হইবে। যিনি সংশয়ী ধর্ম্মবাদ তাঁহার সংশয় দূর করিবে। যিনি আরুরুক্ষু তিনি ধর্ম্মের সোপান পাইবেন। যিনি প্রেমিক তিনি হৃদয়োন্মাদকর অনেক সৎকথা শুনিবেন। যিনি সজ্জনভক্ত তাঁহার আশা চরিতার্থ হইবে। এই স্থানের যেমন পবিত্রতা তেমনি রমণীয়তা। ইহার চতুর্দ্দিকে সুপ্রশস্ত প্রান্তর। স্বাস্থ্যকর মুক্ত বায়ু সততই বহিতেছে। মধ্যে উদ্যান ভূমি ও প্রকাণ্ড প্রাসাদ। তথায় ছায়াবৃক্ষ ও নির্ম্মল জলের অভাব নাই। কলকণ্ঠ বিহঙ্গের সুমধুর সঙ্গীতের বিরাম নাই। এই নির্জ্জন স্থান শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সাধনস্থান ছিল। তিনি অনেক সময় ঐ স্থানে কালাতিপাত করিতেন। ফলত তাঁহার অধিষ্ঠানে ঐ স্থান পবিত্র। যিনি যতই মনোবিকার লইয়া যান স্থানমাহাত্ম্যে তাঁহার মনে নির্ম্মল ও পবিত্র শান্তি আসিবে। ব্রাহ্মসমাজের অদ্বিতীয় ও চির বন্ধু শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মদিগের উপকারার্থ এই পবিত্র স্থান উৎসর্গ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজের যে সকল কার্য্য তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে ইহাও তন্মধ্যে একটী প্রধান কার্য্য। এখন ঈশ্বরের নিকট কায়মনে প্রার্থনা করি তিনি যে সৎ

উদ্দেশ্যে ইহা দান করিলেন তাহা যেন সুসিদ্ধ হয়।"

আমরা নিম্নে ইহার ট্রষ্টডীড মুদ্রিত করিয়া দিলাম। ইহা পাঠ করিলে ইহার কত উচ্চ ও সৎ উদ্দেশ্য তাহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ট্রষ্টডীড।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাং যোড়াসাঁকো কলিকাতা। শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়। পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়। সাং মাণিকতলা কলিকাতা। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী। পিতার নাম কৃপানাথ মুন্সী। হাং সাং পার্কষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

স্নেহাপদেষু।

লিখিতং শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতার নাম ৺ দ্বারকানাথ ঠাকুর সাকিম সহর কলিকাতা যোড়াসাঁকো হাল সাং পার্কষ্ট্রীট্।

কস্য ট্রষ্ট ডিড পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে জেলা বীরভূমের অন্তঃপাতি ডিষ্ট্রীক্ট রেজেষ্টারী বীরভূম সব রেজেষ্টারী বোলপুর পুলিস ডিবিজন বোলপুর পরগণে সেনভূম তালুক সুপুরের অন্তর্গত হুদা বোলপুরে পত্তনির ডৌল খারিজান মৌজে ভুবন নগরের মধ্যে বাঁধের উত্তরাংশে প্রথম তপসিলের লিখিত চৌহদ্দির অন্তর্গত আনুমানিক বিশ বিঘা জমি ও তদুপরিস্থিত বাগান ও এমারত যাহা এক্ষণে শান্তিনিকেতন নামে খ্যাত আছে ঐ বিশ বিঘা জমি আমি সন ১২৬৯ সালের ১৮ ফাল্গুন তারিখে শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ সিংদিগরের নিকট হইতে মৌরসী পাট্টা প্রাপ্ত হইয়া তদুপরি বাগান একতালা ও দোতলা ইমারত প্রস্তুত পূর্ব্বক মৌরসী স্বত্বে স্বত্ববান্ ও দখলিকার আছি। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্য একটী আশ্রম সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে ও অত্র ট্রষ্টডিডের লিখিত কার্য্য সম্পাদনার্থে আমি উক্ত শান্তিনিকেতন নামক সম্পত্তি ও তৎসংক্রান্ত স্থাবর অস্থাবর হক্ হকুক যাহা কিছু আছে ও যাহার মূল্য আনুমানিক ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা হইবেক ঐ সমুদায় সম্পত্তি তোমাদিগকে অর্পণ করিয়া ট্রষ্টী নিযুক্ত করিতেছি যে তোমরা ট্রষ্টী স্বরূপে স্বত্ববান হইয়া স্বয়ং ও এই ডিডের স্বর্ত্তমত স্থলাভিষিক্ত গণ ক্রমে চিরকাল এই ডিডের উদ্দেশ্য ও কার্য্য পশ্চাৎলিখিত নিয়ম মতে সম্পন্ন করিয়া দখলিকার থাকিবে। আমার বা আমার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তগণের ঐ সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব দখল রহিল না। উক্ত সম্পত্তি চিরকাল কেবল নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হইবে। ঐ ব্যবহারের প্রণালী এই ট্রষ্টডিডে যেরূপ লিখিত হইল তৎ বিপরীতে কখনো হইতে পারিবে না। এই ট্রষ্টীর কার্য্য সম্বন্ধে ট্রষ্টীগণের মধ্যে মতভেদ হইলে অধিকাংশের মত অনুসারে কার্য্য হইবেক। কোন ট্রষ্টী কার্য্য ত্যাগ করিলে কিম্বা কোন ট্রষ্টীর মৃত্যু হইলে অবশিষ্ট ট্রষ্টীগণ তাহার স্থানে এই ডিডের উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে উপযুক্ত ও ইচ্ছুক কোন প্রাপ্তবয়স্ক ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ট্রষ্টী নিযুক্ত করিবেন। নূতন ট্রষ্টী সর্ব্বাংশে এই ডিডের নিয়মাধীন হইবেন। উক্ত শান্তিনিকেতনে অপর সাধারণের একজন অথবা অনেকে একত্র হইয়া নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারিবেন, গৃহের অভ্যন্তরে উপাসনা করিতে হইলে ট্রষ্টীগণের সম্মতি আবশ্যক হইবেক, গৃহের বাহিরে ঐরূপ সম্মতির প্রয়োজন থাকিবেক না। নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত

কোন সম্প্রদায় বিশেষের অভীষ্ট দেবতা বা পশু, পক্ষী, মনুষ্যের বা মূর্ত্তির বা চিত্রের বা কোন চিহ্নের পূজা বা হোম যজ্ঞাদি ঐ শান্তিনিকেতনে হইবে না। ধর্ম্মানুষ্ঠান বা খাদ্যের জন্য জীবহিংসা বা মাংস আনয়ন বা আমিস ভোজন বা মদ্য পান ঐ স্থানে হইতে পারিবে না। কোন ধর্ম্ম বা মনুষ্যের উপাস্য দেবতার কোন প্রকার নিন্দা বা অবমাননা ঐ স্থানে হইবে না। এরূপ উপদেশাদি হইবে যাহা বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা ঈশ্বরের পূজা বন্দনাদি ধ্যান ধারণার উপযোগী হয় এবং যদ্দ্বারা নীতি ধর্ম্ম উপচিকীর্ষা এবং সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধিত হয়। কোন প্রকার অপবিত্র আমোদ প্রমোদ হইবে না। ধর্ম্মভাব উদ্দীপনের জন্য ট্রষ্টীগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাইবার চেষ্টা ও উদ্যোগ করিবেন। এই মেলাতে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সাধু পুরুষেরা আসিয়া ধর্ম্ম-বিচার ও ধর্ম্মালাপ করিতে পারিবেন। এই মেলার উৎসবে কোন প্রকার পৌত্তলিক আরাধনা হইবে না ও কুৎসিত আমোদ উল্লাস হইতে পারিবে না, মদ্য মাংস ব্যতীত এই মেলায় সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় হইতে পারিবে। যদি কালে এই মেলার দ্বারা কোন রূপ আয় হয় তবে ট্রষ্টীগণ ঐ আয়ের টাকা মেলার কিম্বা আশ্রমের উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন। এই ট্রষ্টের উদ্দিষ্ট আশ্রম-ধর্ম্মের উন্নতির জন্য ট্রষ্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্ম-বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন অতিথি সৎকার ও তজ্জন্য আবশ্যক হইলে উপযুক্ত গৃহ-নির্ম্মাণ ও স্থাবর অস্থাবর বস্তু ক্রয় করিয়া দিবেন এবং ঐ আশ্রম ধর্ম্মের উন্নতির বিধায় সকল প্রকার কর্ম্ম করিতে পারিবেন। ট্রষ্টীগণ যত্ন-সহকারে চিরকাল ঐ অর্পিত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন ও তজ্জন্য এবং শান্তি-নিকেতনের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত তথায় একজন উপযুক্ত সচ্চরিত্র, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে আশ্রমধারী নিযুক্ত করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে তাহাকে পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। ঐ আশ্রমধারী ট্রষ্টীগণের তত্ত্বাবধানের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিবেন। যদি আশ্রমধারী আপনার শিষ্যগণ মধ্যে কাহাকেও উপযুক্ত বোধ করেন তবে তিনি ট্রষ্টীগণের লিখিত অনুমতি গ্রহণে সেই শিষ্যকে আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতে পারিবেন। কিন্তু ট্রষ্টীগণের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া ঐ রূপ করিতে পারিবেন না, কিম্বা আশ্রমধারী তাহার যে শিষ্যকে ঐরূপ উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতে ইচ্ছা করেন যদি ট্রষ্টীগণের বিবেচনায় ঐ ব্যক্তি ঐ কার্য্যের উপযুক্ত না হয় তাহা হইলে তাঁহারা ঐ ব্যক্তির পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে আশ্রমধারী মনোনীত ও নিযুক্ত করিতে পারিবেন। আশ্রমধারীর মনোনীত শিষ্যকে আশ্রমধারীর পদে নিযুক্ত করিবার ও তাহাকে পরিবর্ত্তন করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ট্রষ্টীগণের থাকিবে। যদি কেহ কখন এই আশ্রমের উন্নতি বা সাহায্যের জন্য কিছু দান করেন তবে ট্রষ্টীগণ তাহা গ্রহণ করিবেন এবং তাহা এই ডিডের লিখিত কার্য্যে ব্যয় করিবেন। এই ডিডের লিখিত উদ্দেশ্য সাধন ও কার্য্য নির্ব্বাহ ও ব্যয় সঙ্কুলন জন্য দ্বিতীয় তফশীলের লিখিত সম্পত্তি সকল দান করিলাম, উহার আনুমানিক মূল্য ১৮৪৫২ টাকা। ট্রষ্টীগণ অদ্য হইতে ঐ সকল সম্পত্তি সংরক্ষণ ও সর্ব্বপ্রকার বিলিবন্দোবস্তের ভার প্রাপ্ত হইলেন। ঐ সকল সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের সর্ব্বপ্রকার ব্যয় ও রাজস্ব প্রভৃতি বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহা দ্বারা আশ্রমের আবশ্যকীয় ব্যয় আশ্র-

মের গৃহাদি মেরামত ও নির্ম্মাণ এবং এই-ডিডের লিখিত অন্যান্য সকল কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন, উক্ত প্রদত্ত সম্পত্তি সকলের আয়ের দ্বারা ট্রষ্টের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত হয় তবে ট্রষ্টীগণ তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট বা কোন রূপ নিরাপদ মালিকি সত্ত্বে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিবেন কিম্বা আশ্রম কিম্বা মেলার উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন। যদি কোন রূপ সম্পত্তি কিম্বা প্রমিসরি নোট খরিদ করা হয় তবে তাহা ট্রষ্টী-সম্পত্তি গণ্য হইয়া এই-ডিডের সর্ত্ত মত ব্যবহার হইবেক। কিন্তু উদ্বৃত্ত আয় হইতে যদি কোন গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট খরিদ করা হয় তাহা হইলে যদি আশ্রমের কোন কার্য্যে সেই প্রমিসরি নোট বিক্রয় করা আবশ্যক হয় তবে তাহা ট্রষ্টীগণ বিক্রয় করিতে পারিবেন। ট্রষ্টীগণ এই আশ্রমের আয় ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন। এই ডিডের লিখিত কার্য্য সমূহ ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে অর্পিত সম্পত্তির আয় ট্রষ্টীগণ ব্যয় করিতে পারিবেন না ও এই সকল সম্পত্তির কোন রূপ দান বিক্রয় দ্বারা হস্তান্তর ও দায় সংযোগ করিতে পারিবেন না। ও ট্রষ্টীগণের নিজের কোন রূপ দেনার নিমিত্ত এই সকল সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ দায়ি হইবে না। কিন্তু দ্বিতীয় তপশীলের লিখিত সম্পত্তির মধ্যে জেলা রাজসাহী ও পাবনার অন্তর্গত গালিমপুর ও ভর্ত্তিপাড়া নামে রেশমের যে দুইটি কুঠী আছে কোন কারণ বশত ঐ কুঠীর দ্বয়ের আয় যদি বদ্ধ হয় তাহা হইলে আবশ্যক বিবেচনায় ট্রষ্টীগণ এই দুই কুঠী বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্যের টাকা দ্বারায় ট্রষ্টীগণ গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট অথবা অন্য কোন নিরাপদ স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিবেন। সেই খরিদা সম্পত্তি আমার অর্পিত মূল সম্পত্তির ন্যায় গণ্য হইয়া এই ডিডের স্বর্ত্তমতে কার্য্য হইবেক এতদর্থে তৃতীয় তপশীলের লিখিত দলিল সমস্ত ট্রষ্টীগণকে বুঝাইয়া দিয়া সুস্থচিত্তে এই ট্রষ্টডিড্ লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯৪ সাল তারিখ ২৬ ফাল্গুন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভক্ত প্রহ্লাদ।

দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ গুরুগৃহে থাকিয়া দণ্ডনীতি প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন কিন্তু উহা তাঁহার ভাল লাগিত না। যে শাস্ত্র তুমি আমি এইরূপ ভেদজ্ঞান শিক্ষা দেয় প্রহ্লাদের বুদ্ধিতে তাহা অসৎশাস্ত্র। এই জন্য তাহাতে তাঁহার মনোনিবেশ হইত না।

একদা দৈত্যপতি তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস তুমি কি ভাল বুঝিয়াছ তাহা আমাকে বল।

প্রহ্লাদ কহিলেন পিতঃ তুমি আমি এই রূপ মিথ্যা বা ভ্রমজ্ঞান বশত যাহাদের বুদ্ধি চঞ্চল হইয়াছে তাহাদের এই অধঃপাতের একমাত্র হেতু অন্ধকূপতুল্য গৃহ এককালে পরিত্যাগ ও হরির পদাশ্রয়কে আমি শ্রেয়স্কর বিবেচনা করি।

দৈত্যপতি প্রহ্লাদের কথায় হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কহিলেন পরবুদ্ধিতেই বালকের এইরূপ মতিচ্ছন্ন হইতে পারে। যা হোক এখন ইহাকে গুরু গৃহে লইয়া যাও। আর যাহাতে হরিভক্তেরা প্রচ্ছন্ন ভাবে ইহার এইরূপ বুদ্ধিমোহ না জন্মাইতে পারে সে বিষয়ে সাবধান হও।

অনন্তর প্রহ্লাদের শিক্ষকেরা তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া স্নেহ বাক্যে কহিলেন বৎস প্রহ্লাদ তুমি সত্য বল, তোমার এইরূপ বুদ্ধিমোহ কেন উপস্থিত হইল। ইহা তোমার পরকৃত, না আপনা হইতেই জন্মিয়াছে। তুমি স্পষ্ট করিয়া বল শুনিতে আমাদের অতিশয় কৌতূহল হইতেছে।

প্রহ্লাদ কহিলেন দেখুন ব্রহ্মেরই মায়াবলে লোকের এইরূপ অনাত্মপর ভেদজ্ঞান উপস্থিত হয় কিন্তু তিনি অনুকূল হইলে এই জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। এবং অভিন্ন আত্মায় নিষ্ঠা আইসে। যখন মুনি ঋষিরা যাঁর দূরবগাহ চরিত্রে বিমুগ্ধ হন তখন অবিবেকীরা সেই একমাত্র আত্মাকে স্বপর ভেদে দর্শন করিবে ইহাতে আর কথা কি। আপনারা আমার যে এই বুদ্ধিভেদের কথা জিজ্ঞাসিলেন, বলিতে কি, ইহা তাঁহারই প্রসাদে ঘটিয়াছে। যেমন লৌহ অয়স্কান্তের সান্নিধ্য পাইলে আপনা হইতেই ভ্রাম্যমান হয় সেইরূপ ব্রহ্মের সান্নিধ্য লাভ করিয়া স্বতই আমার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। জানি না ইহা আমার কোন্ পুণ্যের ফল।

প্রহ্লাদের এই কথায় রাজসেবক গুরু অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং কহিলেন অরে, এই দৈত্যকুল চন্দন বৃক্ষের তুল্য, ইহাতে একটা কণ্টক বৃক্ষের জন্ম হইয়াছে। হরি চন্দন বনের উন্মূলনের পরশু, এই বালকটা সেই অস্ত্রেরই মুষ্টিদেশ।

শিক্ষকেরা প্রহ্লাদকে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া আবার দণ্ডনীতি প্রভৃতি শাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এইরূপ কিয়ৎকাল শিক্ষার পর একদা তাঁহারা দৈত্যপতির নিকট লইয়া গেলেন। দৈত্যরাজ পাত্র মিত্র সমভিব্যাহারে রাজসভায় উপবিষ্ট। প্রহ্লাদ প্রণাম করিবামাত্র তিনি তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলেন এবং স্নেহভরে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন বৎস। এ যাবৎকাল তুমি গুরুগৃহে যাহা শিক্ষা করিয়াছ আমার নিকট তাহার পরিচয় দেও।

প্রহ্লাদ কহিলেন পিতঃ যে শিক্ষায় ব্রহ্মের শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পরিচর্য্যা পূজা বন্দনা দাস্য সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণ ভক্তি জন্মে আমি তাহাকেই সৎ শিক্ষা বলি।

দৈত্যপতি পুত্র প্রহ্লাদের এই কথা শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র রোষাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার নেত্র আরক্ত হইয়া উঠিল এবং অধর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি শিক্ষকদিগকে কহিতে লাগিলেন রে নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ! তোমরা আমার বিদ্বেষের পাত্র হরির আশ্রয় লইয়াছ। এবং আমার অবমাননা করিয়া এই বালককে অসার বিষয় সকল শিক্ষা দিয়াছ। এই পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে তাহারা ছদ্মবেশী দুর্মিত্র। সুরাপায়ী প্রভৃতি মহাপাতকীদিগের যক্ষ্মাদি রোগ যেমন কালে প্রকাশ পায় সেইরূপ কালেই তাহাদের বিদ্বেষ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শিক্ষক কহিলেন দৈত্যরাজ আপনার পুত্র যাহা কহিতেছেন ইহা আমার বা অপর কাহারও উপদেশে হয় নাই। এই বালকের ইহা নৈসর্গিকী বুদ্ধি। অতএব আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন। আমাদের প্রতি এই রূপ দোষারোপ করিবেন না।

তখন দৈত্যরাজ কহিলেন প্রহ্লাদ, যদি তোমার জ্ঞান গুরুমুখী না হয় তবে তুমি এই অসৎ ও অভদ্র জ্ঞান কোথা হইতে পাইলে।

প্রহ্লাদ কহিলেন, পিত! সংসারেই যাহাদের সমস্ত সংকল্প বদ্ধ তাহাদের এই ব্রাহ্মী বুদ্ধি স্বত বা পরত কোন রূপেই উপস্থিত হইতে পারে না। তাহাদের ইন্দ্রিয় অসংযত সেই হেতু তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে এবং কেবলই ভোগ্য ভোজ্যের চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া থাকে।

ক্রমশঃ

ঈশ্বর অসীম।

চতুর্দ্দিকে আমাদের নানা বিষয় লালসা ঘিরিয়া রহিয়াছে, প্রতি পদক্ষেপে কণ্টকের আঘাত তবুও আমরা এই সংসারে সুখে বর্দ্ধিত হইতেছি। তাহার কারণ শুধু তিনি। তাঁহার প্রাণে আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে অনুপ্রাণিত হইতেছি বলিয়া সেই মহাপ্রাণের ছায়ায় বসিয়া আমরা বাল্য হইতে যৌবন, যৌবন হইতে প্রৌঢ়াবস্থা, প্রৌঢ়দশা হইতে বার্দ্ধক্যে পতিত হইয়া ক্রমশই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছি। তাহার বিরাম নাই। এই যে অগ্রসরের ভাব আমাদের প্রত্যেকের জীবনে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে ইহার জন্যই আমরা বাঁচিয়া আছি, বিষয় আমাদের বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না, আমরা সেই মহান লক্ষ্যের দিকে ধাবমান হইতেছি। সেই লক্ষ্য কি আমাদের বিভীষিকা? সেই লক্ষ্য কি আমাদের সীমাবদ্ধের ভয় দেখাইতেছে? না। যেমন কোন পথের উপর দাঁড়াইয়া যখন তাহার শেষ পর্য্যন্ত দেখি তখন স্বাভাবিক দৃষ্টির গতি অনুসারে মনে হয় বটে যে, পথ বুঝি ঐ স্থানে শেষ হইল আর নাই। কিন্তু পথের সেই সীমাবিন্দুতে যদি একবার গিয়া পঁহুছই তাহা হইলে তখন কি আমাদের যে সীমা মনে হইতেছিল তাহা থাকে? পথের আবার পূর্ব্বের মত সেই বিস্তার দেখিয়া আরও অগ্রসর হইবার ভাব জন্মে—হৃদয়ের আনন্দের প্রসারতা আরও বাড়িয়া যায়। সেইরূপ ব্রহ্ম আমাদের। সেই ব্রহ্মবিন্দুতে সকলি আসিয়া শেষ হইয়াছে। আমাদের নয়নের সমক্ষে তিনিই এক বিন্দু। সেই পরম বিন্দুকে কোন রূপ সীমাবদ্ধ করিয়া দেখা ও তাহাতে আপ্তকাম হইবার মানস করা আত্মার উন্নতির মহান ব্যাঘাত। দূর হইতে যত তাঁহাকে আমরা দেখিব আমাদের দৃষ্টির অপূর্ণতা নিবন্ধন ততই তাঁহাকে সীমা আকারে দেখিতে পাইব। যতই কাছে যাইব—সীমা নাই এই বিশ্বাস ভরে যত কাছে যাইব ততই তাঁহার মাধুরী স্পষ্ট বোধগম্য হইতে থাকিবে।

হে পরমাত্মন! তোমারেই প্রদক্ষিণ করিয়া আমাদের জীবন। তোমারই সহবাসে আমাদের আনন্দ। আমরা অদ্য তোমার উপাসনা করিবার নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তুমি আমাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধা, ভক্তি, পবিত্রতা প্রেরণ কর যাহাতে তোমার আনন্দ রূপ অমৃতরূপ দেখিয়া শান্তি লাভ করিতে পারি।

হিতেন্দ্র

নূতন পুস্তক।

সাহিত্য প্রসূন। শ্রীনৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। সংগ্রহকার বঙ্গীয় সাহিত্য ভণ্ডার হইতে কতিপয় রত্ন সংগ্রহ করিয়া ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আমরা এই সংগ্রহের বিশেষ আর কি পরিচয় দিব। যে সমস্ত লোক সুলেখক বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ তাঁহাদেরই গ্রন্থ হইতে এই পুস্তকের কলেবর পুষ্ট হইয়াছে। ফলত ইহা প্রবেশিকা পরীক্ষার একখানি উৎকৃষ্ট পাঠ্য পুস্তক হইতে পারে।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে যাঁহারা এপর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করেন নাই তাঁহারা আর বিলম্ব না করিয়া ত্বরায় দেয় মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। আশা করি এই বিষয়ের জন্য পুনরায় পত্র লিখিয়া তাঁহাদিগকে বিরক্ত ও আমাদিগের অনর্থক ডাকমাশুল ব্যয় করিতে হইবে না।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯।

৫৩৮ সংখ্যা। ১৮১০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজত। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আত্মার অমায়িক সহজ ভাব।

যাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি না কেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা তোমার নিকটতম বস্তু কে? তিনিই তাহার এই প্রত্যুত্তর দিবেন যে আমি আপনি। কেহই বলিবেন না যে আমি আপনা হইতে দূরে আছি; সকলেই বলিবেন যে আমার আপনার নিকট হইতে আমার লেশমাত্রও ব্যবধান নাই। অতএব যদি কোনও সত্য সর্ব্ববাদি-সম্মত হয় তবে তাহা এই যে, আত্মা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম বস্তু।

"আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের নিকটতম বস্তু" ইহা অপেক্ষা সহজ সত্য আর কিছুই নাই; কিন্তু সহজ বলিয়া ইহাকে উপেক্ষা করা হইতে পারে না; বীজকে ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিলে ফলের প্রত্যাশায় একবারে জলাঞ্জলি দিতে হয়। প্রকৃত কথা এই যে, সকল সত্যই পরস্পরের সহিত এরূপ অকাট্য সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত যে আমরা যদি একটি সামান্য সত্যকেও স্থিররূপে ধরিতে পারি তবে তাহার মধ্য দিয়া ক্রমশই উচ্চ হইতে উচ্চতর সত্য অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে থাকে। উপরি-উক্ত সহজ সত্যটির পথ-ধরিয়া চলিলে আমরা নিম্ন-লিখিত গুটিকতক অমূল্য আধ্যাত্মিক সত্যে সহজেই উপনীত হই।

প্রথমত, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম বস্তু তাহাকে হারাণো দুষ্কর; দুষ্কর তো বরং পদে আছে—তাহাকে হারাণো একবারেই অসম্ভব। এই কাগচের দুইটী পৃষ্ঠা—দুইএর মধ্যে ব্যবধান অবশ্যই আছে, তথাপি মোটামুটি এরূপ বলিলেও বলা যাইতে পারে যে এই কাগচের এক পৃষ্ঠা তাহার আর এক পৃষ্ঠাকে হারাইতে পারে না; কিন্তু আমাদের আপনার সঙ্গে আপনার সেটুকুও ব্যবধান নাই—মূলেই ব্যবধান নাই; কাজেই বলিতে হয় যে আপনাকে আপনি হারাণো একান্ত-পক্ষেই অসম্ভব। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে আত্মা কখনই আমাদের নিকট হইতে যাইবার বস্তু নহে—তাহা আমাদের চিরস্থায়ী পৈতৃক সম্পত্তি।

দ্বিতীয়ত, আত্মা যদি আমাদের এতই নিকটতম বস্তু—এমন কি তাহাকে হারাণো

পর্য্যন্ত অসম্ভব—তবে তাহার জন্য সাধনের প্রয়োজন কি? ইংলণ্ড হইতে আমি দূরে আছি এই জন্য ইংলণ্ডে যাইতে হইলে তাহার জন্য আমার সাধনের প্রয়োজন; কিন্তু আমি এখন কলিকাতায় রহিয়াছি, এ অবস্থায় কলিকাতা-প্রাপ্তির জন্য আমার সাধন আবার কিরূপ? তবে কি লোকে আত্মাকে লাভ করিবার জন্য এত যে কষ্টকর সাধনে প্রবৃত্ত হয়—সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতি? তাহা নহে। মনে কর যেন আমি বিদেশ হইতে নৌকাযোগে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিতেছি; একদিন প্রত্যূষে উঠিয়া দেখি যে, সমস্ত দিক্ বিদিক্ ঘন কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন; নাবিককে কোথায় আসিয়াছি জিজ্ঞাসা করাতে নাবিক বলিল কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি; কিন্তু আমি কলিকাতার চিহ্ন মাত্রও দেখিতে পাইতেছি না; এইরূপে আমি কলিকাতায় অবস্থিত হইয়াও কলিকাতাকে হারাইয়া বসিয়া আছি। এ অবস্থায় যদি আমি কোনপ্রকার সাধনা দ্বারা কুজ্ঝটিকা অপসারিত করিতে পারি তবেই আমি কলিকাতাকে পুনঃপ্রাপ্ত হই। সাধনের যে কি প্রয়োজন—এখন তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। আত্মাতে পৌঁছিবার জন্য নহে (আত্মার সহিত মূলেই যখন আমাদের কোন প্রকার ব্যবধান নাই, তখন তাহাতে তো আমরা পূর্ব্ব হইতেই পৌঁছিয়া বসিয়া আছি), তবে কি—না মনের ভ্রম-প্রমাদ-মোহ রূপ কুজ্ঝটিকা অপসারিত করিবার জন্যই সাধনের একমাত্র প্রয়োজন।

এইখানে কেহ বলিতে পারেন যে মনের কুজ্ঝটিকা কি আত্মার কুজ্ঝটিকা নহে—মন কি আত্মা হইতে পৃথক্ কোন বস্তু? আমাদের দেশের শাস্ত্র-সমূহে অনেক কাল যাবৎ এ বিষয়ের চরম বিচার-নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, তাহার সার মর্ম্ম এই; পরমার্থত আমি রোগ শোক জরা মৃত্যুর অতীত কিন্তু ব্যবহারত আমি রোগ শোক জরা মৃত্যুর অধীন; ইহারই ভাষান্তর এই যে আত্মা রোগ শোক জরা মৃত্যুর অতীত, মন রোগ শোক জরা মৃত্যুর অধীন; সংক্ষেপে পারমার্থিক আমিই আত্মা সাংসারিক আমিই মন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে মনই বা রোগ শোকাদির অধীন হয় কেন—আত্মাই বা তাহা না হয় কেন? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে মন পরিবর্ত্তনশীল নশ্বর বিষয়-সকলেতে প্রতিষ্ঠিত—বালির বাঁধের উপরে প্রতিষ্ঠিত—তাই তাহা রোগ শোকাদিতে আক্রান্ত হয়; আত্মা অনাদ্যনন্ত পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত—অটল ভিত্তিমূলের উপরে প্রতিষ্ঠিত—তাই তাহাকে রোগ শোকাদি কোন প্রকার দুর্ঘটনাই নাগাল পায় না; মেঘমালা পর্ব্বতের কটিদেশেই ঘুরিয়া বেড়ায়, শিখরকে কোন প্রকারেই স্পর্শ করিতে পারে না। এইখানে এইটীর প্রতি বিশেষ-রূপে দৃষ্টি করা আবশ্যক যে, আমাদের আত্মা আমাদের আপনাদের সাধনের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে কিন্তু পরমাত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত। আমাদিগকে যদি আপনার চেষ্টায় নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি নিয়মিত করিতে হইত—অন্ন পরিপাক করিতে হইত—শারীরিক উপাদান সকল নির্ম্মাণ করিতে হইত তাহা হইলে আমাদের শরীরকে এক মুহূর্ত্তও টেঁকিয়া থাকিতে হইত না; তেমনি যদি আমাদের আপনার চেষ্টায় আত্মার স্থিতি রক্ষা করিতে হইত তাহা হইলে আত্মা অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইত। বরং প্রদীপকে ফাঁকা স্থানে বাঁচাইয়া রাখিলেও রাখা যাইতে পারে—আত্মাকে আপনার চেষ্টায় বাঁচাইয়া রাখা দেবতারও অসাধ্য। কিন্তু যখন আত্মা পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে—তখন সে মাতৃক্রোড়ে রহিয়াছে—সেখান হইতে কেহই তাহাকে অপহরণ করিতে পারে না ও সেখানে তাহাকে কোন বিপদই স্পর্শ করিতে পারে না।

সাধন তবে কিসের জন্য? সত্য বটে আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের নিকটতম বস্তু; কিন্তু আমরা যখন আমাদের মনের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখিতে পাই যে আমাদের মন সর্ব্বদাই আমাদের আপনাদের নিকট-হইতে দূরে দূরে পরিভ্রমণ করে। বহির্ব্বস্তু যেমন ইতস্তত চালিত হয়—মনও সেইরূপ ইতস্তত চালিত হয়; কখনও বা প্রকৃতির অধীনে চালিত হয় কখনও বা আমাদের আপনাদের অধীনে চালিত হয়; এই মনকে বশীভূত করাই সাধনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু আর এক দিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমরা বহির্বস্তু সকলকে আপন ইচ্ছায় ইতস্তত চালনা করিতে পারি বটে, কিন্তু বহির্বস্তু-সকলের মূলস্থানীয় প্রকৃতির উপরে আমাদের কোন হস্ত নাই। তেমনি আবার আমরা আমাদের মনকে আপন ইচ্ছানুসারে যথা তথা চালনা করিতে পারি বটে, কিন্তু মনের মূলস্থানীয় আত্মার উপরে আমাদের আপনাদের কোন হস্ত নাই। সমস্তের মূলস্থান একমাত্র কেবল পরব্রহ্মেতেই প্রতিষ্ঠিত এবং সেখান হইতে তাহা তিলমাত্রও বিচলিত হইতে পারে না। আমরা বহু যত্নে বীজ আনয়ন করিলাম—ক্ষেত্রকর্ষণ করিলাম—বীজকে তাহার সেই সুখের শয্যায় নিহিত করিলাম; তাহার পর বীজ আমাদের নিকট কোন পরামর্শ, জিজ্ঞাসা না করিয়া আপনার কার্য্য আপনি করিতে আরম্ভ করিল; কিছু দিন যাইতে না যাইতেই অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল; তাহার আর কিছু দিন পরে শাখাপত্র ফল ফুলে সুসজ্জিত হইয়া উঠিল; ইহাতে আমাদের হস্ত কতটুকু? শুদ্ধ কেবল বীজকে আনয়ন করা এবং ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করা—এইমাত্র। মনকে সেই রূপ বহিঃপ্রদেশ হইতে প্রত্যানয়ন করা এবং আত্মাতে সমাহিত করা অবশ্যই আমাদের সাধন-সাপেক্ষ; কিন্তু তাহার পর ঈশ্বর-প্রসাদে মন আপনার কার্য্য আপনি করিয়া লয়; আমাদের সাধনের কোন অপেক্ষা রাখে না। শ্রীমৎ ভগবৎগীতা বলিতেছেন—

"যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরং।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতৎ আত্মন্যেব বশং নয়েৎ।"

অর্থাৎ চঞ্চল অস্থির মন যেখানে যেখানে ধাবিত হয় সেই সেই স্থান হইতেই তাহাকে বাগাইয়া আনিয়া আত্মাতে সংযত করিয়া রাখিবে। আরও বলিতেছেন—

"শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।"

অর্থাৎ ধৈর্য্যসম্পন্ন বুদ্ধি দ্বারা মনকে অল্পে অল্পে বিষয় হইতে প্রত্যাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে আত্মাতে সন্নিবিষ্ট করিয়া কোন চিন্তাই করিবে না। এইরূপ মনকে প্রত্যানয়ন করা এবং তাহাকে আত্মাতে সন্নিবিষ্ট করা ইহাই সাধনের মুখ্য কার্য্য। তাহার পর যাহা কিছু হইবার তাহা ঈশ্বর-প্রসাদে আপনা হইতেই হইবে,—তাহার জন্য আমাদের চিন্তার কিছুমাত্র প্রয়োজন করে না। তাই কথিত হইয়াছে "ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ"। বীজকে যত্ন পূর্ব্বক বপন করা অবশ্য আমাদের সাধন-সাপেক্ষ,

তাহার পরে আর আমাদের চিন্তার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই; তখন বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম, তাহার পরে ক্রমে ক্রমে পত্রপুষ্প-ফলোদ্গম, ইত্যাদি যাহা কিছু হইবার তাহা আপনা হইতেই হয়। আর এক কথা এই যে, আমাদের অভীষ্ট বিষয় যতক্ষণ আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকে ততক্ষণই তাহার জন্য আমাদের ভাবনা চিন্তা শোভা পায়; কিন্তু যখন আমরা তাহাকে মুষ্টির অভ্যন্তরে প্রাপ্ত হই তখন তাহার জন্য আমাদের ভাবনাই বা কি, আর, চিন্তাই বা কি। তখন চিন্তা আনন্দকে সম্মুখে দেখিয়া তাহাকে আপনার আসন ছাড়িয়া দিয়া আপনি অন্তর্ধান করে। তেমনি আমাদের মন যতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মা হইতে দূরে দূরে ঘুরিয়া বেড়ায় ততক্ষণই আত্মার জন্য আমাদের যাহা কিছু ভাবনা চিন্তা; কিন্তু যখন আমাদের মন আত্মাতে রীতিমত আড্ডা গাড়িয়া বসে—আত্মাকে যখন করতলে প্রাপ্ত হয়—তখন আর ভাবনা চিন্তার আবশ্যকতা থাকে না, তখন বিমল আনন্দ অভ্যুদিত হইয়া সমস্ত ভাবনা চিন্তা গ্রাস করিয়া ফেলে।

এতক্ষণ ধরিয়া যাহা আলোচনা করা হইল তাহা হইতে পাওয়া যাইতেছে যে, মনের গতি-কে বিষয় রাজ্য হইতে আত্মার দিকে ফিরাইয়া আনাই সাধন। বহির্বস্তুর গতি এবং মনের গতি এ দুয়ের মধ্যে তুলনা করিয়া দেখিলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, গতিশীল বহির্বস্তু হইতে বস্তুটিকে বাদ দিয়া শুদ্ধ যদি তাহার গতিটিকে গ্রহণ করা যায়, তবে সেই রূপ বস্তু-শূন্য গতিই মনের গতির একমাত্র উপমা-স্থল, কেননা মন যখন চলে তখন তাহার সে চলার সঙ্গে কোন বস্তু মিশ্রিত থাকে না। তাহার সেই গতি শূন্যে অধিষ্ঠিত। কিন্তু গতি বস্তুকে চায়—স্থিতিকে চায়, নিয়ম-শৃঙ্খলা পরিধান করিতে চায়; শূন্যে শূন্যে থাকিতে চায় না; এই জন্য মন আপনার গতি-কে বিষয় ক্ষেত্রে মূর্ত্তিমান করিবার জন্য—অবস্তুক গতি'কে সবস্তুক করিবার জন্য—লালায়িত হয়; মন স্বভাবতই আপনার গতি-কে নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি নৈসর্গিক ক্রিয়াতে এবং চলা-ফেরা, দেখা-শোনা, বলা-কহা, নৃত্য গীত, ক্রীড়া কৌতুক প্রভৃতি স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়াতে মূর্ত্তিমান করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। কিন্তু বিষয়-ক্ষেত্র পরিমিত, মনের গতি অপরিমিত; বিষয়-ক্ষেত্রে মনের গতি এক আনা মাত্র চরিতার্থ হয়—পোনেরো আনা অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। সুতরাং মন তাহাতে আশানুরূপ তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনা কখনই নিবৃত্ত হয় না—ঘৃত প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। সাধক তাই বিষয়-ক্ষেত্র হইতে মনের গতি ফিরাইয়া আনিয়া সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম এবং অন্তরতম আত্মাতে সমাহিত করেন—ইহাতে তাঁহার মন স্বস্থানে বসিয়াই সমস্ত কামনার বিষয় হাত বাড়াইয়া পায়; এইরূপ সাধকই "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ" ইনি আত্মাতে ক্রীড়া করেন, আত্মাতে রমণ করেন, এবং সৎকর্ম্মশালী হয়েন—ইনি ব্রহ্মবিৎদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এবং এইরূপ সাধক উপলক্ষে ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে যে

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

অচল-প্রতিষ্ঠ সমুদ্রে যেমন চতুর্দ্দিক্ হইতে নদী আসিয়া বিলীন হয় তেমনি কামনা-সকল যাঁহাতে আসিয়া লয় প্রাপ্ত হয়—তিনিই শান্তি লাভ করেন, কামনার জন্য যিনি লালায়িত তিনি নহেন।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এই যে, সাধক অনেক সাধ্য-সাধনা দ্বারা অবশেষে যে আধ্যাত্মিক আনন্দে উপনীত হ'ন—বাস্তবিক ধরিতে গেলে তাহা সাধন-নিরপেক্ষ; তাহা আত্মার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি নহে—তাহা আত্মার পৈতৃক সম্পত্তি; পরমাত্মার প্রসাদ এবং করুণাই তাহার মূল; মোহাচ্ছন্ন মনের আবরণে তাহা ভস্মাচ্ছাদিত ছিল—সাধক সেই ভস্মরাশি অপসারিত করিয়া ফেলিল, আর, আত্মার সুবিমল আনন্দ আপন মহিমায় জাগ্রত হইয়া উঠিল। যাহা শুদ্ধ কেবল আমাদের সাধনের উপর নির্ভর করে তাহাতে বিশ্বাস নাই; কেননা বিপরীত সাধন দ্বারা তাহার ধ্বংস হইলেও হইতে পারে। আমরা যদি অনেক সাধ্য-সাধনায় একটা বৃহৎ উপলখণ্ডকে পর্ব্বতের উপর উত্তোলন করি, তবে তাহার বিপরীত সাধন দ্বারা অতীব সহজে তাহাকে আমরা পর্ব্বত হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিতে পারি। কিন্তু আত্মার স্বভাবসিদ্ধ আনন্দ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মার হস্তে গচ্ছিত রহিয়াছে—সেখান হইতে তাহা কোনক্রমেই বিচ্যুত হইবার নহে; তাহা বিষয়-মোহ দ্বারা মেঘাচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু কাহারও সাধ্য নাই যে তাহাকে অপহরণ করে। মনের মোহাবরণ অপসারিত হইলেই আত্মার স্বকীয় পারমার্থিক ভাব—জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান—অমায়িক প্রেম ও অপর্য্যাপ্ত শান্তিসুধা—মনের উপর কার্য্য করিতে পথ পায়; তখন, আত্মারূপ স্পর্শমণি সংসারকে পারমার্থিক রাজ্য করিয়া তুলে—লৌহকে সুবর্ণ করিয়া তুলে। ঈশ্বরের মহিমা যেমন অনন্ত তাঁহার করুণা তেমনি অপার; যেমন তিনি—তেমনি তাঁহার দান—সকলই আশ্চর্য্য, কিন্তু তাঁহার অপরাজিত করুণার নিকটে কিছুই আশ্চর্য্য নহে। অতএব পাপরাশিতে ভারাক্রান্ত কলুষিত মন যে তাঁহার প্রসাদে পুনর্ব্বার নবোদিত দিবাকরের ন্যায় উজ্জ্বল বদনে দীপ্তি পাইবে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

"সদ্‌গুরু পাঁওয়ে, ভেদ বতাঁওয়ে, জ্ঞান করে উপদেশ।
কয়লাকি ময়লা ছুটে যব্ আপ্ করে পরবেশ॥"

আত্মার অন্তরতম আনন্দ যে আত্মার নিজস্ব সম্পত্তি—তাহা যে কখনই আত্মা হইতে বিচ্যুত হইতে পারে না—তাহার প্রমাণ এই যে, আত্মাতে সত্য এবং জ্ঞান একীভূত হইয়া স্বভাবতই আনন্দে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। জ্ঞান দুইরূপ—বস্তু হইতে পৃথক থাকিয়া বস্তুকে জানা—এবং বস্তু হইয়া বস্তুকে জানা। বহির্বস্তুকে জানিবার সময় আমরা বস্তু হইতে পৃথক্ থাকিয়া বস্তুকে জানি; আত্মাকে জানিবার সময় আমরা আত্মা হইয়া আত্মাকে জানি। যখন আমরা ঘটি বাটীকে সত্য বলিয়া জানি, তখন সত্য আমাদের বাহিরে—জ্ঞান আমাদের অন্তরে—সত্য এবং জ্ঞান পরস্পর হইতে দূরে অবস্থিত; কিন্তু যখন আমরা আত্মাকে সত্য বলিয়া জানি, তখন সত্যও আমাদের অন্তরে—জ্ঞানও আমাদের অন্তরে—দুয়ের মধ্যে তিলমাত্রও ব্যবধান নাই। আত্মা যখন আপনাতে আপনি গলিয়া একীভূত হইয়া আপনাকে জানে তখন তাহার সেরূপ জানাকে জ্ঞান বলিলেও বলা যায়—প্রেম বলিলেও বলা

যায়; বাস্তবিক তাহা জ্ঞান এবং প্রেম দুয়েরই পরাকাষ্ঠা। আত্মা আপনাকে আপনি চায়, অথচ তাহার আপনার সহিত আপনার ব্যবধান নাই; অভিলষিত বস্তুর সহিত ব্যবধান না থাকা কত না আনন্দের প্রস্রবণ। এইরূপে আত্মাতে সত্য এবং জ্ঞান মিলিয়া মিশিয়া স্বভাবতই আনন্দে পরিণত হইয়া রহিয়াছে; তাহাকে মোহমুক্ত করিয়া আলোকে আবিষ্কৃত করা এবং কার্য্যে ফলিত করা—ইহাই সাধনের সার সংকল্প।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, আত্মার সহজ আনন্দ বীজ-স্বরূপ; তাহার মধ্য হইতে ক্রমে ক্রমে পরমাত্মার প্রতি প্রেম অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। সকলেই দেখিয়াছেন—ছোলার বীজের দুই দল ভেদ করিয়া কেমন অল্পে অল্পে অঙ্কুর উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে; সত্য এবং জ্ঞান সেইরূপ আত্মার দুইটি দল; তাহার মধ্য হইতে আনন্দ-রূপ অঙ্কুর উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়া পরমাত্মার প্রতি প্রসারিত হয়। এইরূপে যখন বিজ্ঞান-ময় কোষ হইতে আনন্দ-ময় কোষ উন্মেষিত হইয়া পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত হয়, তখন পরমাত্মার প্রসাদ-বারি এবং শান্তি-সুধা অবতীর্ণ হইয়া আত্মাতে নূতন জীবন সঞ্চার করে। এই যে এফটি কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আত্মার সহজ আনন্দ আমাদের সাধনের উপর নির্ভর করে না, ইহার অর্থই এই যে, তাহা জগতের মূলতম এবং অন্তরতম প্রদেশ হইতে—সাক্ষাৎ পরমাত্মা হইতে—আসিতেছে; সাধক পরমাত্মার এই অপার করুণা দৃষ্টে এরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হ'ন যে, তিনি তাঁহার ভক্ত সেবক এবং প্রেমিক না হইয়া কিছুতেই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। পরমাত্মাই আত্মার পরম প্রতিষ্ঠা এবং চরম পর্য্যাপ্তি।

বর্ষশেষ উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজ।

নববর্ষের আগমন দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া অদ্যকার প্রাচীন সূর্য্য গভীর সমুদ্র-গর্ভে প্রবেশ করিল—বর্ষবিম্ব অনন্ত কাল-সাগরে বিলীন হইতে চলিল। সুখ দুঃখময় বর্ত্তমানের ঘটনাবলী চিরকালের জন্য স্মৃতির পুরাতন কক্ষে নিহিত হইল। পৃথিবীর গণনা ক্রমে আমরা জীবন পথে এক বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া ঈশ্বরের দিকে—অমৃতের দিকে একপদ অগ্রসর হইতে চলিলাম। অদ্যকার রজনীর সঙ্গে সঙ্গে আমারদের জীবনের এক অঙ্কের পরিসমাপ্তি হইল। যাঁহার উদার সদাব্রতে লালিত পালিত হইয়া নানা ঝঞ্ঝাতরঙ্গের মধ্যেও তাঁহার অভয় হস্ত দেখিতে পাইয়া হৃদয়ের বলকে শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছি, শোক-তাপে ভয় বিপদে প্রপীড়িত হইয়াও যাঁহার প্রসন্ন-মূর্ত্তি সন্দর্শনে ধৈর্য্য ধারণে সমর্থ হইয়াছি, পাপের পঙ্কিল হ্রদে পতিত হইয়াও যাঁহার বজ্রনির্ঘোষী কঠোর আদেশ শ্রবণে কম্পিত কলেবরে সে পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে শিক্ষা করিয়াছি, আজ বৎসরের শেষ রজনীতে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সকলে সমাগত হইয়াছি। আমরা ভূত ভবিষ্যতের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। সম্মুখে দিগন্ত বিশ্রান্ত অনন্তপথ, প্রাণবিহঙ্গ অনন্ত আকাশে উড্ডীন হইবার জন্য বর্ষকালের পর বর্ষকাল অতিক্রম করিয়া সেই মহা-রজনীর অবসান প্রতীক্ষা করিতেছে। যেখানে দেশ কালের ব্যবধান নাই, পক্ষ-মাস ঋতু সম্বৎসরের পর্য্যাবর্ত্তন নাই, যেখানে প্রেম-সূর্য্যের সুবিমল আলোকে দিক্ বিদিক্ জ্যোতিষ্মান রহিয়া রহিয়াছে, সেই পুণ্যভূমির পবিত্র জ্যোতি সহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

সংসারবন্ধন আমাদিগকে শত বন্ধনে জড়িত করিয়া রাখিয়াছে। স্ত্রীপুত্র পরিবারের দুশ্ছেদ্য মায়াবন্ধন, ভোগ ঐশ্বর্য্যের তীব্র আকর্ষণ আত্মার ভাবকে নির্জ্জীব করিয়া ফেলিতেছে। শমীতরুর ন্যায় অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ আমারদের অন্তরে, অথচ আমরা ইতর প্রাণীদিগের প্রাকৃতিক নিয়মের একমাত্র বশবর্ত্তী। ইহার মধ্যে ঈশ্বরের পদছায়ায় সঞ্চরণ করিতে অভ্যাস করিতে হইবে। সাধন তপস্যাবলে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। একদিকে আমরা ভৌতিক জীব, আর একদিকে ঈশ্বরের বিশেষ কৃপাপাত্র, স্নেহের ধন আধ্যাত্মিক জীব। সংসারের তীব্র ঘূর্ণায় পতিত হইয়া আপনার উচ্চ অধিকার, বিমল আনন্দ ভোগে বঞ্চিত থাকিয়া দিনযামিনী বৃথায় ক্ষেপণ করিতেছিলাম তাই বর্ষের শেষ মুহূর্ত্ত প্রাণে আঘাত দিয়া মর্ম্মস্থলকে প্রকম্পিত করিয়া আমাদিগকে জাগ্রত ও সচকিত করিয়া তুলিল।

আজ বর্ষের শেষ রাত্রি! এইকথা স্মরণ হইবা মাত্র যেন কি এক ভয়ানক তরঙ্গ হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিল। বর্ষচক্র নিঃস্তব্ধে ঘূর্ণিত হইয়া যেমন পূর্ণ এক বৎসরের শেষ নিশাকে আমারদের সম্মুখে আনয়ন করিল এমনই করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সেই মহা নিশাকে আমারদের সমীপস্থ করিবে তখন চিরজন্মের মত পৃথিবীর ধনঐশ্বর্য্যের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে, রোরুদ্যমান হৃদয়-বন্ধু সকলকে মর্ম্মের গভীরতম প্রদেশ হইতে উৎপাটিত করিতে হইবে, শোভা সৌন্দর্য্য হইতে চিরকালের মত নয়নকে মুদ্রিত করিতে হইবে, প্রাণের সহচর অনুচর জানিয়া যাঁহাদিগকে লইয়া সংসার গঠন করিতেছি, চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া সকলের নিকট হইতে পলায়ন করিতে হইবে। আমার এ শরীরসম্বদ্ধ বালুকণা ভস্মরাশিতে পর্য্যবসিত হইবে। এ সকল বিষয় আলোচনা করিলে ধমনীর রক্ত ধমনীতে রহিয়া যায়, হৃৎপিণ্ড অবসন্ন হইয়া পড়ে, রক্ত জলে পরিণত হয়, মস্তিষ্কের ভিতরে অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, দণ্ডায়মান হইবার আর সাধ্য থাকে না। মনে হয় বাস্তবিকই কি আমার অবস্থা ঈদৃশ শোচনীয়, সত্যই কি শরীর ধূলায় ধূসরিত হইবে অথবা আমি স্বপ্ন দেখিতেছি। সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া দ্রুতবেগে কোন এক অজানিত দেশে পলায়ন করিতে পারিলে যেন সে ব্যাকুলতার পরিসমাপ্তি হয়।

সম্বৎসরকাল পরে যে আমরা এই পবিত্র স্থানে শুভ মুহূর্ত্তে সকলে আগমন করিয়াছি, এখনই আমারদের শূন্য হৃদয়ে ঈদৃশ উদাস ভাবের অভিনয় হইতেছে। চঞ্চল কালস্রোত আমাদিগের হৃদয়ের জড়তা অপসারিত করিয়া দিয়া এককালে পৃথিবীর আশা ভরসার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া চলিয়া গেল। আমরা যেন সমুদ্রগামী ভগ্ননৌকা নাবিকের ন্যায় বেলাভূমিতে উপবেশন করিয়া বিস্মিত ও ভীত হইয়া নিজ নিজ নিয়তির বিষয় চিন্তা করিতেছি। আজ নিরাশার পবন চতুর্দ্দিকে বহমান হইয়া সকলের ভীতি উৎপাদন করিতেছে।

সংসারের অনিত্যতা হৃদয়ে সুন্দর-রূপে প্রতিভাত না হইলে, বৈরাগ্যের ভাব অন্তরে সঞ্চয়িত করিতে না পারিলে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহাকে স্থায়ীরূপে হৃদয়মন্দিরে রক্ষা ক-

রিবার জন্য মনুষ্যের ব্যাকুলতা জন্মে না। সংসারকে লইয়া যদি আমরা হৃদয়কে পূর্ণ করি, অথচ তাহার মধ্যে আবার ঈশ্বরের জন্য লালায়িত হই, তবে কেমন করিয়া তাঁহার প্রীতি-পীযূষপানে কৃতার্থ হইতে পারি? আলোক অন্ধকার কেমন করিয়া এক সময়ে একস্থান অধিকার করিতে পারে। আত্মার পিপাসা অনুভব করিয়া তাহাতেই নীয়মান হইয়া লোকে ঈশ্বরের দ্বারের নিকটে দণ্ডায়মান হয় না, সেই জন্য সংসার ও ঈশ্বরকে এককালে সম্ভোগ করিতে গিয়া ধর্ম্ম হইতে ও ঈশ্বর হইতে পরিচ্যুত হয়। যিনি পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট হন, যিনি হৃদয়ের স্পর্শমণি বোধে তাঁহাকে হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে অতি যত্নে রক্ষা করেন, তিনিই সংসারে থাকিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। সংসারের ক্ষতি বৃদ্ধি তাঁহাকে উচ্ছৃঙ্খল করিতে পারে না। তিনি এখানে থাকিয়াই প্রতিকূল স্রোতের মধ্যেও পরম শান্তিলাভ করেন।

স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা। তরতি শোকং
তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তো মৃতো ভবতি।

তিনি আনন্দনীয় পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়েন, তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, হৃদয়গ্রন্থি সমুদয় হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন।

আয়ুক্ষয়কর বর্ষকাল মৃত্যুর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে চলিয়া যাইতেছে। চতুর্দ্দিকে মৃত্যু। অপোগণ্ড শিশু বালক যুবা, প্রৌঢ় বৃদ্ধ সকলেই মৃত্যুর অভিমুখীন। কে জানে কবে কাহার এই দেহের বিলোপ হইবে। মৃত্যুর করাল গ্রাসে কবে কাহাকে নিষ্পেশিত হইতে হয়। মৃত্যুর প্রতিকৃতি এই ভয়াবহ সংসারের চারিদিকেই মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি। দাবানলপরিবেষ্টিত এই বধ্যভূমির মধ্যে থাকিয়াও আমরা সকল সময়ে নিজ অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া নিজ নিজ আহার বিহার লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। কেবল শোক দুঃখ ও বহির্জগতের নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন আমাদিগকে সচেতন করিয়া তোলে। তাই আমরা সকল ভ্রাতায় মিলিত হইয়া দুঃখ দুর্দৈবের পরপারে সহজে উপনীত হইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া বিপদবারণ পরমেশ্বরকে দীনভাবে আহ্বান করিতেছি, পোতকে নির্মজ্জনোন্মুখ দেখিয়া তাঁহার দেবপ্রসাদ ভিক্ষা করিতেছি।

করুণানিধান! তুমি আমাদিগকে দুর্ব্বল জানিয়া কেন এই ভয়ানক পরীক্ষাক্ষেত্রে প্রেরণ করিলে, আমরা যে প্রতিপদে পরাজিত হইয়া তোমা হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছি। আমারদের এমন বল কোথায় যে সংসারের তীব্র আকর্ষণে স্থির থাকিতে পারি, "স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি" যিনি তোমাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় কখনও মরণহীন হন না, এই যে উজ্জ্বল সত্য আমারদের নিকটে প্রেরণ করিয়াছ কই তাহা বক্ষে ধারণ করিয়া সংসারে সঞ্চরণ করিতেছি। যাহা সম্মুখে পাই তাহাতেই প্রীতি স্থাপন করিয়া যে সহস্র বৃশ্চিকদংশনে দংশিত হইতেছি, তোমাকে ছাড়িয়া নশ্বর পদার্থ লইয়া হৃতসর্ব্বস্ব হইতেছি। আপনারও হৃদয়কে তাহাতে আহুতি দিতেছি। তোমাকে ত দেখিলাম না, তোমাকে ত প্রিয়রূপে উপাসনা করিলাম না! তোমার দিকে একপাদ অগ্রসর হইয়া পরক্ষণই যে আবার সহস্রপদ পশ্চাতে বিষয়ের কূপে পতিত হইতেছি। আমারদের কি শোকতাপ বিলাপ ক্রন্দনের অবসান হইবে না। তোমার প্রীতিনীরে কি প্রাণভরিয়া সঞ্চরণ করিতে পারিব না। সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, সকল আশা সকল ভরসা মনুষ্যে স্থাপন করিয়া যে পরক্ষণে গগনভেদী আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক পরিপূরিত দেখি, আমারদের কি এ মোহের শান্তি হইবে না। বিষজর্জ্জরিত দেহের ন্যায় যে আমারদের সকল চেতনার বিলোপ হইয়াছে। তোমার মৃতসঞ্জীবন মন্ত্রে সকলকে জাগ্রত কর, তোমার বিমল জ্যোতি আমারদের সম্মুখে প্রকাশিত কর।

সম্বৎসরকাল চলিয়া গেল। কেবল এই রজনী মাত্র অবশিষ্ট আছে। সম্বৎসরকাল তোমার উদার সদাব্রতে লালিত পালিত হইয়া, রোগের ঔষধ শোকের সান্ত্বনা লাভ করিয়া আজ কোন্ প্রাণে তোমাকে হৃদয়ের ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারি। সহস্র প্রকার সুখে পরিবেষ্টিত হইয়া কেমন করিয়া তোমাকে ভুলিয়া থাকি। তোমার সুশীতল ক্রোড়ে সঞ্চরণ করিয়া কেমন করিয়া তোমার অতুলন পিতৃস্নেহ বিস্মৃত হই। যিনি এক পল বিস্মৃত হইলে পৃথিবীর বিলয় দশা উপস্থিত হয় তাঁহাকে ভুলিয়া কেমন করিয়া সংসারে সঞ্চরণ করি। সম্বৎসরকাল তোমার দিকে আহ্বান করিবার জন্য আমাদিগকে কত না অবসর প্রদান করিয়াছ। পাপমোহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার কত না উপায় বিধান করিয়াছ। অসাড় আত্মাকে সচকিত করিবার জন্য কত না দুঃখ ক্লেশ প্রেরণ করিয়াছ। হা জগদীশ! তোমার দয়ার কথা স্মরণ হইলে বাক্য স্তব্ধ হয়, কৃতজ্ঞতা অশ্রুজলে পরিণত হয়। আমরা মোহান্ধ জীব, সংসারের কীট, সৃষ্টিরাজ্যের বালুকণা। আমারদের উপরও এত দয়া! অধমসন্তানদিগের প্রতি এত বাৎসাল্য ভাব! পাপে কলঙ্কিত জীব, আমারদের উপরও এত মাতৃস্নেহ! আমরা পতিত জীব উদ্ধার করিবার জন্য এত যত্ন চেষ্টা! আমারদের কি সাধ্য যে তোমার অতুলন স্নেহ করুণা স্মরণ রাখিতে পারি। তোমার করুণা নিমেষে নিমেষে আমারদের উপর অজস্র ধারে বর্ষিত হইতেছে। তুমি এখনই আমারদের প্রতি যে করুণা প্রকাশ করিলে তাহারই গুরুত্ব মনে ধারণ করিতে পারি না। আমরা সাশ্রু নয়নে তোমার সিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমারদের পাপ মলা সকল মার্জ্জনা করিয়া দিয়া এ কলুষিত হৃদয়কে ধৌত বিধৌত করিয়া দাও, অভিনব জীবন দান কর যে সরল হৃদয়ে কাতর প্রাণে তোমার মহিমা মহীয়ান করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি। তোমার মোহন মূর্ত্তি আমারদের সম্মুখে প্রকাশিত কর, হৃদয়-সিংহাসনে অবতীর্ণ হও, যে সেরূপ দেখিয়া সংসার ভুলিয়া যাই—ইহকাল পরকালকে একসূত্রে আবদ্ধ করি, শোকতাপের মোহ কোলাহলের উপরিতন স্তরে আনন্দে বিচরণ করিতে থাকি। অকিঞ্চন গুরু! আমরা আপনার জন্য কিছুই করিতে পারি না, তুমি আমারদের আশা ভরসা সকলই। অকৃতজ্ঞ পুত্রের ন্যায় তোমা হইতে বহুদূরে ভ্রমণ করিতে করিতে দীপ্তশিরা হইয়া আবার তোমার পদতলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, পাপের গ্লানিতে অনুতাপের নরকাগ্নিতে হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। তোমার অমৃতবারি সিঞ্চনে

তাহাকে নির্ব্বাণ করিয়া দাও। আর যেন তোমাকে ছাড়িয়া ঈদৃশ ঘোর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না হয়। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

নববর্ষ উপলক্ষে গাজিপুরে ব্রহ্মোপাসনা।

(উদ্বোধন)

গত রাত্রিতে আমরা সেই বিশ্বজননীর ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছিলাম। পাছে আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এই জন্য তিনি দীপ্ত ভানুকে নির্ব্বাণ করিয়া দিলেন জগতের কোলাহল থামাইয়া দিলেন। চারিদিক নিঃস্তব্ধ হইল। বিশ্ব-চরাচর নিদ্রায় মগ্ন হইল। কেবল একমাত্র সেই বিশ্বতশ্চক্ষুঃ বিশ্বজননী, শ্রান্ত জগতের শিয়রে বসিয়া অসংখ্য অনিমেশ তারকা-আঁখি তাহার উপর স্থাপিত করিয়া রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। দিবসের কঠোর পরিশ্রমে জীব-শরীরের যে কোন অঙ্গ ব্যথিত হইয়াছিল তাঁহার কোমল করু সঞ্চালনে সে ব্যথা দূর করিলেন, সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায় যে মন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল তাহাকে অল্পে অল্পে সতেজ করিয়া তুলিলেন—যে আত্মা সংসারের মোহ প্রলোভনে মুহ্যমান হইয়াছিল তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। জগৎ নব-বলে নব-উদ্যমে আবার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল।

সেই বিশ্বকর্ম্মা বিশ্ববিধাতার শিল্পাগার চির উন্মুক্ত—দিবা রাত্রিই তাঁহার কার্য্য অবিরামে চলিতেছে। যখন আর সকলেই নিদ্রিত থাকে, সেই বিধাতা পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া তাঁহার রচিত বিশ্ব যন্ত্রের জীর্ণসংস্কার করিতে থাকেন—তাঁহার এই সংস্কার কার্য্য কেমন গোপনে বিনা আড়ম্বরে সম্পন্ন হয়। তিনি তাঁহার অসম্পূর্ণ সৃষ্টিকে একটা রহস্যময় আবরণে আবৃত করিয়া রাখিতে ভাল বাসেন। যতক্ষণ তাঁহার সৃষ্টি জীবন ও সুখ সৌন্দর্য্যে পূর্ণরূপে ভূষিত না হয় ততক্ষণ তিনি তাহাকে বাহিরের পূর্ণ আলোকে আনিতে চাহেন না। সেই মহা-শিল্পী সেই মহা-রহস্যের আবরণ ক্রমশঃ ভেদ করিয়া তাহার মধ্য হইতে অভিনব বিচিত্র জীবন-সৌন্দর্য্যের বিকাশ করিতেছেন। তিনি জরায়ুর অন্ধকারে অবস্থান করিয়া মানব শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যোজনা করেন। তিনি অণ্ডের মধ্যে থাকিয়া পক্ষী-শাবকের শরীর গঠন করেন—তিনি বীজ কোষে থাকিয়া বৃক্ষ-লতাকে পরিপুষ্ট করেন। তিনি পুরাতন বর্ষের গর্ভে নববর্ষের প্রাণ সঞ্চার করেন—তিনি করাল মৃত্যুর মধ্যে থাকিয়াও অমৃতের আয়োজন করেন। আর সেই মহারাত্রিকে একবার কল্পনার চক্ষে আনয়ন কর—যখন চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র কিছুই ছিল না—যখন সেই স্বয়ম্ভু স্বপ্রকাশ তাঁহার সেই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অতি সূক্ষ্ম তন্মাত্রময় আবরণের মধ্যে বিলীন থাকিয়া আপনাকে আপনি বিকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই অবধি সৃষ্টি আরম্ভ হইল—প্রাণের স্রোত বহিতে লাগিল—সৌন্দর্য্যের উৎস উৎসারিত হইল। সেই মহা-প্রাণের বিরাম নাই—জগতের মৃত্যু নাই।—তাহা অস্তিত্বের অবসান নহে তাহা আবরণ মাত্র—তাহা প্রাণের লীন অবস্থা—তাহা নবজীবনের গূঢ় আয়োজন ভিন্ন আর কিছুই নহে। মৃত্যু আমাদের জীবনরঙ্গভূমির সজ্জা-গৃহ মাত্র। ইহ লোকের অভিনয়-মঞ্চ হইতে

প্রস্থান করিয়া কিছুকাল আমরা মৃত্যুরূপ সজ্জাগৃহে বিশ্রাম করি ও পুনর্ব্বার নব-সাজে সজ্জিত হইয়া জীবন-রঙ্গভূমিতে পুনঃপ্রবেশ করি ও নব উদ্যমে পূর্ণ হইয়া জীবনের নূতন অঙ্ক অভিনয়ে প্রবৃত্ত হই।

বলিতে বলিতে ঐ দেখ পূর্ব্বদিকের যবনিকা অল্পে অল্পে উদ্‌ঘাটিত করিয়া শুভ্র-ভূষা অকলুষা উষা ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করিতেছেন। সুকুমার শিশুর পবিত্র হাসির রেখা দিগন্তের রক্তিম অধরে দেখা দিয়াছে। সুখস্পর্শ প্রভাত সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতেছে। উষার চুম্বনে কুসুম-রাশি জাগ্রত হইয়া কেমন পবিত্র সৌরভ বিস্তার করিতেছে। বিহঙ্গকুলের মধুর কলরবে আকাশ ছাইয়া গেল। জগৎ জীবন সুখে পুনর্ব্বার পূর্ণ হইল। এ সেই পবিত্র স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, মঙ্গল-স্বরূপেরই মহিমা। আইস এই নব-বর্ষের উৎসবে, আমরা তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করি, বর্ষের এই প্রথম দিনে সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতার নাম উচ্চারণ করিয়া আমাদের রসনাকে পবিত্র করি—এই পবিত্র দিবসে এই পবিত্র প্রাতঃকালে তাঁহারই কার্য্যে আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

যে শাখায় উপবেশন সেই শাখার মূলোচ্ছেদন।

ইতি পূর্ব্বে বেদান্ত দর্শনের নূতন প্রকাশ নামক আমার রচিত যে একটি প্রবন্ধ ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী সেন তাহার প্রতিবাদ করিয়া "আত্মা ও অহং বৃত্তি" নামক একটী প্রবন্ধ নব্য ভারতে প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের স্বপক্ষের যাহা বলিবার কথা তাহা আমরা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ভারতীতে এতবার এত রকমে বলিয়াছি যে আবার সেই সকল পুরাতন কথা এখানে নূতন করিয়া বলা এক প্রকার যন্ত্রণা-বিশেষ। সামগ্রী রসালো হইলে কি হয়—একই সামগ্রীকে বারংবার ক্রমাগত কচ্‌লাইলে অমৃতও তিক্ত হইয়া উঠে। এ জন্য এখানে আমরা আবশ্যক মত তাহার কিঞ্চিৎমাত্র উল্লেখ করিয়া শুদ্ধ কেবল এইটি দেখাইব যে, বিপিন বাবু আমাদের কথা খণ্ডন করিতে গিয়া তাঁহার আপনার কথাই আপনি খণ্ডন করিয়াছেন ও আমাদের কথাই সপ্রমাণ করিয়াছেন!

বিজ্ঞান-ভিক্ষু তাঁহার সাংখ্য-সার গ্রন্থে বলিয়াছেন

"দ্রষ্টা সামান্যতঃ সিদ্ধো জানেঽহং ইতি ধীবলাৎ।"

অর্থাৎ "সামান্যতঃ আমি জানি" এইরূপ বুদ্ধিবলে দ্রষ্টার (অর্থাৎ আত্মার) অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। ফরাসীস্ দেশীয় তত্ত্ববিৎ দেকর্ত্তা বলিয়াছেন "I think therefore I am" অর্থাৎ আমি চিন্তা করিতেছি ইহাই আমার আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ। এই দুইটি প্রসিদ্ধ বচনের পরস্পর তুলনা-প্রসঙ্গে, আমি সাংখ্য-সারের উপরি-উক্ত বচনটির মধ্য হইতে "সামান্যত" এই শব্দটি বাদ দিয়া অবশিষ্ট অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম; এতদুপলক্ষে বিপিন বাবু বলিতেছেন যে, "দ্বিজেন্দ্র বাবু ইহার এই মত অর্থ করেন, যথা, আমি জানি এইরূপ বুদ্ধি-বলেই (এক কথায় অহংবৃত্তি বলেই) আত্মা সিদ্ধ হয়েন; উপরোক্ত বচনের মধ্যে যে সামান্যতঃ পদ আছে, তাহা তিনি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য করেন নাই।" বিপিন বাবুর মতে "সামান্য" এ কথাটি সামান্য কথা

নহে—তাহা এমনি-একটি অসামান্য গুরুতর কথা যে, তাহার উল্লেখ না করিলেই নয়। বিপিন বাবু হয় তো মনে করিয়াছেন যে "সামান্যত" এই শব্দটি আমার পক্ষের হানিজনক হওয়াতে আমি তাহা চুপে চুপে সরাইয়াছি; তাহা যদি তিনি মনে করিয়া থাকেন—তবে সেটি তাঁহার বড়ই ভুল। বচনটি এই—

"দ্রষ্টা সামান্যতঃ সিদ্ধো জানেঽহমিতি ধীবলাৎ"

অর্থাৎ সামান্যত আমি জানি এইরূপ বুদ্ধিবলেই দ্রষ্টা সিদ্ধ হয়, কি না আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। এখানে "সামান্যত" এই শব্দটি উল্লেখ না করিলেও ঐ বচনটির প্রকৃত তাৎপর্য্যের যে কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে না—এক্ষণে তাহা আমরা দেখাইতেছি। ফরাসীস্ দেশীয় দেকর্ত্তার এই যে একটি বচন যে "আমি চিন্তা করিতেছি ইহাই আমার অস্তিত্বের প্রমাণ" ইহার অর্থই এই যে সামান্যত আমি চিন্তা করিতেছি ইহাই আমার অস্তিত্বের প্রমাণ; অর্থাৎ আমি ইহা চিন্তা করিতেছি বা উহা চিন্তা করিতেছি—আমি ঘট চিন্তা করিতেছি বা পট চিন্তা করিতেছি—এরূপ বিশেষ বিশেষ চিন্তার কথা এখানে হইতেছে না, কিন্তু সামান্যত আমি চিন্তা করিতেছি ইহা দ্বারাই আমার আপনার অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। এরূপ স্থলে 'সামান্যত' এ শব্দটি উল্লেখ না করিলেও উহা ছাড়া আর কিছুই বুঝাইতে পারে না; এই জন্যই আমরা উহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছিলাম। যেখানে এক কথা বলিলেই মূল বচনের ভাবার্থ বুঝা যায় সেখানে আমরা দুই কথা বলিতে নারাজ। দেকর্ত্তা "সামান্যত" এ শব্দটিকে উহ্য রাখিয়াছেন—বিজ্ঞানভিক্ষু তাহা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিয়াছেন—এই যা প্রভেদ, কিন্তু ফলে দুই কথার তাৎপর্য্য একই প্রকার। মনে কর গঙ্গার পরপারে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে—এপার হইতে আমি তাহা দেখিতেছি; সামান্যত আমি যাহা দেখিতেছি তাহা এই যে, প্রদীপ আলো দিতেছে; কিন্তু বিশেষত তাহা যে কুটীরের মধ্যস্থিত ঘটী বাটীতে আলোক দিতেছে তাহার প্রতি আমার লক্ষ নাই; ফলে, তাহা প্রদীপ কিনা ইহা জানিতে হইলে তাহা ঘটিতে আলোক দিতেছে বা বাটীতে আলোক দিতেছে এসকল বিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার কোন প্রয়োজন করে না; সামান্যত তাহা আলোক দিতেছে ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে তাহা প্রদীপই বটে। 'আমি ঘটি জানিতেছি' ইহা ঘটির অস্তিত্বের প্রমাণ, 'আমি বাটি জানিতেছি' ইহা বাটির অস্তিত্বের প্রমাণ, 'সামান্যত আমি জানিতেছি' ইহা আমার আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ। এখানে "সামান্যত" এ কথাটি ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধ যদি কেবল এইরূপ বলা যায় যে, "আমি জানিতেছি ইহাই আমার আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ" তবে তাহাতে বিশেষ কোন হানি হয় না। কিন্তু বিপিন বাবু 'সামান্যত' এই সহজ শব্দটির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া উহার সঙ্গে 'অনুমান' এই আর একটি শব্দ যুড়িয়া দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন 'দ্রষ্টা সামান্য অনুমান বলে সিদ্ধ হইয়া থাকেন'। তাঁহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে 'অনুমান' কথাটা তিনি কোথা হইতে সঙ্গ্রহ করিলেন—মূল বচনটিতে তো তাহার নামগন্ধও দৃষ্ট হয় না। বিপিন বাবু বলিতেছেন "সামান্য অনুমান বলে," আর এক জন বলিতে পারে "সামান্য জনশ্রুতির বলে", তৃতীয় ব্যক্তি বলিতে

পারে "সামান্য বিশ্বাসের বলে;" মূলের সহিত সম্পর্ক ছাড়িয়া যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহা বলিতে পারে সুতরাং সেরূপ বলা'র কোন মূল্য নাই। যদি এরূপ হইত যে 'সামান্য' এই কথাটির উল্লেখ মাত্রেই অনুমান ছাড়া আর কিছুই বুঝাইতে পারে না, তবে বিপিন বাবুর স্বপক্ষে সেই যা এক বলিবার কথা ছিল; কিন্তু বাস্তবিক তাহা তো আর নহে। মনে কর, প্রথমত আমি প্রদীপ দেখিতেছি, দ্বিতীয়ত আমি রঙ্‌মশাল দেখিতেছি এবং তাহার সঙ্গে ইহাও দেখিতেছি যে উভয়েরই সামান্য লক্ষণ ঔজ্জ্বল্য—রঙ্‌মশালের বিশেষ লক্ষণ শ্বেতবর্ণের আলোক; এখানে অনুমান কোন্‌খানটায়? আমি ঘটি জানিতেছি—বাটি জানিতেছি—ইত্যাদি; এবং তাহার সঙ্গে সামান্যত ইহাও জানিতেছি যে 'আমি জানিতেছি;' অনুমান ইহার কোন্‌খানটায়? 'আমি জানিতেছি' ইহা কি অনুমান—না সাক্ষাৎ জ্ঞান?

বিপিন বাবু এখানে বলিতে পারেন যে যেমন ধূমদৃষ্টে বহ্নি অনুমিত হয়, তেমনি 'আমি জানিতেছি' এই জ্ঞান দ্বারা আমার আপনার অস্তিত্ব অনুমিত হয়; সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধ হয় না। কিন্তু একথা যুক্তিতে স্থান পাইতে পারে না; কারণ, যখন অগ্নি দৃষ্ট হইতেছে না—শুদ্ধ কেবল ধূমই দৃষ্ট হইতেছে, তখনই ধূম দৃষ্টে অগ্নির অনুমান সম্ভবে; কিন্তু যখন ধূমের সঙ্গে অগ্নিও দৃষ্ট হইতেছে তখন অগ্নিও প্রত্যক্ষে বিরাজমান, ধূমও প্রত্যক্ষে বিরাজমান, এবং দুএর যোগও প্রত্যক্ষে বিরাজমান। যখন আমি একটা ঘট দেখিতেছি, তখন ঘটপদার্থ আমার বাহিরে বর্ত্তমান ঘটজ্ঞান আমার অন্তরে বর্ত্তমান; কিন্তু যখন আমি আপনাকে জানিতেছি তখন অহং পদার্থও আমার অন্তরে বর্ত্তমান, অহংজ্ঞানও আমার অন্তরে বর্ত্তমান, এবং দুয়ের মধ্যবর্ত্তী অভেদ-সম্বন্ধও আমার অন্তরে বর্ত্তমান। বিষয়-জ্ঞানের বেলায়—জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞান এ দুএর মধ্যে প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আত্ম-জ্ঞানের বেলা—জ্ঞানের বিষয় (আমি) এবং জ্ঞান (আমি জানিতেছি) দুএর মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। আত্মজ্ঞানের বেলায়—জ্ঞানও যা, জ্ঞাতাও তা, জ্ঞেয় বিষয়ও তা, তিনিই এক। এই জন্য আত্মজ্ঞানের বেলায় এ কথা শোভা পায় না যে, আমি জ্ঞানকেই সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতেছি—আত্মাকে অনুমান দ্বারা উপলব্ধি করিতেছি; কেন না এখানে জ্ঞানও যা—আত্মাও তা—একই,—সুতরাং এককে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিলে দুইকেই সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা হয়। অতএব 'আমি জানিতেছি' ইহা আত্মার অস্তিত্বের আনুমানিক প্রমাণ নহে, কিন্তু সাক্ষাৎ প্রমাণ। এরূপ সাক্ষাৎ প্রমাণের উপর বিপিন বাবুর কেন যে এত বিরাগ, তাহা বুঝিতে পারি না। বিপিন বাবু বলেন যে "এখনও কি শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবু 'আমি জানি' এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে চাহেন।" বিপিন বাবুকে জিজ্ঞাসা করি—তিনি কি আমাদিগকে "আমি জানি না" এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে বলেন? মনে কর একজন আসিয়া বলিলেন "বিন্ধ্যগিরিতে একটা আশ্চর্য্য দেবালয় আছে" ও তাহার প্রমাণ তিনি এই দিলেন যে তিনি নিজেও তাহা দেখেন নাই এবং আর কেহও তাহা দেখে নাই। বিপিন বাবু কি ইঁহার এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে পারেন? 'আমি জানি' এভিন্ন—জ্ঞান ভিন্ন—সত্যের প্রমাণ আর যে কি

জগতে আছে, আমরা তো তাহা জানি না। বিপিন বাবু নিজে কি বলিতেছেন? তিনি বলিতেছেন "আমরা ভরসা করি যে, সকলে তর্কের জঞ্জালময় পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রুতি ও অনুভবাত্মক মীমাংসা মাত্র গ্রহণ করিবেন;" তাঁহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করি —জ্ঞানে যাহা উপলব্ধি হয় তাহাই তো অনুভবাত্মক? না আর কিছু? যাহা জ্ঞানে উপলব্ধি হয় না তাহাকে অবশ্য তিনি অনুভবাত্মক বলিতে পারেন না। ইহা সত্ত্বেও বিপিন বাবু বলিতেছেন যে "অহং বৃত্তি লোপ হয় হউক, এরূপ বাদ দিলে যে অজ্ঞেয় শূন্যাকার অথচ সত্তামাত্র পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহাই দ্রষ্টা সাক্ষী চৈতন্য বা আত্মা।" 'অজ্ঞেয়' অর্থাৎ কেহই তাহাকে জানে না—জানিবে না—জানিতে পারে না; সুতরাং সেরূপ আত্মাকে বিপিন বাবুও জানেন না এবং অন্য কাহারও তাহা জানিবার সম্ভাবনাও নাই। এরূপ না জানা কথার যিনি উপদেশ দেন তিনিই বা কিরূপ উপদেষ্টা, এবং যিনি তাহা গ্রহণ করেন তিনিই বা কিরূপ শিষ্য, তাহা বুঝিয়া ওঠা ভার। গুরু মদ্দা-ছাগল দোহন করিতেছেন এবং শিষ্য দুগ্ধ গ্রহণ করিবার জন্য চালুনী ধরিয়াছেন;—কৌতুকের চূড়ান্ত! ইহারই নাম "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ"—এক অন্ধ আরএক অন্ধের পথ-প্রদর্শক। যিনি আত্মাকে জানেন তিনি কখনই আত্মাকে অজ্ঞেয় বলিতে পারেন না, কেননা জ্ঞাত বিষয় কখনই অজ্ঞেয় শব্দের বাচ্য হইতে পারে না; তবেই হইতেছে যে, অজ্ঞেয়-বাদী আত্মাকে জানেন না; যদি তিনি আত্মাকে না জানেন, তবে তিনি আত্মার সম্বন্ধে যতই বড় বড় শব্দ প্রয়োগ করুন্ না কেন, সমস্তই অন্ধকারে ঢেলা নিক্ষেপ।

কিন্তু বিপিন বাবু তাঁহার স্বপক্ষের প্রমাণার্থে একজন সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মাকে—ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে—সহায় ডাকিতেছেন; তিনি শঙ্করাচার্য্যের নিম্নলিখিত বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন,

আত্মনঃ সচ্চিদংশশ্চ বুদ্ধের্বৃত্তিরিতিদ্বয়ং
সংযোজ্য চাবিবেকেন জানামীতি প্রবর্ত্ততে।

এবং তিনি ইহার অর্থ করিতেছেন "আত্মার সচ্চিদংশ ও বুদ্ধিবৃত্তি এই দুই পদার্থকে জীব অবিবেক হেতু সংযোগ করিয়া 'আমি জানি' এই বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হয়"। ইহার প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, এখানকার এই যে 'আমি জানি' ইহা স্বতন্ত্র, এবং আমরা যাহার কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহা স্বতন্ত্র। 'আমি জানি' বলিতে দুই প্রকার 'আমি জানি' বুঝায়,—প্রথম, লৌকিক ব্যবহারের "আমি জানি" এবং, দ্বিতীয়, তত্ত্বজ্ঞানের "আমি জানি"। লৌকিক ব্যবহারকালে আমি যখন বলি যে, আমি গৌরবর্ণ বা শ্যামবর্ণ, তখন আমার শরীরকে লক্ষ্য করিয়াই "আমি" শব্দ প্রয়োগ করি, সুতরাং তখন আমি আমার শরীরকে 'আমি' বলিয়া জানি; শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন যে এইরূপ অবিবেকাত্মক "আমি জানি"ই সচরাচর লোকে প্রচলিত—"সংযোজ্য চাবিবেকেন জানামীতি প্রবর্ত্ততে।" লৌকিক ব্যবহার কালে আমরা এরূপ করি বটে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা-কালে আমরা আত্মাকেই 'আমি' বলিয়া জানি—শরীরাদিকে নহে। পূর্ব্বোক্ত লৌকিক "আমি জানি" অবিবেক-জনিত; শেষোক্ত আধ্যাত্মিক "আমি জানি" বিবেক-জনিত। শঙ্করাচার্য্যের মতে অবিবেক-জনিত লৌকিক "আমি জানি"ই দূষ্য; বিবেক-জনিত আধ্যাত্মিক

'আমি জানি' সাধকের পরম শ্রেয়স্কর। শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্যের গোড়াতেই আত্মাকে অস্মৎ প্রত্যয়ের গোচর (অর্থাৎ 'আমি' এইরূপ জ্ঞানের গোচর) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে আত্মাকে আমি বলিয়া জানা শঙ্করাচার্য্যের মত-বিরুদ্ধ নহে; কি তবে তাঁহার মত-বিরুদ্ধ? দেহাদিকে আমি বলিয়া জানাই তাঁহার মত-বিরুদ্ধ। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যের উপক্রমণিকায় যাহা বলিয়াছেন তাহার অবিকল অনুবাদ আমরা নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

"তুমি (অথবা "ইহা" "উহা") এবং "আমি" এই দুইরূপ প্রত্যয়ের গোচর, এবং ছায়া ও আলোকের ন্যায় বিরুদ্ধ-স্বভাব যে, বিষয় এবং বিষয়ী, এ দুয়ের মধ্যে যখন পরস্পর ঐক্য হইতে পারে না তখন তাহাদের পরস্পরের ধর্ম্মের মধ্যেও যে ঐক্য হইতে পারে না ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব অস্মৎ-প্রত্যয়-গোচর চিদাত্মক বিষয়ীতে যুষ্মৎ-প্রত্যয়-গোচর বিষয়ের এবং তদীয় ধর্ম্মের যে আরোপ, অথবা বিষয়েতে বিষয়ীর এবং তদীয় ধর্ম্মের যে আরোপ, তাহা মিথ্যা হওয়াই যুক্ত। তথাপি একের সত্তা ও ধর্ম্মেতে অন্যের সত্তা ও ধর্ম্ম আরোপ করত পরস্পরকে পৃথক্‌রূপে অবধারণ না করাতে —অত্যন্ত পৃথক্ যে উল্লিখিত ধর্ম্মদ্বয় ও ধর্ম্মিদ্বয় তদ্বিষয়ে মিথ্যা জ্ঞান উদ্ভূত হইয়া সত্য এবং মিথ্যা দুয়ে জড়িত এইরূপ লোক-ব্যবহার প্রচলিত দেখা যায় যে, আমি এই (শরীর বা মস্তিষ্ক ইত্যাদি), আমার এই (গৃহ বা ভূমি ইত্যাদি)।"

এইরূপ দেখা যইতেছে যে, শরীরাদিকে আমি বলিয়া জানাই শঙ্করাচার্য্যের মত-বিরুদ্ধ—আত্মাকে আমি বলিয়া জানা শঙ্করাচার্য্যের সম্পূর্ণ মতানুযায়ী। শঙ্করাচার্য্যের মতে অস্মৎ-প্রত্যয়ের বিষয় আত্মা, এবং যুষ্মৎ-প্রত্যয়ের বিষয় দেহাদি, এই দুইকে একত্র মিশাইয়া খিচুড়ি পাকানো'র নামই অবিবেক, এবং উভয়ের পার্থক্য রক্ষা করা'র নামই বিবেক। এ উপলক্ষে স্কটলাণ্ড দেশীয় তত্ত্ববিৎ হামিলটন কি বলিতেছেন পাঠক তাহা একবার মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন—তাহা হইলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, সকল শৃগালেরই এক রায়; হামিলটন বলিতেছেন—

"But the something of which we are conscious, and of which we predicate existence, in the primary judgement, is two fold,—the ego and the nonego, we are conscious of both and affirm existence of both. But we do more, we do not merely affirm the existence of each out of relation to the other, but, in affirming their existence we affirm their existence in duality, in difference, in mutual contrast (ইহার নাম বিবেক); that is, we not only affirm this ego to exist, but deny it existing as the nonego; we not only affirm the non-ego to exist, but deny it existing as the ego.

শঙ্করাচার্য্যের প্রকৃত মত এই যে, যুষ্মৎ-প্রত্যয়ের বিষয় দেহাদি এবং অস্মৎ প্রত্যয়ের বিষয় আত্মা এই দুইকে জড়াইয়া এক করিয়া ফেলাই অবিদ্যা। আমার প্রতিবাদীরা বলিতেছেন—আত্মাকে অস্মৎ প্রত্যয়ের গোচর বলিয়া নির্দ্দেশ করা অবিদ্যা। শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন চা'লে ডা'ল খিচুড়ি হয়; ইঁহারা বলিতেছেন ডা'ল ব্যতিরেকেও শুধু চা'লে খিচুড়ি হয়। এটা ইহাঁরা দেখিতেছেন না যে, আত্মাকে অস্মৎ-প্রত্যয়ের গোচর বলিয়া

নির্দ্দেশ করিলে উল্টা আরও যুস্মৎ প্রত্যয়ের বিষয় দেহাদি হইতে তাহার পার্থক্য রক্ষা করা হয় এবং ইহারই নাম বিবেক; আত্মাকে দেহাদির সহিত জড়াইয়া ফেলার নামই অবিবেক। আমরা তাই বলিয়াছিলাম এবং এখনও বলিতেছি যে "আত্মা অস্মৎ প্রত্যয়ের বিষয়" শঙ্করাচার্য্যের এই গোড়ার কথাটীকে অবিদ্যাজনিত বলিলে তাঁহার অধ্যাস-বাদের পাকা ভিত্তিমূল কাঁচিয়া যায়। আমার প্রতিবাদিরা বলিতেছেন "না—তাহা কাঁচিয়া যায় না; আত্মাকে অস্মৎ প্রত্যয়ের বিষয় বলিলেই যথেষ্ট খিচুড়ি পাকানো হয়—যুস্মৎ প্রত্যয়ের বিষয় দেহাদির সহিত তাহাকে জড়াইবার কোন আবশ্যকতা নাই (শুধু চা'লেই খিচুড়ি পাকানো হইতে পারে ডা'লের কোন প্রয়োজন নাই)," অথচ শঙ্করাচার্য্য চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেছেন যে আত্মা এবং দেহাদি এ দুইকে জড়াইয়া একীভূত করিবার নামই খিচুড়ি পাকানো। এখন, শঙ্করাচার্য্যের কথা শুনিব—না ইঁহাদের কথা শুনিব?

বিপিন বাবু শঙ্করাচার্য্যের নিম্ন-লিখিত প্রসিদ্ধ বচনটিও উদ্ধৃত করিতে ত্রুটি করেন নাই

> ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং।
> ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
> অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা।
> চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবোহং।

এই শ্লোকটির অর্থ প্রকৃত-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার প্রভেদই বা কোন্‌খানে এবং অভেদই বা কোন্‌খানে তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিচার্য্য। বিষয়টি অতি গুরুতর, বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহার স্থান-সঙ্কুলন হওয়া সুকঠিন, এ জন্য বারান্তরে তাহার রীতিমত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এখানে কেবল আমাদের বক্তব্যের স্বল্প মাত্র আভাস দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেছি।

লোকে কথায় বলে যে "তেলে জলে কিছুতেই মিশ খায় না"—তেলে জলে এত যে প্রভেদ, তথাপি, একটা কাচের পাত্রে তেল ও জল রাখিলে উভয়ের সন্ধিস্থলে একটী চক্রাকৃতি অভেদ-স্থান লক্ষিত হয়; সেই অভেদ-স্থানটিকে তৈল-রেখাও বলা যাইতে পারে—জল-রেখাও বলা যাইতে পারে। জ্ঞান এবং অজ্ঞানের মধ্যে এত যে প্রভেদ, তথাপি উভয়ের অভেদ-স্থান আছে—যেমন সুষুপ্তি। সুষুপ্তির যদি জ্ঞানের সহিত আদবেই কোন সংস্রব না থাকিত—সুষুপ্তি যদি একেবারেই অজ্ঞেয় হইত—তবে তাহার সম্বন্ধে আমরা এ কথাও বলিতে পারিতাম না যে 'আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম'। সুষুপ্তির সহিত যে-অংশে জ্ঞানের সংস্রব আছে সেই অংশে সুষুপ্তির অভ্যন্তরে অহংবৃত্তিও আছে এবং সেই অংশেই আমরা বলি যে, আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম; সুষুপ্তি যে-অংশে অজ্ঞানাবস্থা সে অংশে আমরা তাহা বলি না—বলিতে পারিও না; কেননা একেবারেই যাহা জ্ঞান-বহির্ভূত তাহার সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা কহা অনর্থক বাচালতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। নিদ্রার সময় আমি সত্যসত্যই জ্ঞানে সুখ অনুভব করিয়াছিলাম, তাই আমি স্মরণ করিয়া বলি যে, আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম; তাহা যদি না হইত, তবে "আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম" এ কথার কোন অর্থই থাকিত না। এই জন্য বিপিন বাবুর এ কথায় আমরা সায় দিতে পারি না যে, সুষুপ্তিকালে আমাদের অহংস্মৃতি বিলুপ্ত হয়।

উপরি-উক্ত দুইটি দৃষ্টান্ত হইতে এইরূপ পাওয়া যাইতেছে যে, যেখানেই প্রভেদ সেইখানেই প্রভিন্ন বস্তুদ্বয়ের মধ্যে একটা না একটা অভেদ-স্থান আছেই আছে। তেমনি আবার দেখানো যাইতে পারে যে, যেখানেই অভেদ-স্থান সেইখানেই তাহা প্রভিন্ন বস্তুদ্বয়ের অভেদ স্থান। তেল আর জলের মধ্যে যদি প্রভেদ বিলুপ্ত হয়—তেলটুকু যদি কোন মহাপুরুষের মন্ত্রবলে জল হইয়া যায়—তবে উভয়ের সেই অভেদ-রেখাটিও দৃষ্টি হইতে পলায়ন করে। কঠোপনিষদে আছে

> "ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি"

জীবাত্মা এবং পরমাত্মা ছায়াতপের ন্যায় বিভিন্ন। তথাপি উভয়ের অভেদ স্থান এই যে, উভয়ই আত্মা। ভাগ-ত্যাগ লক্ষণা দ্বারা এই অভেদ-স্থানটীর প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন "শিবোহং শিবোহং।" এই অভেদ-স্থানটিতে পরমাত্মার সংস্পর্শে জীবাত্মার পাপ-রাশি ভস্মীভূত হইবারই কথা এবং পুণ্যের খদ্যোত-জ্যোতি ব্রহ্মানন্দের সূর্য্যালোকে কবলিত হইয়া যাইবারই কথা। কিন্তু সেই যে অভেদ স্থান—তাহা তো আর অজ্ঞেয় শূন্যাকার নহে; তাহা জ্ঞান-জ্যোতি ও আনন্দ-জ্যোতিতে পরিপূর্ণ। সেই অভেদ স্থানে যখন আত্মা বিরাজমান তখন কাজে-কাজেই বলিতে হইতেছে যে, সেখানে জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই; কেননা আত্মা-মাত্রেরই সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, তাহা জ্ঞানও বটে জ্ঞাতাও বটে এবং জ্ঞেয়ও বটে—আত্মা মাত্রই আপনাকে আপনি জানে; যে—আপনাকে আপনি জানে না, তাহাকে আত্মা বলাও যা—দেয়াল বলাও তা'—এ-কই। তবে আর উপরি-উক্ত অভেদ-স্থানীয় পরম পরিশুদ্ধ আত্মাকে অজ্ঞেয় বলি কিরূপে? তিনি কি আপনার নিকটে এবং সাধকের নিকটে জ্ঞেয় নহেন। শঙ্করাচার্য্য আত্মাকে 'করতল-ন্যস্ত আমলকবৎ' জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়াছিলেন—তবুও কি বলিতে হইবে যে, তাঁহার নিকটে আত্মা অজ্ঞেয় শূন্যাকার ছিল? শঙ্করাচার্য্যের নিকট যদি পরব্রহ্ম অজ্ঞেয় শূন্যাকার হইতেন, তবে তিনি অন্য ব্যক্তিকে ব্রহ্ম-জ্ঞানের উপদেশ দিবার অধিকারীই হইতেন না; কেন না, তাঁহার নিজের নিকটে যাহা অজ্ঞেয়—তিনি নিজে যাহা জানেন না—তাহা তিনি অন্য ব্যক্তিকে শিক্ষা দিতে যা'ন—ইহা কত না লজ্জার কথা!

অতএব বিপিন বাবু পঞ্চদশীর এই যে, একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন যে,

> "স্বয়মেবানুভূতিত্বাৎ বিদ্যতে নানুভাব্যতা জ্ঞাতৃ জ্ঞানান্তরাভাবাৎ"

অর্থাৎ জ্ঞানান্তরের অভাব-প্রযুক্ত জ্ঞান অজ্ঞেয়—ইহার আদবেই কোন অর্থ নাই। প্রদীপান্তরের অভাব-প্রযুক্ত প্রদীপ কি কখনও অদৃশ্য হয়? তবে জ্ঞানান্তরের অভাব-প্রযুক্ত জ্ঞান অজ্ঞেয় হইবে কেন? প্রদীপ প্রকাশিত হইবার জন্য অন্য প্রদীপকে অপেক্ষা করে না—তাই বলিয়াই কি প্রদীপকে অদৃশ্য বলিতে হইবে? জ্ঞান প্রকাশিত হইবার জন্য অন্য জ্ঞানকে অপেক্ষা করে না—তাই বলিয়াই কি জ্ঞানকে অজ্ঞেয় বলিতে হইবে? প্রদীপ যেমন আপনার আলোকে আপনি প্রকাশিত, জ্ঞান তেমনি আপনার আলোকে আপনি জ্ঞাত—তবে আর জ্ঞান অজ্ঞেয় কি রূপে? জ্ঞাত বস্তুকে অজ্ঞেয় বলা কি রূপ কথা?

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, আত্ম-জ্ঞানের উপদেষ্টা আত্মাকে স্বীয় অন্তরে অনুভব করেন কি না? যদি করেন—তবে তিনি বলিতে পারেন না যে, "বিদ্যতে নানুভাব্যতা" আত্মা অনুভব-যোগ্য নহে; যদি না করেন—তবে তাঁহার উপদেশ মূলেই অনুভবাত্মক নহে, তাহা শুদ্ধ কেবল বিতণ্ডা ও শব্দাড়ম্বর মাত্র। তবে আর বিপিন বাবুর এ কথা কোথায় রহিল যে "আমরা ভরসা করি যে, সকলে তর্কের জঞ্জাল-ময় পথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রুতি ও অনুভবাত্মক মীমাংসা মাত্র গ্রহণ করিবেন?" তিনি আমাদিগকে যে পথে লইয়া যাইতেছেন—সমস্তই তো তর্কের জঞ্জাল-ময় পথ—তাহার ত্রিসীমার মধ্যেও তো অনুভবাত্মক কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মনে কর যেন ব্যাঙ্কের তহবিলে নগদ এক পয়সাও নাই—তাহা নিতান্তই অজ্ঞেয় শূন্যাকার, অথচ ব্যাঙ্ক হইতে হাজার হাজার টাকার ব্যাঙ্ক নোট বাহির হইয়া দেশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে; এরূপ ব্যাঙ্ক নোটের কি কোন মূল্য আছে? যিনিই ব্যাঙ্কে নোট ভাঙাইতে যাইবেন তিনিই অজ্ঞেয় শূন্যাকার দেখিবেন—অন্ধকার দেখিবেন, ও শূন্য-হস্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিবেন। প্রদীপ যদি আপনাকে আপনি প্রকাশ না করে, নিজেই যদি অপ্রকাশ হয়, তবে তাহা অন্য বস্তুকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? জ্ঞান যদি আপনাকে আপনি না জানে, আপনার নিকট আপনি অজ্ঞেয় হয়, তবে তাহা অন্য বস্তুকে কিরূপে জানিবে? এই জন্যই আমরা বলি যে, যিনি 'অনুভবাত্মক' 'সত্যের প্রয়াসী, অথচ 'আমি জানি' এমন একটি সুনিশ্চিত অপরোক্ষ অনুভূতিকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া অনুভবাতীত অজ্ঞেয় অন্ধকারে ইচ্ছা করিয়া নিপতিত হন, তাঁহার সেরূপ পতনের কারণ আর কিছু নয়—যে শাখায় উপবেশন সেই শাখার মূলোচ্ছেদ—অনুভবাত্মক সত্য সংস্থাপন করিতে গিয়া অনুভবের মূলোচ্ছেদ।

শিক্ষা।

আমি কে, কোথা হইতে আসিলাম, কেন আসিলাম, ইত্যাদি রূপ আমি-তত্ত্বের জন্য আমরা জগতে মহান ভিক্ষুক হইয়া রহিয়াছি। এই সকল ভিক্ষার তরে আমরা জগতের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। জগত এই সকল ভিক্ষা দিয়া কি আমাদের তৃপ্তি সাধন করিবে? করিতে পারিবে? পারিবে, যদি জগত ধনী হয়, তাহার এত ধন থাকে যে আমাদের দিয়া তাহার প্রচুর থাকিতে পারে। কিন্তু জগত এত ধনী নয় তাই আমাদের ভিক্ষার কাছে জগত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে—কহে "আমার তোমাদের ভিক্ষা যোগাইবার সামর্থ্য নাই।" তখন জগতের দারিদ্র্য বুঝা যায়, আমাদের ভিক্ষার কাছে তাহার হীনতা উপলব্ধি করা যায়, তখন তাড়াতাড়ি ক্ষুৎপিপাসু পথিকের ন্যায় ছট ফট করিতে করিতে জগতের নিকট হইতে ফিরিয়া আসি এবং জগতের অতীত দেশে যাইতে চেষ্টা করি কিন্তু সহসা পারি না। সেখানে অমূল্য অসীম ধনাগার স্থাপিত আছে; বিশুদ্ধবেশে অনবরতঃ জাগরূক রহিয়া পাহারা দিতেছে। এই নিয়মকে করায়ত্ত করিতে না পারিলে জগতের অতীত দেশে আমরা পঁছিতে পারিব না সুতরাং সেথায় জ্যোতিষ্মান ধনীর জ্যোতিষ্মান ধনাগারও দেখিতে পাইব না,—আমাদের দারিদ্র্য দুঃখও ঘুচিবে না। অতএব যদি সেই নিয়ম প্রহরীকে আমরা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে রাখিতে পারি তাহা হইলে অসীম ধনাগারও আমাদের আয়ত্ত হইবে। সেই অসীম ধনাগারের অসীম অনন্ত ধন পাইলে আমাদের কোন্ ভিক্ষা না পূর্ণ হইবে? সমুদয় ভিক্ষাই পূর্ণ হইবে এই জন্য বলি নিয়মকে আমাদের সর্ব্বাগ্রে করায়ত্ত করাকর্ত্তব্য। ইহাই আমাদের প্রথম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। ইহা হইতে সমুদয় শিক্ষা প্রাদুর্ভূত হয়। শিক্ষা যদি থাকে তবে সে ইহাই। ইহা ভিন্ন শিখিবার তো আর কিছুই নাই। ইহাই আমাদের চরম পরম উন্নত শিক্ষা। এই শিক্ষা বজায় রাখিবার জন্য আমাদের বাজে কত শিক্ষা আবশ্যক হয়। মূল শিক্ষা এই। ইহা ভিন্ন আর কাহাকে প্রকৃত শিক্ষার নামে উপযুক্ত বোধ করা যাইতে পারে? বিজ্ঞান জ্যোতিষ যাহাই শিখিতেছি সব ইহাকে অবলম্বন করিয়া। ইহা তখন অগ্নি শিখাস্বরূপ। সকলের উপরে। যেমন আলোক বজায় রাখিবার জন্য তৈল সুতা প্রভৃতি দ্রব্যের সাহার্য্য আবশ্যক হয় সেইরূপ নিয়মায়ত্তের শিক্ষা আমাদের আলোকের স্বরূপ। ইহাকে বজায় রাখিবার জন্য আমাদের চারিধার হ'তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিক্ষার সংগ্রহ করিতে হয়। না হইলে ইহা প্রকাশ পাইবে কিরূপে? ইহার প্রকাশ যত যেখানে তত সেখানে বল তেজ হাসি খেলা! ইহার অপ্রকাশে সমুদয় বিশৃঙ্খল ভগ্ন চূর্ণ। অতএব নিয়মায়ত্তই জগতের প্রকৃত শিক্ষা। এই শিক্ষায় হিত প্রস্ফুটিত।

হিতেন্দ্র

আলোচনা।

(গত আষাঢ় মাসের পত্রিকার ৪৮-পৃষ্ঠার পর।)

ভৌতিক জগতের উপর মানুষের নিয়ন্তৃত্ব।

আমাদের জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ, অতি স্বল্প বলিয়া অনেক সময়ে আমরাই যাহার কারণ, আমরা ঈশ্বরকে তাহার কারণ, নির্দ্দেশ করি এবং তাহা করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকি। যতই মানবজাতির জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে, ততই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে মানুষ পূর্ব্বে যাহা একমাত্র ঈশ্বরের সাধ্যায়ত্ত মনে করিত, তাহা মানুষেরও সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে। মারীভয় হইলে পূর্ব্বে ভগবানই তাহার প্রেরক লোকে এইরূপ বিশ্বাস করিত, কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে মারীভয়ের কারণ ঈশ্বর নহেন, মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধাচরণই তাহার কারণ এবং মনুষ্যের জ্ঞান-প্রভাবেই তাহা দূর করা যায়। বিজ্ঞান এইরূপ কত অলৌকিক কার্য্য করিতেছে যাহা মনুষ্যের সাধ্যের অতীত বলিয়া লোকে পূর্ব্বে বিশ্বাস করিত। এইরূপ ক্রমেই আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে ভৌতিক জগতের উপর ঈশ্বর মানুষকে প্রভূত ক্ষমতা দিয়াছেন, মানুষ সে ক্ষমতা সেই পরম পিতার প্রদত্ত জ্ঞান ও বুদ্ধি বলে স্ফুরিত ও সমন্নত করিতে পারিলে সে ঈশ্বরের সাহায্যে ও অনুশাসনে ভৌতিক মঙ্গলামঙ্গলের অনেক পরিমাণে নিয়ন্তা হইতে পারে। এই নিয়ন্তৃত্ব মানুষের কতদূর হওয়া সম্ভব তৎসম্বন্ধে আমরা এখন কিছুই জানি না; যতই বিজ্ঞানের উন্নতি হইবে ততই আমরা তাহা বুঝিতে পারিব। এই সত্য উপলব্ধি করিয়া আমরা যেন আমাদের

দোষে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহা অসতর্কতা-পূর্ব্বক ঈশ্বরে আরোপ না করি।

আয় ব্যয়।

পৌষ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	... ...	১৪৭৭৸৫
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৯৫৭৷৶১০
সমষ্টি	... ...	৪৪৩৫৶১৫
ব্যয়	...	১৫৫৬৷৷০
স্থিত	... ...	২৮৭৮৷৷৶১৫

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	২১৩৷৶০

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধানাচার্য্য মহাশয় ব্রহ্মসঙ্গীত বিদ্যালয়ের সাহায্য শ্রাবণ হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত		২৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা) ১৮০৯ শকের আষাঢ় হইতে মাঘ পর্য্যন্ত		২৲
শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮০৮ শকের ফাল্গুন হইতে ১৮০৯ শকের মাঘ পর্য্যন্ত		২৪৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব	কোন্নগর	৫৲
তাঁহার স্ত্রী		১০৲
ডাক্তার চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	পাণ্ডুয়া	৭৲
শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ ধর		৪৲
,, ,, মণিলাল মল্লিক		৪৲
,, ,, দিননাথ অধ্যেতা		২৲
,, ,, গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	হুগলী	২৲
,, ,, কেদারনাথ মিত্র		২৲
,, ,, লালবিহারী বড়াল		২৲
,, ,, রাজকৃষ্ণ আঢ্য		২৲
,, ,, কাশীনাথ দত্ত		২৲
,, ,, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়		১৲
,, ,, মহানন্দ মুখোপাধ্যায়		১৲
,, ,, ক্ষেত্রমোহন ধর		১৲
,, ,, রাধামোহন সিংহ	আঁদুল	১৲
,, ,, ঘনশ্যাম চন্দ্র		১৲
শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী		৫৲
শ্রীমতী ত্রৈলোক্যমণি দাসী		৫৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		২৲
,, ,, নীতিন্দ্রনাথ ঠাকুর		৪৲
,, ,, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর		৪৲
,, ,, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর		৪৲
,, ,, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর		৪৲
,, ,, হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর		৩৪
,, ,, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর		৪৲
,, ,, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর		৪৲
,, ,, জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল		৪৲
,, ,, ভবদেব নাথ	গোয়াড়ী	৫৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়		৫৲
ডাক্তার চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	পাণ্ডুয়া	১৲

এককালীন দান।

শ্রীমতি সৌদামিনী দেবী		১৷৹
,, কামিনীসুন্দরী দেবী		১৲
শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর		১৲
,, ,, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর		১৲
পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী		১৲
ডাক্তার চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	পাণ্ডুয়া	১৲
দানাধারে প্রাপ্ত ইত্যাদি বিবিধ আয়		২৪৷৶০
		২১৩৷৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৭৮ ৶০
পুস্তকালয়	...	১০৬৸৶১০
যন্ত্রালয়	...	৫০৯ ৶৫
গচ্ছিত	...	২১৭৷৷৶১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৬২৷০
দাতব্য	...	৯০৲
সমষ্টি		১৪৭৭৸৫

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	৫০৪৷৷০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৬১৸৶১০
পুস্তকালয়	... ...	৮৩৷৷৶১৫
যন্ত্রালয়	... ...	৫৮৫৸৶১০
গচ্ছিত	... ...	৫৩৷৷৶১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৫৸১০
দাতব্য		৬১৲
সমষ্টি	... ...	১৫৫৬৷৷০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
আষাঢ় ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯।

৫৩৯ সংখ্যা ১৮১০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আত্মা এবং পরমাত্মা।

আমাদের আত্মা স্বয়ং পূর্ণ সত্য নহে, কিন্তু তাহা পূর্ণ সত্যের প্রতিকৃতি। পরিমণ্ডল (globe) যেমন মহাকাশের প্রতিকৃতি, আত্মা সেইরূপ পরমাত্মার প্রতিকৃতি। পরিমণ্ডলের কেন্দ্র হইতে কিরণাবলীর ন্যায় রেখা-সকল যতদূর ইচ্ছা ততদূর প্রসারিত হইয়া পরিমণ্ডলের অবয়ব যতই বর্দ্ধিত হউক্ না কেন, তাহা কখনই অসীম আকাশে পরিণত হইতে পারিবে না; সেইরূপ আত্মা আপনার ধীশক্তি এবং ক্রিয়া-শক্তি প্রসারণ করিয়া যতই জ্ঞান-ধর্ম্মে পরিবর্দ্ধিত হউক্ না কেন, তাহা কখনই পরমাত্মার সহিত একীভূত হইতে পারিবে না। জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে ছায়াতপের ন্যায় প্রভেদ সর্ব্বকালেই বলবৎ থাকিবে। পরিমণ্ডলকে যেমন মহাকাশ সর্ব্বতোভাবে ব্যাপিয়া রহিয়াছে, পরমাত্মা সেইরূপ জীবাত্মাকে সর্ব্বতোভাবে জানিতেছেন; আর, পরিমণ্ডল যেমন স্বীয় পরিধির সীমা-পর্য্যন্তই মহাকাশকে স্পর্শ করিয়া আছে, জীবাত্মা সেইরূপ পরমাত্মাকে কিয়ৎ পরিমাণেই জানিতেছে। যাঁহার জ্ঞান-ধর্ম্মের যতটুকু পরিধি পরমাত্মা তাঁহার নিকট সেই অংশে প্রকাশিত হ'ন। পরমাত্মা জ্ঞানবান্ মনুষ্য মাত্রেরই নিকট প্রকাশিত আছেন, কিন্তু কাহারো নিকট সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত নহেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন "যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপং—যদি মনে কর যে আমি পরব্রহ্মকে সম্যক্‌রূপে জানি তবে নিশ্চয়ই পরব্রহ্মের স্বরূপ তুমি অল্পই জানো।"

কোন প্রতিবাদী এখানে বলিতে পারেন যে, পরমাত্মা জ্ঞানবান্ মনুষ্য মাত্রেরই নিকট প্রকাশিত আছেন—এ কথাটা কি সত্য? জ্ঞানবান্ লোকের মধ্যে সকলেই কি আস্তিক? ইহার উত্তর আমরা এইরূপ দিই—

আমরা যাহা কিছু দেখি—সমস্তই দৃশ্য আবির্ভাব মাত্র—তাহার কোনটিই মূল-বস্তু নহে—ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। দৃশ্য-আদি আবির্ভাবের মূলে আধার-বস্তু আছে—ইহাও সর্ব্ববাদি-সম্মত। সমস্ত জগতের একই মূলাধার, ইহাও সর্ব্ববাদি-সম্মত;

কেবল সেই মূলাধার কিরূপ ইহা লইয়াই যত কিছু বিবাদ বিসম্বাদ। এ প্রশ্নের মীমাংসা কে করিবে? অবশ্য—জ্ঞান, তা ভিন্ন আর কে? জ্ঞানকে জিজ্ঞাসা কর—জ্ঞান কি বলে? জ্ঞান যখন বলিতেছে যে, দৃশ্য আবির্ভাব-সকলের মূলাধার আছেই আছে" তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, সেই মূলাধার জ্ঞানের নিকটে অপ্রকাশ নাই; কেননা, মূলাধার জ্ঞানে প্রকাশ পাওয়াতেই জ্ঞান বলিতেছে "মূলাধার আছেই আছে" নতুবা আর কিসের জোরে জ্ঞান ওরূপ কথা বলিতে সাহসী হইবে? ঈশ্বর তাঁহার আপনারই প্রদত্ত মনুষ্য-জ্ঞানে আপনি আবির্ভূত হ'ন; রাজা যেমন তাঁহার আপনার প্রদত্ত প্রিয়-জনের ভবনে আপনি আতিথ্য গ্রহণ করেন—সেইরূপ। সমস্তের মূলাধার—মনুষ্যের জ্ঞানে প্রকাশিত আছেন ইহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই,—জিজ্ঞাস্য শুধু কেবল এই যে, তিনি জ্ঞানে কিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন? যদি বল যে, মূলাধার দৃশ্য বস্তুরূপে জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছেন, তবে সে কথার কোন অর্থ নাই; কেননা যাহা চক্ষে দৃষ্ট হয় তাহা দৃশ্য আবির্ভাব-মাত্র, তাহা মূল বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই আবির্ভূত হয়, তাহা স্বয়ং মূল-বস্তু নহে। যদি বল যে, মূলাধার শূন্য-রূপে জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছেন, তবে সেরূপ কথারও কোন অর্থ নাই; কেননা শূন্য কিছুই নহে—যাহা কিছুই নহে তাহার প্রকাশ অসম্ভব। অতএব জগতের যিনি মূলাধার তিনি স্বয়ম্ভু আত্মা রূপেই জ্ঞানে প্রকাশিত আছেন—এ ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। স্বয়ম্ভু আত্মা—অর্থাৎ তিনি আমাদের ন্যায় অপূর্ণ আত্মা নহেন, কেননা অপূর্ণ আত্মা অনেক অংশে অন্যের উপর নির্ভর করে; যিনি মূলাধার পুরুষ তিনি অন্য কাহারো উপর নির্ভর করেন না—তাঁহারই উপর সমস্ত জগৎ নির্ভর করে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, জগতের যিনি মূলাধার তিনি পরিপূর্ণ নিরবলম্ব স্বয়ম্ভু পরমাত্মা-রূপে আমাদের জ্ঞানাভ্যন্তরে নিরন্তর প্রকাশিত আছেন; অথচ অনেক সময়ে আমরা আমাদের বুদ্ধির দোষে এইরূপ মনে করি—যেন আমাদের নিকটে তিনি অপ্রকাশ রহিয়াছেন। আমরা আমাদের অভ্যাস-দোষে চক্ষের উপলব্ধি বা হস্তের উপলব্ধিকেই উপলব্ধি মনে করি, জ্ঞানের উপলব্ধিকে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই ধরি না; আমরা সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাকে জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়াও মনে করি—যেন আমরা তাঁহাকে উপলব্ধি করিতেছি না। পরমাত্মা আমাদের জ্ঞানাভ্যন্তরে এরূপ নিগূঢ় ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন যে, আমরা তাঁহাকে দেখিয়াও দেখি না; কিন্তু তাহা বলিয়া এরূপ বলিতে আমরা অধিকারী নহি যে, তিনি আমাদের জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছেন না। বণিক্ যেমন টাকা দিয়া টাকা উপার্জ্জন করে, শিষ্য যেমন বুদ্ধি দিয়া বুদ্ধি উপার্জ্জন করে—আপনার অপরিস্ফুট বুদ্ধি দিয়া গুরুর পরিপক্ক বুদ্ধি উপার্জ্জন করে; মনুষ্য সেইরূপ জ্ঞান দিয়া জ্ঞান-স্বরূপের দর্শন লাভ করে—ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়া পরিপূর্ণ জ্ঞানের দর্শন লাভ করে। পরমাত্মার দর্শন-লাভের এরূপ সহজ উপায় সত্ত্বেও শুষ্ক বৈজ্ঞানিকেরা জ্ঞান দিয়া অজ্ঞান ক্রয় করেন—আলোক দিয়া অন্ধকার ক্রয় করেন; তাঁহাদের জ্ঞানের ফল এই যে, পরমাশ্চর্য্য বিচিত্র জগতের মধ্যে তাঁহারা কেবল অজ্ঞান-অন্ধকারই দর্শন করেন। তাঁহারা বিপুল বিদ্যা বুদ্ধি ব্যয় করিয়া

শেষে পা'ন এই যে, তাড়িত-পদার্থে সকলই হয়—তাহারই শক্তি-মাহাত্ম্যে অন্ধকার হইতে আলোক পরিস্ফুট হয়, জড় হইতে প্রাণ পরিস্ফুট হয়, অজ্ঞান হইতে জ্ঞান পরিস্ফুট হয়; জগতে এমন কোন অসাধ্য ব্যাপার নাই যাহা, তাহার কর্ত্তৃত্বের সীমা-বহির্ভূত;—বাস্তবিকই যেন তাঁহারা তাড়িত পদার্থের সর্ব্ব-কর্ত্তৃত্ব দিব্য-চক্ষে অবলোকন করিয়াছেন! এই অন্ধ শক্তিটিই জড়বাদী প্রভৃতি শুষ্ক বৈজ্ঞানিকদিগের স্পর্শমণি; এবং ইহার উপার্জ্জনে তাঁহারা অশেষ বিদ্যা-বুদ্ধি ব্যয় করিয়া থাকেন।

কিন্তু জ্ঞান এমন যে দুর্লভ ধন, তাহা কি অন্ধ-শক্তি ক্রয় করিবার জন্যই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে? তবে হীরক দিয়া কাচ ক্রয় করা কি দোষ করিল? যাঁহারা জ্ঞান দিয়া জ্ঞান-স্বরূপকে ক্রয় করেন, তাঁহারাই জ্ঞানের যথার্থ সদ্ব্যয় করেন; তাঁহারা

"সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।"

পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানতৃপ্ত কৃতাত্মা বীত-রাগ এবং প্রশান্ত হ'ন।

জীবাত্মা প্রকৃতি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, পরমাত্মা জীবাত্মা এবং প্রকৃতি সমস্ত ব্যাপিয়া সকলের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান। জীবাত্মা এবং প্রকৃতি উভয়ে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী; পরমাত্মা দ্বন্দাতীত অটল প্রশান্ত নিরঞ্জন। সংসার, সত্য এবং মিথ্যার, আলোক এবং অন্ধকারের, জীবন এবং মৃত্যুর, দ্বন্দ্ব-ক্ষেত্র; জীবাত্মা পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে সেই সকল দ্বন্দ্বের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে,—ক্রমে অসত্য হইতে সত্যে উপনীত হয়, অন্ধকার হইতে আলোকে উপনীত হয়, মৃত্যু হইতে অমৃতে উপনীত হয়, এইরূপে শান্তি হইতে শান্তিতে পদনিক্ষেপ করে। জীবাত্মা পৃথিবীর গর্ভ-নিহিত বীজ-স্বরূপ, পরমাত্মা সূর্য্য স্বরূপ; সেই সূর্য্যেরই প্রভাবে সেই বীজ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া আকাশে পর্য্যুত্থান করে—এবং সেই সূর্য্যেরই আলোক আত্মসাৎ করিয়া নবজীবন হইতে নবতর জীবন লাভ করিতে থাকে। এরূপ জীবন-লাভের অন্ত নাই, যেহেতু পরমাত্মা-রূপ সূর্য্য অনন্ত জীবনের অক্ষয় ভাণ্ডার।

জীবাত্মা যখন আপনার জন্য কার্য্য করে, তখন তাহার সেরূপ কার্য্যকে স্বার্থ কহে; আর, যখন সে পরমাত্মার জন্য কার্য্য করে তখন তাহার সেরূপ কার্য্যকে পরমার্থ কহে। আমাদের মন নানা প্রকার কামনার আশয়; কোনটি বা প্রসুপ্ত, কোনটি বা জাগ্রত,—যেমন শত্রুর দর্শন-মাত্রে মনোমধ্যে তাহার অনিষ্ট-কামনা জাগ্রত হইয়া উঠে, শত্রুর অদর্শনে তাহা প্রসুপ্ত থাকে; কোনটি বা মুখ্য, কোনটি বা গৌণ,—যেমন ভূমি-কামনা উপস্বত্ব লাভের জন্য, সুতরাং উপস্বত্ব-কামনা মুখ্য—ভূমি-কামনা গৌণ; আবার, উপস্বত্ব-কামনা সুখ-সাধনের জন্য, সুতরাং সুখ-কামনা মুখ্য—উপস্বত্ব-কামনা গৌণ; কোনটি বা বৈধ কোনটি বা অবৈধ—কামনা-সকল এইরূপ বিচিত্র ভাবাপন্ন; সেই সকল কামনা উপযুক্ত রূপে চরিতার্থ করিবার জন্যই মনুষ্য প্রথমতঃ বুদ্ধিকে নিয়োগ করে। বুদ্ধি উপস্থিত কামনাকে কিয়ৎপরিমাণে দমন করিয়া কামনা-চরিতার্থতার সাধারণ নিয়ম-সকল অবধারণ করে; ইহাতে বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব অভিমান জন্মে—অহংকার জন্মে; অতঃপর বুদ্ধির অহঙ্কার এবং মনের বিষয়-কামনা দুয়ের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ উপস্থিত হয়। যেই

অহংকার মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান হয়, অমনি বিষয়-কামনা আসিয়া তাহার দর্প চূর্ণ করিয়া দেয়। অহংকার সংগ্রামে জয়লাভ করিতে নিতান্তই অসমর্থ। শুদ্ধ কেবল আপনার কামনার চরিতার্থতাতেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত মনুষ্যের লক্ষ্য আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার কামনা-সকল বিপথে ধাবিত হইয়া বৈধ চরিতার্থতা হইতে বঞ্চিত হয়—ও বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব-অভিমানকে বৃথা করিয়া দেয়। সাধারণ জন-সমাজের বৈধ কামনা-সকল যথোচিত চরিতার্থ হইলে আমারও বৈধ কামনা-সকল যথোচিত চরিতার্থ হইবে—অতএব তাহারই প্রতি যত্ন নিয়োগ করা কর্ত্তব্য, এইটিই শুভ বুদ্ধি। লোক-সমাজের বৈধ কামনা-সকলের চরিতার্থতায় সহায়তা করিতে হইলে আপনার বুদ্ধির অহংকার দমনে রাখিয়া সকলের নিকট হইতে সুবুদ্ধি গ্রহণ করা আবশ্যক—পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের নিকট হইতে, বর্ত্তমান সাধু মণ্ডলীর নিকট হইতে, এবং সাধারণতঃ সকল ব্যক্তির নিকট হইতেই সুবুদ্ধি ও সুপরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক; এবং সকলের সকল প্রকার শুভবুদ্ধি যাঁহাতে একাধারে বর্ত্তমান—সকল শুভ বুদ্ধির যিনি একমাত্র প্রেরয়িতা—সেই সর্ব্বমূলাধার পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করা এবং তাঁহার অভিপ্রায় শিরোধার্য্য করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। ইহারই নাম পরমাত্মার জন্য কার্য্য করা—ইহাই পরমার্থ। পরমার্থ-পথেই মনুষ্যের বৈধ কামনা-সকল উপযুক্ত চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে—স্বার্থ-পথে তাহা কোন ক্রমেই সম্ভবে না।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের

সারাংশ।

অতি মূঢ় ব্যক্তিরই নিকট এসংসার রমণীয় ভাবে প্রতিভাত হয় কিন্তু স্থির চিত্তে অল্পক্ষণ মাত্র জ্ঞানশক্তির চালনা করিলে মনুষ্য মাত্রেরই বোধ জন্মে যে এই আপাতমধুর সংসার বস্তুত বহু শোক-সমাচ্ছন্ন। জরা মৃত্যু হইতে ভয়, ব্যাধি বৈকল্য হইতে ভয়, হিংস্র জন্তু ও ততোধিক হিংস্র মনুষ্য হইতে ভয়, এবং সাধারণত প্রিয়বিয়োগ ও অপ্রিয়যোগে ভয়—এইরূপ নানাভয়ে মনুষ্য সর্ব্বদা পীড়িত হইতেছে। সংসারে যে সুখ দেখা যায় তাহাও বস্তুত সুখ নহে সুখের আভাস মাত্র। মনুষ্যের দেহ এরূপে গঠিত যে কোন অনুকূল বিষয়ের উপস্থিতিতেও যখন সুখের উদয় হয় তৎক্ষণাৎ দেহে স্নায়বীয় বিপ্লব ঘটে, তাহার গর্ব্ভে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ দুঃখের বীজ নিহিত রহিয়াছে। ইহা যথার্থ যে—"দুঃখ যেন দুর্দিন সুখ খদ্যোতিকা হেন মনরে নিশ্চিত জেন সংসারকান্তারে"। দুঃখের প্রতিবিধান করিতে মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। সংসারের ক্লেশ আলোচনা করিয়া যখন মনুষ্য উক্ত প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয় তখন তাহাকে কে আশ্বাস দিতে পারে? পৃথিবীতে এমন এক দল মনুষ্য আছেন তাহারা দুঃখের অন্ত জিজ্ঞাসুকে দুঃখের কখনই শেষ নাই এরূপ বলিয়া দুঃখের প্রতিবিধিৎসা ত্যাগ করিতে উপদেশ করেন। অনেক সাংসারিক জ্ঞানে মহা জ্ঞানী ব্যক্তি এই দলের অন্তর্ভূত এবং তাহাদের কথায় শ্রাদ্ধাবান লোক

ও অনেক। কিন্তু ইহা অতি সহজেই বোধগম্য হয় যে যাহা যে জানে না তাহাকে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করা বৃথা। যাহার দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইচ্ছা তাহার পক্ষে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ নাই এরূপ উপদেশ নিষ্প্রয়োজন। এ অবস্থায় বুদ্ধিমান মনুষ্য মাত্রেই জিজ্ঞাসা করিবেন যে, "কেহ কি দুঃখ নাশের উপায় দেখাইতে প্রস্তুত আছেন" এবং এরূপ কাহাকে দেখিলে প্রথমতঃ তাহার বাক্য অনাস্থেয় ইহা সপ্রমাণ না হইলে "দুঃখের অন্ত নাই" এই সর্ব্বহারক তামসিক জ্ঞানকে কখনই বরণ করিবেন না। ইহার বিপরীত সর্ব্বতোভাবে দুর্ব্বুদ্ধির কার্য্য। যিনি দুঃখের অন্ত না দেখিয়া এরূপ স্থির করিয়াছেন যে দুঃখের অন্ত হইতেই পারে না দুঃখের অন্তপ্রত্যাশীর পক্ষে তাঁহার বাক্যের উপযোগিতা নাই। আর, যিনি বলেন যে দুঃখের অন্ত আছে তাঁহার কথার সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে বিবাদ উঠিতে পারে কিন্তু তাহার বাক্য যে জিজ্ঞাসুর পক্ষে উপযোগী তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহের অবসর নাই। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বভাষায় শুনা যায়—

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ বিভেতি কুতশ্চন।
ব্রহ্মবিৎ পরমাপ্নোতি!
অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি।"
যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥"

অতএব শ্রেয়ার্থীর দ্রষ্টব্য যে এই সকল বাক্য শ্রদ্ধেয় কি বন্ধ্যাপুত্র খপুষ্পাদিবৎ অর্থশূন্য। স্বেচ্ছায় এই দৃষ্টি রোধ করা সর্ব্বতোভাবে যুক্তিবিরুদ্ধ। এই বিচারে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমেই ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে এই সকল বাক্য সন্দেহস্পৃষ্ট নহে। ইহাদের মধ্যে "হইতে পারে" "বোধ হয়" এরূপ কোন ভাব নাই, ইহারা নিশ্চয়রূপে অবধারিত। দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে কিরূপে এই সন্দেহসঙ্কুল জগতে এ প্রকার সুমেরু-তুল্য অচল বাক্যরাশির প্রচার হইয়াছে। সমুদায় জগৎ যাহাকে অপ্রমাণ করিতে যত্নশীল জগতে তাহার বক্তাই বা কিরূপ সম্ভব হয় আর তাহাতে লোকের বিশ্বাসই বা কিরূপে হয়! আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যাহারা উক্ত বাক্যে শ্রদ্ধাশীল এবং তদুচিত সাধন করিতে যত্নবান দিন দিন তাঁহাদের দুঃখ শমিত হয়। ইহাও প্রত্যক্ষ যে যাহারা উল্লিখিত পথ অবলম্বন করিয়া অভীপ্সিত দেশাভিমুখে অগ্রসর হন তাঁহাদের অনেকের মধ্যে তদ্দেশ লাভের প্রমাণ তাঁহাদের বাক্যে ও তদনুযায়ী লিঙ্গ দ্বারা প্রদর্শিত হয়; অন্যেরা উক্তরূপে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য না হইলেও প্রতিদিন তাঁহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি ও পরিণামে উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে দৃঢ় বিশ্বাস দৃষ্ট হয়, আর অনেকে বিশেষরূপ লব্ধকাম না হইলে তাহা নিজের দোষ নিবন্ধন এইরূপ স্থির বিশ্বাসের পরিচয় প্রদান করেন। অতি অল্প সংখ্যক যাত্রীই উদ্দেশ্যকে দোষ দিয়া যাত্রা হইতে বিরত হ'ন। ইহাতে অতি প্রাচীন কাল হইতে অদ্যাবধি কোন ব্যভিচার লক্ষিত হয় না।

সুবোধ লোক মাত্রই ইহাতে স্থির করেন যে দুঃখ হইতে পরিত্রাণের উপায় যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা স্বকর্ম্মসাধনে সক্ষম। এরূপ আস্তিক্য বুদ্ধি সত্ত্বেও নানা সংশয় উপস্থিত হয়। কেন না ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন দুঃখ নাশের উপায় প্রচার করিতে ব্রতী হইয়াছেন এবং নিজ নিজ মত সমর্থনের নিমিত্ত নরহত্যাদি

মহা পাপাচরণে কুণ্ঠিত হন না। এইরূপ ধর্ম্মঘটিত বাক্‌যুদ্ধ ও অস্ত্রযুদ্ধ নাস্তিকতার একটি প্রধান উদ্দীপক। কিন্তু সমরধূলি স্থিত হইলে যখন অন্ধকার দূর ও দৃষ্টি বাধা-শূন্য হয় তখন প্রকাশিত হয় যে যেমন মহা বাত্যায় সমুদ্রের উপরিভাগ মাত্র আলোড়িত হয় কিন্তু তাহার অভ্যন্তর দেশ অবিচলিত ভাবে স্থির থাকে সেইরূপ এসকল অশান্তির মধ্যে যথার্থ যে সুখস্বরূপ প্রাপ্তির উপায় (যাহা ধর্ম্মের নামান্তর) তাহা অক্ষুণ্ণ একই ভাবে বিরাজমান। ধর্ম্মের যে অংশ লইয়া বিবাদ তাহা অকিঞ্চিৎকর, দেশকালপরিচ্ছিন্ন ও সাধকদিগের প্রকৃতিবৈচিত্র্যজাত। আর যে অংশ নির্ব্বিবাদ তাহা সার, নিত্য ও সত্যের স্বভাব হইতে উৎপন্ন। ইহা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলে যে সকল অমঙ্গল ধর্ম্মকে কলুষিত করে তাহা একেবারে নিঃশেষিত হয়।

পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে তাহাদের চরম লক্ষ্য একই। সত্য প্রাপ্তিকে সকল ধর্ম্মই পরম পুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। সত্যই পরমেশ্বরের স্বরূপ। অতএব পরমেশ্বরের স্বরূপ বিদিত করাই ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য। যেরূপ সাগর সমুদায় নদীরই শেষ গতি তদ্রূপ পরমেশ্বরই ধর্ম্মনদী সমূহের একমাত্র সাগর। সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরকে বিদিত হইলেই মনুষ্য মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হয় ইহা সর্ব্ব ধর্ম্মেরই উক্তি।

সর্ব্বে বেদাঃ যৎপদমামনন্তি—
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যৎ বদন্তি,
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি।"

তাহা সেই একাক্ষর প্রণবের প্রতিপাদ্য পরমেশ্বর, সত্যই যাঁহার স্বরূপ। ইহা সর্ব্ব ধর্ম্মেরই শাসন যে পরমেশ্বর স্বরূপতঃ (কার্য্যতঃ নহে) যে কি বা কেমন তাহা সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের অগোচর বাক্যের অগোচর ও মনের অগোচর। হে দম্ভিন্, হে অশান্ত মনুষ্য, তুমি চিন্তা করিয়া এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ যে কি ও কেমন তাহা স্থির কর। যখন তুমি ইহাতে অক্ষম তখন জগতাতীত জগদীশ্বর যে কি ও কেমন তুমি কি উপায়ে স্থির করিবে? সুবোধ ব্যক্তি মাত্রেই দর্শন করেন যে পরমেশ্বরতত্ত্ব সর্ব্ব ধর্ম্মে একই রূপে বর্ণিত রহিয়াছে। তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায়ও সর্ব্বত্র একই। যে বৈষাদৃশ্য তাহা কেবল মাত্র বাহ্যিক। সর্ব্বত্রই শ্রুত হওয়া যায়,

"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যক জ্ঞানেন।"

এই যে আত্মা তিনি সত্যের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা ও সম্যক জ্ঞানের দ্বারা লভ্য হয়েন।

'সত্য' শব্দের অর্থে যে কেবল স্বীয় অনুভূত বিষয়কে যথাতথভাবে পর বুদ্ধি সংক্রমণ করা তাহা নহে। যে যথার্থ বাক্য নৈষ্ঠুর্য্য বা পৈশুন্যদোষাশ্রিত তাহা ধর্ম্ম্য নহে ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী। যেরূপ বাক্য ধর্ম্ম্য তাহা এই,

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।

যে বাক্য শ্রোতার উদ্বেগ করে না যে বাক্য যথানুভূত যাহা শ্রোতার ব্যবহারিক ও পারমার্থিক হিতকর তাহাই ধর্ম্ম্য তাহাই যথার্থ সত্য। এবং এই সত্যই পরম ধর্ম্ম, ইহাই পরম সম্পৎ। "তপঃ" শব্দের অর্থে শরীরপীড়ন নহে, "মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঐকাগ্র্যং পরমং তপঃ।" মনঃ ও ইন্দ্রিয়বর্গের একাগ্রতাই উৎকৃষ্ট তপস্যা। মন অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি ও ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি ইহাদের পরমেশ্বরের অভিমুখী হওনের নাম তপস্যা। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ক্রিয়াশক্তির আরম্ভ হয় বলিয়া ইহা প্রথমে উক্ত হইল। সর্ব্বাগ্রে পরমেশ্বরে প্রীতি স্থাপন করা বিধেয় কেননা ক্রিয়াশক্তি ইচ্ছাশক্তির অধীন। যাহার পরমেশ্বরে প্রীতি নাই তাহার পুণ্য ক্রিয়াও সাধন পক্ষে নিষ্ফল। অতএব ঈশ্বরে প্রীতিরূপ সম্পত্তি নিঃসংশয় অমূল্য।

যা প্রীতি রবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িষু।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

হে পরমেশ্বর বিবেকহীন ব্যক্তিগণের নশ্বর বিষয়ে যেরূপ প্রীতি তাহা তোমাকে যথা নিয়ম চিন্তা করি যে আমি আমার হৃদয় হইতে যেন প্রস্থান না করে। অর্থাৎ অবিবেকির যেরূপ শব্দাদি বিষয়ে অনুরাগ সাধকের পরমেশ্বরের প্রতি তদ্রূপ প্রীতি হয়। যাঁহাদের পরমেশ্বরে এইরূপ প্রীতি হয় তাঁহারা ধন্য। একেবারে ঈশ্বরে অব্যভিচারিণী প্রীতি লাভ করা মনুষ্যের পক্ষে দুর্ঘট। মনের চাঞ্চল্যবশতঃ, বিষয়ের প্রলোভনবশতঃ, সাংসারিক দুঃখের তীব্র পীড়ন বশতঃ আমরা সদা সর্ব্বদা ঈশ্বর হইতে বহির্মুখ হইয়া পড়ি। মনকে অন্তর্মুখ করিবার নিমিত্ত, ঈশ্বরপ্রীতি বর্দ্ধনের নিমিত্ত পুণ্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন। কেহ যেন এরূপ বিবেচনা না করেন যে অনুষ্ঠানের ফল ঈশ্বরে প্রীতি কেন না স্বভাবতই ঈশ্বর পরপ্রেমাস্পদ। ক্রিয়া দ্বারা সেই প্রীতির বিরোধী যে সকল ভাব তাহারই নিষ্কাশন হয়। ঊর্দ্ধদেশ হইতে পড়িতেছে যে বস্তু বাধাবশতঃ তাহার পতন রোধ হয় এবং পরে সেই বাধার অভাব হইলে তাহা পুনরায় পড়িতে আরম্ভ করে। কিন্তু তাহা বলিয়া বাধা নিষ্কাশন কখন উক্ত বস্তুর পতনের কারণ হইতে পারে না। ইহাও তদ্বৎ। ক্রিয়ার দ্বারা দৃশ্য বিষয় হইতে মন প্রত্যাহৃত হইলে ঈশ্বরে প্রীতির বর্দ্ধন হয় অর্থাৎ অন্য বিষয়ে প্রীতি পরিত্যাগ করিলে স্বতঃসিদ্ধ ঈশ্বরপ্রীতি প্রস্ফুটিত হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই তাহাতে প্রীতি হয় আমাদের ক্রিয়া-হেতুক নহে। সেই প্রীতিকে অন্য বিষয়ে স্থাপন করিয়া স্বীয় অবনতি করা কিম্বা তদ্বিপরীত আচরণে স্বীয় উন্নতি করা আমাদের ইচ্ছাধীন।

কিরূপ ক্রিয়া দ্বারা উক্ত অর্থ সাধিত হইতে পারে? ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে ভিন্ন ভিন্ন মত কিন্তু এক বিষয়ে কাহার মতভেদ নাই। সর্ব্ব ধর্ম্মেরই শাসন যে সর্ব্বলোকের হিতকামনা করিবে, শুভানুষ্ঠায়িকে উৎসাহিত করিবে, বিপন্নকে করুণা করিবে এবং দুরাচারিকে উপেক্ষা করিবে। যে সকল ক্রিয়া ইহার অনুকূল তাহাই আচরণীয়, তদ্বিপরীত হেয়।

এই সাধনগুলির সঙ্গে অপর একটী সাধন প্রয়োজন তাহা "সম্যকজ্ঞান" অর্থাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার পরিত্যাগ। যে সকল ঈশ্বর সম্বন্ধীয় বিশ্বাস আপাততঃ মধুর হইলেও বস্তুতঃ তাঁহার অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করে তাহা সর্ব্বতোভাবে হেয়। সাধক তাঁহাকে স্বরূপতঃ

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি, শান্তং শিবমদ্বৈতং"

এবং কার্য্যতঃ জগতের সৃষ্টিস্থিতি ভঙ্গের এক মাত্র চেতন কারণ বলিয়া জানেন। নতুবা তাহার সাধন বৃথা হইয়া যায় কেননা তাহার প্রীতি যথার্থ পাত্রে স্থাপিত হয় না। জগতের সৃষ্টিস্থিতি ভঙ্গের দ্বারা যাঁহার সত্তার উপলব্ধি হয়, যাঁহার স্বরূপ বাক্য ও মনের অতীত অথচ যিনি অচিন্ত্য শক্তিযোগে

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়স্থানং নিধানং বীজ মব্যয়ং॥

তিনিই এক মাত্র পরম প্রীতির আস্পদ অপর কেহ নহে। অতএব বিশেষ সাবধানতার সহিত কুসংস্কার হাতব্য।

যাঁহারা এই সর্ব্বসম্মত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী ক্রমে ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত আছেন তাঁহারা ধন্য। সর্ব্ব জগতের একমাত্র ঈশ্বর, সর্ব্ব মনুষ্যের একমাত্র পিতা মাতা আমাদের হৃদয়কে নিজাভিমুখে আকর্ষণ করুন যাহাতে আমরা সর্ব্ব বাসনাত্যাগ করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্তিরূপ চির শান্তি ও অক্ষয় সুখ ভোগ করিতে পারি ইহাই একাগ্রচিত্তের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং॥

বৈদান্তিক-ব্রহ্মজ্ঞান।

বেদান্তীরা প্রথমে শিষ্যদিগকে নৈত্যিক (যাহা প্রতিক্ষণে হইতেছে) বৈষয়িক-জ্ঞানের প্রণালী উপদেশ করেন, বুঝান, পশ্চাৎ ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করেন বা বুঝান। তাঁহাদিগের অভিপ্রায় এই যে, স্বতঃসিদ্ধ মানবীয় জ্ঞান কিম্বিধ প্রণালীতে উৎপন্ন হয়, তাহার অবস্থা বা বিভাগ কতপ্রকার, এ সকল না জানিলে, না বুঝিলে, বিচারোৎপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান আয়ত্ত ও উৎপাদন করা যায় না। যে ব্যক্তি স্বতঃসিদ্ধ নৈত্যিক বিষয়িক জ্ঞানের প্রণালী ও গতি বুঝে না, জানে না, সে ব্যক্তি বিচারোৎপাদ্য ব্রহ্ম-জ্ঞানের অনধিকারী। বেদান্তীদিগের এই অভিপ্রায় বজায় রাখিয়া, বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞান বুঝাইবার পূর্ব্বে, প্রথমতঃ আমরা বেদান্তমতের নৈত্যিক জ্ঞানের বা নিত্যানুভূত বিষয়িক-জ্ঞানের প্রণালী ও বিভাগ বর্ণন করিব।

বেদান্ত মতে মানবীয় জ্ঞানের প্রথমতঃ দুই মুখ্য বিভাগ প্রদর্শিত আছে। অনুভূতি ও স্মৃতি। অনুভূতি ও অনুভব তুল্য কথা। এবং স্মৃতি ও স্মরণ তুল্য কথা। এই দুই মুখ্য বিভাগের অবান্তর বিভাগ ভ্রম ও প্রমা। এই দুই মুখ্য বিভাগ লৌকিক ভাষায় ক্রমান্বয়ে মিথ্যা ও সত্য নামে ব্যবহৃত বা উল্লিখিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ মানবগণের ভ্রমাত্মক অনুভব, প্রমাত্মক অনুভব, ভ্রমাত্মক স্মৃতি ও প্রমাত্মক স্মৃতি হইতে দেখা যায়। এই দুই বিভাগ সমান সমালোচ্য ও সমান অনুসন্ধেয় হইলেও বেদান্তীরা প্রথমে প্রমা জ্ঞানেরই স্বরূপ অনুসন্ধান ও নির্ণয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, প্রমা কি? কিম্বিধ জ্ঞানের নাম প্রমা? এতথ্য নিশ্চিত হইলে তৎসঙ্গে অপ্রমা বা ভ্রম আপনা হইতেই নিশ্চিত বা স্থির হইবে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে প্রমাজ্ঞানই বিবেচ্য।

স্মৃতি বিভাগ বাদ রাখিয়া, কেবল মাত্র অনুভব বিভাগীয় প্রমা বুঝিতে হইলে, এইরূপে বুঝিবে।—"যে জ্ঞান অনধিগত ও অবাধিত বস্তু অবগাহন করে, বা অবগাহন পূর্ব্বক উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানই অনুভব বিভাগীয় প্রমা।" আর স্মৃতি ও অনুভব, উভয় সাধারণ। প্রমা বুঝিতে হইলে, "যে জ্ঞান অবাধিত বস্তু অবগাহন করে, সেই জ্ঞানই প্রমা," এইরূপে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ "অনধিগত" বিশেষণটী ত্যাগ করিলেই প্রমাসামান্যের আকার স্থির হইবে।

বিবরণ—উপরোক্ত সূত্রভূত কথার বিবরণ এইরূপ—জ্ঞান-নির্দোষ-ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত বস্তু যৎস্বরূপ, ঠিক তৎস্বরূপ বা তদাকার মনোবৃত্তি (মনে ইন্দ্রিয় সংযুক্ত বস্তুর ছবি হওয়া) অনধিগত-যাহা পূর্ব্বানুভূত

নহে। অবাধিত—যাহার বাধ হয় না, অর্থাৎ পরীক্ষা কালে যাহার অন্যথা হয় না। সমুদয় কথার নিষ্কর্ষ বা নির্গলিতার্থ এই যে, যে জ্ঞানের বা যে মনোবৃত্তির (বস্তু ছবির) বিষয় বা বস্তু জ্ঞানোত্তরকালেও থাকে, পরীক্ষা করিলেও, অন্যথা হয় না, তিরোহিত হয় না, সেই জ্ঞান বা সেই মনোবৃত্তি প্রমা-শব্দের বাচ্য। বাহ্যিক দূরত্বাদি দোষ নাই, আন্তরিক ইন্দ্রিয়-বৈকল্যাদি দোষ নাই, এমন অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়-সম্পর্ক প্রভাবে যদ্রূপ বস্তু ঠিক তদ্রূপ মনোবৃত্তি (ছবি) জন্মিয়া থাকে, অন্যথা হইলে অন্যরূপ হয়, অর্থাৎ প্রমা হয় না, ভ্রমই হয়। জ্ঞানগোচরিত বস্তুর স্বরূপ ঠিক থাকিলেই, অন্যথা না হইলেই অর্থাৎ পরীক্ষায় টিকিলেই তাহা অবাধিত বলিয়া গণ্য। কখন কখন রজ্জু-চক্ষুঃ-সংযোগের পর রজ্জুজ্ঞান না হইয়া সর্প জ্ঞান হয়, সে জ্ঞানের সে সর্প পরীক্ষায় টিকে না, অন্যথা হয়, অর্থাৎ ইহা সর্প নহে, এরূপ পুনঃ-প্রতীতি হয়, সুতরাং সে সর্প বাধিত। এরূপ অন্যথা জ্ঞান, বা একে আর জ্ঞান, কোন রূপ দোষ থাকিলেই হয়, দোষ না থাকিলে হয় না।

পেচকগণ স্ফীতালোক সূর্য্যমণ্ডলে অন্ধকার অনুভব করে, তাহা তাহাদের নেত্রদোষ। কেহ কেহ রক্ত বর্ণকে কৃষ্ণ বর্ণ ও শ্বেত বর্ণকে পীত বর্ণ মনে করে, সে সমস্তই তাঁহাদের চক্ষুর দোষ। আমরা সকলেই বহু যোজন বিস্তৃত সূর্য্যকে হস্ত-প্রমাণ দেখি, সুতরাং তাহা আমাদের দোষ নহে, বাহ্যিক দূরত্ব-দোষই আমাদিগকে উহাকে ঐরূপে প্রদর্শন করায়। অতএব বাহ্যিক বা আন্তরিক কোন প্রকার দোষ (প্রতিবন্ধক) বিদ্যমান থাকিলে প্রমোৎপত্তি হয় না, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। যে জ্ঞান দোষাভাব সহকারে উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানেরই বিষয় অবাধিত ও অব্যভিচরিত হয়। অন্যথা বা অন্যরূপ হয় না। বাধিত শব্দের পরিবর্ত্তে মিথ্যা শব্দের ব্যবহার করিতেও পার। বাধিত—মিথ্যা। অবাধিত—সত্য। অতএব যে জ্ঞান অবাধিত পদার্থ অর্থাৎ সত্য বস্তু অবগাহন করে, সেই জ্ঞানই প্রমা জ্ঞান। ইহাও মনে রাখিতে হইবেক, এ সত্য ব্যবহারিক সত্য। স্মৃতিজ্ঞান প্রমা বটে, কিন্তু ইহার বিষয় সে সময়ে উপস্থিত বা বিদ্যমান থাকে না। চিত্তে পূর্ব্বানুভূত জ্ঞানের সংস্কার থাকে, উদ্বোধক উপস্থিত হইলে, সেই সংস্কারই তদাকারে (তদ্বস্তুর আকারে) অভিব্যক্ত হয়। কাযেই এই জ্ঞান বিদ্যমান-বিষয়-নিরপেক্ষ। বিষয় বিদ্যমান থাকে না, কেবল মাত্র পূর্ব্বানুভব-জনিত-সংস্কার-বলে উদিত হয় বলিয়া, স্মৃতিজ্ঞানটী স্বপ্নসদৃশ অস্পষ্ট। অনুভবের সহিত স্মৃতির এই মাত্র প্রভেদ দেখিয়া যাঁহারা স্মৃতি জ্ঞানকে পৃথক্ শ্রেণী করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনধিগত বা অননুভূত এই শব্দটীকে বিষয়বিশেষণ দিবেন। অর্থাৎ অনধিগত (অননুভূত) ও অবাধিত বস্তু অবগাহী জ্ঞানই প্রমা, এইরূপ বলিবেন। যে বস্তু অননুভূত, পূর্ব্বে অনুভূত হয় নাই অথচ অবাধিত অর্থাৎ মিথ্যা নহে, এমন বস্তু যে-জ্ঞানের বিষয়, সেই জ্ঞানই প্রমা। ইহাই প্রমা লক্ষণ, এই লক্ষণই মনে রাখিবেন।

যখন কোন ধারাবাহী জ্ঞান জন্মে তখনও তদন্তর্গত দ্বিতীয়াদি জ্ঞানের বিষয় (আলম্বন বস্তু) নিম্নলিখিত প্রকারে অনধিগত বলিয়া গণ্য, তদনুসারে, স্মৃতিঘটিত প্রমাজ্ঞানের লক্ষণও তাদৃশস্থলে অব্যাপ্ত নহে। অর্থাৎ ধারাবাহী জ্ঞানের দ্বিতীয়াদি জ্ঞানে এ প্রমা লক্ষণ বজায় থাকে।

প্রণালী যথা—কালের কোন রূপ (রং) না থাকিলেও কাল ইন্দ্রিয়বেদ্য, ইহা অনেক পণ্ডিতের স্বীকার আছে। সেই স্বীকার অনুসারে, ইন্দ্রিয়-জনিত-মনোবৃত্তিরূপ জ্ঞান যখন যেবস্তু অবগাহন করে বা গ্রহণ করে, তখনই সে তদবচ্ছিন্ন বা তদ্বিশিষ্ট (তৎসঙ্গে) ক্ষণাদিরূপ সূক্ষ্ম কালকেও অবগাহন করে, গ্রহণ করে। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ধারাবাহী জ্ঞানের প্রথম জ্ঞানটী প্রথম-ক্ষণ-বিশিষ্ট ঘটকে অবগাহন করিয়াছিল এবং দ্বিতীয়াদি জ্ঞানগুলি দ্বিতীয়াদিক্ষণবিশিষ্ট ঘট গ্রহণ করিয়াছিল। ঘট এক হইলেও যেমন শ্বেত ঘট, রক্ত ঘট, পীত ঘট, এইরূপে ভিন্ন, তেমনি, প্রথমক্ষণান্বিত ঘট, দ্বিতীয়ক্ষণান্বিত ঘট, তৃতীয়ক্ষণান্বিত ঘট, ঐরূপে বিভিন্ন। যদি বিভিন্নই হইল, তাহা হইলে আর দ্বিতীয়াদি জ্ঞানের বিষয় (অবগাহ্য ঘট) অধিগত বা পূর্ব্বানুভূত বলিয়া গণ্য হইল না, সুতরাং প্রথমোক্ত প্রমালক্ষণের অব্যাপ্তি দোষও (লক্ষ্যে লক্ষণ না যাওয়া) হইল না।

বিস্তার—উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত কথার বিস্তার এইরূপ—কখন কখন এমন হয়, কোন এক জ্ঞান দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বিরাজিত থাকে। সে দীর্ঘ জ্ঞান কখন আপনা আপনি কখন বা ইচ্ছাবলে সেরূপ স্থায়ী হয়। দেবচিন্তক, ঈশ্বরোপাসক, ভাবুক, শোকমগ্ন, প্রেমমগ্ন, এইরূপ এইরূপ লোককে প্রায়ই ইচ্ছা পূর্ব্বক স্বীয় ভাব্য বিষয়ক জ্ঞানকে দীর্ঘ বা স্থায়ী করিয়া রাখিতে দেখা যায়। এইরূপ দীর্ঘ জ্ঞান সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার মত প্রচার করিয়া থাকেন। কেহ বলেন, তাদৃশ দীর্ঘ (সম্বা) বা স্থায়ী জ্ঞান এক জ্ঞান নহে, তাহা জ্ঞানধারা। অর্থাৎ তাহা উত্তরোত্তর সংলগ্ন বহু জ্ঞান। ইহারই অন্য নাম ধারাবাহী জ্ঞান। ঘট বিষয়ক ধারাবাহিক জ্ঞানের আকার এইরূপ "ঘট ঘট ঘট ঘট—।" এক প্রযত্নে অনেকগুলি ঘটজ্ঞান শীঘ্র উৎপন্ন হইয়া শীঘ্র সংলগ্ন হইয়া যায় বলিয়াই উহাদের মধ্যবর্ত্তি চ্ছেদ অনুভূত হয় না, সুতরাং একটীর ন্যায় দেখায় অর্থাৎ এক বলিয়া বোধ হয়। অতএব ধারাবাহি জ্ঞানের মধ্যে যে জ্ঞানটী প্রথম, সেইটী ভিন্ন অন্য সমস্ত গুলিই প্রমালক্ষণে অব্যাপ্ত অর্থাৎ প্রমা লক্ষণে লক্ষিত হয় না। ভাবিয়া দেখ, প্রথমোৎপন্ন জ্ঞান যে ঘট অবগাহন করিয়াছে, পুনর্ব্বার সেই ঘটই দ্বিতীয়াদি জ্ঞানের বিষয় হইতেছে সুতরাং দ্বিতীয়াদি জ্ঞান অধিগত বিষয়-বিষয়ক হইল, অনধিগত বিষয়-বিষয়ক হইল না। অনধিগত-বিষয় বিষয়ক না হওয়াতেই অনধিগত-ঘটিত প্রমালক্ষণ দ্বিতীয়াদি জ্ঞানে থাকিল না। অথচ সে সকল জ্ঞান প্রমা মধ্যে গণ্য। এ সম্বন্ধে যে প্রণালী অবলম্বন করিতে হয় সে প্রণালী এই—ধারাবাহি জ্ঞান পরপর সংলগ্ন বহুজ্ঞান হইলেও তদন্তর্গত দ্বিতীয়াদি জ্ঞানে নিম্নলিখিত প্রকারে প্রথমোক্ত প্রমালক্ষণের সমন্বয় আছে। যথা—প্রথমতঃ কালের ইন্দ্রিয়-বেদ্যতা স্বীকার কর। কোনরূপ রূপ না থাকিলেও কাল ইন্দ্রিয়-বেদ্য। ছয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই কালজ্ঞান হইয়া থাকে। কেমন করিয়া? তাহা বিবেচনা কর। অনুস্বার ও বিসর্গ যেমন পৃথক্ উচ্চারিত হয় না, কোন একটা বর্ণের যোগ ব্যতীত উচ্চারিত হয় না তেমনি, কালও ইন্দ্রিয়-বেদ্য বস্তুর যোগ ব্যতীত পৃথক্ অনুভূত হয় না। যখন যে ইন্দ্রিয় যে-বস্তু গ্রহণ করে, তখন সেই ইন্দ্রিয় সেই বস্তুর সঙ্গে

স্বক্রিয়াবচ্ছিন্ন কালকেও গ্রহণ করে। "এখন ঘট আছে" ইত্যাকার জ্ঞানের "এখন" অংশটুকু কালবিষয়ক ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। যখনই তুমি চক্ষুঃ দ্বারা ঘট দেখিয়াছ, তখনই তৎসঙ্গে স্বক্রিয়াবচ্ছিন্ন কালকেও দেখিয়াছ। যে পর্য্যন্ত ঘটে চক্ষুঃ সংযোগ বিদ্যমান থাকে, সে পর্য্যন্ত কাল স্বক্রিয়াবচ্ছিন্ন নামে খ্যাত। চক্ষুঃ যদি ঘটের সঙ্গে স্বক্রিয়াবচ্ছিন্ন কালকে না দেখিয়া থাকে, তাহা হইলে, "এখন" এতদ্রূপ কালবোধক অংশ বা জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? কে উৎপাদন করিয়া দিল? অতএব, বিবেচনা করা উচিত, ঐ স্থলে চক্ষুই ঐ জ্ঞান উৎপাদন করিয়াছে, অন্য কেহ করে নাই। কালের রূপ নাই, রস নাই, শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, তজ্জন্য কাল দেখা যায় না, শুনা যায় না, এ সকল প্রবাদ বা এ সকল নির্ণয় অস্বাতন্ত্র্যমূলক ভিন্ন অন্যমূলক নহে। অর্থাৎ কাল অনুস্বার বিসর্গের ন্যায় স্বতন্ত্ররূপে বা পৃথক রূপে অনুভবগম্য হয় না। ইন্দ্রিয়গৃহীত কালের উক্তপ্রকার ইন্দ্রিয়বেদ্যতা অঙ্গীকার করিলে অবশ্যই ধারাবাহী জ্ঞানের অন্তর্গত দ্বিতীয়াদি জ্ঞানের বিষয় গুলিকে অর্থাৎ বিভিন্ন-ক্ষণ-বিশিষ্ট বিভিন্ন ঘট পর পর গুলিকে অনধিগত বলিয়া গণ্য বা অঙ্গীকার করিতে পার। কেন না, দ্বিতীয়ক্ষণান্বিত ঘট দ্বিতীয় জ্ঞানেরই বিষয়, তাহা প্রথমে জ্ঞানে অধিগত হয় নাই। যে ঘট প্রথম জ্ঞানে অধিগত হইয়াছে, সে ঘট প্রথমক্ষণান্বিত ঘট, সুতরাং সে ঘট দ্বিতীয় জ্ঞানের অধিগত নহে। ঘট বস্তু এক হইলেও যেমন শ্বেত-ঘট পীতঘট এবম্প্রকারে রূপে ভিন্ন, তেমনি ঘট বস্তু এক হইলেও প্রথমাক্ষণান্বিত ঘট, দ্বিতীয়ক্ষণান্বিত ঘট, এবম্প্রকারে বিভিন্ন। এই বিভিন্নতা অবলম্বন করিয়াই প্রদর্শিত-প্রকারে লক্ষণদোষ নিবারণ করা যাইতে পারে।

এ সম্বন্ধে বেদান্ত-সিদ্ধান্ত, ধারাবাহিক জ্ঞান একই জ্ঞান; পর পর সংলগ্ন বহুজ্ঞান নহে। যে পর্য্যন্ত ঘটরূপ বিষয়ের স্ফুরণ থাকে সেই পর্য্যন্ত ঘটাকারা মনোবৃত্তি একই বৃত্তি; নানা বা বহু নহে। উৎপন্ন মনোবৃত্তির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিয়ম এই যে; যে পর্য্যন্ত স্ববিরোধ বৃত্তি অর্থাৎ অন্যরূপ বৃত্তি উৎপন্ন না হয়, সে বৃত্তি সেই পর্য্যন্ত বিরাজিত থাকে। ঘটাকারে মনোবৃত্তি জন্মিল, সে বৃত্তি, পটাকার অথবা অন্য কোন প্রকার মনোবৃত্তি উৎপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবে না। এই নিয়ম অনুসারে ঘটধারাবাহি বুদ্ধি স্থলে যে সুদীর্ঘ ঘটাকারাবৃত্তি বিরাজিত থাকে, তাহা একই বৃত্তি; বহু নহে। যেমন বৃত্তি এক, তেমনি, তাবৎকালস্থায়ী তৎপ্রতিফলিত (ঘটাকার মনোবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত) চৈতন্য রূপ জ্ঞানও এক, অর্থাৎ ধারাবাহিক জ্ঞান এক জ্ঞান; বহুজ্ঞান নহে। এই সিদ্ধান্তই সৎসিদ্ধান্ত, এসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে ধারাবাহিক জ্ঞানে অবশ্যই প্রমালক্ষণ লক্ষিত হইবেক সুতরাং অব্যাপ্তি দোষ নিবারিত থাকিবেক।*

বলিতে পার, বেদান্ত মতে এসকল কিছুই সত্য নহে, ঘট পট, সমস্তই মিথ্যা। ঘট যদি মিথ্যাই হয়, তবে অবশ্যই তাহা বাধিত; বাধিত হইলে, "যে জ্ঞান অবাধিত পদার্থ অবগাহন করে, সেই জ্ঞানই প্রমা"

* লক্ষ্যে লক্ষণ না গেলে ন্যায় ভাষায় তাহাকে অব্যাপ্তি বলে। স্থূল কথা এই যে লক্ষণ সমস্ত লক্ষ্যব্যাপক হওয়া চাই। ধারাবাহী জ্ঞান প্রমা-মধ্যে গণ্য তজ্জন্য তাহা লক্ষ্য, লক্ষণ তাহাকে স্পর্শ করিতেদিল না, কাযেই অব্যাপ্তি দোষ হইতে দিল।

এলক্ষণ একবারে অসম্ভব হইয়া পড়িল এবং ঘটজ্ঞান প্রমা না হইয়া অপ্রমামধ্যে নিবিষ্ট হইল। ঘট জ্ঞান কেন, কোনও জ্ঞান প্রমা হইল না। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, ঐ সকল বাধিত সত্য; ঘটও বাধিত সত্য; কিন্তু সংসার দশায় বাধিত নহে। ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত, এ সমস্তই অবাধিত বলিয়া গণ্য। যখন ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইবে তখন এ সকল বাধিত বা মিথ্যা হইবে। ঐন্দ্রজালিক মায়ার ন্যায় অসত্য বলিয়া স্থির হইবে। ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত। এ সম্বন্ধে বেদান্ত-বাক্য যথা—"যখন এ সকল আত্মপর্য্যবসিত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শীর আত্মভূত হয়, তখন সে কি দিয়া কি দেখিবে?" "যখন দ্বৈততুল্য হয় অর্থাৎ আমি, আমার, ইত্যাদিবিধ কল্পিত ভেদবুদ্ধি থাকে, তখনই জীব অন্য হইয়া পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির দ্বারা ভিন্নপ্রায় হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন দর্শন বা অনুভব করে।" এই দুই শ্রুতি বলিতেছেন, আত্মযাথার্থ্য সাক্ষাৎ-অনুভূত না হওয়া পর্য্যন্ত সংসার দশায় সমস্ত ব্যবহার্য্য অবাধিত। অতএব সংসারী জীবের সংসারদশার প্রমা কিরূপ তাহা বুঝাইবার জন্য যে, প্রমা লক্ষণ বলা হইয়াছে, তদ্গত অবাধিত শব্দের বিবক্ষিত অর্থ সংসারদশায় অবাধিত। ফলিতার্থ অর্থ এই যে, সংসার দশার যে-জ্ঞান, সংসারদশার অবাধিত পদার্থ অবগাহন করে, সেই জ্ঞানই সংসারদশায় প্রমা। এই লক্ষণই সম্পূর্ণ লক্ষণ। এ লক্ষণ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত; কোথাও অব্যাপ্ত নহে। যতকাল আত্মসাক্ষাৎকার না হইবে, ততকালই এইরূপ প্রমা, প্রমার উৎপাদক প্রমাণ, তন্নিষ্ঠ প্রামাণ্য, এইরূপ এইরূপ সমস্তই ব্যবহার অলুপ্ত থাকিবেক, সত্য বলিয়া গৃহীত হইবেক, কোনও ব্যবহার মিথ্যা বা লোপপ্রাপ্ত হইবেক না। অর্থাৎ ইহা মিথ্যা হইলেও কেহ ঐ সকলকে মিথ্যা বলিয়া বুঝিবেক না। এ সম্বন্ধে তত্ত্বদর্শী আচার্য্য বলিয়াছেন, যতকাল আত্মনিশ্চয় না হয়, আমি কি, কিংস্বরূপ, তাহা স্থির না হয়; ততকাল দেহাত্ম জ্ঞানের ন্যায় এ সকল জ্ঞান প্রমাণ অর্থাৎ লৌকিক ঘট পটাদি জ্ঞান প্রমা বলিয়া গণ্য।* প্রমা বা সত্যজ্ঞান নির্নীত হইল। এক্ষণে তাহার জনক বা উৎপাদক কে ইহা বলিতে হইবেক। কিরূপে উক্ত লক্ষণ প্রমা উৎপন্ন হয়, কে উৎপাদন করে? উৎপাদক অনুসারে উহার কত প্রকার বিভাগ বা শ্রেণী নির্ব্বাচিত হইতে পারে? এক্ষণে এই সকল বর্ণিত হইবেক।

ক্রম প্রকাশ্য।

ব্রাহ্মের আদর্শ।

প্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বীগণের আদর্শ কোন না কোন মানুষ বা কাল্পনিক জীব, কিন্তু ব্রাহ্মের আদর্শ ব্রহ্ম। যদিও বাইবেলে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে যে ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণতা লাভ করিতে চেষ্টা কর, তথাপি কার্য্যতঃ খ্রীষ্টীয়ানগণ খ্রীষ্টকেই আদর্শ রূপে গ্রহণ করেন। মুসলমানগণ মহম্মদকে, বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবকে এবং প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মালম্বীগণ স্ব স্ব উপাস্য দেবতাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেন। ব্রাহ্ম কোন মানুষকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করেন না, ঈশ্বরই তাঁহার আদর্শ। পরকালে

* এখন অর্থাৎ সংসার দশায় দেহকে আমি বলিয়া জানিতেছি। ইহা আমাদের ভ্রম সত্য; কিন্তু তাহা জানিয়াও জানিতেছি না, বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। সুতরাং এ অবস্থায় দেহাত্মজ্ঞান আমাদের নিকট অপ্রমা বলিয়া গণ্য নহে; প্রত্যুত প্রমা বলিয়া গণ্য। ঘটাদি জ্ঞানকে ও ঐরূপ জানিবে!

অনন্তকাল যিনি মানুষের আদর্শ থাকিবেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাকে ইহলোক হইতেই আদর্শ-রূপে বরণ করিতে উপদেশ দিতেছেন। এই সার উপদেশের দ্বারা অন্যান্য ধর্ম্মের উপর ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইতেছে।

দ্বৈতাদ্বৈত বাদ।

ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে,

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
মম তত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জ্জিতম॥

অর্থাৎ "কেহ কেহ অদ্বৈত পক্ষ প্রতিপন্ন করেন এবং কেহ কেহ দ্বৈতপক্ষ প্রতিপন্ন করেন; কিন্তু তাঁহারা উভয়েই আমার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহেন, কারণ যাহা প্রকৃত তত্ত্ব তাহা সম্পূর্ণ দ্বৈত অথবা সম্পূর্ণ অদ্বৈত এই উভয় বিবর্জ্জিত।"

এই মত সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতানুযায়ী। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে দ্বৈত ভাবে ও উপাসনা করেন না, আবার সম্পূর্ণরূপে অদ্বৈত ভাবেও উপাসনা করেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরকে ভগবদ্গীতার ন্যায় দ্বৈতাদ্বৈত ভাবে দেখিয়া থাকেন। ঈশ্বর দ্বৈতভাবসমন্বিত, কারণ সৃষ্টি হইতে তিনি বিভিন্ন—সৃষ্টির জড়ত্ব ও অন্যান্য গুণ বিবর্জ্জিত, আবার তিনি অদ্বৈতভাব সমন্বিত, কারণ সৃষ্টির প্রত্যেক পরমাণুর সহিত তাঁহার গাঢ় যোগ—অনন্তকালের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; এমনি সম্বন্ধ যে তাঁহার গাঢ় আলিঙ্গন হইতে সৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য বিচ্যুত হইলে তাহা লয় প্রাপ্ত হয়। অতএব ঈশ্বর এই দৃষ্টিতে সৃষ্টির সঙ্গে অভেদ বলিতে হয়। এই দ্বৈতাদ্বৈত মতই সত্য মত।

ঐশ্বরিক প্রেম।

পৃথিবীর ঘটনা দেখিয়া ঈশ্বর মানবকে প্রীতি করেন কি না, তদ্বিষয় সিদ্ধান্ত করিতে যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। জীবের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম পূর্ণ ও অনন্ত। পূর্ণ ও অনন্ত প্রেমের গতি ও কার্য্য অপূর্ণ ও অন্তবৎ জীবের নিকট সহজবোধ্য নহে। মানুষের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম, মানুষের প্রতি মানুষের প্রেমের আদর্শ অপেক্ষা অনন্তগুণে উচ্চ সুতরাং মানবীয় প্রেমের নিয়মে ঐশ্বরিক প্রেম নিয়মিত হইবে এরূপ হইতে পারে না। যখন ঐশ্বরিক প্রেমের কার্য্য বুঝিবার ক্ষমতা মানুষের নাই, তখন সেই প্রেমে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাই জ্ঞানীর কার্য্য। ঈশ্বর এই চরাচর অনন্ত জগতের অনন্ত ক্ষেত্রে শান্তভাবে চিরকাল আপনার মঙ্গল উদ্দেশ্য সংসাধন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, কাহারও হাস্য ক্রন্দন দ্বারা বিচলিত হয়েন না।

সাধু পার্কারের ধর্ম্ম।

মহাত্মা থিয়োডোর পার্কার পৃথিবীর এক জন প্রধান ব্রহ্মজ্ঞানী। তাঁহার ন্যায় সাধু লোক বর্ত্তমান কালে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন। আজীবন তিনি ধর্ম্মের সেবা করিয়াছিলেন। কেবল ঈশ্বরোপাসনাকে তিনি ধর্ম্ম বলিতেন না। ব্রাহ্মদিগের ন্যায় শরীর মন ও আত্মার সমান উৎকর্ষ সাধনকেই তিনি ধর্ম্ম শব্দে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। এই উচ্চ ধর্ম্মে মতি রক্ষা জন্য তিনি যে কয়েকটী নিয়ম সদা-সর্ব্বদা পালন করিতেন তাহা এইস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন জন্য ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিভাব সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। এই নিমিত্ত প্রকৃ-

তির কার্য্য-পর্য্যালোচনা করিবে, ঈশ্বরের চিন্তা করিবে, তাঁহার উপর আমরা কতদূর নির্ভর করি তাহা উপলব্ধি করিবে, দুই সন্ধ্যা প্রার্থনা করিবে এবং যখনই ভক্তিভাব হৃদয়ে আবির্ভূত হইবে তখনই তাঁহার উপাসনা করিবে। ঈশ্বরের নিকট আমরা সুখ চাহি না তথাপি তিনি আমাদিগকে সুখ প্রেরণ করিতেছেন এবং তিনি আমাদিগের হৃদয়গত নির্ম্মল নিঃস্বার্থ প্রার্থনা সকল পূর্ণ করিতেছেন, ইহা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে। কল্পনা হইতে ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা সম্বন্ধীয় অপবিত্র চিন্তা সকল দূর করিবে। দ্বিতীয়তঃ, মানসিক উন্নতি সাধন নিমিত্ত এই নিয়ম পালন করিবে যে যখন যে বিষয় জানিবার জন্য কৌতূহল হইবে তখনই সেই বিষয়ের সমস্ত তত্ত্ব জানিবার জন্য উপায় অবলম্বন করিবে। ইহার জন্য কেবল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবে না, নিজে গাঢ় রূপে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়া তৎসম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি করিবে। তৃতীয়তঃ শারীরিক উন্নতি সাধন জন্য আহার ও পানে অপরিমিতাচার বর্জ্জন করিবে, প্রত্যহ অন্ততঃ তিন ঘণ্টা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও শারীরিক পরিশ্রম করিবে, প্রত্যহ ছয় ঘণ্টাকাল বা যতক্ষণ তোমার পক্ষে স্বাস্থ্যকর ততক্ষণ নিদ্রা যাইবে। এইরূপে শরীর মন ও আত্মার এককালীন উন্নতি সাধন করিবে। এই উন্নতি সাধনই প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা।

প্রার্থনা।

সংসারের পাপ তাপ মোহে জরজর হইয়া—হৃদয়ের নিদারুণ যন্ত্রণা সহিতে না পারিয়া—প্রাণের ক্রন্দন জানাইবার জন্য আমরা তোমার চির-উদ্ঘাটিত দুয়ারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি; একবিন্দু শান্তিবারি দিয়া শোকে বিহ্বল, পাপে মলিন, দীন হীন সন্তানকে তোমার মহাসিংহাসনের পার্শ্বে দাঁড়াইবার উপযুক্ত কর। আমাদের বল নাই, আশা নাই, ভরসা নাই। তুমি যে বল দিয়াছিলে সংসারের ছলনা-অন্ধকারে মুগ্ধ হইয়া সে বল কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছি। এখন অবসন্নহৃদয়ে কাতর প্রাণেকরুণামৃত লাভ করিবার জন্য ভিখারী-বেশে তোমার দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছি। অবনত মস্তক উন্নত করিয়া তুলিবার আর সামর্থ্য নাই—পঙ্কিল কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে জীবনের শান্তির সমাধি রচনা করিয়াছি। এখন ক্রন্দন মাত্র সম্বল। মৃত্যু ধীরে ধীরে আমাদিগকে সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মিথ্যার পাষাণ স্তূপে আবদ্ধ করিয়াছে। সেই চির-ধ্রুব অটল আশ্রয় ছাড়িয়া—ভূলোক দ্যুলোকের প্রতিষ্ঠাভূমি ছাড়িয়া—সেই ভূমানন্দ পরিপূর্ণপ্রেম ছাড়িয়া—বালক আমরা বুঝিবার দোষে হলাহল-সাগরে ডুবিয়াছি; দয়াময়! আমাদের কি উদ্ধার নাই? হৃদয়ে সত্যের আলোক নিভাইয়া দিয়া আমরা এই বিশাল সৃষ্টির মধ্যে আশ্রয় খুজিয়া বেড়াইতেছি—প্রাণের মধ্যে, আত্মার মধ্যে সতত যে মহান্ আশ্রয় রহিয়াছে অন্ধকারে তাহা দেখিতে পাই না। হতাশচিত্তে মৃত্যুকে আশ্রয় বলিয়া আলিঙ্গন করি—তাহার অধরৌষ্ঠের সাদর-সম্ভাষণী হাসিতে একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়ি। তখন পাপকেই সুখ বলিয়া ভ্রম হয়—মিথ্যার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া মনে করি, তোমারই প্রিয় কার্য্য সাধিত হইল। এখন দেখিতেছি মৃত্যু আমাদিগকে তাহার পদসেবায় নিযুক্ত করিয়াছে—হিম মৃত্যুর স্পর্শে আমরা জরজর।

এখন আর প্রাণে উৎসাহ নাই—হৃদয়ে আশা নাই। মিথ্যার উপাসনা আমাদিগকে নরকের পথে টানিয়াছে। আমাদের পানে বিভীষিকা তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইতেছে। তোমার প্রসন্ন মুখ পাপমলিন হৃদয় আর অনুভব করিতে পারে না। তোমার নামে সে অন্ধকারে লুকাইতে চায়—জানে না যে অন্ধকারের মধ্যেও মাতার স্নেহ-আঁখি জাগিয়া থাকে। এই যে মুক্ত আকাশ—এই যে প্রাণপূর্ণ বিশ্ব ইহা তাহার নিকট বিভীষিকা। আমরা এতদূর নামিয়াছি যে মাতার নামে শিহরিয়া উঠি। কানাকানি, দ্বেষ, হিংসা ও পরনিন্দার মধ্য দিয়া আমরা পাপের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি। কিন্তু তোমার সন্তান হইয়া পাপের পদসেবায় জীবন অতিবাহিত করিব কিরূপে? আমাদের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তুমি আমাদিগকে পাপের মধ্যে পুণ্য, বিষাদের মধ্যে শান্তি, উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে সংযম শিক্ষা দিয়াছ। আমাদের মঙ্গলের জন্যই পাপের রাজ্যে কণ্টক বন সৃষ্টি করিয়াছ। সেই কণ্টক বনে ক্ষতবিক্ষত হইয়া এখন তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি—নাথ! রোগীকে তোমার পুণ্য স্পর্শে পবিত্র কর।

সন্তান আজ ভিখারীবেশে মাতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া—মায়ের সম্মুখেও জড়সড় সঙ্কুচিত ভাব। প্রসন্নমুখে তুমি আমাদিগকে ক্রোড়ে আহ্বান করিতেছ—মলিন হৃদয় লইয়া তোমার ক্রোড়ে যাইতে সাহস হইতেছে না। তুমি মার্জ্জনা করিয়া আমাদিগকে সাধু শিক্ষা দিবে জানি—জানি, কঠোর পীড়ন তোমার উদ্দেশ্য নহে—অমঙ্গলের ছায়ার মধ্য দিয়া তুমি মঙ্গলের পথে লইয়া যাও, কিন্তু ছদ্মবেশী মোহের ছলনায় এখনও ভুলিয়া আছি—এখনও জড়তা পরিত্যাগ করিয়া তোমার সন্নিধানে মুক্তকণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারিতেছি না। পদে পদে দুর্ব্বল হৃদয় চমকিয়া উঠে। তোমার শান্তিনিকেতনেও সে পৃথিবীর ধূলি বহিয়া আনে। দয়াময়! রক্ষা কর—নহিলে মোহ বন্ধনে জীবন অবসান হয়।

পাপে মোহে আমরা ডুবিয়াছি। আমাদের উদ্ধার করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। তোমার করুণাই আমাদের জীবন। আমরা তোমার আদেশ শতবার লঙ্ঘন করিয়াছি—মার্জ্জনা করিয়া তুমি আমাদিগকে উন্নত শিক্ষা দিয়াছ। তুমিই আমাদিগকে রোগে, শোকে, সম্পদে, বিপদে চিরদিন রক্ষা করিতেছ। তাই আজ দিনান্তে পাপতাপে জরজর হইয়া তোমারই দুয়ারে আশ্রয় লইতে আসিয়াছি—তুমি আমাদের কল্যাণ বিধান করিতেছ—তুমি আমাদের কল্যাণ বিধান কর।

ভক্ত প্রহ্লাদ।

আত্মাতেই যাঁহাদের পুরুষার্থ ব্রহ্ম তাঁহাদেরই প্রাপ্য, যাহারা বহির্বিষয়ে নিমগ্ন সেই সমস্ত দুরাশয় তাঁহাকে কখন জানিতে পারে না। প্রত্যুত এক অন্ধ অন্য অন্ধ দ্বারা নীয়মান হইয়া যেমন গর্ত্তে পতিত হয় সেইরূপ এই সকল লোক বেদোক্ত কাম্য কর্ম্মে বদ্ধ হইয়া অন্ধকারে গমন করে। যাবৎ বিষয়াভিলাষশূন্য মহত্তম ব্যক্তিদিগের শরণাপন্ন না হয় তাবৎ এই সকল লোকের বুদ্ধি শ্রুতিবাক্য দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞাত হইলেও কখনও অসম্ভাবনা ও কখন বা বিপরীত ভাবনা দ্বারা বিহত হয় এবং ইহা কদাচ তাঁহার

চরণ স্পর্শ করিতে পারে না। ফলত মহত্তম ব্যক্তির অনুগ্রহ ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান ও তজ্জনিত মোক্ষও হয় না। এই বলিয়া প্রহ্লাদ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

তখন দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া তাঁহাকে ক্রোড় দেশ হইতে ভূতলে বলপূর্ব্বক ফেলিয়া দিলেন এবং রোষরক্ত লোচনে কহিতে লাগিলেন, ঘাতকগণ শীঘ্র ইহাকে বাহিরে লইয়া যাও এবং শীঘ্রই ইহার প্রাণসংহার কর। যখন এই দুরাত্মা আত্মীয় স্বজন সকলকে পরিত্যাগ করিয়া দাসবৎ বিষ্ণুর পদসেবা করিতেছে তখন এ অবশ্যই আমার বধ্য। যদি একজন পরও ঔষধের ন্যায় হিতকারী হয় তবে সেইই পুত্র, আর ঔরস পুত্রও যদি ব্যাধির ন্যায় অহিতকারী হয় তবে তাহাকে পরই বলিয়া জানিবে। ইহাও তো দূরের কথা সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে একটী যদি আপনার অনিষ্টকর হয় তবে তাহা ছেদন করিয়া ফেলিবে, কারণ উহা ছিন্ন হইলে অপর গুলি সুখে জীবিত থাকিতে পারে। মুনির পক্ষে দুষ্ট ইন্দ্রিয় যেমন শত্রু সেইরূপ এই দুর্বৃত্ত আমার ছদ্মবেশী শত্রু, অতএব যে কোনও উপায়ে হউক ইহাকে বধ কর।

দৈত্যপতির আদেশমাত্র তাম্রশ্মশ্রু তাম্রকেশ বিকটদণ্ড বিকটমুখ ঘাতকেরা মার মার রবে শূলহস্তে উপস্থিত হইল। এবং প্রহ্লাদের মর্ম্মস্থলে সুতীক্ষ্ণ শূল বিদ্ধ করিতে লাগিল। তখন তাঁহার চিত্ত নির্ব্বিকার অনির্দ্দেশ্য বিশ্বাত্মা ব্রহ্মে সমাহিত। ব্রহ্মতেজে শূলপ্রহার ব্যর্থ হইয়া গেল।

তখন দৈত্যপতি অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন এবং অন্যান্য উপায়ে প্রহ্লাদকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল প্রযত্নই বিফল হইল। এইরূপে যখন তিনি সেই নিষ্পাপ পুত্রের প্রাণবধে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না তখন অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া কহিতে লাগিলেন আমি ইহাকে অনেক অসাধু বাক্যে ভর্ৎসনা করিয়াছি, বিবিধ উপায়ে বধের চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু এ স্বতেজে তাহা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। এই বালক আমার অদূরে দণ্ডায়মান কিন্তু নির্ভয়। কিছুতেই ইহার ভয়সঞ্চার হইতেছে না। আশ্চর্য্য, মৃত্যুও ইহার ত্রিসীমায় যাইতে সাহসী নয়। ইহার প্রভাব নিতান্ত অপরিমেয়। এই বালকের সহিত বিরোধ করিয়া নিশ্চয় আমাকেই মরিতে হইবে। এইরূপ দুশ্চিন্তায় তিনি অধোমুখে যেন সমস্ত অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

এই অবসরে দৈত্যগুরু শুক্রের পুত্র নির্জ্জনে তাঁহাকে কহিলেন দানবরাজ, তুমি সর্ব্ববিজয়ী, তোমার ভ্রূভঙ্গীতে ভয় না করে এমন কেহই নাই। সুতরাং তোমার এইরূপ দুশ্চিন্তার বিষয় আমরা কিছুই দেখি না। আর দেখুন বালকদিগের কার্য্যে গুণ দোষ গ্রহণ করা উচিত নয়। এক্ষণে তুমি প্রহ্লাদকে গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখ। যেন কোনরূপে কোথাও পলাইয়া না যায়। দেখ পুরুষের বুদ্ধি বয়সে ও সাধুসঙ্গে সমীচীন হইয়া থাকে।

তখন দৈত্যপতি গুরুপুত্রের কথায় সম্মত হইয়া কহিলেন ভালই; তবে তোমরাও ইহাকে গৃহী রাজার ধর্ম্ম শিক্ষা দেও। অনন্তর প্রহ্লাদ ধর্ম্মার্থকাম এই ত্রিবর্গে উপদিষ্ট হইতে লাগিলেন কিন্তু যাঁহারা রাগদ্বেষের বশীভূত হইয়া বিষয়ে বিচরণ করেন ঐ সমস্ত শিক্ষা তাঁহাদের

মুখনির্গত, প্রহ্লাদের কিছুতেই তাহা ভাল বোধ হইল না।

অনন্তর একদা শুক্রাচার্য্য গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বয়স্য বালকদিগের সহিত প্রহ্লাদকে আহ্বান করিলেন।

ঐ সময় পরম কারুণিক প্রহ্লাদ সহচর দৈত্যবালকদিগকে কহিতে লাগিলেন, দেখ একেতো এই মনুষ্যজন্ম দুর্লভ, পরজন্মে এই যোনি লাভ হইবে কি না সন্দেহ। অতএব ইহজন্মে কৌমার অবস্থাতেই ভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। বিষ্ণু সর্ব্বভূতের প্রিয় আত্মা প্রভু ও সুহৃৎ, অতএব তাঁহার শরণাপন্ন হওয়াই শ্রেয়। দেহীদিগের দেহযোগ বশত দৈবাৎ ইন্দ্রিয়সুখলাভ হইয়া থাকে কিন্তু দুঃখ অযত্নসম্ভূত। সুতরাং সেই ইন্দ্রিয়সুখের জন্য প্রয়াস অকর্ত্তব্য, ইহাতে কেবল আয়ুক্ষয় হয়। আর বিষ্ণুকে ভজনা করিলে যে কল্যাণলাভ হয় ইহা দ্বারা কোনও মতে তাহা হইতে পারে না। অতএব এই জন্মে যাবৎ শরীর না নষ্ট হয় তাবৎ কল্যাণ লাভার্থ যত্ন করিবে। একে তো আয়ু শতবর্ষমাত্র, যাহারা ইন্দ্রিয়ের দাস তাহাদের ইহারও অর্দ্ধেক, রাত্রিকালে অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যতক্ষণ নিদ্রিত থাকি সে কালটুকু তো নিস্ফল, বাল্য ও কৈশোরে অনর্থক ক্রীড়া কৌতুকে বিংশতি বর্ষ অতিক্রান্ত হইয়া যায়, আর জরা দেহে প্রবেশ করিলে আবার ঐরূপ বিংশতি বর্ষ নিরর্থক যায়। আয়ুর অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাও গৃহাসক্ত প্রমত্ত গৃহীর দুঃখপূর্ণ কামনা ও বলীয়ান মোহে ব্যয়িত হয়। বল দেখি কোন অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ সুদৃঢ় স্নেহপাশবদ্ধ সংসারাসক্ত আপনাকে সংসার হইতে বিমুক্ত করিতে উৎসাহী হয়। বলদেখি তস্কর সেবক ও বণিক প্রিয়তর প্রাণ অপেক্ষাও অভীষ্ট যে অর্থ প্রাণহানি স্বীকার করিয়াও ক্রয় করে কোন্ পুরুষ সহজে সেই অর্থতৃষ্ণা ছাড়িতে পারে। যে ব্যক্তি দয়া স্নেহে পালিত প্রিয়তমার নির্জনসঙ্গ ও মনোহর আলাপে আত্মবিস্মৃত, যে আত্মীয় স্বজনের স্নেহে বদ্ধ, যাহার মন মধুরাস্ফুটভাষী শিশুতে অনুরক্ত, যে মনোজ্ঞ উপকরণে সজ্জিত গৃহসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, যে কুলক্রমাগত জীবিকা উপার্জ্জনে ব্যস্ত, এবং যাহার চিত্তে এই সমস্ত সততই জাগরূক তাহার কিরূপে বৈরাগ্য উপস্থিত হইতে পারে। কোষকারী কীট যেমন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া আপনার নির্গমন দ্বার পর্য্যন্ত রাখে না সেই রূপ কর্ম্মবাসনা এই সমস্ত লোককে বদ্ধ করিতেছে, ইহাদের বাহির হইবার পথ নাই। ইহাদের লোভ অতিমাত্র প্রবল সুতরাং কিছুতেই কামনার শান্তি নাই, ইন্দ্রিয়সুখ সর্ব্বাপেক্ষা ইহাদের বহুমত এবং সংসারমোহ যার পর নাই দুর্দ্দম, বল দেখি এই সকল লোকের মনে কি রূপে বৈরাগ্য আসিবে। এইরূপ ভোগ বিলাসে যে নিজের আয়ু ও পুরুষার্থ নষ্ট হইতেছে এইরূপ প্রমাদী চিত্ত তাহা বুঝিতে পারে না। ইহারা ত্রিতাপে তাপিত কিন্তু স্ত্রী পুত্রের প্রতি অতিমাত্র অনুরাগ নিবন্ধন ইহাদের মনে কিছুতেই বৈরাগ্য আইসে না। প্রত্যুত এই সকল লোকই ক্রমশ দুরাচার অসৎ হইয়া উঠে। এই স্ত্রীপুত্রানুরাগবশত কেবল অর্থেতেই ইহাদের তৃষ্ণা বলবতী হইতে থাকে। পরস্বাপহারীর ঐহিক ও পারত্রিক দণ্ডের বিষয় জ্ঞাত থাকিলেও ইন্দ্রিয়ের দুর্জয়তা ও কামনার অশান্ততা হেতু ইহারা পরস্বাপহরণ করে।

বিবিধ।

বৈশেষিক দর্শন কণাদ ঋষিকৃত। এই মহর্ষি কাশ্যপ গোত্রে জন্মিয়া ছিলেন। ইহাঁর অপর নাম উলূক। এই জন্য বৈশেষিক দর্শনকে ঔলূক্য দর্শন বলে। উঞ্ছবৃত্তি অর্থাৎ ধান্যের এক এক কণা সংগ্রহ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন এ জন্য এই ঋষির নাম কণাদ।

এই ঋষি অতি প্রাচীন। মহাভারতে ইহাঁর উল্লেখ আছে। সাংখ্য-দর্শনের একটী সূত্রে বৈশেষিকের উল্লেখ দৃষ্ট হয় সুতরাং ইহা সাংখ্য অপেক্ষা প্রাচীন। বেদান্তের অণুবাদখণ্ডন দেখিলেই বুঝা যাইবে ইহা তদপেক্ষা প্রাচীন। শব্দের উৎপত্তি বিনাশবত্ত্বা এই দর্শনের সিদ্ধান্ত কিন্তু জৈমিনি অতি যত্নে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন সুতরাং ইহা তদপেক্ষা যে প্রাচীন যে বিষয়েও সন্দেহ নাই। আর ইহা ন্যায় দর্শন অপেক্ষা যে প্রাচীন তাহারও প্রমাণ আছে। বৈশেষিকে অনুমান প্রণালী সংক্ষেপে কিন্তু ন্যায়ে সবিস্তরে বর্ণিত হইয়াছে। আর একটী প্রমাণ এই বৈশেষিকে তিনটী হেত্বাভাস গৃহীত হইয়াছে কিন্তু ন্যায়ে পাঁচটী স্বীকৃত দেখা যায়। এস্থলে অনুমান করিতে হইবে যদি ন্যায় দর্শনের পরে ইহা রচিত হইত তাহা হইলে পঞ্চ হেত্বাভাস স্থলে কেন যে তিনটী মাত্র স্বীকৃত হইতেছে তাহার হেতু প্রদর্শন অবশ্যই ইহাতে থাকা সম্ভব। কিন্তু তাহা নাই। ইহাতেও বুঝা যায় বৈশেষিক ন্যায়েরও পূর্ব্ববর্ত্তী। ফলত ইহা অতি প্রাচীন দর্শন। ইহার প্রাচীনতার আরও একটু প্রমাণ এই যে অন্যান্য দর্শনের সূত্র সকল যেরূপ দুর্বোধ ইহা সেরূপ নহে। ইহার সূত্র সকল অতি সরল। পাঠ মাত্রেই তাহার অর্থগ্রহ হইয়া থাকে। বিশেষ পদার্থ যাহা অপর দর্শনে স্বীকার করে না ইহা তাহা স্বীকার করে বলিয়া ইহার নাম বৈশেষিক।

ভগবদ্গীতার সারমর্ম্ম।

(১) আত্মার সাংসারিক সুখ দুঃখ বোধ ম্লান করা কর্ত্তব্য। যত আত্মার সাংসারিক সাড় কমিবে তত আধ্যাত্মিক সাড় (ব্রহ্মানন্দ) বাড়িবে।

"দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ"।
"ব্রহ্ম সংস্পর্শং অত্যন্ত সুখমশ্নুতে"।

(২) বাহ্য জগৎ, শরীর ও মনকে অনাত্মীয় বলিয়া ঝেড়ে ফেলা এবং আমি কেবল আত্মা মনে করা এবং আত্মাতে ও আত্মার আত্মাতে সংস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই ঝেড়ে ফেলা প্রণালী গীতা হইতে বিলক্ষণ শিক্ষা করা যায়। বৌদ্ধ যোগীরা কেবল আত্মাতে সংস্থিত হইতেন। ঋষিরা আত্মার আত্মাতে সংস্থিত হইতেন। "উপাস্যং তৎপরং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ"। এই সর্ব্বোত্তম যোগ।

(৩) কর্ম্ম ও যোগের সামঞ্জস্য। "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি"। যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করার প্রধান লক্ষণ নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করা। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে ন ফলেষু কদাচন"।

(৪) জ্ঞান ও ভক্তি ওকর্ম্মের সামঞ্জস্য।

পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত "তত্ত্ববোধিনী" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমেতৎ

বিগত ১৬ই ফাল্গুনের তত্ত্বকৌমুদীতে শ্রীমন্মহর্ষি মহাশয়ের ও পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের যে পত্র বাহির হয় তৎপাঠে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়ক মত যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছিলাম—তদতিরিক্ত অনেক মত

তাঁহার সহিত বিশেষ আলাপে জানিতে পারিয়াছি এবং তাঁহার প্রচারকার্য্য বা দীক্ষাপ্রণালী স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। তিনি "জীবনে সত্যস্বরূপ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার" করিতেছেন কি কি করিতেছেন আপনারা তাহার বিচার করুন এবং তাঁহার অবলম্বিত প্রচারপ্রণালীই যদ্যপি প্রকৃত 'ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার' হয়, তবে আপনারাও সেই "ঋষি প্রবর্ত্তিত পথ" অবলম্বন করুন।

১। গোস্বামী মহাশয় কাহার বুদ্ধিভেদ ঘটান না। তিনি বলেন একজন লোক যদ্যপি অশ্বকে ঈশ্বরবোধে, আবার তাহার সেই ঈশ্বর নরবলিতে সন্তুষ্ট হয় এই জ্ঞানে, ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে নরবলি দিয়া পূজা করে, তবে তাহাকেও তিনি প্রথমে সেই অশ্বরূপেই দর্শন দিয়া ক্রমে অজ্ঞানতা দূর করিয়া প্রকৃত রূপ দর্শন দিবেন। তাঁহার মতে পরমেশ্বর আত্ম-স্বরূপের অন্যথা করিয়া ভক্তের কল্পিত রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। মহাপ্রলয়ের উল্লেখ করিয়া তিনি পরমেশ্বরের স্বরূপ ধ্বংসও স্বীকার করিয়া থাকেন।

২। সমস্ত দেব দেবীর অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন—তাহাদের আবার স্বতন্ত্র, বাসস্থান বা লোক আছে, তাহাও বলেন, ইহাও বলেন যে, যে যাঁহার উপাসক, তিনি তাহাকে সেই রূপে দর্শন দিয়া ঈশ্বরের নিকটে লইয়া যাইবেন, তাহার পরমার্থ পথে, সহায় হইবেন। তিনি স্বয়ং নৃসিংহ অবতার প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন প্রকাশ করেন।

৩। তিনি অতি গোপনে লোককে দীক্ষিত করেন—যে তাঁহার মন্ত্রে দীক্ষিত নহে, সে সেস্থানে থাকিতে পারে না—দীক্ষিত করার সময় তাঁহাকে তাঁহার গুরুদেবের অনুমতি লইতে হয়—গুরুদেব সেই সময় স্থূলদেহে বা সূক্ষ্মদেহে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অনুমতি করেন। কোন্ নাম বা বীজ মন্ত্রের কে অধিকারী তাহাও তিনিই বলিয়াদেন। গুরুদেবই গোস্বামী মহাশয়ের দ্বারায় মন্ত্র দেন। তাঁহার নিজের মন্ত্র দেওয়ার শক্তি এখনও জন্মে নাই। তাঁহার শরীর ভগ্ন সেই জন্য তাঁহার গুরুদেব তাঁহার শরীর হইতে আত্মাকে (সূক্ষ্মদেহকে) বাহির, করাইয়া তাহার দ্বারায় মন্ত্র দেওয়ান। ঈশ্বরবিশ্বাসী হইলেই তাঁহার অবলম্বিত সাধনের অধিকারী স্বাব্যস্ত হয়।

৪। গোস্বামী মহাশয়ের সাধন প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাহাকে স্বধর্ম্ম ছাড়িতে হয় না। একজন শাক্ত তাহার পূর্ব্ব পূজাপদ্ধতি ঠিক রাখিয়া তাঁহার মতে সাধন ভজন করিতে পারে। কাহাকেও তিনি স্বধর্ম্ম ছাড়িতে উপদেশও করেন না। সাধন প্রভাবে মন্ত্রশক্তিতে কালে তাহার ভ্রম দূর হইবে এই কথা বলেন।

৫। তাঁহার একজন লেখা পড়া না জানা শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছি তাহাকে মন্ত্রের অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া হয় নাই। সে মন্ত্রের বা নামের অর্থও জানে না।

৬। মন্ত্র প্রদান কালে শিষ্যকে কতকগুলি নীতি বিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হয়—কাহাকে এই এই কর্ম্ম করিও না উপদেশ দেওয়া হয়—কাহাকেও বা যখন যে কার্য্যে পাপ বোধ হইবে, তখন সেই কার্য্য করিতে বিরত হইও বলা হয়। উপদেশের মধ্যে সাধনের বিঘ্ন হইতে দেখিলে গুরুচিন্তা করার উপদেশও দেওয়া হয়। গুরুচিন্তা করিলে গুরু যেখানে থাকুন উপস্থিত হইয়া সাধনে সহায়তা করিয়া থাকেন।

৭। তাঁহার মন্ত্রশিষ্যগণের প্রত্যেকের মুক্তির জন্য তিনি নিজে দায়ী। যতটি লোককে তিনি দীক্ষিত করিবেন যে কাল পর্য্যন্ত তাহাদের সকলের সদ্গতি না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত তাঁহারও উদ্ধার নাই। শিষ্যদের মুক্তির জন্য তাঁহাকে পুনর্জ্জন্মও গ্রহণ করিতে হইবে।

৮। তাঁহার শিষ্যগণ মধ্যে যে কেহ যে দণ্ডে যে পাপ কার্য্য করিবে, সেই দণ্ডেই সেই পাপের ছবি (ফটোগ্রাফের ন্যায়) গুরুর সন্নিধানে উপস্থিত হয়। অর্থাৎ যেখানে থাকিয়া যে কোন পাপকর কার্য্য করিবে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা জানিতে পারেন।

৯। মন্ত্রপ্রদানকালে যে শক্তি প্রদান করা হয় শিষ্য কোন প্রকার পাপকর কার্য্য করিলে তিনি বা তাঁহার গুরুদেব বা অন্যান্য মহা পুরুষ সেই শক্তি অলক্ষিত ভাবে হরণ করিয়া লয়েন। শিষ্য সে প্রাণায়াম প্রক্রিয়াটি ভুলে না বা মন্ত্রটিও বিস্মৃত হয় না—অথচ সাধনের যে ফল তাহা লাভ করিতে পারে না। সে যদি পাপানুষ্ঠান ছাড়েও, তথাপি সেই শক্তি পুনঃ প্রাপ্ত না হইলে সে মন্ত্রজপে বা প্রাণায়ামে কিছুই ফল পাইতে পারে না।

১০। তিনি কোন সমাজ বিশেষের অধীনতা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন তিনি হিন্দুর তিনি মুসলমানের তিনি খৃষ্টানের তিনি ব্রাহ্মের; তিনি ছাগশোণিতপ্লাবিত দেবীমন্দিরকে যে চক্ষুতে দেখেন ব্রহ্মোপাসনা মন্দিরকেও সেই সেই চক্ষুতে দেখেন। তিনি আধুনিক ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে প্রকৃত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বলেন না। তাঁহার অবলম্বিত পথই প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের পথ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন!

এই তো কতকগুলি তাঁহার প্রধান মত বা প্রচার

প্রণালী। ইহা ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত আছে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত যোগাবলম্বনে যে সমস্ত অলৌকিক শক্তি মনুষ্যের জন্মে তাহারই কয়েকটি নূতন নূতন বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

এই যোগপথে অগ্রসর হইলে ঈশ্বরদর্শনতো হইবেই তাহা ব্যতীত সর্ব্বজ্ঞতা ভূত ভবিষ্যত ঘটনার জ্ঞান প্রাপ্তি—এখান হইতে অতিদূর দেশের নিভৃত কক্ষে কি হইতেছে, তাহা জানা, সূক্ষ্ম বা স্থূলদেহে দূর প্রদেশে গমন, এমন কি চন্দ্রলোক সূর্য্যলোক প্রভৃতিতে গমন শক্তিও জন্মে। ইহলোকস্থিত দূরদেশবাসী মহাপুরুষদের স্থূলদেহেই পলকের মধ্যে একত্রিত হওয়া, পরলোকগত আত্মার সন্দর্শন, মৃত শরীরে যোগীর আত্মার প্রবেশ ও শবকে জাগ্রত করা এবং এক কথায় বহু বৎসরের কুষ্ঠরোগ পর্য্যন্ত আরোগ্য করা ইত্যাদি কত কি অদ্ভুত শক্তি লাভ।

শ্রীঅনাথবন্ধু রায়।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে যাঁহারা গত ১৮০৯ শকের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার স্ব স্ব দেয় মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিতেছেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সঙ্গে বর্ত্তমান সনের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। এবং যাঁহাদের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল গত চৈত্র মাস পর্য্যন্ত নিঃশেষিত হইয়াছে তাঁহারা আর বিলম্ব না করিয়া বর্ত্তমান সনের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেণ্টের এমন কোন বিশেষ নিয়ম নাই যাহাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের নৈতিক উন্নতি হয়। বর্ত্তমান কালের ছাত্রেরা অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতেছে সত্য কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই নৈতিক জ্ঞান কিছু শিথিল দেখিতে পাওয়া যায়। আবার বঙ্গভাষায় এমন পুস্তকও বিরল যদ্দ্বারা ছাত্রদিগের এই মহৎ অভাবটী দূর হইতে পারে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা এই উপহার নামক ক্ষুদ্র পুস্তকখানি ছাত্রদিগকে বিনামূল্যে প্রদান করিবার সংকল্প করিয়াছি। ১৮০৮ শকে পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বদেশের নৈতিক ও সামাজিক সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে অমূল্য উপদেশ দেন এই পুস্তকে তাহাই মুদ্রিত হইল। কিরূপে সৎপুত্র হওয়া যায়, কিরূপে সৎপতি ও সৎগৃহী হওয়া যায় এবং কিরূপে ধর্ম্মশীল ও সাধু হওয়া যায় এই পুস্তকে সংক্ষেপে সেই সমস্ত উপদেশ আছে। ফলত ইহা একখানি বঙ্গভাষার উজ্জ্বল রত্ন। প্রতি গৃহস্থেরই ইহার এক এক খণ্ড রক্ষা করা আবশ্যক, আমরা এই আশয়ে বহুল পরিমাণে ইহা মুদ্রিত করিলাম। কলিকাতায় বিতরণ করিবার কোনই ব্যয় নাই। মফস্বলে প্রতি ৫ খণ্ড পুস্তকে ৴২০ সামান্য ডাক মাশুল লাগিবে। যাঁহাদের আবশ্যক হইবে আমার নিকট ডাকমাশুলসহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলেই পাইবেন।

৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন যোড়াসাঁকো কলিকাতা। } শ্রীনীলকমল মুখোপাধ্যায়।

আগামী ৯ই আষাঢ় শুক্রবার সন্ধ্যা ৭॥ টার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ষট্‌ত্রিংশ সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হইবে।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীশ্রীশচন্দ্র চৌধুরী
১লা আষাঢ় ১৮১০ শক } সম্পাদক।

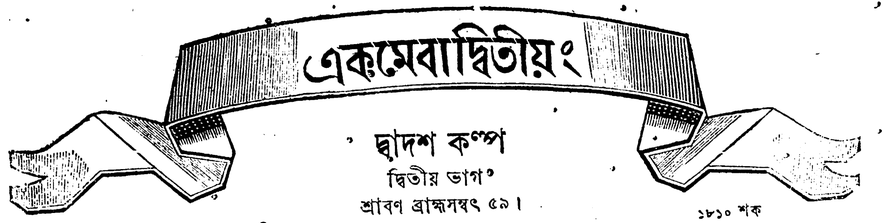

দ্বাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
শ্রাবণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯।

৫৪০ সংখ্যা ১৮১০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়মর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ভবানীপুর ষট্‌ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

৯ আষাঢ় শুক্রবার ১৮১০ শক।

উদ্বোধন।

আমরা ক্ষুদ্র—পৃথিবীর ধূলিকণা হইয়া কি প্রকারে সেই মহান্ অসীম জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা পিতা পাতা অনুপমমহিম ঈশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত হই? কি প্রকারে আমরা আত্মাতে তাঁহার সন্ধান পাইয়া তাঁহার প্রতি মনঃ প্রাণ সমাধান করিতে সমর্থ হই? ইহার কারণ কি ইহাই নয়, যে যেমন মধুমক্ষিকারা কোথায় মকরন্দ আছে সংস্কারবশতঃ তাহা জানিতে পারিয়া তদ্‌যুক্ত পুষ্পের প্রতি ধাবিত হয়, আমরাও সেইরূপ আত্মনিহিত সংস্কার ও বুদ্ধি কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করি ও তাঁহাকে আত্মাতে পাইয়া ভক্তি ও প্রীতি-পুষ্প দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করি। "ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ" তিনিই দয়া করিয়া আমাদিগকে তাঁহাকে জানিবার, সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিবার ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন; তিনি আমাদিগকে তাঁহাকে পাইবার, তাঁহাকে ভজন সাধন করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। যে আত্মা প্রকৃতিস্থ, সে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সতত উন্মুখ থাকে। বিষয়-সুখ ধন মান পৃথিবীর মহোচ্চ সম্পদ্ আত্মাকে কদাচ পরিতৃপ্ত করিতে পারে না, বৃহৎকায় তিমি মৎস্য কি ক্ষুদ্র তড়াগে বিচরণ করিতে পারে? পরমেশ্বরই আমাদিগের পরম ধন, পরম আনন্দ ও পরম সম্পদ্। তাঁহাকে লাভ করিলে যে তৃপ্তি যে আনন্দ যে শান্তি লাভ করা যায়, তাহা পৃথিবীর কোন বস্তুই প্রদান করিতে পারে না। যে সকল প্রশান্তচেতা সাধুরা ঈশ্বরকে জীবনের মধ্য বিন্দু করিয়া তাঁহার উদ্দেশে আপনাদিগের চিন্তা ও কার্য্য নিয়োগ করেন, তাঁহারাই ধন্য। ভাগরতে* আছে যে, যে সকল মুনি আত্মারাম, অর্থাৎ যাঁহারা ঈশ্বরেতে নিরন্তর রমণ করেন, তত্ত্বজ্ঞান নিষ্পন্ন হওয়াতে যাঁহারা গ্রন্থের বহির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারাও পরমেশ্বরের মধুময় গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি অহেতুকী

* আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূত গুণোহরিঃ ॥১।৭।১০

ভক্তি করেন, যেহেতু তাঁহার প্রতি ভক্তি-যোগ "অনর্থোপশমম্," সকল অনর্থের প্রশমন, সে ভক্তি থাকিলে আর সংসারে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না। অতএব যাঁহাদিগের গতি মতি ঈশ্বরে দৃঢ় হয় নাই, বিষয়-কামনা হইতে পাপ প্রলোভন হইতে যাঁহারদিগের চিত্ত এখনও বিমুক্ত হয় নাই, তাঁহারা একান্তে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে, তাঁহার পথের পথিক হইতে, কায়-মনে উদ্‌যুক্ত হউন, তদ্‌ভিন্ন শ্রেয়োলাভের আর সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বর এমনি দয়াময় যে পাপ তাপে তাপিত ব্যক্তি যদি পাপ জন্য অনুতাপ করিয়া তাঁহার নিকট ক্রন্দন করে, তিনি তাহার পাপ-ভার হরণ করেন, তাহাকে শুভমতি প্রদান করেন, তাহাকে নব জীবন দিয়া কৃতার্থ করেন। তিনি সাধু অসাধু সকলকেই আপনার মঙ্গল ছায়া দান করিবার জন্য ব্যগ্র রহিয়াছেন। অতএব আইস, মঙ্গল যাঁহার নাম, মঙ্গল যাঁহার কার্য্য, যাঁহার উপাসনা অশেষ মঙ্গলের নিদান, সেই উপাসনাতে আমরা এক্ষণে প্রবৃত্ত হই।

উপদেশ।

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্‌পশ্যতি নান্তরাত্মন্।

ঈশ্বর ইন্দ্রিয় সকলকে শব্দাদি বহির্বিষয় প্রকাশের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, এই জন্য ইন্দ্রিয় সকল অনাত্মা শব্দাদি বিষয়ই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না।

এই কাঠশ্রুতিতে ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও ঈশ্বরে নিবৃত্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক ইন্দ্রিয়ের এই দুই প্রকার প্রবৃত্তিকে রূপকচ্ছলে দেবতা ও অসুররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাক্ চক্ষু মন প্রভৃতির শাস্ত্রনিয়মিত কর্ম্ম ও জ্ঞান বিষয়ে যে প্রবৃত্তি তাহা দেবতা এবং উহাদের স্বাভাবিক কর্ম্ম ও জ্ঞান বিষয়ে যে প্রবৃত্তি তাহা অসুর। এই দেবাসুর যুদ্ধে অসুরেরা দেবতাকে পরাভব করে, অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উদ্ভবে অসুরের জয়লাভ হয়। অসুরের জয়ে জীবের পাপে প্রবৃত্তি ও নরকাদি দুর্গতি হইয়া থাকে। আবার যখন শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম ও জ্ঞানে ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি হয় তখন স্বাভাবিক আসুরী বৃত্তির অভিভবে দেবতার জয় হইয়া থাকে। ইহাতে জীবের শুভ কর্ম্মের বাহুল্য ও সদ্গতি হয়। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে একটী অযত্নসিদ্ধ ও অপরটী যত্নসিদ্ধ, সুতরাং অসুরেরই জয় অবশ্যভাবী হইয়া উঠিল।

পরে দেবতারা পরস্পর পরামর্শ করিয়া একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞে তাঁহারা পক্ষপাত ও অভিমানাদি শূন্য উদ্গাতা ও ঋত্বিককে আশ্রয় করিয়া অসুরগণকে পরাভব করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং সর্ব্বপ্রথমে বাগিন্দ্রিয়কে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ঐ ইন্দ্রিয় উদ্গাতৃকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া বাক্যকথনরূপ কার্য্য দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের সাধারণ উপকার নিষ্পন্ন করিল বটে কিন্তু যাহা তাহার অসাধারণ ধর্ম্ম অর্থাৎ উৎকৃষ্টরূপে বর্ণোচ্চারণ তাহা স্বপক্ষে সম্পন্ন হওয়াতে সে তদ্বিষয়ে অভিমানী ও আসক্ত হইল। ফলত এই অভিমান ও আসক্তি দ্বারা অসুরেরা তাহাকে জানিতে পারিয়া তাহাকে নষ্ট করিল। এইরূপে অভিমান ও আসক্তি-দোষে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ই নষ্ট হইয়া গেল। পরিশেষে সর্ব্বেন্দ্রিয়সাধারণ মন আসিয়া ঋত্বিকের কার্য্যে ব্রতী হইলেন। কিন্তু তাঁহারও

স্বপক্ষে শোভন সঙ্কল্পে অভিমান উপস্থিত হইল। তিনিও ঐরূপে নষ্ট হইলেন।

বৃহদারণ্যকের এই রূপক আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে অভিমান ও আসক্তিই জীবের বিনাশের নিদান। যতকাল এই দুইটী থাকিবে তাবৎ জীবের বৈরাগ্য ও তন্নিবন্ধন ভগবদ্ভক্তির উদয় হয় না। এবং তদভাবে তাহার মুক্তিও দুর্লভ হইয়া থাকে। কিন্তু পরম কারুণিক ঋষিরা এই অভিমান ও আসক্তি ত্যাগ হইবার জন্য অধিকারভেদে নানা উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে প্রধানত দর্শনের অভিপ্রায় কিরূপ তাহার আলোচনা আবশ্যক। বেদান্ত দর্শন কহিলেন এই সংসার ভ্রমকল্পিত, ইহার বাস্তবিক সত্তা নাই। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। সমস্তই ব্রহ্ম, পারমার্থিক সত্তা কেবল তাঁহারই। যাহা সত্য প্রকৃত পক্ষে তাঁহারই সত্তা, তিনিই ব্রহ্ম। আর এই নামরূপাত্মক বিকার অসত্য, ইহার সমস্ত ব্যবহার যথাযথ নিষ্পত্তি হইলেও জ্ঞানোদয়ে অর্থাৎ অবিদ্যার নাশে ইহার সত্তা তোমার নিকট লোপ পাইবে। বেদান্তের এই যে সংসার সম্বন্ধে পারমার্থিক সত্তার লোপ ও ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার ইহার হেতু এই যে জীবের ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ এত প্রবল যে সংসারের অনুমাত্র বীজ থাকিলে তাহার ভোক্তৃভোগ্য ব্যবহার অঙ্কুরিত হইয়া তাহাকে সংসারী করিয়া ফেলিবে এবং তাহার বৈরাগ্য দুর্ঘট হইয়া পড়িবে। ফলত বৈরাগ্য সহজ হইবার নিমিত্তই সংসারের পারমার্থিক সত্তার লোপ স্বীকৃত হইয়াছে। নতুবা আমার অজ্ঞান নাশ ও জ্ঞানোদয় হইলে সংসারের যথাযথ ব্যবহার সম্পন্ন হইবে কিন্তু ইহার বাস্তবিক সত্তা আমার চক্ষে আর নাই এ কথার কোন আর অর্থ থাকে না। কঠ শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে ঈশ্বর ইন্দ্রিয়কে বহির্বিষয় প্রকাশের নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং বিষয়ে বিচরণ তাহার স্বভাব কিন্তু এই স্বভাবই তাহার তত্ত্বদৃষ্টির ব্যাঘাতক, অর্থাৎ তত্ত্বদৃষ্টি তাহার পক্ষে কৃচ্ছ্রসাধ্য। বিষয়ের গুরুতর আকর্ষণ বিনা আয়াসে তাহাকে তত্ত্বজ্ঞানে উপনীত হইতে দেয় না। সুতরাং যাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য তাহাতে জীবের সহজে মতি হইবে না। অথচ তাহার মুক্তি চাই। আবার মুক্তি বৈরাগ্যকে সম্পূর্ণ অপেক্ষা করে। এই জন্য বৈদান্তিক বলিলেন এই যে সম্মুখে বিশাল সংসার দেখিতেছ ইহা মায়া মরীচিকা। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় আর কোন পদার্থ নাই। যাই এই জ্ঞানাগ্নি জীবে প্রবেশ করে তখন সে সর্ব্বত্র একমাত্র ব্রহ্মেরই স্ফূর্ত্তি দেখিতে পায়। বিষয় তো তখন তাহার সম্মুখ হইতে চলিয়া গিয়াছে আর তাহার আকর্ষণ কোথায়? তখন সে পরম বৈরাগ্যে বিভোর হইয়া বলিয়া উঠে

[৩] তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

বেদান্তজ্ঞান আবার কহিলেন যখন এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু নাই তখন কি তুমি জ্ঞানে আর তোমার স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিতে পার? এই স্থানে জীবের অহঙ্কার এককালে চূর্ণ হইয়া যায়। তখন সে, যে কোন কার্য্য করে রূপকে প্রদর্শিত বাগাদি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় সেই সকল কার্য্যে আর তাহার অভিমান ও আসক্তি থাকে না। বাস্তবিকই সে তখন জ্ঞানে আপনার অনস্তিত্ব অনুভব করে। এ অনস্তিত্ব কিরূপ? যেমন জ্যোতিঃ

পুঞ্জ সূর্য্যের নিকট একটা খদ্যোতের অস্তিত্ব। এই অস্তিত্ব একপ্রকার অনস্তিত্বই বলিতে হইবে। ফলত যত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান করা যায় ততই বোধ হয় যে জীবের বিষয়ে অনাসক্তি ও অভিমান ত্যাগের জন্যই এই বৈদান্তিক মায়াবাদের সৃষ্টি। বাস্তবিক পক্ষে এই জীব সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট ব্রহ্মও হন না এবং এই সংসারও একটা অলীক পদার্থ নয়। অভিমান নষ্ট করিয়া পর বৈরাগ্যে আনয়ন এই পরম জ্ঞানের গূঢ় উদ্দেশ্য। বিষয় বৈরাগ্য ব্যতীত ব্রহ্মে ভক্তি হয় না, আবার ভক্তি ব্যতীত মুক্তি নাই সুতরাং জ্ঞানই মুক্তির নিদান। বেদান্ত সেই জ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন।

আবার গীতার আলোচনায় এই কথারই প্রতিধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। গীতা কহিলেন কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। কর্ম্মে তোমার অধিকার ফলে অধিকার নাই। এইটী গীতার নিস্কাম কর্ম্মের উপদেশ। যে ঘোর সংসারী তাহারই কামনা হয় কিন্তু যে ত্রিবিধ তাপে উত্তপ্ত হইয়া তত্ত্বালোচনায় সংসারের অলীকত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে তাহার আর সংসার ভোগের কামনা থাকে না। ফলত নিস্কাম কর্ম্মাচরণ দ্বারাই জীবের বৈরাগ্য সিদ্ধি হয়। ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিই কামনার অধিষ্ঠান। যতক্ষণ অভিমান থাকে তাবৎ কামনাও থাকে। এই অভিমান নাশের উপায় ইন্দ্রিয়দমন অর্থাৎ অনাসক্ত ভাবে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সঞ্চরণ। এই অনাসক্তি বৈরাগ্য ব্যতীত সম্ভবে না।

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে
এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং।
তস্মাত্ত্বং ইন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং।

এই সমস্ত ও অন্যান্য শ্লোকে জ্ঞান বিজ্ঞান নাশক কামনা ত্যাগের কথা গীতায় পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে। গীতার মুখ্য কথা এই তোমার ইন্দ্রিয় বিষয়ে বিচরণ করুক কিন্তু বিষয়ে আসক্তি যাহা তোমার তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষ ব্যাঘাতক সেই টুকু তোমাকে ত্যাগ করিতে হইবে। অর্থাৎ তুমি যদি নিস্কাম হইয়া কর্ম্ম কর তাহা হইলে তুমি আসক্তিশূন্য হইলে। এই আসক্তিশূন্যতাই বৈরাগ্য। দর্শনকার সংসারের নাস্তিত্ব দেখাইয়া এবং জীবের অহঙ্কার বা আমি ও আমার বুদ্ধি লোপ করাইয়া মনে একটী প্রবল বৈরাগ্যের উদয় করিয়া দিতেছেন। স্মৃতিকার এক নিস্কাম কর্ম্মের উপদেশে তাহাই করিতেছেন। ফলত ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয়ে অনাসক্ত করাই ব্রহ্মলাভের পূর্ব্বসোপান। উপনিষদ, দর্শন ও গীতা বেদান্তের এই ত্রিবিধ প্রস্থানই ব্রহ্মলাভের জন্য এক বাক্যে ইন্দ্রিয়ের এই বিষয়ে অনাসক্তি বা বৈরাগ্যের উপদেশ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মগণ, ব্রহ্মলাভ আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু আমাদের অন্তরে নিরন্তর দেবাসুরের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। শাস্ত্রালোচনায় আমরা এইটুকু বুঝিলাম যে এই অসুর নিপাত করিতে না পারিলে আমাদের লক্ষ্য সিদ্ধি হইবে না। যতক্ষণ অভিমান ও আসক্তি না যায় তাবৎ অসুরের জয়। ঈশ্বর আমাদের ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ও তাহার বিষয় দিয়াছেন। অভিমানশূন্য হইয়া অনাসক্ত ভাবে বিষয়ে বিচরণ কর অসুর নিপাত হইবে। দেখ আমরা স্বাধীন নহি। ভৃত্য যেমন প্রভুর আদেশে কার্য্য করে সেই রূপ আমরা ঈশ্বরের আদেশে তাঁর সংসারে তাঁহারই কার্য্য করিতে আসিয়াছি। তবে প্রত্যেক কার্য্যে আমরা আপনাকে কেন

প্রতিবিম্বিত দেখি। ব্রহ্মের কার্য্য করিতে আসিয়াছ তাঁহার কার্য্য কর। ফলের প্রতি লক্ষ্য করিও না। ফল ফলদাতার হস্তে। ফলত কামনাই সর্ব্বনাশের মূল। সকল শাস্ত্র একবাক্যে তাহাই কহিয়াছে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বাক্যামৃতকণা।

মনোরথানাং ন সমাপ্তিরস্তি।
বর্ষাযুতেনাপি তথাব্দলক্ষৈঃ।
পূর্ণেষু পূর্ণেষু পুনর্নরাণাং।
উৎপত্তয়ঃ সন্তি মনোরথানাং॥

* * *

পূর্ণেঽপি তত্রাপ্যপরস্য জন্ম
নিবার্য্যতে কেন মনোরথস্য॥
আমৃত্যুতো নৈব মনোরথানাং
অন্তোঽস্তি বিজ্ঞাতমিদং ময়াদ্য॥
মনোরথাসক্তিপরস্য চিত্তং।
ন জায়তে বৈ পরমাত্মসন্ধি॥

* * *

নিঃসঙ্গতা মুক্তিপদং যতীনাং
সঙ্গাদশেষাঃ প্রভবন্তি দোষাঃ।
আরূঢ়যোগোঽপি নিপত্যতেঽধঃ
সঙ্গেন যোগী কিমুতাল্পসিদ্ধিঃ॥

বিষ্ণু পুরাণং।

অযুত বৎসরেই হউক আর লক্ষ বৎসরেই হউক বাসনারাশির সমাপ্তি নাই। বার বার পূর্ণ হইলেও পুনর্ব্বার মনুষ্যগণের বাসনারাশির ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে উৎপত্তি হয়। * * *

যে স্থানে এক বাসনার পরিপূরণ সেই স্থানেই যে অপর বাসনার জন্ম তাহা কি উপায়ে নিবারিত হইতে পারে? ইহা মৎকর্ত্তৃক অদ্য বিদিত হইল যে দেহের অন্ত হইলেও বাসনার অন্ত নাই এবং বাসনা বিষয়াসক্তির বশ যে পুরুষ তাহার চিত্ত কখন পরমাত্মায় অভিনিবিষ্ট হয় না।

* * *

নিঃসঙ্গতাই যতিদিগের মুক্তিপদ এবং সঙ্গ হইতে অশেষ দোষ উৎপন্ন হয়। সঙ্গ হেতু যোগারূঢ় যোগীও অধঃপতিত হয়েন, অল্প মাত্র সিদ্ধি হইয়াছে যে পুরুষের তাহার আর কি কথা।*

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

ভগবদ্গীতা।

শব্দাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়কে মনে মনে আলোচনা করে যে পুরুষ তাহার সেই বিষয়ে প্রীতি জন্মায়, প্রীতি হইতে সেই বিষয়কে পাইবার ইচ্ছাস্বরূপ যে কাম তাহার উৎপত্তি হয়। কাম হইতে (তাহার প্রতিঘাত হেতুক) ক্রোধ সমুৎপন্ন হয়। ক্রোধ হইতে কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে বিভ্রম জন্মায়। উক্ত বিভ্রম হইতে পূর্ব্বোদিত-শুভবুদ্ধির সংস্কারজনিত যে স্মৃতি তাহা ভ্রষ্ট হয়। স্মৃতিভ্রংশ হইতে অন্তঃকরণের কার্য্যাকার্য্য বিবিক্ত করিবার শক্তি নষ্ট হয় এবং এইরূপ বুদ্ধিনাশ হইতে পুরুষ পুরুষার্থ হইতে বিচ্যুতিরূপ যে আধ্যাত্মিক মৃত্যু তাহাকে প্রাপ্ত হয়।

কাম জানামি তে মূলং সংকল্পাৎ ত্বং হি জায়সে।
ন ত্বাং সঙ্কল্পয়িষ্যামি তেন মে ন ভবিষ্যসি॥

মহাভারতং।

হে কাম তোমার মূল আমি অবগত হইয়াছি; তুমি সঙ্কল্প হইতে জন্মগ্রহণ কর ইহা নিশ্চিত। তোমাকে সঙ্কল্প ক-

* অনুপস্থিত অনুকূল বিষয় প্রাপ্তির ইচ্ছা বাসনার্থ। এবং উপস্থিত অনুকূল বিষয়কে ত্যাগ করিতে অনিচ্ছার নাম আসক্তি। অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ের সহিত আত্মার কোন সম্পর্ক নাই এই রূপ নিঃসংশয় জ্ঞানের নাম নিঃসঙ্গতা। পরমেশ্বরকে ক্রিয়া দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না কেননা তিনি নিজের স্বভাবেই অযত্নে আমাদের হৃদয়ে চির উদিত। এই জ্ঞান যাঁহার জন্মিয়াছে তিনি যোগারূঢ় যোগী।

রিব না সেই নিমিত্ত তুমি আমার সম্বন্ধে ঘটিবে না।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে॥
মণ্ডুকাদি শ্রুতিঃ।

আমার ও সর্ব্বজগতের অন্তর্যামী যিনি তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিলে জীবের সমুদায় কর্ম্মরাশি ক্ষয় হয়, সমুদায় সংশয় ছিন্ন হয় এবং হৃদয়ের গ্রন্থি স্বরূপ যে কাম তাহাও ভিন্ন হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

আমি ডাকি হে কাতরে বড় ব্যাকুল আছে মন
কেমনে তোমারে পাই বল পিতা বল তাই
আর কিছু নাহি চাই তোমারি ভিখারী যে
যে তোমারে চায় তুমি রাখ তারে পায়
আমি আসিয়াছি দীনহীন লইতে শরণ
সদা অজ্ঞান তিমিরে কেন আছি প'ড়ে
তোমার করুণা হিল্লোলে বিতর চেতন
এস পিতা এস কাছে প্রাণ কাঁদে তোমায় যাচে

আমার মরমবেদনা যত করি নিবেদন
আত্মবন্ধু প্রিয়জনে তুমি লইয়াছ সঙ্গোপনে
তবে কেন তোমা হ'তে করহে বঞ্চন
এখন তোমারে দাও সঙ্গে ক'রে লও
এখন দয়াময় বন্ধু পেলে জুড়াবে জীবন।

রাগিণী রামকেলি—তাল কাওয়ালি।

যখন জান্‌তে পেয়েছি হে তোমায় ছাড়িব না
তুমি দয়াময় তোমায় দিয়ে হৃদয়
আমি পূর্ণ করিব সব কামনা।
তোমাতে যখন হই হে মগন
কি আনন্দ পাই হৃদয়ে তখন
ভুলে যাই তাপ, দূরে যায় পাপ
কোথা চ'লে যায় অন্য বাসনা।
তোমারি আশাতে র'য়েছি বাঁচিয়ে
থাকিব তোমারি চরণ ধরিয়ে
দাও প্রেম তব হৃদয় ভরিয়ে
পাইব সান্ত্বনা।
ঘুচাও সকল ভব কোলাহল
তোমারি ভাবেতে করহে বিহ্বল
দূর ক'রে দাও হৃদয় গরল
তাহে অমৃত কর সিঞ্চন।

দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব।

সিদ্ধান্ত ॥ ৮ ॥

জড়বস্তুর গুণ স্বতঃ কিরূপ।

জড়বস্তুর সমস্ত গুণ স্বতঃ (অর্থাৎ আশ্রয়ের সহিত সম্বন্ধ ব্যতিরেকে) একান্তপক্ষেই জ্ঞানের অগম্য।

প্রমাণ।

জড় বস্তুর ন্যায় জড়বস্তুর গুণ-সকল স্বতঃ আশয়-ভ্রষ্ট বিষয়। কিন্তু দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, আশ্রয়কে না জানিয়া কোন বিষয়কেই জানা যাইতে পারে না,—প্রতীচ্য জ্ঞান ব্যতিরেকে পরাচ্য জ্ঞান সম্ভবে না। অতএব জড়বস্তুর সমস্ত গুণ স্বতঃ একান্তপক্ষেই জ্ঞানের অগম্য।

মন্তব্য এবং ব্যাখ্যান।

প্রয়োজন ॥ ১ ॥

ভৌতিক বস্তুর অস্তিত্ব-জ্ঞান কি-প্রকার জ্ঞান—এই প্রশ্নের আন্দোলন-কালে মনোবিজ্ঞান দুইটি বিভিন্ন মতের মধ্যে দোলায়িত হয়। কখন বা মনোবিজ্ঞান লৌকিক চিন্তার দলে মিশিয়া সপ্তম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের এই মত-টি অনুমোদন

করে যে, জড়বস্তু স্বতঃ জ্ঞান-গম্য; কখন বা এরূপ একটি মত ব্যক্ত করে—লৌকিক চিন্তা যাহার কোন ধারই ধারে না; সেটি এই যে, জড়বস্তু নিজে না হউক্ তাহার গুণ-সকল স্বতঃ জ্ঞান-গম্য। প্রথম মতটির সম্বন্ধে সপ্তম সিদ্ধান্তে যাহা বলিবার তাহা বলিয়া চুকিয়াছে; উক্ত সিদ্ধান্তে যা'র পর নাই স্পষ্টরূপে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, জড়বস্তু স্বতঃ (অর্থাৎ জ্ঞাতার সঙ্গাশ্রয় ব্যতিরেকে) কোন জ্ঞানেই উপলব্ধি-গম্য নহে। দ্বিতীয় মতটি যাহা নিম্ন-লিখিত প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তে স্পষ্ট-রূপে বিন্যস্ত হইয়াছে তাহার খণ্ডনার্থেই বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের অবতারণা। ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অষ্টম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত সপ্তমটিরই ন্যায় স্ববিরোধ-গর্ভ।

অষ্টম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত ॥ ২ ॥

যদিচ জড়বস্তু স্বতঃ, উপলব্ধি-গম্য নহে, তথাপি জড়বস্তুর বিশেষ একজাতীয় গুণ স্বতঃ উপলব্ধি-গম্য।

জড়বস্তুর মৌলিক গুণ এবং বৈকারিক-গুণ দুয়ের প্রভেদ ॥ ৩ ॥

উপরি-উক্ত "বিশেষ এক জাতীয় গুণ" আর কিছু নয়—যে গুণ-গুলিকে মনোবিজ্ঞানীরা জড়বস্তুর মৌলিক গুণ Primary qualities বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন সেই-গুলি। এই স্থানটিতেই জড়বস্তুর মৌলিক এবং বৈকারিক এই দুই প্রকার গুণের প্রভেদ আলোচিতব্য। ঐ প্রভেদটি তত্ত্বজ্ঞান-ক্ষেত্রে এক সময়ে খুবই ধূমধাম করিয়াছে—কিন্তু সমস্তই বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। যাহাই হো'ক্—উহা যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানের ইতিবৃত্তে একটি সুব্যক্ত স্থান অধিকার করিয়া আছে, এজন্য উহার অসারতা এবং ভ্রমাত্মকতা প্রকাশ্যে বাহির করিয়া দেখানো আবশ্যক।

জড়বস্তুর বৈকারিক গুণের পরিচয়-চিহ্ন ॥ ৪ ॥

জড়বস্তুর মৌলিক এবং বৈকারিক গুণ-সকল সবিস্তরে প্রদর্শন করা অথবা তাহাদের কাহার কিরূপ প্রকৃতি তাহা বিবৃত করিয়া ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক। ঐ দুই জাতীয় গুণের কাহার কিরূপ পরিচয়-চিহ্ন তাহার একটি সাধারণ আদর্শ প্রদর্শন করাই এখানকার পক্ষে যথেষ্ট; তাহা হইলেই পাঠক উভয়ের প্রভেদই বা কি এবং সে প্রভেদের তাৎপর্য্যই বা কি তাহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। শৈত্য ঔষ্ণ্য বর্ণ শব্দ আস্বাদ গন্ধ—এই গুলিই বৈকারিক গুণ। এই প্রকার গুণ-বাচক শব্দগুলির অর্থ দুইরূপ। উহাদের এক অর্থ আমাদের অভ্যন্তর-স্থিত বিশেষ বিশেষ ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি, এবং উহার আর-এক অর্থ সেই সকল অনুভূতির উদ্ভেজক বিশেষ বিশেষ জড়বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণ। উত্তাপ অথবা বর্ণ বলিতে আমাদের ইন্দ্রিয়-সংক্রান্ত অনুভূতি-বিশেষও বুঝায় আর সেই অনুভূতির উৎপাদক ভৌতিক কারণ বিশেষও বুঝায়। উত্তাপ আমাদের শরীরে এবং উত্তাপ অগ্নিতে, এ দুই কথার অর্থ দুই প্রকার। শরীরের বেলায় তাহার অর্থ এক প্রকার স্পর্শানুভব—অগ্নির বেলায় তাহার অর্থ এক প্রকার ভৌতিক গুণ যাহা সেই স্পর্শানুভবের কারণ। এইরূপ, বৈকারিক গুণ-বাচক শব্দ যত আছে, সমস্তই দ্ব্যর্থ-সূচক। সেই শব্দ-গুলি কিরূপ স্থলে প্রয়োগ করা হইতেছে তাহা দেখিয়া তবে আমরা তাহাদের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারি, অর্থাৎ সে গুলি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত—ঐন্দ্রিয়ক অর্থে অথবা ভৌতিক অর্থে—তাহা আমরা বুঝিতে পারি। এখানে বিশেষ যেটি দ্রষ্টব্য তাহা এই যে, বৈকারিক গুণ

গুলি স্বতঃ যে কি সে-বিষয়ে আমরা স্থির কিছুই বলিতে পারি না, কেননা আমাদের ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে তাহারা যেরূপ শব্দ-স্পর্শাদির অনুভব উৎপাদন করে, তাহা হইতে তাহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। জড়বস্তুর বৈকারিক গুণ আমরা আমাদের জ্ঞানে যাহা উপলব্ধি করি, তাহা ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি ভিন্ন আর কিছুই নহে; কাজেই, শুদ্ধ যদি কেবল সেই ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতিই জড়বস্তুর একমাত্র পরিচায়ক হইত, তবে জড়বস্তুর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নিতান্তই সংশয়-স্থলে নিপতিত হইত।

মৌলিকগুণের পরিচয় চিহ্ন ॥ ৫ ॥

মনোবিজ্ঞান বলে যে, জড়বস্তুর মৌলিক গুণগুলি স্বতন্ত্র প্রকার; তাহারা জড়বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে। আকার বিস্তৃতি এবং সংঘাত (Solidity)—এইগুলিই প্রধানত জড়বস্তুর মৌলিক গুণ। শৈত্য ঔষ্ণ্যের ন্যায় এগুলিকে আমরা শুদ্ধ কেবল ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি মাত্র বলিয়া উপলব্ধি করি না, তা ছাড়া এগুলিকে আমরা বহির্বস্তু-সমাশ্রিত বলিয়া উপলব্ধি করি। শৈত্য ঔষ্ণ্য, বর্ণ, শব্দ, এই সকল গুণ আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিকার মাত্র—এবং ইহাদের মাত্রাতিশয্য হইলে ইহারা আমাদের নিকট অসহ্য হইয়া উঠে। কিন্তু ভৌতিক বস্তু-সকলের আকৃতি বিস্তৃতি এবং সংঘাতের ওরূপ মাত্রাতিশয্য সম্ভবে না। এই ব্যাপারটি ঐন্দ্রিয়ক অনুভব এবং প্রত্যক্ষ এ দুয়ের প্রভেদ জ্ঞাপন করিতেছে।

ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি বিভিন্ন মাত্রায় উত্তেজিত হইতে পারে—এবং কতক-না-কতক মাত্রা শারীরিক সুখ দুঃখ তাহার সঙ্গে লাগিয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যক্ষ-নামক মনোবৃত্তি, যাহা আকৃতি বিস্তৃতি এবং সংঘাত লইয়া ব্যাপৃত হয়, তাহা সেরূপ নহে; তাহার মাত্রা সর্ব্বদাই সমান, এবং তাহা শারীরিক সুখ-দুঃখে জড়িত নহে। প্রত্যক্ষ দ্বারাই আমরা জড়বস্তুর মৌলিক গুণগুলি (অর্থাৎ আকৃতি বিস্তৃতি সংঘাত) অবগত হই—ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি দ্বারা নহে। মনোবিজ্ঞান আরো এই বলে যে, মৌলিক গুণ-বাচক শব্দ-গুলি বৈকারিক গুণ-বাচক শব্দগুলির ন্যায় দ্ব্যর্থ-সূচক নহে। কিন্তু এ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা একটি গুরুতর বিষয় যাহা মনোবিজ্ঞান আমাদের লক্ষ্যে আনয়ন করে তাহা এই যে, মৌলিক গুণ-গুলির সাহায্যে আমরা যে-সকল বস্তু উপলব্ধি করি—মৌলিফ গুণ-গুলি সেই সকল বস্তুকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে—আমাদের মনকে আশ্রয় করিয়া নহে; এ সকল গুণ আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাহিরে উপলব্ধি করি—আমাদের মনের অভ্যন্তরে নহে। আকৃতি বিস্তৃতি এবং সংঘাতের বাহ্য অস্তিত্ব আমরা সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করি—সুতরাং তাহারা যে, বহির্ব্বস্তুরই গুণ, এ বিষয়ে আর আমাদের সংশয় থাকিতে পারে না। কিন্তু শব্দ-স্পর্শাদি বৈকারিক গুণ-সকলের বাহ্য-সত্তা বিষয়ে আমরা স্থির কিছুই বলিতে পারি না,—কাজেই ইহারা স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত।

জড়বস্তুর মৌলিক এবং বৈকারিক এই দুই জাতীয় গুণের মধ্যে—প্রত্যক্ষ এবং ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতির মধ্যে—মনোবিজ্ঞান যেরূপ ভেদ নির্দ্দেশ করেন তাহা ঐ। ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি বলিয়া যে একটি মনোবৃত্তি—তাহা বৈকারিক গুণ-সকলের বাহ্য-সত্তা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারে না, তাহা অন্তর্বাহ্যের মধ্যে ক্রমাগতই ইতস্ততঃ করে; আর, প্রত্যক্ষ বলিয়া যে একটি মনোবৃত্তি তাহা মৌলিক গুণ সকলের বাহ্য সত্তা অতীব স্পষ্টাক্ষরে জ্ঞাপন করে।

মনোবিজ্ঞানের মতানুসারে, ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি মানসিক অবস্থার পরিচায়ক এবং প্রত্যক্ষ-বৃত্তি বহির্জগতের পরিচায়ক।

এই প্রকার প্রভেদের দোষ ॥ ৬ ॥

প্রভেদটি নিজে তত দোষের নহে। যদিচ ওরূপ প্রভেদ নিরূপণে বিশেষ কোন ফল দর্শে না, তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে কোন দোষ নাই যে, জড়বস্তুর মৌলিক গুণগুলি এক শ্রেণীভুক্ত ও তাহার বৈকারিক গুণ-গুলি আর এক শ্রেণী-ভুক্ত; শেষোক্ত গুণগুলি অস্পষ্ট এবং আনুভূতিক, পূর্ব্বোক্ত গুণগুলি স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। ফলে, মনোবিজ্ঞান এই যে একটি কথা বলিতেছেন যে বৈকারিক গুণ-গুলি দ্ব্যর্থ-সূচক, ইহার উত্তর এই যে, দ্ব্যর্থ-সূচকতার কথা যদি বল—তবে সে বিষয়ে বৈকারিক গুণও যেমন—মৌলিক গুণও তেমনি—দুইই সমান। আকৃতি বিস্তৃতি সংঘাত বলিতে শুদ্ধ কি কেবল বহির্ব্বিষয়েরই গুণ বুঝায়—আমাদের প্রত্যক্ষ-বৃত্তির পরিণাম বুঝায় না? প্রত্যক্ষ-বহির্ভূত আকৃতি বিস্তৃতি এবং সংঘাত যে, কি, তাহা কি মনোবিজ্ঞান বলিতে পারেন, না কোন মনুষ্য তাহা বলিতে পারে? মৌলিক গুণের প্রত্যক্ষই কেবল আমাদের মানসক্ষেত্রে উপস্থিত হয়—মৌলিক-গুণ স্বতন্ত্ররূপে তথায় উপস্থিত হয় না। তেমনি আবার, বৈকারিক গুণের ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতিই কেবল আমাদের মানস-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, বৈকারিক গুণ স্বতন্ত্ররূপে তথায় উপস্থিত হয় না। ইহাও যেমন উহাও তেমনি; উভয়েই একদিকে যেমন বহির্বস্তুর গুণ, আর একদিকে তেমনি মনোবৃত্তির পরিণাম। অতএব বৈকারিক গুণ-বাচক শব্দগুলিও যেমন—মৌলিক গুণবাচক শব্দগুলিও তেমনি—দ্ব্যর্থ-সূচকতা-বিষয়ে কেহ কাহারো অপেক্ষা ন্যূন নহে। কাজেই, দুয়ের প্রভেদ নিরূপণ দ্বারা মৌলিক গুণের দ্ব্যর্থ-সূচকতা দোষ ঘুচাইতে গেলে, সে দোষ কিছু আর সত্য সত্যই ঘুচানো হয় না—শুদ্ধ কেবল গোপন করা হয় মাত্র। আর ঐ দুই জাতীয় গুণের মধ্যে প্রভেদ নিরূপণ দ্বারা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের একটা সিদ্ধান্ত দাঁড় করাইতে গেলে—চক্ষে ধূলি দেওয়া রকমের একটা গোলমেলে সিদ্ধান্ত গড়িয়া তোলা হয় মাত্র।

উহা স্ববিরোধিতায় প্রধাবিত হয় ॥ ৭ ॥

কিন্তু এখানকার ভ্রম যেটি, তাহা উক্ত প্রভেদ-নিবন্ধন তত নহে—যত সেই প্রভেদের প্রয়োগ-নিবন্ধন। মনোবিজ্ঞানের হস্তে পড়িয়া ঐ প্রভেদটি স্পষ্ট একটি স্ববিরোধিতায় প্রধাবিত হয়। সে স্ববিরোধিতা অষ্টম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তে মূর্ত্তিমান—তাহা এই যে, জ্ঞাতা আপনাকে না জানিয়া জড়বস্তুর বিশেষ এক জাতীয় গুণ জ্ঞানে উপলব্ধি করিতে পারে। কোথা হইতে এই স্ববিরোধের সূত্র উত্থাপিত হয় তাহা অতঃপর দেখা যাইতেছে।

মনোবিজ্ঞানের মতে মায়াবাদ কিরূপ ॥ ৮ ॥

মনোবিজ্ঞান যাহাকে মায়াবাদ বলিয়া ভয় পা'ন, তাহার প্রতিবিধান-মানসেই তিনি ঐরূপ প্রভেদ নিরূপণে প্রবৃত্ত হ'ন। মনোবিজ্ঞানের মতে ঐরূপ প্রভেদের অস্বীকারের উপরেই মায়াবাদ প্রতিষ্ঠিত। তিনি ভাবেন যে, মায়াবাদ ঐ দুই জাতীয় গুণকে মিসাইয়া এক করিয়া ফেলে—বৈকারিক গুণের ধর্ম্ম মৌলিক গুণে আরোপ করে—শৈত্য ঔষ্ণ্য প্রভৃতির ন্যায় আকৃতি বিস্তৃতি এবং সংঘাতকে অন্তঃকরণের বিকার মাত্র বলিয়া প্রতিপাদন করে। তাঁহার মতে, মায়াবাদ জড়বস্তুর বৈকারিক গুণ-সকলের ন্যায় তাহার মৌলিক গুণ-সকলকেও অ-

স্পষ্ট এবং দুর্ভেদ্য মনে করে। মায়াবাদ মনে করে যে, জড়জগতের আন্দোলন-কালে আমরা জড়-বস্তুর গুণ-সকল জ্ঞানে উপলব্ধি করি না; উপলব্ধি করিবার মধ্যে শুদ্ধ কেবল আমাদের আপনাদের কতক গুলি মানসিক বিকারই উপলব্ধি করি। মনোবিজ্ঞানী ভাবেন যে, এইরূপে মায়াবাদ জড়বস্তুর অস্তিত্ব হয় একেবারেই উড়াইয়া দে'ন—নয় বিষম ভজকটে ফেলিয়া দেন; কারণ, বৈকারিক গুণের যে দশা—মৌলিক গুণেরও যদি সেই দশা হয়, যদি দুই জাতীয় গুণের কাহাকেও আমরা স্বরূপতঃ উপলব্ধি করিতে না পারি, আর যদি আমরা সমস্ত জড়-জগৎকে ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি পরম্পরায় পরিণত করিতে বাস্তবিকই সমর্থ হই, তবে তাহাতে দাঁড়ায় এই যে, আমাদের ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতির উত্তেজক কারণ—জড় জগৎ না হইয়া আর-কোন কিছু হইলেও হইতে পারে, কাজেই জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা সংশয় স্থলে নিপতিত হয়; তাহা হইলেই দাঁড়ায় যে, অনুভবিতা'র বিলোপ হইলেই সমস্ত জড় জগৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়, কেননা সমস্ত জড়জগৎ অনুভূতি-পরম্পরা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মনোবিজ্ঞানের মতে—ইহাই মায়াবাদ। মনোবিজ্ঞান ভাবেন যে, জড়জগতের মূলোচ্ছেদ করা—মৌলিক এবং বৈকারিক এই দুই জাতীয় গুণের প্রভেদ অগ্রাহ্য করিয়া জড়বস্তুর স্বতন্ত্র-সত্তাকে জ্ঞান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া—ইহাই মায়াবাদের চরম উদ্দেশ্য। মনোবিজ্ঞানী মনে করেন যে মায়াবাদ নিম্ন-প্রকার অতি ব্যাপ্তি দোষে দূষিত;—জড়বস্তুর কোন কোন গুণ (যেমন উত্তাপ শব্দ বর্ণ) পরীক্ষাতে এইরূপ পাওয়া যায় যে, তাহারা আমাদের ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি-মাত্র, অতএব জড়-বস্তুর সমস্ত গুণই আমাদের মনোবৃত্তির পরিণাম।

মনোবিজ্ঞান-কর্তৃক মায়াবাদের খণ্ডন ॥ ৯ ॥

"মায়াবাদের ভুল এইবার ধরা পড়িয়াছে—মায়াবাদ মৌলিক এবং বৈকারিক এই দুই বিভিন্ন জাতীয় গুণকে এক সঙ্গে মিসাইয়া খিচুড়ি পাকাইয়াছেন" এইরূপ স্থির-নিশ্চয় করিয়া, মনোবিজ্ঞান মায়াবাদের খণ্ডন-কার্য্যে কোমর বাঁধিয়া প্রবৃত্ত হ'ন,—জড়জগতের নিকট হইতে তাহার স্বতন্ত্র সত্তা যাহা অবৈধ-রূপে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে তাহা তাহাকে ফিরাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হ'ন। তিনি ঐ প্রভেদটিকে কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতারণ করেন। ইহা তিনি স্বীকার করেন যে, জড়বস্তুর কোন কোন গুণ আমাদের মনোবৃত্তির পরিণাম-মাত্র; কিন্তু তাহা বলিয়া জড়বস্তুর সকল গুণই যে সেইরূপ, তাহা তিনি স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, জড়বস্তুর আকৃতি আছে—বিস্তৃতি আছে—সংঘাত আছে, ইহারা ও-রূপে বাগ মানিবার পাত্র নহে; ইহারা শৈত্য ঔষ্ণ্য প্রভৃতির দলে মিশিয়া ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি সাজিতে কিছুতেই সম্মত হয় না। তবুও যদি ও-দুই শ্রেণীর গুণকে বল-পূর্ব্বক একত্র মিসাইতে যাও, তবে তেলে জলে মিসানোই সার হইবে। মৌলিক-গুণ সকল লুকাচুরি জানে না, তাহাদের ভিতর-বাহির সমান; তাহাদের সত্তা অতীব সুস্পষ্ট সত্তা, তাহার মধ্যে দুর্ভেদ্য কিছুই নাই। বৈকারিক গুণসকলই মূলবস্তুতে একরূপ এবং আমাদের ইন্দ্রিয়াভ্যন্তরে আর-একরূপ, কিন্তু মৌলিক গুণ-সকল সেরূপ নহে। তাহারা পষ্টাপষ্টি মায়াবাদীর সম্মুখে দণ্ডায়-

মান হইয়া বলে যে, "তুমি তোমার সমস্ত গোলাগুলি বর্ষণ করিয়া আমাদিগকে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা কর—পারিবে না।" আমাদের ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি জড়বস্তুর আভ্যন্তরিক প্রকৃতি-বিষয়ে স্পষ্ট কোন কথাই বলে না, এমন কি জড়বস্তুর অস্তিত্বেরও সমুচিত প্রমাণ প্রদর্শন করে না; সে তাহা না করুক্—প্রত্যক্ষ বলিয়া আর-একটি মনোবৃত্তি যাহা আমাদের আছে, যাহা জড়বস্তুর আকৃতি বিস্তৃতি এবং সংঘাত লইয়া ব্যাপৃত হয়, সেই প্রত্যক্ষ-বৃত্তি আমাদিগকে জড়বস্তুর আভ্যন্তরিক প্রকৃতি এবং সত্তাতে সহজেই পৌঁছাইয়া দেয়; আর, এই মৌলিক গুণ-সকলের সুব্যক্ত সত্তার বলেই আমরা জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা প্রতিপাদন করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হই না।

উহা স্ববিরোধী এই জন্য গ্রাহ্য নহে ॥ ১০ ॥

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় বটে যে, উপরি-উক্ত যুক্তিটি নিতান্ত বল-হীন নহে, কিন্তু উহার বলবত্তা শিরোধার্য্য করিবার পূর্ব্বে সামান্য গুটি-দুই কথা বিবেচ্য। এ শুধু বলিলে চলিবে না যে, ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি প্রত্যক্ষ হইতে বিভিন্ন, অথবা মৌলিক গুণ-সকল বৈকারিক গুণ-সকল হইতে বিভিন্ন; তা ছাড়া, এইটি দেখানো চাই যে, মৌলিক গুণ-সকল স্বতন্ত্র-রূপে (অর্থাৎ জ্ঞাতার অপেক্ষা না রাখিয়া স্বতন্ত্র রূপে) জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য; মনোবিজ্ঞানী যতক্ষণ না এইটি দেখাইতে পারিতেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার ঐ যুক্তিটিতে কোন ফল দর্শিতেছে না। জড়বস্তুর জ্ঞান-বহির্ভূত স্বতন্ত্র সত্তা প্রমাণ করাই মনোবিজ্ঞানীর উদ্দেশ্য। মনে কর যেন জড়বস্তুর ঐরূপ সত্তা আছে; কিন্তু তাহার প্রমাণ কি? মনোবিজ্ঞানী বলিবেন যে, মৌলিক গুণ-সকলের জ্ঞান-বহির্ভূত স্বতন্ত্র সত্তাই জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তার একমাত্র প্রমাণ। উত্তম কথা,—মৌলিক গুণ-সকলের জ্ঞান-বহির্ভূত স্বতন্ত্র সত্তার প্রমাণ প্রদর্শন কর, তাহা হইলেই বিবাদ মিটিয়া যাইবে; কিন্তু তাহা তুমি করিতেছ না—তুমি কেবল বলিতেছ যে, বৈকারিক গুণ (শব্দ-স্পর্শাদি) একজাতীয় গুণ এবং মৌলিক গুণ (আকৃতি বিস্তৃতি সংঘাত) আর-এক জাতীয় গুণ; হইলই বা আর একজাতীয় গুণ, তাহাতে কাহার কি আইসে যায়? মৌলিক গুণ কি জ্ঞাতার অপেক্ষা না রাখিয়া স্বতন্ত্র রূপে জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য? তাহা হইলেই বলিতে পারি যে, মৌলিক গুণের স্বতন্ত্র সত্তা যখন আমাদের জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য—তখন কাজেই তাহা আমাদের শিরোধার্য্য; কেননা জ্ঞানই সত্তার একমাত্র প্রমাণ। অতএব মনোবিজ্ঞানীর প্রকৃত অভিপ্রায়টিকে জঞ্জালমুক্ত করিয়া স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত করিতে হইলে এইরূপ বলিতে হয় যে, জড়বস্তুর বিশেষ এক-জাতীয় গুণ (মৌলিক গুণ) স্বতন্ত্র-রূপে (অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-বহির্ভূত রূপে) জ্ঞানে উপলব্ধ হয়, অতএব মৌলিক গুণ এবং তাহার আশ্রয়ীভূত জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা বাস্তবিকই আছে। ওরূপ স্বতন্ত্র সত্তা বাস্তবিকই আছে কি নাই এ বিষয়ে এখানে আমরা কোন কথাই বলিতে চাহি না, এখানে আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে, উপরি উক্ত যুক্তির গোড়ার কথাটি (অর্থাৎ "মৌলিক গুণের স্বতন্ত্র সত্তা জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য" এই কথাটি) ভ্রমাত্মক ও স্ববিরোধী। ইহা একটি যুক্তিযুক্ত অবশ্যম্ভাবী সত্যের বিরোধী—অষ্টম সিদ্ধান্তের বিরোধী। যে-কোন জ্ঞাতা হউন্ না কেন,

WORM EATEN.

তিনি আপনাকে উপলব্ধি না করিয়া জড়-বস্তুর কোন গুণই উপলব্ধি করিতে পারেন না। অতএব জড়বস্তুর স্বতন্ত্র-সত্তার সপক্ষে মনোবিজ্ঞানী যত কিছু যুক্তি প্রদর্শন করেন সমস্তই জ্ঞানের নিয়ম-বিরুদ্ধ ভ্রান্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই সব যুক্তি একে তো আপন অভীষ্ট সাধনে অসমর্থ তাহাতে আবার জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী নিয়ম উল্টাইয়া দিয়া তত্ত্বজ্ঞানের মূল উৎস পর্য্যন্ত বিষায়িত করে।

দুই জাতীয় গুণের ভেদ-নিরূপণ অকিঞ্চিৎকর ॥ ১১ ॥

মৌলিক এবং বৈকারিক গুণের প্রভেদের বিষয় এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট। এই প্রভেদটি মনোবিজ্ঞানের বিশেষ একটি নির্ভর-স্থল—ইহা হইতে তিনি বিস্তর ফল-প্রাপ্তির প্রত্যাশা করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ প্রভেদটি কোন কার্য্যেরই নহে। ইহার বহ্বারম্ভ, দেখিতে দেখিতে, লঘু-ক্রিয়ায় পরিণত হয়। প্রকৃত মায়া-বাদের কথা দূরে থাকুক্—মনোবিজ্ঞানী যাহাকে মায়াবাদ বলেন সেই কৃত্রিম মায়া-বাদকে খণ্ডন করিতে গিয়াও উহা আপনার অসারতা এবং অকিঞ্চিৎকরতা সপ্রমাণ করে। উহাকে উহার নিজ মূর্ত্তিতে দেখিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা জ্ঞানের নিয়ম সকলের বিরোধী ও তত্ত্বজ্ঞানকে বিপথে লইয়া যাইবার একটি প্রধান গুরু। তত্ত্বালোচনার সমুদ্র-বক্ষে উহা একটি বুদ্‌বুদ্ বই আর কিছুই নহে—এখন উহাকে চুপে চাপে ভগ্ন এবং বিলীন হইয়া যাইতে দেও। উহার যাহা কৃত্য উহা তাহা সাধ্যমতে করিয়া চুকিয়াছে—তাহাও ভাল করিয়া নহে।

আত্মা ও পরমাত্মা।

আত্মা ও পরমাত্মা এক নিগূঢ় সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই নিগূঢ় সম্বন্ধের বিষয় যতই আলোচনা করা যায়, ততই উহারদের নৈকট্য প্রতিভাত হয়। উভয়ে উভয়ের সখা সযুজা না বুঝিলে কেমন করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে মিলনের গাঢ়তা হইবে। পৃথিবীতে দুইজনের মধ্যে সখ্য-ভাব স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে যেমন পরস্পরের প্রকৃতি ভাব লক্ষ্য অবগত হওয়া চাই, তেমনি জীবাত্মা ও পরমাত্মার অনন্ত-কালভোগ্য মিলনের পূর্ব্বে পরমাত্মার পিতৃভাব, আত্মার অমরত্ব, উহার অনন্ত গতি, অনন্ত উন্নতি, উহার অপূর্ণতা পরমাত্মার উপর একান্ত নির্ভরের ভাব অগ্রে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা উচিত।

আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি যখনই জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে নিঃসৃত, তিনি আমারদের পিতা; যখন তাঁহার স্নেহদৃষ্টি সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সকল সময়ে সমান রূপে আমারদের উপরে নিপতিত দেখি তিনি আমারদের মাতা; যখন তিনি আমারদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া শুভবুদ্ধি কর্ত্তব্যজ্ঞান আমারদের অন্তরে নিয়ত প্রেরণ করিতেছেন ও নানা রূপ বিপদাপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন তিনি আমারদের বন্ধু, যখন তাঁহার অনুগত ও সেবক হইয়া তাঁহার পূজার্চ্চনা ও ধ্যান ধারণা আমারদের জীবনের লক্ষ্য দেখি তখনই তিনি আমাদের প্রভু, যখন তাঁহাকে গতি মুক্তির নিদানভূত জানিয়া হৃদয়মন্দির হইতে সকল প্রকার নীচকামনা নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া সেই সংমোহন মূর্ত্তিকে সংস্থাপিত

করি এবং তাঁহার প্রেমসাগরে অবগাহন করিয়া বিমল শান্তি উপভোগ করিতে থাকি তখনই তাঁহাকে হৃদয়-রাজ্যের স্বামী না বলিয়া আর থাকিতে পারি না। তাঁহার সঙ্গে আমারদের সম্বন্ধ-বৈচিত্র এত অধিক যে যতই তাঁহার বিষয় আলোচনা করিতে থাকি ততই মনে নূতন ভাবের বিকাশ হইতে থাকে। এই জন্য ঈশ্বর-চিন্তা কোন কালেই আমারদের নিকট পুরাতন হয় না। বাস্তবিক উহার মধ্যে এতই মাধুরী বিদ্যমান রহিয়াছে, যে, পৃথিবীর সকল প্রকার প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া সাধক কেবল তাঁহাতেই শান্তি পান, এবং বলিতে থাকেন "নাল্পে সুখমস্তি"।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই আত্মা। ইহাই উভয়ের ঐক্যস্থল। যে আপনাকে জানে সেই আত্মা। জীবাত্মা বলিতে পারে "আমি আছি"। শোণিত-মাংস-অস্থি-সমন্বিত জড় শরীর আপনাকে আমি বলিতে পারে না। মৃত্যুর সময়ে এ দেহ পড়িয়া থাকিবে, আমি বা আত্মা এ দেহ-পিঞ্জর হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইবে। "আমি আছি" ইহাই জীবাত্মার নির্দ্দেশ, সুতরাং আমি কালে বদ্ধ। আত্মা নিরাকার সুতরাং দেশে ইহাকে বদ্ধ করা যায় না। পরমাত্মা অর্থাৎ "আমি আছি চিরকাল" ইহা দেশেও বদ্ধ নহে কালেও বদ্ধ নহে। এমন এক সময় ছিল যখন "আমি ছিলাম না।" ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ, সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ। এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, কেবল এক সৎ-স্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেন, আলোচনা করিলেন এবং এই সমুদয় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন। সৎ-স্বরূপ পরব্রহ্ম যেমন সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিলেন এখনও আছেন, পরেও থাকিবেন। আত্মাকে সেরূপ বলা যাইতে পারে না। তিনি "অজ" আত্মা" তাঁহার জন্ম নাই বিকার নাই সুতরাং তিনি দেশ কালের অতীত। কিন্তু জীবাত্মার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে না যে তিনি অজ আত্মা। ইহাই জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ।

জীবাত্মা পরিমিত শক্তি ধারণ করিয়া পরমাত্মা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তাঁহারই ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। যতদিন তাঁহার ইচ্ছার বিরাম না হইবে ততকাল তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে থাকিবে। কিন্তু পরমাত্মা স্বতন্ত্র, স্বয়ম্ভূ নিত্য পরিপূর্ণ ও নির্ব্বিকার। যখন তাবৎ প্রাণী নিদ্রাতে অভিভূত থাকে, তখন পরমাত্মা নিদ্রিত থাকেন না। য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ যিনি অন্ধকার রজনীর সাক্ষীস্বরূপ হইয়া সকলের প্রয়োজনীয় নানা অর্থ নির্ম্মাণ করিতে থাকেন তিনিই ব্রহ্ম। কিন্তু মনুষ্যের চঞ্চলতা আছে, অজ্ঞানতা আছে, মোহ আছে, ভ্রম প্রমাদ আছে, বিকার আছে সুতরাং তাহার সঙ্গে সঙ্গে, জীবাত্মারও সজীবতা নির্জীবতা আছে। জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়েই আত্মা হইলেও উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এত অধিক।

জীবাত্মা পরমাত্মার সাদৃশ্যে গঠিত হইয়া স্বয়ম্প্রকাশ পরমেশ্বরের প্রকাশে প্রকাশিত হইতেছে। তিনিই ইহার আলোক তিনিই ইহার জীবন জ্যোতি সকলই। তিনিই ইহার প্রতিষ্ঠাভূমি। যখনই মোহমেঘ অন্তরাকাশে উদিত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন করে, তখনই আত্মা নির্জীব মৃতপ্রায় অসাড় হইয়া পড়ে।

WORM EATEN.

পরক্ষণে যখন আত্মপ্রভাব ও ঈশ্বরকৃপায় রিপুকুল প্রশমিত হয়, হৃদয়রাজ্যে আশ্রমের চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই সাধন তপস্যাবলে আত্মার বল বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ঈশ্বরের প্রসন্ন মূর্ত্তি আত্মফলকে সুন্দররূপে প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে। যেমন স্বচ্ছ সরোবরে শশাঙ্কের মূর্ত্তি সহজে প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ আপনার আপনার সাধনের গুণে ও দৈববলে অভ্যন্তরে বিভিন্নমুখী বৃত্তি প্রবৃত্তির মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হইলে তবে শান্তস্বরূপ পরমেশ্বর দেখা দেন। ঈশ্বরের দিকেত আত্মার স্বাভাবিক গতি। আত্মার সে স্বাভাবিক গতির যাহাতে ব্যত্যয় না হয় সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার জন্য সচেষ্ট থাকিতে হইবে। পার্থিব ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর সুখের বিনিময়ে যদি সেই অক্ষয় ধন লাভ করা যায় তবে ইহা অপেক্ষা আমারদের সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে।

ধার্ম্মিকতার পরীক্ষা।

অনেকে ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিতে অথবা শুনিতে উৎসাহী হইতে পারেন, উৎসবে মাতিতে পারেন অথবা ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিয়া দ্রবীভূত হইতে পারেন কিন্তু প্রকৃত রূপে ধার্ম্মিক হওয়া বড় সুকঠিন। রিপুদমনের বেলা প্রকৃত ধার্ম্মিকতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেকে ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিতে অথবা শুনিতে উৎসাহী হইতে পারেন, উৎসবে মাতিতে পারেন অথবা ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিয়া দ্রবীভূত হইতে পারেন কিন্তু সৌন্দর্য্য দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অন্যায় কামাচরণের সুবিধা থাকিলেও তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া কিম্বা নিজ বিষয়ে কেহ বিশেষ অনিষ্ট করিতেছে তাহাকে জব্দ করিবার বিশেষ সুযোগ হইলেও বিমুখ হওয়া কিম্বা অন্যায় রূপে এককালে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিবার বিলক্ষণ সুবিধা থাকিলেও সে সুবিধা পরিত্যাগ করা কিম্বা বিষয় রক্ষা এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধি কার্য্যে কিঞ্চিৎমাত্র অন্যায় ও অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত হওয়া কিম্বা মিথ্যারূপে যে ব্যক্তি নিন্দা করিতেছে তাহাকে মনের সহিত ক্ষমা করা বড়ই সুকঠিন। এই সকল সময়ে ধার্ম্মিকতার পরীক্ষা হয়। বাহিরে লোকে ধার্ম্মিকতার ভান করিতে পারে কিন্তু গৃহে অন্য আকার ধারণ করিতে পারে। ইংরাজীতে একটি জনসাধারণ বাক্য আছে "No one is a hero to his valet-de chamber"। "কেহই আপনার ভৃত্যের নিকট সুরবীর বলিয়া গণ্য হয়েন না।" ভৃত্যের প্রতি ব্যবহার দ্বারা প্রকৃত ধার্ম্মিক লোকের পরিচয় পাওয়া যায়। অজ্ঞ অশিক্ষিত ভৃত্যকে কথা শুনাইতে হইবে অথচ তাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করা হইবে না ইহা বড় কঠিন কার্য্য। কাজের হানি না করিয়া কেবল ভাল কথা দ্বারা ভৃত্যদিগকে চালানোতে কোন ব্যক্তি প্রকৃত রূপে ধার্ম্মিক কিনা বুঝিতে পারা যায়। রোগের সময় সহিষ্ণুতা গুণে ঐরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। জর্ম্মেনির সম্রাট তৃতীয় ফ্রেডরিক যাঁহার সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে তাঁহার দীর্ঘকাল স্থায়ী নিদান পীড়ার সময় আপনাকে ঈশ্বরের একটি শিশু সন্তানের ন্যায় মনে করিয়া তাঁহার প্রতি নির্ভর ও সহিষ্ণুতা-গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কত সময় পরিবার ও ভৃত্যদিগকে যতদূর সম্ভব উদ্বেজিত করিতেন না। আপনার হস্তে যতদূর পারেন কর্ম্ম করিতেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের

মধ্যে প্রায় দেখা যায় অন্য সকল বিষয়ে ভাল হইলেও তাঁহাদিগের ক্রোধবৃত্তি কিছু প্রবল হয় এবং তাহা ভিন্নমতাবলম্বীর প্রতি বিশেষ রূপে পরিচালিত হয়। এইরূপ অনৌদার্য্য হইতে যিনি মুক্ত তিনি প্রকৃত ধার্ম্মিক। সমদম তিতিক্ষা, সদা সন্তোষ, ক্ষমা, মৈত্রী ও করুণা, এই সকল গুণ দ্বারা প্রকৃত ধার্ম্মিকতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এই জন্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি"।

ধর্ম্মপথ শাণিত ক্ষুরধারার ন্যায় দুর্গম ও দুরতিক্রমণীয় ইহা জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন। জে গোল্ড (Jay Gould) ন্যায় লোকে পঞ্চান্ন কোটী টাকার অধীশ্বর হইতে পারে কিন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া বড়ই কঠিন। আমরা অনেক সময় ধর্ম্ম কি কঠিন মনে করি না। আমরা অনেক সময় মনে করি কেবল বক্তৃতা অথবা উৎসবে মাতা অথবা ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিয়া গলিয়া যাওয়া অথবা ঈশ্বরের নামশ্রবণে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করাই প্রকৃত ধর্ম্ম। ভক্তি ধর্ম্মের প্রধান উপাদান বটে কিন্তু কোন মনুষ্যে যথার্থ ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে কিনা তাহা সমদম তিতিক্ষাদি গুণের বর্ত্তমানতা দ্বারা উপলব্ধি করা যায়।

মৃত্যু।

মৃত্যু কি ভয়াবহ শব্দ। মৃত্যু শব্দ শ্রুতিগোচর হইলে সকলেই ত্রস্ত ও বিকম্পিত হয়। মৃত্যু এতাদৃশ ভয়াবহ হইবার কারণ কি? আমাদিগের অমরাত্মার বাস-গৃহ এই শরীরের নাশই মৃত্যু। ইহাতে আমরা এত ভয় পাই কেন? কি আশ্চর্য্য! আমাদিগের কি প্রত্যয় হয় না যে, যে প্রেমময় পুরুষ আমাদিগের শরীরকে অতুল স্নেহে রক্ষণ ও পালন করিতেছেন তিনি কি শরীরের প্রাণরূপী আমাদিগের জীবনের জীবন জীবাত্মাকে কখনই বিনাশ করিবেন না। জীবাত্মা অনন্তের আশ্রয়ে অনন্ত কাল থাকিয়া তাঁহার যশোঘোষণা করিবেক, তাঁহার প্রদত্ত প্রেমান্ন গ্রহণে দিন দিন পরিপুষ্ট হইবে, উন্নতির এক অবস্থা হইতে আর এক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রেমানন্দ যোগানন্দ ব্রহ্মানন্দ ক্রমশঃ সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইবে, ইহা বিশ্বাস করিয়াও আমরা কি জীবাত্মার লোকান্তরিত হইবার সময় মুহ্যমান্ হইব? জীবাত্মা শরীর পরিত্যাগ সময়ে বিলাপ ও ক্রন্দন করে কেন? সংসারের প্রতি মোহ স্নেহাদির আধিক্যই ইহার কারণ। কিসে এই মোহাদির নিবারণ হয়? ঈশ্বর-প্রীতিই সেই মোহাদি নিরসনের এক মাত্র উপায়। কিন্তু ঈশ্বরেতে প্রীতি সংস্থাপন কালে আমরা কি জগৎকে উপেক্ষা করিব? না ঈশ্বরকে প্রীতি করিবার সঙ্গে সঙ্গে জগৎকেও প্রীতি করিব? ঈশ্বর-তত্ত্ব-রসপানার্থী ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই বলিয়া থাকেন যে ঈশ্বরকেই প্রীতি করিবে এবং জগৎকে প্রীতি করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া তাহাকে প্রীতি করিবে। কিন্তু অনেকে কার্য্যকালে ঈশ্বরকে প্রীতি করেন ও জগৎকে উপেক্ষা করেন।

ঈশ্বর-প্রীতির লক্ষণ কি? ঈশ্বরপ্রসঙ্গ, ঈশ্বরধ্যান, ঈশ্বর গুণগান, তাঁহার অনুগত থাকিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান, পাপচিন্তা পাপালাপ পাপ কার্য্য পরিত্যাগ, তাঁহার নিকট আত্ম-নিবেদন, ধর্ম্ম-বল প্রার্থনা ইত্যাদি। আর সংসারের প্রতি

প্রীতি কি প্রকারে প্রকাশ পায়? প্রাণপণ চেষ্টা দ্বারা পরদুঃখ বিমোচন, পরসুখোন্নতি সাধন, পিতা মাতা সন্তান ভ্রাতা ভগিনী বন্ধু প্রভৃতি আত্মীয়বর্গকে সর্ব্বদা প্রীতি-নয়নে সন্দর্শন, তাঁহাদিগের অভাব নিবারণ, তাঁহাদিগের শারীরিক ও মানসিক পীড়া নিবারণ, এক কথায় কাহারো প্রেমে বিমুগ্ধ না হইয়া সাধ্যমতে লোকের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন, এই সকল কার্য্য দ্বারাই আমরা সংসারে প্রীতি করিয়া থাকি। এ দুই প্রকার প্রীতির কি সমন্বয় হয় না? অবশ্যই হয়। যেহেতু যাঁহার চিত্ত ঈশ্বরপ্রীতিতে নিমগ্ন তিনি সহজেই আপন শরীর আত্মা পরার্থে উৎসৃষ্ট করিয়া থাকেন।

শিবায় লোকস্য ভবায় ভূতয়ে
য উত্তম-শ্লোকপরায়ণা জনাঃ।
জীবন্তি নাত্মার্থমসৌ পরাশ্রয়ং
মুমোচ নির্ব্বিদ্য কুতঃ কলেবরং॥

ভাগবত ১।৪।১২

ভগবদ্ভক্ত জনগণ লোকের হিত ও সুখ সমৃদ্ধির জন্য তৎপর থাকেন, তাঁহারা কেবল আত্মার্থ প্রাণ ধারণ করেন না।

অনেক ভক্তিমান্ লোকে ঈশ্বর-প্রীতিতে নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহার ধ্যান ধারণাতেই তৎপর কিন্তু পরদুঃখবিমোচনাদিতে তাদৃশ অগ্রসর হয়েন না। ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে? আমাদিগের চতুর্দ্দিকে ভ্রাতৃগণের দুঃখজনক হৃদয়-বিদারক ক্রন্দন ধ্বনির প্রতি কি আমরা বধির হইয়া থাকিব? আমাদিগের ভ্রাতৃগণ জ্ঞান, অর্থ, শারীরিক বল ও ধর্ম্মবল অভাবে পীড়া অকালমৃত্যু পাপ তাপ দারিদ্র্য প্রভৃতি কত নিদারুণ ক্লেশ সহ্য করিতেছে, আমরা কি তাহা দেখিয়াও দেখিব না? তৎপ্রশমন জন্য একটী অঙ্গুলীও কি উত্তোলন করিব না? ঈশ্বর করুন যেন আমাদিগের এ প্রকার ঔদাসীন্য না হয়, যেন আমরা সংসারকে তাঁহার অভিমতানুসারে যথার্থ প্রীতি করিতে পারি।

যিনি ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও সংসারের প্রতি প্রীতি এ দুই প্রীতি দ্বারা আপন জীবনকে নিয়মিত করেন, মৃত্যু তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে পারে না। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকেন। প্রীতি-সুধা-পানে সবল হইয়া তিনি সংসারের আকর্ষণ শক্তির উপর কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করেন। এখানে চিরকালের জন্য আসি নাই, কিছু দিন পরে এখান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতে হইবেক, যতদিন এখানে থাকিব ততদিন পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয় জনগণের ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতি ও স্নেহ সহকারে সন্তোষ সাধন করিব, সাধ্যানুসারে দেশের উন্নতি, জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচার ও লোকের দুঃখ দূর করিতে যত্নশীল থাকিব, দিন দিন তাঁহারই প্রেমে আবদ্ধ হইব যিনি আমাদিগের চিরকালের পিতা মাতা ও সুহৃৎ। এ প্রকার ভাব তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক থাকে। তিনি সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সংসারের সহস্র কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন ও অমৃত নিত্য প্রেমদাতার প্রেম-নয়নের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া স্থির ভাবে নির্ভীক চিত্তে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করেন। ধর্ম্মাত্মা সাধুদিগের জীবন এই বাক্য সমর্থন করিতেছে।

ধর্ম্মপরায়ণা এলিজেবেথ ফ্রাই নয়টী সন্তানের প্রসূতী হইয়াও সংসারাসক্ত হয়েন নাই। অথচ তাহাদিগের লালন পালন জন্য জননী-সুলভ স্নেহ ও যত্ন করিতেন। তিনি লোকহিতৈষণাপরায়ণা হইয়া প্রাণপণে লোকহিত সাধন করিতেন। তিনি পিতৃবিয়োগ ও প্রাণাধিক প্রিয়তর সন্তান বিয়োগে শোকে অভিভূত হইয়া অচিরে তৎশোক সম্বরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়িতা হইয়া নির্ভয়ে ইহলোক হইতে অবসৃতা হয়েন। তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার কোন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন যে "যে অবধি আমার অন্তরে ঈশ্বর-অনুরাগ প্রবেশ করিয়াছে সেই অবধি কি সুস্থ কি রুগ্ন শরীরে এইটী মনে না করিয়া আমি প্রতি দিন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করি নাই যে অদ্য কি প্রকারে আমি প্রভুর অনুমোদিত কার্য্য করিব" তৎপরে তিনি তাঁহার কোন পরিচারিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আমার দেহে যাতনা কিন্তু আমার আত্মাতে ভয় নাই। তৎপরে "হে প্রভো! তোমার দাসীকে সাহায্য ও রক্ষা কর" এই বলিয়া চির নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। যিনি আমরণ ঈশ্বরের সেবক হয়েন, ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহার মৃত্যুভয় কোথায়? সংসারের প্রতি মোহান্ধ হওয়াই মৃত্যু-ভয়ের কারণ। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিই সেই মোহ ভঞ্জনের মহৌষধ। সেই প্রীতিই যেন আমাদের আত্মার একমাত্র উপজীব্য হয়।

ব্যাখ্যানমঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্যের ব্যাখ্যান মূলক পদ্য।

ত্রয়োবিংশ ব্যাখ্যান।

তিনি প্রাণদাতা, তিনি পিতা পাতা, তিনি প্রভু সবাকার।
তিনিই সৃজন, পালন কারণ, সকলের মূলাধার॥
যাঁহার রচনা—শশি দিবাকর,
অযুত তারকা, ভূধর সাগর,
পতঙ্গ বিহঙ্গ যত জীবগণ,
ফলে ফুলে ধরা অতুল শোভন,
তিনিই সবার হয়েন কারণ,
তাঁর কার্য্যে ফেরে চরাচরগণ॥
তাঁহার নিয়মে ভ্রমে গ্রহ তারা।
অসীম আকাশে নহে পথহারা॥
রবি শশী করে কর বিতরণ।
মেঘ বর্ষে বারি, বহিছে পবন॥
তাঁহার শাসনে ঋতু আসে যায়।
গিরি হ'তে নদ নদী বেগে ধায়॥
তাঁহার ইচ্ছায় সবে ভ্রাম্যমাণ।
সে ইচ্ছা এখনো আছে বিদ্যমান॥
সে ইচ্ছার স্রোতে চলিছে ভুবন।
কতই মঙ্গল করিছে সাধন॥
তিনিই জাগ্রৎ জীবন্ত ঈশ্বর।
অসীম জগৎ ঘোষে নিরন্তর॥
"তাহার মহিমা অসীম অপার।
তাঁর দয়া প্রেম—অন্ত নাহি তার"॥

জগৎ যাঁহার আজ্ঞাধীনে রয়।
হে নর! তিনিই তোমার আশ্রয়॥
কি সৌভাগ্য তব ভেবে দেখ মনে।
রবে চির দিন তুমি যাঁর সনে॥
তিনিই তোমারে দেন অধিকার।
তাঁরে ভজিবার—তাঁরে সাধিবার॥
দেখ—অমৃতের পথের সোপান।
তিনি দয়া করি তোমারে দেখান॥
করিছেন কত অমৃত বর্ষণ।
বলিছেন কত অমিয় বচন॥
দেখ কৃপা তাঁর—কাতরে যে জন।
হৃদয়ে তাঁহারে ডাকে অনুক্ষণ॥
তাঁরে ছাড়া যবে চাহে না সে আর।
করয়ে তাঁহারে জীবনের সার॥
তবে তিনি তার বুঝিয়া হৃদয়।
আপনারে দান করেন নিশ্চয়॥
দাও তাঁরে সব হৃদয় তোমার।
পাবে প্রতিদান সহবাস তাঁর॥
প্রেমময় রূপে দিয়া দরশন।
করিবেন তব হৃদয় পূরণ॥

করিছেন তিনি তোমারে আহ্বান।
তাঁর পথে তুমি হও আগুয়ান॥
দেখিবে তাঁহার উৎসাহ জনন।
বরাভয়প্রদ প্রসন্ন বদন॥
তোমার যতন করিতে বর্দ্ধন।
পথের কণ্টক করি বিমোচন॥
দিবেন তোমারে আপন সুছায়।
অমৃতের বারি—স্বরগের বায়॥

এক মনে লও তাঁহার শরণ।
ঘুচাবেন তিনি ভবের বন্ধন॥
দেখ তিনি হ'ন অতুল বিভব।
তাঁর তুলনায় তুচ্ছ আর সব॥

ধন ধান্য আদি যা কিছু সংসারে।
তিনি ছাড়া তৃপ্তি কেবা দিতে পারে?
দেখ দেখ তাঁর প্রীতির নয়ন।
ভজ তাঁরে হবে সফল জীবন॥
কর তাঁর নাম হৃদয়ে সাধন।
হইবেন তিনি—হৃদি প্রিয়ধন॥
নয়ন-রঞ্জন—পরশ রতন।
পাপের দমন—দুঃখের হরণ॥

ভেবে দেখ কি সম্বন্ধ হয় তাঁর সনে।
মনুষ্য হইয়া তাহা পাল সযতনে।
তাঁরে করি শিরোধার্য্য, কর জীবনের কার্য্য,
টলোনা টলোনা আর মোহের ছলনে॥

খুলে দাও দাও তাঁরে হৃদয় দুয়ার।
প্রেম সত্য রূপ তাঁর ভাব অনিবার॥
আপনার আপনার, রেখোনা করোনা আর,
তাঁহার অধীন হও, ছাড় স্বেচ্ছাচার॥

স্বেচ্ছাচারে হয় নর প্রবৃত্তি অধীন।
পশুর সমান বুদ্ধি জ্ঞান ধর্ম্ম হীন।
আপনার প্রভু নয়, প্রবৃত্তির দাস হয়,
তার চেয়ে হতভাগ্য আছে কে বা দীন?

ঝটিকা যেমন করে নৌকারে মগন।
ইন্দ্রিয়ের পরবশ হয় যদি মন।
সেই মন প্রজ্ঞা হরে, সংসার তরঙ্গে মরে
ডোবাইয়া করে তার মৃত্যুর সাধন॥

পাপের দাসত্বে নর যে যাতনা পায়।
এক মুখে কভু তাহা বলা নাহি যায়।
পাপে দেহ ম্রিয়মাণ, কলুষিত মনঃ প্রাণ,
পাপ তেয়াগিতে সবে করহ উপায়॥

একা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হয় পাপ প্রশমন।
পাপের ঔষধ ইহা হয় অতুলন।
এ ধর্ম্মের যিনি প্রাণ পাপহারী ভগবান্,
শুভ মতি সাধকেরে দেন অনুক্ষণ॥

এ ধর্ম্মে স্বাধীন মোরা অবশ্য হইব।
প্রবৃত্তির দাস হয়ে আর না থাকিব।
আপনার প্রভু হয়ে, আপন জীবন লয়ে,
জীবন দাতার পদে উপহার দিব॥

রিপুর দাসত্ব হ'তে যে চাও নিস্তার।
চিত্তের সন্তোষ যেবা চাহ আপনার।
এ ধর্ম্ম আশ্রয় লও, স্বাধীন পবিত্র হও,
মিলিবে সে ধন যার তুল নাহি আর।

পূর্ব্বদিকে উদি যথা নবীন তপন।
চারিদিকে ক্রমে করে কর বিতরণ।
বঙ্গাচলে তথা আজি, ব্রাহ্মধর্ম্ম সুবিরাজি,
ধরাময় প্রকাশিবে কিরণ আপন।

বঙ্গভূমি সহে দুঃখ পর্ব্বত প্রমাণ।
ছেট মুখে রহে সদা বঙ্গের বয়ান।
ঘুচিবে বঙ্গের দুখ, হইবে বিপুল সুখ,
ব্রহ্ম নামে সবে যবে হবে এক প্রাণ॥

এদেশের দীন দশা দেখি দয়াময়,
বিনাশিতে নিদারুণ এর দুঃখ চয়।
দিলেন এ ধর্ম্ম ধন, কর তাহে সুরক্ষণ
এই ধর্ম্ম দিয়া বাঁধ সবার হৃদয়॥

এ ধর্ম্ম হৃদয়ে রাখ করিয়া যতন।
তাঁর কাছে শুভমতি করহ যাচন।
চাও তাঁরে দিব্য জ্ঞান, নূতন জীবন প্রাণ,
চাও তাঁর প্রেম মুখ করিতে দর্শন॥

তাঁহার প্রসাদ তিনি করিবেন দান।
তাঁর বলে করিবে তোমা বলীয়ান।
তাঁহার কবচ পরি, বিঘ্ন ভয় পরিহরি,
তাঁর কার্য্য সাধিবারে দাও মন প্রাণ॥

রক্ষ এই ধর্ম্মে, ইহা তোমারে রক্ষিবে।
দেহে বল মনে শান্তি ইহ মুক্তি দিবে।
কপটতা মলিনতা, যাবে পাপ কুটিলতা,
ধর্ম্মের পবিত্র মঞ্চে ক্রমে আরোহিবে।

শুধু মরতের ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম নয়।
দেবতারা এই ধর্ম্ম সেবেন নিশ্চয়॥
ব্রহ্মেতে মগন হয়ে, তাঁর প্রেম কার্য্য লয়ে
থাকেন স্বরগে দেব পুণ্যাত্মা নিচয়।

প্রার্থনা।

কবে নাথ! ব্রাহ্মধর্ম্ম হইবে বিস্তার।
কবে দ্বেষ মলিনতা যাবে হাহাকার।
তোমা পেয়ে সবে হবে আনন্দ মগন।
তব প্রেমে পাবে সবে নূতন জীবন।
কবে সবে মিলে নাথ! তোমারে ঘোষিবে।
ভক্তি প্রেম দিয়া তব চরণ পূজিবে।
প্রেম সত্য রূপে হৃদি তুমি দেখা দাও।
তোমার অরূপ রূপ মধুর দেখাও।
দাও তব সহবাস, তোমার স্মরণ।
আপনি আসিয়া কর হৃদয় পূরণ।

ইতি ত্রয়োবিংশ ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

গত আষাঢ় মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মতামত সম্বন্ধে একখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশ হইয়াছে। আমরা স্থানাভাব বশতঃ তৎসম্বন্ধে কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারি নাই। ফলত ঐ পত্রে এমন সকল মত ব্যক্ত হইয়াছে যে গুলি শাস্ত্র ও যুক্তির এককালে অধিকার বহির্ভূত। সুতরাং সে সকল কথার আলোচনা করা আমরা আবশ্যক বিবেচনা করি না। তবে এইটুকু বলা সঙ্গত যে যখন গোস্বামী বহুদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং তিনি স্বয়ং নৃসিংহমূর্ত্তি দেখিয়াছেন তখন তাঁহাকে আর কি বলিয়া ব্রাহ্ম বলিতে পারি। আর তিনি যে স্বমুখে ব্যক্ত করেন যে, তাঁহার বিশ্বাসানুরূপ ধর্ম্মই প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম এ কথাই বা কিরূপে সঙ্গত হয়। ফলত সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কর্ত্তা নিত্য নির্ব্বিকার নিরাকার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মে যাঁহার বিশ্বাস তিনিই ব্রাহ্ম। আর যিনি বহুদেবদেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং স্বয়ং নৃসিংহমূর্ত্তি দর্শন করেন তিনি ব্রাহ্ম নামেরই যোগ্য নহেন। ঈশ্বরের মূর্ত্তি নাই। তিনি অকায়মব্রণং। শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আত্মাতে সেই নিষ্কল অক্ষর ব্রহ্মকে দর্শন করিতে হয়। তিনি কোন ইন্দ্রিয়েরই গম্য নহেন। মন বুদ্ধিও তাঁহার নিকট পরাস্ত। আমাদের এই আত্মা তাঁহার অধিষ্ঠান ভূমি। নিজের কঠোর সাধনা ও ব্রহ্মকৃপায় এই আত্মাতে এক একবার সেই বিদ্যুৎপুরুষের স্ফূর্ত্তি অনুভব করা যায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম এত কাল এই কথাই ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন। যিনি ইহার বিরুদ্ধ বলেন এবং বিরুদ্ধ আচরণ করেন তিনি ব্রাহ্ম হইতে পারেন না। নৃসিংহ একটী পৌরাণিক অবতার। ব্রাহ্মধর্ম্মে অবতারবাদ নাই। এই অব-

তারবাদে যিনি বিশ্বাস করেন তিনি ঘোর পৌত্তলিক। তিনি স্বমুখে ব্রহ্মোপাসক ব্রাহ্ম বলিয়া আপনাকে প্রচার করিলেও লোকে আর তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না এবং তাঁহার প্রচারিত মতের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের যে কোনও যোগ আছে ইহাও কেহই স্বীকার করিবেন না।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে যাঁহারা গত ১৮০৯ শকের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার স্ব স্ব দেয় মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিতেছেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সঙ্গে বর্ত্তমান সনের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। এবং যাঁহাদের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল গত চৈত্র মাস পর্য্যন্ত নিঃশেষিত হইয়াছে তাঁহারা আর বিলম্ব না করিয়া বর্ত্তমান সনের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেণ্টের এমন কোন বিশেষ নিয়ম নাই যাহাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের নৈতিক উন্নতি হয়। বর্ত্তমান কালের ছাত্রেরা অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতেছে সত্য কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই নৈতিক জ্ঞান কিছু শিথিল দেখিতে পাওয়া যায়। আবার বঙ্গভাষায় এমন পুস্তকও কিরূপ যদ্দ্বারা ছাত্রদিগের এই মহৎ অভাবটী দূর হইতে পারে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা এই উপহার নামক ক্ষুদ্র পুস্তকখানি ছাত্রদিগকে বিনামূল্যে প্রদান করিবার সংকল্প করিয়াছি। ১৮০৮ শকে পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বদেশের নৈতিক ও সামাজিক সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে অমূল্য উপদেশ দেন এই পুস্তকে তাহাই মুদ্রিত হইল। কিরূপে সৎপুত্র হওয়া যায়, কিরূপে সৎপতি ও সৎগৃহী হওয়া যায় এবং কিরূপে ধর্ম্মশীল ও সাধু হওয়া যায় এই পুস্তকে সংক্ষেপে সেই সমস্ত উপদেশ আছে। ফলত ইহা একখানি বঙ্গভাষার উজ্জ্বল রত্ন। প্রতি গৃহস্থেরই ইহার এক এক খণ্ড রক্ষা করা আবশ্যক, আমরা এই আশয়ে বহুল পরিমাণে ইহা মুদ্রিত করিলাম। কলিকাতায় বিতরণ করিবার কোনই ব্যয় নাই। মফস্বলে প্রতি ৫ খণ্ড পুস্তকে ৵১০ সামান্য ডাক মাশুল লাগিবে। যাঁহাদের আবশ্যক হইবে আমার নিকট ডাক মাশুলসহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলেই পাইবেন।

৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন যোড়াসাঁকো কলিকাতা। } শ্রীনীলকমল মুখোপাধ্যায়।

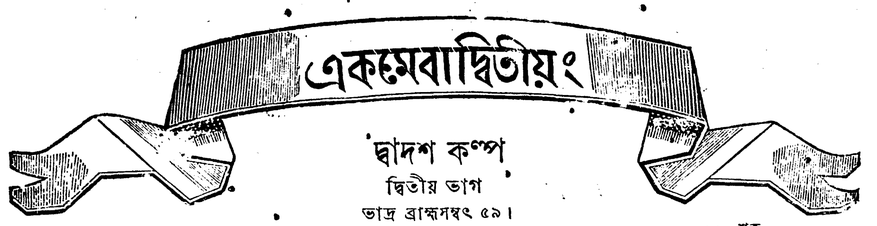

দ্বাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
ভাদ্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯।

৫৪১ সংখ্যা ১৮১০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্, সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব।

সিদ্ধান্ত ॥ ৯ ॥

অহম্পদার্থ বা আত্মা স্বতঃ কোন জ্ঞানেই উপলব্ধি-গম্য নহে। স্বতঃ—অর্থাৎ বিশেষ কোন-কিছুর সহিত—বাহিরের কোন বস্তুর সহিত কিম্বা অন্তরের কোন ভাবনার সহিত—সম্পর্ক না রাখিয়া একাকী। উহা বিশেষ কোন-না-কোন আন্তরিক অবস্থার সহিত অথবা বিশেষ কোন না কোন বহির্বস্তুর সহিত—আত্মেতর কোন-না-কোন-কিছুর সহিত—সম্পৃক্ত ভাবেই আপনাকে আপনি উপলব্ধি করিতে পারে।

প্রমাণ।

অহম্পদার্থ সকল-জ্ঞানেরই সার্ব্বভৌমিক অবয়ব (৪ সিদ্ধান্ত দেখ)। কিন্তু জ্ঞান-মাত্রেরই একদিকে যেমন সার্ব্বভৌমিক অবয়ব থাকা চাই, আর একদিকে তেমনি বিশেষ-অবয়বও থাকা চাই; তা ভিন্ন—বিশেষ হইতে পৃথক্কৃত সার্ব্বভৌমিক অবয়বের অথবা সার্ব্বভৌমিক হইতে পৃথক্কৃত বিশেষ অবয়বের কোন জ্ঞানই সম্ভবে না (৩ সিদ্ধান্ত দেখ)। অতএব অহম্পদার্থ বা আত্মা স্বতঃ কোন জ্ঞানেই উপলব্ধি-গম্য নহে। অন্তরের বিশেষ কোন অবস্থার সহিতই হউক্, আর, বাহিরের বিশেষ কোন বস্তুর সহিতই হউক্, বিশেষ কোন-না-কিছুর সহিত সম্পৃক্ত ভাবেই জ্ঞাতা আপনাকে আপনি উপলব্ধি করিতে পারে।

মন্তব্য এবং ব্যাখ্যান।

প্রথম সিদ্ধান্তের সহিত বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের তুলনা ॥ ১ ॥

প্রথম সিদ্ধান্ত বলিতেছে যে, আত্ম-জ্ঞান-ব্যতিরেকে আত্মেতর-জ্ঞান সম্ভবে না; বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত বলিতেছে যে, আত্মেতর-জ্ঞান ব্যতিরেকে আত্ম-জ্ঞান সম্ভবে না। ইহার প্রতি অনেকে অনেক প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন, অতএব ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলা আবশ্যক।

প্রথম আপত্তি ॥ ২ ॥

"আত্মজ্ঞান আত্মেতর জ্ঞানের সম্বন্ধ-সাপেক্ষ" এ কথা বলিলে তাহাতে কি এইরূপ বুঝায় না যে, প্রথম সিদ্ধান্তে

BLEED THROUGH.

যাহা জ্ঞানের একমাত্র মূল নিয়ম বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা—বাস্তবিক—জ্ঞানের একমাত্র মূল নিয়ম নহে? কেননা প্রথম সিদ্ধান্তে যেমন দেখা গিয়াছে যে, "আত্মেতর-জ্ঞান আত্ম-জ্ঞানের সঙ্গ-সাপেক্ষ" এইটিই জ্ঞানের একমাত্র মূল নিয়ম—বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে তেমনি পাওয়া যাইতেছে যে, ঐটিই যে জ্ঞানের একমাত্র মূল নিয়ম তাহা নহে; তদ্ভিন্ন জ্ঞানের আর একটি মূল নিয়ম এই যে, আত্ম-জ্ঞান আত্মেতর-জ্ঞানের সঙ্গ-সাপেক্ষ। আত্মেতর-জ্ঞান যেমন আত্মজ্ঞানের সঙ্গাধীন, আত্মজ্ঞানও যদি তেমনি আত্মেতর-জ্ঞানের সঙ্গাধীন হয়, তবে দুইটি নিয়মের একটিই বা বড় কিসে—অন্যটিই বা ছোট কিসে? দুয়েরই তো পদবী অবিকল সমান। তবে আর কেমন করিয়া বলি যে, প্রথম নিয়মটিই শিরঃস্থানীয় ও দ্বিতীয় নিয়মটি তাহা অপেক্ষা নিম্নস্থানীয়।

আপত্তি-খণ্ডন ॥ ৩ ॥

তাহাতে কোন দোষ নাই; আপাততঃ যাহা গোলোযোগের মতো দেখাইতেছে—অনতি-পরেই তাহা দিব্য পরিষ্কার বেশে দেখা দিবে। প্রথম সিদ্ধান্তে যে নিয়মটি স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই প্রধান পদবীর উপযুক্ত; কেননা তাহা এমনি একটি অবশ্য-জ্ঞেয় বস্তুর নাম নির্দ্দেশ করিতেছে—যাহাকে না জানিয়া অন্য কোন-কিছুকেই জানা সম্ভবে না; কি? না অহম্পদার্থ। পক্ষান্তরে, বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত বলিতেছে বটে যে, আপনাকে জানিতে হইলে তাহার সঙ্গে অন্য কোন-না-কোন-কিছু জানা আবশ্যক, কিন্তু সেই যে "কোন-না-কোন-কিছু" তাহা যে, কি, তাহার নাম নির্দ্দেশ করিতেছে না—কেমন করিয়াই বা করিবে? জ্ঞানের বিশেষাত্মক অবয়ব-সকল দেশ-ভেদে বিভিন্ন, কাল-ভেদে বিভিন্ন, পাত্র-ভেদে বিভিন্ন, তাহা নিতান্তই অনির্দ্দেশ্য। অতএব প্রথম সিদ্ধান্ত এবং বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত, দুইই যদিচ সুনিশ্চিত সত্য, তথাপি প্রথম সিদ্ধান্তের প্রদর্শিত জ্ঞানের নিয়মটি প্রধান পদবীর উপযুক্ত, তাহাতে আর ভুল নাই। বস্তু অসংখ্য—তাহার মধ্যে যে-কোনটিকেই হউক্ আর যতগুলিকেই হউক্ জানিতে হইলে তাহার সঙ্গে যখন একই অদ্বিতীয় বস্তুকে—আপনাকে—জানা আবশ্যক, তখন এই নিয়ম অগ্রে, না আপনাকে জানিতে হইলে সেই অসংখ্য বস্তুর যে-টি হউক্ একটিকে জানা আবশ্যক—এই নিয়ম অগ্রে? অবশ্য—দুইই সমান সত্য, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নিয়মটিই প্রধান আসন পাইবার যোগ্য ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। অপিচ, তত্ত্বজ্ঞানের প্রথম প্রশ্ন এই যে, জ্ঞানের অদ্বিতীয় এমন একটি মূল উপাদান কি, যাহাকে না জানিয়া অন্য কোন বস্তুকেই জানা যাইতে পারে না? ইহার উত্তর এই যে অহম্পদার্থ। কিন্তু যদি প্রশ্নটি ওরূপ না হইয়া এইরূপ হইত যে, জ্ঞানের অদ্বিতীয় এমন একটি মূল উপাদান কি যাহাকে না জানিয়া আপনাকে জানা যাইতে পারে না? তবে এরূপ প্রশ্ন নিতান্তই অর্থ-শূন্য; কেননা আত্মেতর বস্তু-সকলের একটিও এরূপ অবশ্য-জ্ঞেয় নহে যে, আপনাকে জানিতে হইলে সেইটিকে না জানিলেই নয়। প্রথম সিদ্ধান্তের সহিত বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের যে কিরূপ সম্বন্ধ, আর, কিসেই বা প্রথম সিদ্ধান্ত প্রধান পদবীর উপযুক্ত, তাহা এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে; তাহা এই যে, প্রথম সিদ্ধান্ত যাহাকে জ্ঞানের মূল উপাদান বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা সুনির্দ্দিষ্ট একটি-মাত্র বস্তু—আত্মা; আর, বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত যাহাকে জ্ঞানের অপর উপাদান বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা অনির্দ্দিষ্ট কোন-না-কোন বস্তু—অনাত্মা; অনাত্মা বলিতে সুনির্দ্দিষ্ট একটি-মাত্র কোন বস্তু বুঝায় না।

দ্বিতীয় আপত্তি এবং তাহার খণ্ডন ॥ ৪ ॥

এ যেমন সত্য যে, জড়-বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান-মাত্রই, সংক্ষেপে—ভৌতিক-জ্ঞান মাত্রই, আত্মজ্ঞান-সাপেক্ষ; এটাও কি তেমনি সত্য যে, আত্মজ্ঞান-মাত্রই ভৌতিক জ্ঞান-সাপেক্ষ? না, সেরূপ কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। আপনাকে জানিতে হইলে তাহার সঙ্গে বিশেষ কোন-না-কোন কিছু জানা নিতান্তই আবশ্যক—এইমাত্র; কিন্তু সেই যে "বিশেষ কোন-না-কোন কিছু" তাহা ভৌতিক বস্তু না হইয়া আর কোন-কিছু হইলেও হইতে পারে—মানসিক ভাব-বিশেষ বা অবস্থা-বিশেষ হইতে পারে। পাছে কেহ মনে করেন যে, "ভৌতিক জ্ঞান ব্যতিরেকে আত্ম-জ্ঞান সম্ভবে না" এইটি প্রতিপাদন করাই আমাদের মনোগত অভিপ্রায়, এইজন্য আমরা চতুর্থ সিদ্ধান্তেও বলিয়াছি এবং এখানেও বলিতেছি যে, তাহা নহে; আত্ম-জ্ঞানের পক্ষে যাহা নিতান্ত নহিলে নয় তাহা শুদ্ধ কেবল জ্ঞানের কোন-না কোন প্রকার বিশেষ অবয়বের উপলব্ধি; এ নিয়মটি সাধারণতঃ সকল জ্ঞানের সম্বন্ধেই খাটে। কিন্তু জ্ঞানের সেই যে বিশেষ অবয়ব তাহা ভৌতিক বস্তু না হইয়া একটা মানসিক কল্পনা (যেমন পক্ষীরাজ ঘোড়া) অথবা একটা মানসিক অবস্থা (যেমন মনের স্ফূর্ত্তি, আলস্য, ইত্যাদি) অথবা একটা মানসিক অনুভূতি (যেমন সুখ দুঃখ) হইতে না পারে এমন নহে। অতএব এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নাই যে, আপনাকে জানিতে হইলে তাহার সঙ্গে কোন-না-কোন ভৌতিক বস্তুকে না জানিলেই নয়। আমরা যখন একটিও-কোন ভৌতিক বস্তুকে জানিতেছি না, তখনও আমরা আমাদের মানসিক অবস্থা-বিশেষের জ্ঞাতা বলিয়া সচ্ছন্দে আপনাকে আপনি উপলব্ধি করিতে পারি।

ডেবিড্ হিউমের মত ॥ ৫ ॥

ডেবিড্ হিউম্ তাঁহার মানব-প্রকৃতি বিষয়ক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, "আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে যখনই আমি আপনার অভ্যন্তরে তদ্গত ভাবে অভিনিবিষ্ট হই, তখনই আমি বিশেষ কোন-না কোন প্রকার অনুভূতিতে সহসা আটক পড়িয়া যাই—যেমন শীতোষ্ণ—আলোক অন্ধকার—রাগ-দ্বেষ—সুখ দুঃখ—ইত্যাদি। বৃত্তি-হীন অবিকৃত অবস্থায় একবারও আমি আপনি আপনার অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা দিই না।" হিউম্ এ যাহা বলিয়াছেন—ঠিক্ই বলিয়াছেন। বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত ঐ কথাই বলিতেছে। কিন্তু হিউম্ আর একটি কথা যাহা বলেন—সেটি বড় গোলোযোগের কথা। তিনি বলেন যে, তাঁহার প্রত্যক্ষ এবং অনুভূতি প্রভৃতি বৃত্তি-সকল যাহা তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়, তাহা অহং-বর্জ্জিতরূপেই—আত্ম-বর্জ্জিতরূপেই—প্রতিভাত হয়। তিনি বলেন যে, "প্রত্যক্ষাদি বিশেষ বিশেষ মনোবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই আমি আপনার অভ্যন্তরে দেখিতে পাই না।" তবেই হইতেছে যে, প্রত্যক্ষাদি মনোবৃত্তি আমারও নহে এবং আর কাহারো নহে। ইহার ন্যায় দ্বিতীয় এমন একটি গায়ের জোরের কথা তত্ত্বজ্ঞান-

ক্ষেত্রে মেলা ভার। মনুষ্য আপনাকে অবিশিষ্ট অবস্থায়—অর্থাৎ বিশেষ কোন কিছু দ্বারা অনুপরক্ত অবস্থায়—উপলব্ধি করিতে পারে না, এই যথার্থ কথাটির উদ্গীরণে ক্ষান্ত না থাকিয়া হিউম্ আরো এই বলেন যে, মনুষ্য আদবেই আপনাকে আপনি উপলব্ধি করিতে পারে না। এটা বৈশিষ্ট্যবাদের আত্যন্তিক বাড়াবাড়ি। হিউমের দার্শনিক আলোচনা অনেক তত্ত্বজ্ঞানীর চক্ষের বিষ; অথচ হিউমের প্রতিবাদ করিতে গিয়া তাঁহারা হিউমের ঐ কথাটিই উল্টিয়া পাল্টিয়া বলিয়াছেন; তাঁহাদের প্রতিবাদ আর কিছু নয়—হিউম্ যাহা স্পষ্ট-বাক্যে বলিয়াছেন, তাহাই তাঁহারা অতীব অস্পষ্ট এবং সন্দিগ্ধ বচনে ঘোর-ফের করিয়া বলিয়াছেন—এই মাত্র।

বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য ॥ ৬ ॥

বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের সার মর্ম্ম আর কিছু নয়—শুদ্ধ কেবল এই যে, আপনাকে জানিতে হইলে আপনাকে বিশেষ কোন-একটা অবস্থায় অবস্থিত বলিয়া জানা চাই; তা সে—যে অবস্থাই হউক্ না, আর, যে কোন-প্রকারেই তাহা সংঘটিত হউক্ না—তাহাতে কিছুই আইসে যায় না, একটা কোন অবস্থায় অবস্থিত বলিয়া জানিলেই হইল। এ সিদ্ধান্তটি জ্ঞানের একটি অবশ্যম্ভাবী সত্য। জ্ঞাতা কোন একটিও বিশেষ অবস্থায় দণ্ডায়মান না হইয়া আপনাকে আপনি জানিতে পারে—এরূপ মনে করাই ভ্রম। কেননা, জ্ঞাতা আপনার কোন অবস্থাতেই আপনাকে উপলব্ধি করিতেছে না অথচ আপনাকে উপলব্ধি করিতেছে, উপলব্ধি করিতেছে না অথচ উপলব্ধি করিতেছে, ইহা কত বড় একটা স্ববিরোধী কথা!

জ্ঞাতা আপনার কোন-না-কোন বিশেষ অবস্থাতে আপনাকে উপলব্ধি করে বটে, কিন্তু সেই বিশেষ অবস্থা বলিয়া আপনাকে উপলব্ধি করে না ॥ ৭ ॥

"জ্ঞাতা আপনার কোন-না-কোন বিশেষ অবস্থাতেই, বা কোন-না-কোন বিশেষ অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই, আপনাকে উপলব্ধি করে" এ কথার অর্থ কেহ যেন এরূপ না বোঝেন যে, জ্ঞাতা আপনাকে আপনার কোন-একটি বিশেষ অবস্থা বলিয়া উপলব্ধি করে। এরূপ সিদ্ধান্ত পূর্ব্বেরই ন্যায় স্ববিরোধী। "আত্মাকে তাহার কোন অবস্থাতেই জানিতেছি না, অথচ আত্মাকে জানিতেছি" এটা যেমন অসঙ্গত, "আত্মাকে তাহার কোন-একটি অবস্থা-বিশেষ বলিয়া জানিতেছি" এটাও তেমনি অসঙ্গত। কেননা, আত্মা যদি আপনাকে আপনার বিশেষ কোন-একটি অবস্থা বলিয়া জানিতে বাধ্য হইত, তবে সে অবস্থা-ব্যতিরেকে আর-কোন অবস্থাতেই আত্মা আপনাকে আপনি জানিতে সমর্থ হইত না; কাজেই আত্মার জ্ঞান-বৈচিত্র্য ও ধ্যান-বৈচিত্র্যের দ্বার একেবারেই অবরুদ্ধ হইয়া যাইত, এবং বৈচিত্র্য-বিরহে তাহার জ্ঞান সমূলে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। তাহা হইলে ফলে এইরূপ দাঁড়াইত যে, অহম্পদার্থ আপনার সকল অবস্থার সাধারণ কেন্দ্র নহে—অহম্পদার্থ বিশেষ-একটি অবস্থা মাত্রেই পর্য্যবসিত; তবেই হইল যে, সামান্যের সহিত সম্পর্ক-রহিত বিশেষ—জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য; কিন্তু ইহা যে, কত বড় একটা স্ববিরোধী কথা তাহা তৃতীয় সিদ্ধান্তের অকাট্য যুক্তির বলে এখন আর কাহারো জানিতে বাকি নাই। এটা যদিও সুনিশ্চিত যে, আত্মা আপনার কোন-না-কোন প্রকার বিশেষ অবস্থাতেই আপনাকে আপনি উপলব্ধি করে; কিন্তু তাহা বলিয়া এটা ঠিক্ নহে যে, আত্মা আপনাকে আপনার সেই বিশেষ অবস্থা বলিয়া, অথবা, বিশেষ বিশেষ নানা অবস্থার সমষ্টি বলিয়া; উপলব্ধি করে। জ্ঞাতা আপনাকে আপনার সমস্ত অবস্থা হইতে ভিন্ন বলিয়াই উপলব্ধি করে—এমনি একটি সার্ব্বভৌমিক পদার্থ বলিয়া উপলব্ধি করে যাহা।—কি সম্মুখ-স্থিত পরিবর্ত্তনশীল বস্তু-সমূহ—কি অন্তরস্থিত পরিবর্ত্তন-শীল ভাবনা-সমূহ, সমস্তেরই মধ্যে, স্বয়ং অটল এবং অবিচ্যুত-রূপে দণ্ডায়মান। আত্মাকে তাহার বিশেষ বিশেষ অবস্থার অভ্যন্তরে জানা স্বতন্ত্র, আর, আত্মাকে তাহার বিশেষ বিশেষ অবস্থা বলিয়া জানা স্বতন্ত্র; এ দুই কথার প্রভেদের প্রতি দৃষ্টি না করাতেই হিউম্ উপরি-উক্ত ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন; আর, অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞেরাও (বিশেষতঃ ব্রাউন্) আপনাদের দার্শনিক নৌকাকে ঐ প্রকার অনবধানতার গুপ্ত-শৈলে নিপাতিত করিয়া ভ্রান্তি-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। মনোবিজ্ঞানের একটি সর্ব্বোচ্চ ভ্রম-সিদ্ধান্ত এই যে, আত্মা শুদ্ধ কেবল আপনার পরিবর্ত্তনশীল বিশেষাত্মক বৃত্তিগুলিই জ্ঞানে উপলব্ধি করে; আর, আপনাকে আপনার সেই সকল বৃত্তির প্রবাহ-রূপেই উপলব্ধি করে।

নবম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত ॥ ৮ ॥

অহম্পদার্থ স্বতঃ—সর্ব্বতোভাবে এবং সর্ব্বসাধারণতঃ জ্ঞানের অগম্য নহে। আমরা যে, আমাদের আত্মাকে বিশুদ্ধ কৈবল্য অবস্থায় উপলব্ধি করি না, সে কেবল আমাদের মনোবৃত্তির অপূর্ণতা-নিবন্ধন; কিন্তু যোগী মহাপুরুষেরা—যাঁহাদের জ্ঞান আমাদের ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে তাঁহারা—স্ব স্ব আত্মাকে সর্ব্বাবস্থা-বিনির্মুক্তরূপে উপলব্ধি করিলেও করিতে পারেন।

দ্বিবিধ ভ্রম ॥ ৯ ॥

প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের এই মতটি যদিচ লৌকিক চিন্তায় তেমন দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হয় নাই, কিন্তু মনোবিজ্ঞান ঐ মতটিকে প্রশ্রয় দান করিয়া বাড়াইয়া তুলিতে একটুও ত্রুটি করেন নাই; এমন কি—অনেক স্থলে উহাকে অবশ্য-গ্রাহ্য বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু আশয়-ভ্রষ্ট বিষয়ই বলো, আর, অবস্থা-ভ্রষ্ট আত্মাই বলো—তাহা যে, কি কারণে আমাদের জ্ঞানাতীত, মনোবিজ্ঞান তাহার প্রকৃত তত্ত্বটি বুঝিতে না পারিয়া তাহার একটা কৃত্রিম সিদ্ধান্ত গড়িয়া তুলিতে গিয়াছেন—এইটিই তাঁহার ভ্রমের মূল। মনোবিজ্ঞানের ভ্রম দ্বিবিধ। প্রথম; জ্ঞানের প্রধান যে-একটি নিয়ম—যাহা সকল জ্ঞানের পক্ষেই সমান বলবৎ—মনোবিজ্ঞান তাহা দেখিয়াও দেখেন না; তাহা এই যে, কোন জ্ঞাতাই আপনাকে সর্ব্বাবস্থা-বিনির্মুক্ত-রূপে জ্ঞানে উপলব্ধি করিতে পারে না। দ্বিতীয়; ঐরূপ অসাধ্য-সাধনে কেন যে আমরা অপারগ তাহার কারণ তিনি এই দেখান্ যে, আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি সীমাবদ্ধ বলিয়া আমরা তাহা পারিয়া উঠি না, এ নহে যে, উপরি উক্তি নিয়মটি সকল-জ্ঞানের পক্ষেই অনতিক্রমণীয় বলিয়া আমরা তাহা পারিয়া উঠি না। আমাদের জ্ঞান খুবই অপূর্ণ তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই, কিন্তু তাহা বলিয়া—জ্ঞান আপনার মূল নিয়ম আপনি উল্টাইতে পারে না—আপনি আপনার মূলোচ্ছেদ করিতে পারে না—এটা কিছু আর জ্ঞানের অপূর্ণতার লক্ষণ নহে; যে নিয়মটির উপরে জ্ঞানের জ্ঞানত্ব নির্ভর করিতেছে তাহার অপরি-

হার্য্যতাকে জ্ঞানের অপূর্ণতা বলিয়া দোষ দেওয়া কোন-প্রকারেই বিধেয় নহে। জ্ঞানের এটা একটা অখণ্ডনীয় নিয়ম যে,যে-কোন জ্ঞান হউক্ না কেন তাহার সার্ব্বভৌমিক অবয়বটি স্বতঃ (অর্থাৎ কোন না কোন বিশেষ অবয়বের সহিত সম্বন্ধ ব্যতিরেকে স্বতন্ত্ররূপে) কোন প্রকারেই কাহারো উপলব্ধি-গম্য নহে (৪ সিদ্ধান্ত দেখ)। এ নিয়মটি জ্ঞানের একটি অবশ্যম্ভাবী সত্য, এবং বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত ইহারই উপরে প্রতিষ্ঠিত।

তত্ত্ব-শব্দের ঐতিহাসিক বিবরণ ॥ ১০ ॥

আত্মার "নিগূঢ় তত্ত্ব" সম্বন্ধে নানা প্রকার অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তি যাহা তত্ত্বালোচনার ইতিবৃত্তে সময়ে সময়ে দেখা দিয়াছে, এই স্থানটি তাহার পর্য্যালোচনার সবিশেষ উপযোগী। তত্ত্ব-শব্দের অর্থ পুরাকালে একরূপ ছিল, এখন আর-একরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে, কোন বস্তুর তত্ত্ব বলিতে বস্তুটির মর্ম্মস্থানীয় এমনি একটি অবয়ব বুঝাইত যাহা তাহার অপরাপর সমস্ত অবয়বের উপর জ্ঞানালোক ছট্‌কাইবার মূলাধার। পূর্ব্বে উহা ছিল—আলোকের বীজ, জ্ঞাতব্য বস্তুর প্রকৃত অভিজ্ঞান। তত্ত্ব—কিনা যে বস্তু যাহা সেই বস্তুর তাহাত্ব, অর্থাৎ যাহা দৃষ্টে নানা বস্তুর মধ্য-হইতে সেই বস্তুটিকে ঠিক্‌ঠাক্ চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুতরাং তখনকার মতানুসারে, যে বস্তুর যে অবয়বটি বিশিষ্ট-রূপে জ্ঞানাস্পদ এবং ধ্যানাস্পদ, তাহাই সেই বস্তুর তত্ত্ব। এখনকার মতানুসারে, তত্ত্বশব্দের অর্থ ঠিক্ তাহার বিপরীত। এখন কার কালে "নিগূঢ় তত্ত্ব" বলিতে বস্তুর এমনি একটি অবয়ব বুঝায়, যাহার নিজেরও কোন আলোক নাই এবং যাহার উপর অন্যত্র-হইতেও আলোক নিক্ষিপ্ত হইতে পারে না। এখনকার কালের "নিগূঢ়তত্ত্ব" অন্ধকারের আড্ডা; উহা বস্তু সকলের এমনি একটি কাল্পনিক অবয়ব যেখানে জ্ঞানেরও প্রবেশ নিষেধ—ধ্যানেরও প্রবেশ নিষেধ। এখনকার মতানুসারে যাহা একেবারেই জ্ঞানের অগোচর এবং ধ্যানের অগোচর তাহাই প্রকৃত তত্ত্ব। পরে প্রকাশ পাইবে যে, পূর্ব্বতন কালের আরো অনেকগুলি শব্দের অর্থ এইরূপ ঘাঁটিয়া ঘুঁটিয়া লণ্ড ভণ্ড করা হইয়াছে।

অর্থ-বিপর্য্যয়ের ফল ॥ ১১ ॥

কোন-একটি দার্শনিক শব্দকে নূতন অর্থে প্রয়োগ করিতে হইলে, তাহার অর্থ পূর্ব্বে কি ছিল তাহা ভাল করিয়া জানিয়া শুনিয়া এবং তাহার সেই পূর্ব্বতন অর্থের সহিত তাহার আধুনিক অর্থের প্রভেদ কিরূপ তাহার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া—আধুনিক অর্থে সেই শব্দ প্রয়োগ করিলে তাহাতে কোন দোষ হয় না। কিন্তু "তত্ত্ব"এ শব্দটির সম্বন্ধে সেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা হয় নাই। মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, তত্ত্ব-শব্দের অর্থ তাঁহারা যেরূপ বোঝেন, পূর্ব্বতন আচার্য্যেরাও সেইরূপ বুঝিতেন; এই কারণ-বশত পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের নামে এইরূপ একটা মিথ্যা অপবাদ রটিয়া গিয়াছে যে, তাঁহারা মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য তমসাচ্ছন্ন বিষয়-সকলেরই আলোচনায় অষ্টপ্রহর নিযুক্ত থাকিতেন। এরূপ অমূলক অপবাদ দ্বিতীয় একটি খুঁজিয়া পাওয়া ভার। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা নিগূঢ় তত্ত্বের অনুসন্ধানেই বৃথা কাল-ক্ষেপ করিতেন; আর, সে কাল অপেক্ষা এ কাল নাকি বিদ্যা বুদ্ধিতে অগ্রগণ্য—তাই নব্য দার্শনিকেরা স্থির-স্থা করিয়া বসিয়া আছেন যে, পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের তত্ত্বানুশীলন—আগা গোড়া সমস্তই পাগলামি, কেননা নিগূঢ় তত্ত্ব মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত। তোমরা যাহাকে তত্ত্ব বলিতেছ তাহা ঐরূপই বটে, কিন্তু পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা যাহাকে তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহা আর-এক প্রকার। তাঁহাদের মতানুসারে, বস্তুর সেই অংশটিই তত্ত্ব-শব্দের বাচ্য যাহা সুস্পষ্ট-রূপে মনোমধ্যে ধারণা-যোগ্য; তোমাদের নব্য মতানুসারে বস্তুর সেই অংশটিই কেবল তত্ত্বশব্দের বাচ্য, যাহার কোন ভাবই কাহারো জ্ঞানাভ্যন্তরে স্থান পাইতে পারে না। পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের শব্দের অর্থ তুমিই উল্টাইয়া দিয়া একটা বিপরীত কাণ্ড করিয়া তুলিতেছ—তাঁহাদের পরিষ্কার আলোক নিভাইয়া দিয়া দিক্‌বিদিক্ অন্ধকার করিয়া দিতেছ, আবার তুমিই বলিতেছ যে, তাঁহারা তমসাচ্ছন্ন বোধাতীত বিষয় সকলের আলোচনায় সময় নষ্ট করিতেন। অপরাধ—তোমার না তাঁহাদের? তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় তোমার স্বকপোল-কল্পিত উল্টা অর্থেই তমসাচ্ছন্ন ও বোধাতীত, কিন্তু তাঁহাদের অভিপ্রেত সোজা অর্থে তাহা তমসাচ্ছন্নও নহে—বোধাতীতও নহে।

উল্টা অর্থের ফল ॥ ১২ ॥

উল্টা অর্থটিকে শুদ্ধ যদি কেবল একটা নূতন নামকরণ বলিয়া ধরা যায়, তবুও সেরূপ অর্থ-পরিবর্ত্তন করা—কাজটা ভাল হয় নাই। একটা গোলমেলে এবং অলীক দার্শনিক মতের প্রচার ভিন্ন উহাতে করিয়া আর কোন ফলই লভ্য হইতে পারে না। এখনকার কালে বিষয়-ভ্রষ্ট, অব্যহা-ভ্রষ্ট, জ্ঞান-বহির্ভূত আত্মা, এবং আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব, এ দুই কথা একই অর্থে পরিগৃহীত হইয়া থাকে; আত্মার অব্যক্ত ভিত্তিমূল জ্ঞাপন করিবার অভিপ্রায়ে মনোবিজ্ঞান ঐ দুই কথা নির্ব্বিশেষে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বিষয়ভ্রষ্ট আত্মা যে একান্তপক্ষেই জ্ঞান-বহির্ভূত এবং অচিন্তনীয়, এ বিষয়ে আর সংশয় মাত্র নাই; যদিচ মনোবিজ্ঞানী যে কারণে তাহাকে অচিন্তনীয় বলেন, আমরা তাহাকে সে কারণে অচিন্তনীয় বলি না—আমরা তাহাকে আর এক কারণে অচিন্তনীয় বলি। মনোবিজ্ঞানী বলেন যে, আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ—এই জন্য জ্ঞান-বহির্ভূত আত্মা আমাদের জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে; আমরা বলি যে, জ্ঞানের নিয়মই এই যে,জ্ঞান-বহির্ভূত আত্মা কাহারো জ্ঞানেই উপলব্ধি-গম্য নহে—কোন জ্ঞানেই উপলব্ধি-গম্য নহে; বক্র ঋজু-রেখা যেমন কোন জ্ঞানেই উপলব্ধি-গম্য নহে—জ্ঞান-বহির্ভূত আত্মা সেইরূপ কোন জ্ঞানেই উপলব্ধি-গম্য নহে। আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞানবহির্ভূতও নহে অচিন্তনীয়ও নহে—তাহা খুবই চিন্তনীয়। আত্মা যাহা কিছু জানে তাহারই সঙ্গে আত্মজ্ঞান অবিচ্ছেদে স্ফূর্ত্তি পায়, এবং সেই আত্মজ্ঞানই আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব; কেন না আত্মজ্ঞানেই আত্মার আত্মত্ব। আত্মজ্ঞান চলিয়া গেলে আত্মাও চলিয়া যায়, আত্মজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে আত্মাও ফিরিয়া আসে। অতএব আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞান-বহির্ভূত হওয়া দূরে থাকুক্—তাহা আত্মজ্ঞান স্বয়ং; তাহা অচিন্তনীয় হওয়া দূরে থাকুক, তাহা চিন্তার ধ্রুব তারা।"

বিষয়-ভ্রষ্ট আত্মা স্ববিরোধী ॥ ১৩ ॥

ইহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, সপ্তম সিদ্ধান্তে যেমন আশয়-ভ্রষ্ট জড়-বস্তু, বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে সেইরূপ বিষয়-ভ্রষ্ট আত্মা—দুইই স্ববিরোধীর কোটায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; দুয়ের কোন-টিই

কাহারো জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে। দুইই যদিচ স্ববিরোধী, কিন্তু দুয়ের মধ্যে বিশেষ একটু প্রভেদ আছে—তাহা এই যে, আপনার বিরোধ ভঞ্জনের শক্তি, অর্থাৎ স্ববিরোধের অন্ধকূপ হইতে আপনাকে জ্ঞান-রাজ্যে উত্তোলন করিবার শক্তি, আত্মার আপনার অভ্যন্তরেই বর্ত্তমান। আত্মা আপনার ইচ্ছা-শক্তি দ্বারা আপনাকে বিশেষিত করিতে পারে অর্থাৎ আপন ইচ্ছায় বিশেষ কোন-না-কোন বিষয় মানস-ক্ষেত্রে উদ্ভাবন করিতে পারে। কিন্তু জড়বস্তু স্ববিরোধের ঘুমের ঘোরে এরূপ মন্ত্রাহত হইয়া রহিয়াছে যে, তাহা ভঞ্জন করা তাহার নিজের সাধ্যাতীত; তাহার ভঞ্জনের জন্য তাহাকে আত্মার দ্বারস্থ হইতে হয়। এ প্রভেদটি সামান্য প্রভেদ নহে,—ইহাতে করিয়া আশয়-ভ্রষ্ট জড় বস্তু অপেক্ষা বিষয়-ভ্রষ্ট আত্মার অসীম শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইতেছে—যদিচ দুইই স্ববিরোধী।

ব্যক্তিত্ব ॥ ১৪ ॥

অহম্পদার্থ (যাহা জ্ঞানের সর্ব্বসাধারণ অবয়ব) এবং বহির্বস্তু বা মানসিক অবস্থা বা আর কোন-কিছু (যাহা জ্ঞানের বিশেষ অবয়ব) এই দুয়ের সঙ্ঘাতেই ব্যক্তির-ব্যক্তিত্ব। জর্ম্মান দেশীয় তত্ত্ববিৎ লাইব্‌নিট্‌জ ইহাকেই অণুক (Monad) নামে সংজ্ঞিত করিয়াছেন; অণুক—অর্থাৎ অখণ্ড মৌলিক বস্তু। এইরূপ মৌলিক বস্তু সার্ব্বভৌমিকত্ব এবং বিশেষত্ব এই দুয়ের সংঘাত। আত্মা এবং তাহার বৃত্তি-প্রবাহ দুয়ে মিলিয়া জ্ঞান-সমক্ষে যে একটি সমগ্র বস্তু দাঁড়ায়—তাহাই ব্যক্তি-শব্দের বাচ্য। কেননা জ্ঞাতাকে ছাড়িয়া জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ বৃত্তি ব্যক্তি-যোগ্য (অর্থাৎ জ্ঞানে প্রকাশ-যোগ্য) নহে; আবার, জ্ঞানের বিশেষ বৃত্তি-সকলকে সমূলে পরিত্যাগ করিয়াও জ্ঞাতা ব্যক্তি-যোগ্য নহে; সুতরাং আশয়-ভ্রষ্ট বিষয় এবং বিষয়-ভ্রষ্ট আশয় দুইই অব্যক্তি; দুয়ের সঙ্ঘাতই ব্যক্তি।

আপত্তি-খণ্ডন ॥ ১৬ ॥

পরিশেষে, নিম্ন-লিখিত দুইটি বিষয়ে পাছে কাহারো মনে কোন-প্রকার ধোঁকা থাকিয়া যায়, এ জন্য মন্তব্য-চ্ছলে গুটি দুই কথা বলা আবশ্যক। প্রথমতঃ কেহ বলিতে পারেন যে, তোমার মতে অহং-পদার্থ জ্ঞানের শুদ্ধ কেবল একটি অবয়ব-মাত্র বলিয়াই উপলব্ধি-গম্য—জ্ঞানের অভৌতিক অবয়ব বলিয়া উপলব্ধি-গম্য, সমগ্র একটি অভৌতিক বস্তু বলিয়া নহে; তবে আর হইল কি? ইহার উত্তর এই যে, আত্মা তাহার সমস্ত জ্ঞানের সার্ব্ব-ভৌমিক এবং অভৌতিক অবয়ব বলিয়া আপনাকে আপনি জানে ইহা একটি সুনিশ্চিত সত্য; আর, ভৌতিক বস্তু প্রমাণে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, তাহা অনেক সময় যদিচ জ্ঞানের বিশেষ অবয়বের স্থলাভিষিক্ত হয় কিন্তু তাহা যে জ্ঞানাভ্যন্তরে না থাকিলেই নয় এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নাই—তাহার পরিবর্ত্তে মানসিক কোন-একটা-কিছু থাকিলেও জ্ঞানের কার্য্য চলিতে পারে; আর, সেই যে মানসিক বস্তু তাহা আত্মার নিজের শক্তি-সম্ভূতই হউক্, আর ঈশ্বর-দত্তই হউক্ উভয় পক্ষেই তাহা অভৌতিক। আমাদের বক্তব্য শুদ্ধ কেবল এই যে, জ্ঞানের সার্ব্বভৌমিক অবয়ব এবং তাহার বিশেষ অবয়ব—এই দুই অবয়বের কোন-টিই অপরটির সঙ্গ ছাড়িয়া, একাকী, জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে; এ নহে যে, বিশেষ অবয়বটি ভৌতিক না হইলেই নয়। অতএব, পাঠক যদি আমাদের নিকট

হইতে এরূপ একটা অসঙ্গত আত্মসত্তার প্রমাণ প্রত্যাশা করেন—যাহা ভৌতিক বা অভৌতিক একটিও কোন বিশেষাত্মক সত্তার সহিত আদবেই কোন সম্পর্ক রাখে না, তবে আমরা স্পষ্টই বলিতেছি যে, তাঁহার সে আশা নিতান্তই দুরাশা; তাঁহার মনোরথ পূরণ করা তত্ত্ব-জ্ঞানের সাধ্যাতীত।

ঐ ॥ ১৭ ॥

অপর কেহ বলিতে পারেন যে, এই যে একটি কথা তুমি বলিতেছ যে, আত্মা স্বতঃ একেবারেই জ্ঞান-বহির্ভূত এবং স্ববিরোধী, ইহা আত্মার বাস্তবিক সত্তার পক্ষে হানি-জনক; ইহাতে দাঁড়ায় এই যে, আত্মা ঐকান্তিক নির্বিশেষ অবস্থায় অবস্তুরই সামিল। ইহার উত্তর এই যে, হইলই বা—তাহাতে ক্ষতি কি? আমি যদি বিশেষ কোন ভাবে বা বিশেষ কোন অবস্থায় বা বিশেষ কোন-কিছুর সংস্রবে না থাকিলাম, তবে সেরূপ থাকিয়া ফল কি? এমন একটা স্ববিরোধী সত্তা যাহা কোন জ্ঞানেই প্রকাশ পাইবার নহে তাহার মূল্য যে কি—তাহা মনোবিজ্ঞানীরা ভাবিয়া চিন্তিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হয় করুন্, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের নিকট তাহার কোন মূল্যই নাই। এক দিকে আত্মা এবং আর এক দিকে বিশেষ কোন মানসিক ভাবনা অথবা বিশেষ কোন ভৌতিক বিষয়, এই দুয়ের সঙ্ঘাতেই আত্মার বাস্তবিক সত্তা জ্ঞানে প্রকাশিত হয়; এই সত্য বৃত্তান্তটিতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া—আত্মা যে অংশে একেবারেই জ্ঞান-বহির্ভূত—যে অংশে তাহা বিষয়-বর্জ্জিত, ভাবনা-বর্জ্জিত, অবস্থা-বর্জ্জিত, তাহার জন্য কাহার যে কি এত মাথাব্যথা তাহা বুঝিয়া ওঠা ভার। উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে হয় তো ঐ লোক-প্রচলিত ভ্রান্তি-টি—জ্ঞান-বহির্ভূত সত্তার জন্য বৃথা আঁকুবাঁকু—সংশোধিত হইয়া যাইতে পারে। আমাদের এই তন্ত্র আত্মার ভাবী গতির পক্ষে যেরূপ জ্যোতির্ম্ময় পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয় এবং যেরূপ দৃঢ় ভিত্তি-মূলের উপরে আত্মার অমরত্ব সংস্থাপন করে, কোন মনো-বিজ্ঞানই সেরূপ পারে না।

ইহার ফল ॥ ১৯ ॥

এ যখন হইল—আশয়-ভ্রষ্ট জড় বস্তুর স্ববিরোধিতা যখন স্থির-প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য একটি কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। ইহাতে করিয়া প্রতিপক্ষের সমস্ত দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হইয়া গিয়া তত্ত্বজ্ঞানের পথ অনেক পরিমাণে নিষ্কণ্টক হইল। তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য একটি প্রশ্নে নূতন আলোক নিপতিত হইল। সে প্রশ্ন এই যে, জ্ঞানের অপরিহার্য্য উপকরণ—অপরিহার্য্য অবয়ব—কি? ইহারই আর-এক পৃষ্ঠা এই যে, সেই অপরিহার্য্য অবয়বটি অপসারিত হইলে জ্ঞেয় বিষয়ের কি অবশিষ্ট থাকে? ইহার উত্তর এই যে স্ববিরোধীই কেবল অবশিষ্ট থাকে। জ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞেয়ত্ব-সিদ্ধির জন্য নিতান্তই যাহা নহিলে নয়, তাহা যদি তাহা হইতে অপসারিত করা যায়, তবে অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা একান্ত পক্ষেই অজ্ঞেয় এবং অচিন্তনীয়, এক কথায়—স্ববিরোধী, এভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। ইহার পরেই আসিতেছে যে, সেই যে স্ববিরোধী—তাহা কি? ইহার উত্তর এই যে, তাহা স্বতন্ত্র-রূপী জড়বস্তু; আরো ব্যাপক-রকমের উত্তর এই যে, তাহা আশয়-ভ্রষ্ট বিষয়—কেননা জড়-বস্তু ভিন্ন আরো অনেক প্রকার বিষয় আছে (যেমন মানসিক ভাবনা-বিশেষ)। এইটিই (আশয়-ভ্রষ্ট বিষয়ই) সমস্ত জ্ঞানের

স্ববিরোধী অবয়ব, এইটিকে জয় করা, এই গহন অরণ্য প্রদেশটিকে আবাদ করিয়া অবিদ্যাকে বিদ্যায় পরিণত করা, জ্ঞানের একমাত্র কার্য্য।

স্ববিরোধীকে হস্তে পাওয়ার ফল ॥ ২০ ॥

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, স্ববিরোধীকে জ্ঞানে উত্তোলন করা কিরূপে হইতে পারে? স্ববিরোধীর স্ববিরোধিতা কিরূপে ঘুচানো যাইতে পারে? অচিন্তনীয়কে কিরূপে চিন্তনীয় করিয়া তোলা যাইতে পারে? যাহা একান্ত-পক্ষেই অবিজ্ঞেয় তাহাকে কিরূপে জ্ঞানায়ত্ত করা যাইতে পারে? পূর্ব্বতন তত্ত্বজ্ঞানীদিগের নিকট তত্ত্বজ্ঞানের মীমাংস্য প্রশ্ন এই আকারেই দেখা দিয়াছিল, দেখা দিয়াছিল মাত্র—খুব যে স্পষ্টরূপে দেখাদিয়াছিল তাহা নহে। তাহার সাক্ষী—প্লেটো এইরূপ বলিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞান আর কিছু নয়—মানব আত্মাকে অজ্ঞান হইতে জ্ঞানে উত্তোলন করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। প্রকৃত কথা এই যে, তত্ত্বজ্ঞানী শুধু নয়—সকল মনুষ্যই ঐ স্ববিরোধী অবয়বটিকে জয় করিয়া অজ্ঞানকে জ্ঞানে পরিণত করিয়া থাকে; প্রভেদ কেবল এই যে, তত্ত্বজ্ঞানী তাহার প্রণালী জানিয়া তাহা করে, অপর লোকে তাহার প্রণালী না জানিয়া তাহা করে। স্ববিরোধীর বিরোধ-ভঞ্জন যে-কোন উপায়েই হউক্ না কেন—প্লেটোর মতানুযায়ী মৌলিক ভাব সকলের সাহায্যেই হউক্, আর, আমাদের মতানুযায়ী অহম্পদার্থের কর্ত্তৃত্বেই হউক্—এটা স্থির যে, আমরা যাহাকে স্ববিরোধী অচিন্তনীয় এবং অজ্ঞেয় বলিতেছি তাহা যে, কি বস্তু, তাহা যে পর্য্যন্ত না খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে সে পর্য্যন্ত তাহার বিরোধ-ভঞ্জন সম্বন্ধে একটিও কথা উচ্চারণ করা কাহারো মুখে শোভা পায় না। আমরা তাহা খুঁজিয়া পাইয়াছি; তাহা কি? না স্বতন্ত্র-রূপী জড়-বস্তু। তাই অজ্ঞান কিরূপে জ্ঞানে উদ্ধৃত হয়—এখন আমরা তাহা দেখাইতে পারি।

স্ববিরোধী কি ভাবে চিন্তনীয় ॥ ২১ ॥

আমরা বলিতেছি বটে যে, আমরা স্ববিরোধীকে মুষ্টি-মধ্যে পাইয়াছি; কিন্তু তাহার অর্থ এ নহে যে, স্ববিরোধী কখনও কাহারো জ্ঞান-গোচর অথবা ধ্যান-গোচর হইতে পারে। স্ববিরোধী একান্ত-পক্ষেই অচিন্তনীয়—এইরূপেই তাহা চিন্তনীয়। স্ববিরোধীর অচিন্তনীয়তা-লক্ষণের পরিচয় প্রাপ্ত হইলেই তদ্বিষয়ে আমাদের জ্ঞান চরিতার্থ হয়। স্ববিরোধীর ভাবনা এক হিসাবে খুবই সহজ। মনে ভাবো যে, পুস্তকের এই পাতাটির এ-পৃষ্ঠা আছে—ও-পৃষ্ঠা নাই, তাহা হইলেই একটা স্ববিরোধী বিষয় তোমার ভাবনাতে আরূঢ় হইবে। পাঠক বলিবেন যে, "কোনক্রমেই তাহা আমি ভাবিতে পারি না।" সত্য, এক হিসাবে কোন-ক্রমেই তাহা তুমি ভাবিতে পার না; কিন্তু আর-এক হিসাবে তাহা তুমি অতীব স্পষ্টরূপে ভাবিতে পার—এইরূপে তাহা তুমি ভাবিতে পার যে, তাহা কেহই ভাবিতে পারে না; তাহাকে তুমি একান্তই ধ্যানের অগোচর বলিয়া ভাবিতে পার। স্বতন্ত্র-রূপী জড় বস্তুর চিন্তনীয়তার দৌড় এই পর্য্যন্ত—ইহার অধিক নহে।

স্বতন্ত্ররূপী জড় বস্তু একেবারেই অসৎ নহে ॥ ২২ ॥

এই অনির্বাচ্য পদার্থটির কি অস্তিত্ব আছে? এ প্রশ্নটিকে আর একটু পাকিতে দেও—অস্তি-তত্ত্ব ইহার সমুচিত মীমাংসা

করিবে। তত্ত্বজ্ঞানীরা উহার অপক্ক অবস্থায় উহাকে করায়ত্ত করিতে গিয়া বারম্বার বিপদে পড়িয়াছেন। একটি বিষয়ে পাঠক নিশ্চিন্ত থাকুন;—স্বতন্ত্র-রূপী জড়বস্তু যে, আদবেই কিছু নহে—একেবারেই শূন্য, এরূপ কথা আমরা বলি না। সত্তাও যত প্রকার অসত্তাও তত প্রকার,—যেমন আলোক অন্ধকার—শব্দ নিঃস্তব্ধতা—জড়বস্তু শূন্য-আকাশ ইত্যাদি। আমাদের জ্ঞানাভ্যন্তরে উপস্থিত হইতে হইলে—সত্তাই যে কেবল অহংসাপেক্ষ তাহা নহে, অসত্তাও অহংসাপেক্ষ। জ্ঞানে প্রকাশ পাইতে হইলে আলোকও যেমন—অন্ধকারও তেমনি; শব্দও যেমন নিঃস্তব্ধতাও তেমনি, সকলই, অহংসাপেক্ষ। কিন্তু "স্বতন্ত্র-রূপী জড়বস্তু" শূন্য-আকাশাদির ন্যায় অসত্তা নহে, কেননা শূন্য আকাশাদি জ্ঞানে প্রকাশ-যোগ্য—স্বতন্ত্র-রূপী জড়বস্তু একেবারেই জ্ঞানের অগম্য। মায়াবাদ যদি এ কথা বলে যে, স্বতন্ত্র-রূপী জড়বস্তু কিছুই নহে, তবে আমরা এই দণ্ডেই মায়াবাদের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিলাম। * প্রকৃত মায়াবাদ ওরূপ কথা বলে না। কিন্তু প্রকৃত মায়াবাদ কি জগতের সমস্ত বস্তুকেই জ্ঞানের প্রতিভাস-মাত্র বলে না? মনে কর যেন তাহাই সে বলে,—তেমনি, প্রকৃত মায়াবাদ জগতের সমস্ত অসত্তাকে (শূন্য-আকাশাদিকে) কি জ্ঞানের প্রতিভাস-মাত্র বলে না? জড়-বাদী মনে করেন যে মায়াবাদীর বুঝি এইরূপ মত যে, যখন একখানি বস্ত্রকে দৃষ্টির অগোচরে সিন্দুকের মধ্যে পুরিয়া রাখা যায় তখন বস্ত্র-খানি একেবারেই নাস্তি হইয়া যায়। তিনি তবে বলুন্ না কেন যে, মায়াবাদীর মতানুসারে বস্ত্র-খানি তখন রুটি হইয়া যায়! বস্ত্র-খানি যদি শূন্য হইয়া যাইতে পারিল, তবে রুটি হইয়া যাইতে না পারিবে কেন? শূন্যও যেমন—রুটিও তেমনি—দুইই তো অবস্ত্র; বস্ত্রও যেমন জ্ঞানে প্রতিভাসিত হয়, অবস্ত্রও তো তেমনি জ্ঞানে প্রতিভাসিত হয়; কোনটিই তো আর জ্ঞান-ছাড়া নহে। পূর্ব্বে নয় বস্ত্রখানি দৃশ্য বস্তু-রূপে প্রতিভাসিত হইয়াছিল—এখন নয় শূন্য আকাশ-রূপে প্রতিভাসিত হইল—উভয়-পক্ষেই উহা জ্ঞানের প্রতিভাস্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। মায়াবাদ এরূপ কথা বলে না যে, কোন-একটি বস্তু যখন জ্ঞানের প্রতিভাস-রাজ্য হইতে একেবারেই বহিষ্কৃত হয়, তখন তাহা জ্ঞানের এক প্রকার প্রতিভাস হইতে আর-এক-প্রকার প্রতিভাসে পরিণত হয়। না, বস্ত্র বা আর কোন কিছু জ্ঞান-বহির্ভূত হইলে তাহা নিখিল প্রতিভাস-রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়া গিয়া ঐকান্তিক স্ববিরোধী অবস্থায়—ঐকান্তিক অচিন্তনীয় অবস্থায়—নিপতিত হয়; সে অবস্থা-হইতে উদ্ধারের এক উপায় কেবল—কোন-না-কোন জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত হওয়া। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কোন-বস্তুকে নিখিল জ্ঞান-রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত বলিয়া জানা না যায়—না যা'ক্, ভাবা যাইতে পারে তো? সে বিষয়ে

* প্রকৃত মায়াবাদ এমন বলে না যে, অবিদ্যা কিছুই নহে; তাহা এই বলে যে, অবিদ্যা সৎ এবং অসৎ (কিছু এবং কিছু না) উভয়াত্মক; অথবা যাহা একই কথা, সৎও নহে অসৎও নহে—দুয়ের বা'র। বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত যেমন—যেই আছে সেই নাই, আছে অথচ নাই, তাহাকে জ্ঞানে ধরিতে-ছুঁইতে পাওয়া যায় না—অবিদ্যা সেইরূপ একটি জ্ঞান-বিরোধী ব্যাপার। অবিদ্যাকে জ্ঞানে যেই তুমি ধরিবে—সেই তাহা বিদ্যা হইয়া দাঁড়াইবে, অবিদ্যা যে-কে-সেই পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। অবিদ্যা কেদণ্ডে যাহা—সেই দণ্ডে তাহা নহে—এইরূপ একটি স্ববিরোধী ব্যাপার।

বড়ই সন্দেহ। দশম সিদ্ধান্ত পার হইয়া একাদশ সিদ্ধান্তে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ওরূপ জ্ঞান-বহির্ভূত বস্তু জ্ঞানের যেমন অগোচর, ধ্যানেরও তেমনি অগোচর।

অধিকার।

আজকাল বড় একটা অনধিকার চর্চ্চার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ইহার গতিবিধির 'আকর্ষণে দেশ আজকাল এমনি আকৃষ্ট হইয়া আছে যে, যেমন সর্পদষ্ট ব্যক্তির ক্ষতস্থানে বিষশোষক প্রস্তর প্রযুক্ত হইলে তাহা সমুদয় বিষ টুকু টানিয়া লইয়া পড়িয়া যায় সেইরূপ এই দেশ অনধিকারচর্চ্চারূপ হলাহল টানিয়া টানিয়া বিচ্ছেদ পতনোন্মুখী হইতেছে।

বাস্তবিক অনধিকার চর্চ্চা কিছুই নাই। তবে ইহা বলি কেন? শুদ্ধ বোধের তারতম্য অনুসারে। অধিকারটা কি! অধিকারের মূলস্থান কোথায়? ইত্যাদিরূপ, অধিকারের মর্ম্মের মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া অধিকারের চর্চ্চা করাই অনধিকারচর্চ্চা। কোন্ বিষয়ে কাহার না অধিকার আছে সকল বিষয়েই সকলের সমান অধিকার। কিন্তু থাকিলে কি হইবে? তাহা বোঝে অতি অল্প জন। এই বোঝা না বোঝার দরুণ অধিকারের তারতম্য ঘটিয়া থাকে—বৈষম্য জাগিয়া ওঠে। এই বৈষম্য হইতে কত শত ক্ষুদ্রভাব চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া মনুষ্যকে তাহার চতুস্পার্শ্বে স্বকীয় ক্ষুদ্রায়তন কৃত্রিম অধিকার নির্ম্মাণ করিবার জন্য মত্ত করিয়া তুলিতেছে। মহান অধিকারের মাঝে মগ্ন হইতে দেয় না—কত কুটিলতা কত মলিনতা কত বাধাই হায় তাহার সম্মুখে জড় করে। এই কৃত্রিমতার স্পর্শে অধিকারের মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। অকৃত্রিম অন্তরের মধ্যে অধিকার শোভা পায়। পাশব শক্তির অধিকার বেশী না প্রেমের অধিকার বেশী? প্রেমের মত অকৃত্রিম আর কি আছে? ইহার অধিকারে কেমন জীবন্ত ভাব কেমন ব্যাপকতা জাগে। ইহার সম্মুখে সহস্র বাধা উপস্থিত হউক ইহার সহজ ভাব অবাধে গতি। চৈতন্য যখন প্রথমে মহান প্রেমে উন্মত্ত হইয়া সমুদয় জগতকে আপনার বলিয়া ভাবিয়াছিলেন তখন অনেকে তাঁহার নিন্দাবাদ তাঁহাকে বিদ্রুপাদি করিতে ত্রুটি করে নাই, কিন্তু তিনি প্রেমের শান্তি অনুভব করিয়াছিলেন তাহার বিশুদ্ধ অধিকারের মধ্যে বাস করিতেন। উপহাস নিন্দাবাদাদির জন্য কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া কেমন প্রশান্তভাবে পরিমলপূর্ণচিত্তে কহিতেন

"পরিবদতু যথা তথায়ং নন্থ মুখরো নবয়ং বিচারয়ামঃ।"

যথায় তথায় লোকে পরিবাদ দিউক মুখর বলিয়া আমরা তাহাদের বিচার করি না। প্রেমের অধিকারে দ্বেষ হিংসা সমুদয় বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহারি স্পর্শে আমাদের পবিত্রতা জন্মে। ইহাই আমাদের বাস্তবিক অধিকার। এই প্রেম হইতে আমরা যতটা দূরে পড়িব ততটা আমাদের অন্ধতা ততটা আমাদের দারিদ্র্য বিপত্তি। ইহার বাতাস যখনি হৃদয়ে আসিয়া লাগে তখনি আমরা কেমন সহজ প্রাণে "ওঁ শান্তিঃ" এই বাক্য উচ্চারণ করিতে পারি? এই প্রেমের অধিকার ঠিক্ বুঝিতে না পারিয়া শত আত্মা ভ্রমপ্রমাদে অন্ধীভূত—মৃতকল্প—অশাসনে দিকভ্রষ্ট তরণীর ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে মৃত্যুকে প্রধান সম্বল করিতে প্রস্তুত। তাহারা মৃত্যুর কুটিল গতি পর্য্যবেক্ষণ না

করিয়া তদ্বিরুদ্ধে সাংঘাতিক অভিলাষ সঞ্চালন করিতে সক্ষম হয় না—দিন দিন কপট বিকট হইয়া উঠে। তাহাদের চক্ষে অধিকারের সরল জ্যোতি কিরূপে পড়িবে? অধিকারের বিশুদ্ধ মর্ম্মগ্রাহী তাহারা কিরূপে হইবে? যাহারা মৃত্যুর বক্রভাব বুঝিয়া তাহা হইতে দূরে থাকিতে চাহে, যাহারা অনন্তের মধ্যে জীবন্ত ভাবে বিচরণ করিতে চাহে তাহাদিগকেই প্রেম আসিয়া জাগ্রতরূপে অধিকার করে। তাহারাই অধিকারের সৌন্দর্য্যটুকু গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। চরাচরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ তাহাদিগেরই জন্মে।

একটী সুন্দর পদার্থ কখনই তাহার সৌন্দর্য্য-বিরহিত হইবে না যদিও অন্যে তাহাকে মলিন অসুন্দর করিয়া দেখে। অনতিদূরস্থ কোন বাড়ীর সৌন্দর্য্য যখনি আমরা উন্মুক্তভাবে নিজ ঘরের মধ্যে বসিয়া দেখি তখনি সেই সৌন্দর্য্যের প্রকৃত অবয়ব আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু ঘরের সারসি বন্ধ করিয়া তাহার মাঝখান দিয়া দেখিলে সারসির অন্তরস্থ গতি অনুসারে সেই সৌন্দর্য্যকে দেখিতে পাইব। সারসির কাচের অন্তরটী যদি আঁকা বাঁকা ঢেউ খেলানো হয় তবে সম্মুখস্থ বাড়ীর সরল রেখাগুলি তন্মধ্য দিয়া দৃষ্টি করিলে আঁকাবাঁকা ঢেউখেলানোই দেখিতে পাইব। সেইরূপ আমরা আমাদের নিজের স্বচ্ছ বিমল স্বরূপের মধ্য না দিয়া মোহমলিনতার বক্র আবরণের ভিতর দিয়া অধিকারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহার সরল বিমল আকৃতি কিরূপে বুঝিতে পারিব? জড়বৎ হইয়া শিরানাড়ির মধ্যে অষ্টপ্রহর মরণ-সম্বন্ধ রচনা করিতেছি, কিরূপে অধিকারের নিগূঢ় তত্ত্ব ধ্যান করিতে সমর্থ হইব? একমাত্র প্রাণই অধিকারের নিয়ামক। আবার এই প্রাণ প্রেমের আশ্রয়েই লাভ করা যায়। আমরা যদি প্রেমের বলে বলীয়ান হইয়া তাহার প্রতি অসঙ্কোচে নির্ব্বিবাদে লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারি তাহা হইলে আমাদিগের অন্তঃকরণ হইতে "অনধিকার চর্চ্চা" এ কথাটী উঠিয়া যাইবে। তাহার স্থানে অধিকার বিমল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিতে থাকিবে, তখন ইহার সৌগন্ধে কেনা মোহিত হইবে? এই প্রেমোন্মুখী অধিকারের রাজ্যে যদি সকলে বাস করি তবে আমাদের চতুর্দ্দিকে এই যে কলহ বিবাদ দেখা যায়' ইহা কি তিষ্ঠিতে পারে? অকৃত্রিম প্রেমের সহজভাবে ডুবিতে পারিলে যে কতখানি প্রাণ পাওয়া যায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না। ইহার মধুময় আভাস না দেখিয়া সকলে কলুষিত হস্তে ইহার কাছে আসে—পূজা করে। সে পূজাতে ভাল নয় ক্রমে তাহা অপূজাতে গিয়া দাঁড়ায়। যতটা সাধ্য ইহার মৃত্যুময় পূজা দূর করিতে হইবে তাহা হইলে এমনি শক্তি লাভ হয় যে তদ্দ্বারা দুঃখ শোক সমুদয় তিরোহিত হইয়া যায়। এই বিচিত্র বিশ্বের মধ্যে ইহার সুন্দর ছবি জ্বলন্ত রূপে প্রকাশ পাইতেছে বুঝিয়া লইতে পারিলেই হয়। ইহার আনন্দ কল্পনা করিতে গিয়া কবি উথলিয়া ওঠেন, প্রতিকটাক্ষে অভ্রান্তির সুখময় হাস্য উপলব্ধি করিয়া পরম উপকৃত হয়েন—উপকারে ব্যস্ত হইয়া যান। ঔৎকর্ষ্য উৎসাহ আসিয়া তাঁহাকে সত্বর ঘিরিয়া ফেলে।

যে জাতি যতখানি প্রেমের আশ্রয়ে থাকিয়া অধিকারের বিশুদ্ধ বাণী শ্রবণ করিতে পারিয়াছে ততখানি সেই জাতির উন্নতির পথ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

এই অনন্ত অকৃত্রিম প্রেমের আশ্রয় হইতে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমরা দূরে পড়িয়া যাই। ইহাকে চিরদিন আমাদের অধিকারে রাখিতে গেলে চিরদিন সাধনা করিয়া যাইতে হইবে। ক্রমিকই সাধনা করিয়া যাওয়া চাই, নিমেষের তরে বিরাম যেন না হয়, তবে আমরা ক্রমিকই ইহার মধুর রহস্য উপলব্ধি করিতে থাকিব। সাধনার প্রারম্ভাবস্থায় প্রেমকে তাকে তাকে রাখিতে হইবে—প্রেমপিপাসু হইয়া প্রেমের অন্বেষণে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়াবস্থায় প্রেম থেকে থেকে আয়ত্ত হইবে। তাহা ব্যবধানযুক্ত প্রেম। তৃতীয়াবস্থায় পরে প্রেমের আনন্দ উপভোগ করিতে সক্ষম হইবে। তাহাতে অব্যবধান বর্ত্তমান।

"সিংহাবলোকিতাখ্যশ্চ মণ্ডূক প্লুতিরেবচ।
গঙ্গাস্রোত ইব খ্যাতা অধিকারা স্ত্রয়োমতাঃ॥"

এই শ্লোক অনুযায়ী প্রারম্ভাবস্থার প্রেমাধিকারকে সিংহাবলোকিত সদৃশ, দ্বিতীয়াবস্থার প্রেমাধিকারকে মণ্ডূকপ্লুতি সদৃশ, তৃতীয়াবস্থার প্রেমাধিকারকে গঙ্গা স্রোতসদৃশ কহিতে পারি। এই গঙ্গাস্রোতসদৃশ প্রেমাধিকারে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ফুটিয়া ওঠে।

মরুভূমির আরবেরা বিডুইন নামক আরব জাতি বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল সেই এক ধাঁচে চলিতেছে। এই অবসরে কত জাতি উন্নতি অবনতির মধ্য দিয়া মহা উন্নতির দিকে ধাবমান হইতেছে, অধিকারের সুন্দর রাজ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে কিন্তু মরুভূমির আরবদের সে মহোন্নতি নাই। মরুর নীরস একত্বের তুল্য তাহাদের একত্ব জাগিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বকাল হইতে এখনো পর্য্যন্ত প্রায় সেই এক প্রকার ভাব। একরূপ হওয়াতো খুব ভালই কারণ জগতের মাঝে একত্বই বিরাজ করিতেছে, এই বৈচিত্রের মধ্যে একত্বেরই ধ্বনি বিকাশিত। সে একত্ব সরস সরল। কিন্তু মরুভূমির আরবদের একত্ব প্রশংসাযোগ্য নয়, তাহা নীরস তাহা বাস্তবিক ধরিতে গেলে একত্বহীন অনেকত্ব। নীরস একত্ব হইতে অনধিকার চর্চ্চা জন্মায়। এই নীরস একত্বময় মরুভূমির আরবেরা দস্যুবৃত্তি দ্বারা পথিকদিগকে আক্রমণ করিয়া স্বার্থ সিদ্ধ করে কিছু মাত্র ব্যথিত হয় না। এ শুধু তাহাদের অধিকারের বিশুদ্ধ দিকে দৃষ্টি না রাখার দরুন। আধুনিক ইউরোপের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করি দেখিতে পাই তাহারা অধুনাকালে অন্যাপেক্ষা অধিকারের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়াছে। তাই তাহাদের নিকটে স্বর্গের পথ ক্রমশই প্রশস্ত হইতেছে। তাহার স্পর্শে অন্য কত জাতি আবার জাঁকিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে! আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অতি প্রাচীনকালে শ্রেষ্ঠ রূপে আত্মার মহান অধিকার বুঝিয়া পার্থিব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিকারের উপর রাজত্ব করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন—পরমেশ্বরকে করতলস্থিত আমলকবৎ লাভ করিয়া আপ্তকাম হইয়াছিলেন। প্রেমাধিকার তাঁহারদের কেমন সুন্দর রূপে ঘটিয়াছিল। আমরা মহান উন্নত হইতে চাহিলে আমাদিগকে সতত প্রেমের অধিকারের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিতে হইবে। ইহা বিনা আমাদের অন্য গতি নাই। ইহার দ্বারা সমুদয় কার্য্য সম্পূর্ণ রূপে অথচ নীরবে সম্পন্ন হইয়া যায়। এই প্রেমেরই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া গ্রহের পশ্চাতে গ্রহ ঘুরিতেছে অথচ কিছু মাত্র কোলাহল বিশৃঙ্খলতা নাই; কেমন নিঃশব্দে নীরবে কার্য্য সমাধা হইয়া যাইতেছে। যদি সমাজে আসিয়া পরমেশ্বরকেই লাভ করিবার সাধ থাকে তবে আমাদের ব্যক্তিগত দোষ গুণ ব্যক্তিগত ত্রুটী লইয়া মনে মনে কোলাহল না করিয়া নীরবতা অভ্যাস করা শ্রেয়। এই নীরবতা ছাড়িয়া হট্টগোল হুজুকে মাতিয়া থাকিলে প্রেমের মাধুর্য্য আমরা হারাইয়া ফেলি সঙ্গে সঙ্গে সেই মহান অনন্ত হইতে দূরে পড়িয়া যাই। একটী হিন্দুস্থানি গানে আছে "পরম পদ গোঙাহো য়্যাসে পাওয়ে। কর নহি চাল পগনহি হাল বিনে রসনা গুণ গাওয়ে। যদি পরম পদ পাইতে অভিলাষ হয় তবে মূক হও। হাত চলিবে না পদ চলিবে না বিনা রসনায় তাঁহার গুণ গাও। অসীমের মহিমা বুঝিতে গেলে এইরূপ নীরব পথ অবলম্বন করিয়া মৌনী হইয়া প্রেমের সূক্ষ্ম মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে।

"সংত্যজ্য বাসনাং মৌনাদৃতে নাস্ত্যত্তমং পদম্।

বাসনা ত্যাগ করিয়া মৌনভাব অবলম্বন না করিলে কখনো উত্তম পদ লাভ হয় না। মৌনী হইয়া ক্রমিকই আমাদের প্রেমের অধিকারের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে তবে আমাদের রক্ষা। আমাদের ঝঞ্ঝাট ভয়ের কারণ কিছুই রহিবে না। আমরা নির্ভীক সাহসী হইতে পারিব। আমরা এমনি পরাধীন এমনি দুর্ব্বল যে, আমাদের স্বদেশ আমাদের জন্মভূমি অথচ তবু আমাদের তাহাতে কিছুমাত্র অধিকার নাই। ইহা হইতে দারিদ্র্য দুর্দশা আর কি হইতে পারে? এ দারিদ্র্য এ দুর্দশাও ঘুচিবে যদি আমরা একবার প্রেম অধিকার করিয়া দীপ্তিমান হই। প্রেমের পথ দিয়া ত্রিকালজ্ঞের আনন্দ ঘোষণা করিয়া বেড়াই। ইহাই আমাদের কাজ। ইহাই আমাদের সাজ।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের অন্তরে তোমার প্রেম তোমার নিবাসের যে মহান অধিকার দিয়া আমাদের প্রতি তোমার অসীম করুণার পরিচয় দিয়াছ তাহা ভুলিয়া কেন আমরা এই সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে জড়িত হইয়া পড়ি, রাশি রাশি হীনতা ক্ষীণতা আসিয়া আমাদের ধ্বংস করিবার উপক্রম করে। ইহা হইতে তুমি আমাদিগকে মুক্ত কর। তুমিই মুক্তিদাতা অদ্বিতীয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রী হিতেন্দ্র

নীতি।

ধর্ম্মের দুইটি দিক, লৌকিক ও আধ্যাত্মিক। মনুষ্যের সঙ্গে মনুষ্যের সম্বন্ধ লৌকিক; মনুষ্যের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগ আধ্যাত্মিক। মনুষ্যের সঙ্গে মনুষ্যের এই সম্বন্ধের অপর নাম নৈতিক যোগ। এবং যে নিয়ম অনুসারে মনুষ্যেরা আপনারদের মধ্যে ব্যবহার নিয়মিত করে তাহার নাম নীতি। ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপাসনার স্বাভাবিকত্ব সহজ জ্ঞানে উপলব্ধ হইলেও যেমন তাঁহার সহিত ঘনিষ্ট যোগে আবদ্ধ হওয়া মনুষ্যের নিজ নিজ যত্ন চেষ্টা সাধন তপস্যা সাপেক্ষ, তেমনি সত্য দয়া ক্ষমা মৈত্রী প্রভৃতি মানসিক সুকোমল ভাব হৃদয়-ক্ষেত্রের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস হইলেও উহারদের উৎকর্ষ বিধান মনুষ্যের ঐকান্তিক অধ্যবসায়ের ফল। মনুষ্য এখানে আসিয়া যাহা কিছু সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে পারেন, তাহার মধ্যে ব্রহ্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত হইলেও ইহাই ধর্ম্ম সাধনের তাবৎ নহে। আমারদের বিশ্বাসে দৃঢ়তা অনুষ্ঠানে তৎপরতা চাই। একদিকে আমরা সামাজিক জীব

BLEED THROUGH.

আর এক দিকে আধ্যাত্মিক জীব। আমরা যতদূর সামাজিক ততদূর আমাদিগকে ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া পাত্র বিশেষে শ্রদ্ধা ভক্তি দয়া মৈত্রী ভাব প্রদর্শন করিতে হইবে, অপরের সুখশান্তিকে অব্যাহত রাখিতে হইবে, অসত্য পরদ্রোহ পরপীড়ন, চৌর্য্য নিষ্ঠুরতা ইন্দ্রিয়লৌল্য, ক্রোধ প্রতিহিংসা হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে। আবার যতদূর আধ্যাত্মিক জীব সংসারের অনিত্যতা সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া ঈশ্বরকে গতি মুক্তির নিদানভূত জানিয়া ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল লাভের জন্য তাঁহার উপর নির্ভর করিতে হইবে, কাতর প্রাণে বিমল হৃদয়ে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে, সম্পদে বিপদে স্থির থাকিয়া সেই ধ্রুবতারার উপর অনিমেষ আঁখি স্থাপন করিতে হইবে, তাঁহার সঙ্গে অক্ষয় যোগ নিবদ্ধ করিতে হইবে। জীবনকে গৃহী সন্ন্যাসীর অভিনয়ক্ষেত্র করিতে হইবে। ইহাই মনুষ্যের পক্ষে যার পর নাই উচ্চ লক্ষ্য, উন্নততম আদর্শ। এই আদর্শ জীবনে প্রতিফলিত করিতে না পারিলে শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকল লক্ষ্য অভাবে সহজেই উদ্দাম হইয়া মনুষ্যকে বিপদগামী করে। আবার বিশ্বাসের সঙ্গে অনুষ্ঠানের এমনই গূঢ়তম সম্বন্ধ যে কার্য্যক্ষেত্রে বিলক্ষণ দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে অগ্রসর হইতে না পারিলে বিপদপাতের সমধিক সম্ভাবনা। এই জন্যই ধর্ম্মগতপ্রাণ মহানুভব প্রভূতমনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ পৃথিবীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া মনুষ্যসমাজে সুপ্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়াও স্বার্থপরতা ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য বা অযথা ক্রোধের নিকট ধর্ম্মকে বলিদান দিতে সময় বিশেষে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই। একদিকে ঈশ্বরসাধন যেমনই কঠোর, নীতিসাধন তেমনই দৃঢ়তা তিতিক্ষা ও স্থৈর্য্যসাপেক্ষ। সংক্ষেপতঃ নৈতিক উন্নতিই ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তি, এবং ইহাই আধ্যাত্মিক বললাভের পরিচায়ক। চরিত্র সংগঠনের উপরেই ঈশ্বরলাভের আশা ভরসা নির্ভর করিতেছে।

ন্যায় অন্যায় জ্ঞান মনুষ্যের সহজ জ্ঞান সম্ভূত হইলেও কাল ও দেশ বিশেষে কেন যে কোন এক গর্হিত কর্ম্ম আদরের চক্ষে পরিলক্ষিত হয়, আবার কোন এক শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান ঘৃণার সহিত সমালোচিত হয়, এই বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে অনেক রহস্য প্রকাশিত হইতে পারে; নীতির মূলমন্ত্রে সকলে সমান ভাবে দীক্ষিত হইয়াও কেন যে বিসদৃশ ভাবের পরিচয় দেয়, ইহার রহস্য উদ্ভেদ বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। আমারদের বিবেচ্য বিষয়কে তিন ভাগে বিভক্ত করিলে অনেকটা বিষদ হইবার সম্ভাবনা (১) নীতিজ্ঞানের মূল কোথায় (২) সকল জাতির নীতি-জ্ঞান সম্বন্ধে কতদূর ঐক্য আছে (৩) কার্য্য ক্ষেত্রে ন্যায় অন্যায় বিবেচনার বিভিন্নতা কোথা হইতে আইসে।

১। নীতি জ্ঞানের মূল কোথায়। সদসৎ জ্ঞান মনুষ্য মাত্রেরই সহজ জ্ঞান হইতে উদ্ভূত। লোকে কোনটি ন্যায় কোনটি অন্যায় আপনা হইতেই বুঝিতে পারেন। ন্যায় অন্যায় বুঝিতে কোনরূপ শিক্ষার আবশ্যক করে না। বালকের জ্ঞান সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে সে কার্য্যের হিতাহিতত্ব বুঝিতে থাকে। বিনা কারণে পিতামাতা কর্ত্তৃক তাড়িত হইলে বা অন্যায় কার্য্য করিতে আদিষ্ট হইলে অমনি তাহার অসন্তোষের কারণ উপস্থিত হয়। অন্যায় রূপে প্রহার করিলে অমনি সে বিরক্তি প্রকাশ করিতে থাকে। মিথ্যা কখন

তাহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। সরলতা পবিত্রতা তাহার প্রকৃতির মাধুর্য্য। নরহত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা চৌর্য্য অপহরণ প্রবঞ্চনা এই সকল কার্য্য চিরকালই ঘৃণার চক্ষে পরিলক্ষিত হয়। নীতিবিরোধী কার্য্য সকলের অনুষ্ঠানে তাহার চিরঘৃণা। তবে যে স্থলবিশেষে তাদৃশ ঘৃণা উৎপাদিত হয় না তাহার যে অন্য কারণ আছে তাহা পরে দর্শিত হইবে। আমরা যদি বাল্য কাল হইতে কাহাকে শিখাইতে থাকি যে চৌর্য্য প্রবঞ্চনা বিশ্বাসঘাতকতা দস্যুবৃত্তি বাস্তবিক হিতকর, আর দরিদ্রকে দান, অসহায়কে সাহায্যকরণ, যারপর নাই নীতিবিরুদ্ধ, তবে এরূপ শিক্ষা কোন রূপেই অন্তরের ভিতর হইতে সায় প্রাপ্ত হয় না। মনুষ্য এরূপ শিক্ষায় কখনই আপনাকে নিয়মিত করিতে পারেন না। এরূপ শিক্ষায় না তিনি ভিতরের অনুমোদন পান, না বহির্জগতের সহানুভূতি পান। প্রতি অহিতাচরণে তাঁহাকে অন্তরে কোন এক অজানিত প্রভুর কশাঘাত সহ্য করিতে হইবেই হইবে। অনুতাপের গ্লানি সেই নরকাগ্নি হইতে কোন মতেই তাঁহার পরিত্রাণ নাই। এই প্রভুর নাম হিতাহিত জ্ঞান, ইহাই জড় প্রকৃতির রাজা; হস্তপদাদি ইহার সৈন্যদল, কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ ইহার একান্ত সেবক ও অধীন। এই হিতাহিত জ্ঞানই মনুষ্যহৃদয়ে সারবান ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি। ইহার অস্তিত্বে বিশ্বাস যার পর নাই ধর্ম্মানুগত ও ঈশ্বরানুগত বিশ্বাস।

উপরে যেমন হিতাহিত জ্ঞানের স্বাভাবিকত্ব প্রতিপন্ন হইল কিন্তু ইহাই যে একমাত্র অবিসম্বাদী মত তাহা নহে। ন্যায় অন্যায় জ্ঞানবিরোধী দলের মতে সহজ স্বাভাবিক আশৈশব ঈশ্বরদত্ত কোন এক মানসিক ক্ষমতা প্রসূত নহে। তাঁহারদের মতে এরূপ কোন রূঢ় বৃত্তি নাই; হিতাহিত জ্ঞান কয়েকটি মানসিক ভাবের সংঘাতে উৎপন্ন। কেহ বলেন ঈদৃশ জ্ঞানের ভিত্তিমূলে মনুষ্যের ভয়, কুসংস্কার, দেশীয় প্রচলিত রীতি, ইত্যাদি বিদ্যমান রহিয়াছে। কেহ বলেন ইহা ভবিষ্যদ্দৃষ্টি, প্রচলিত মতামত ও রাজদণ্ড দ্বারা নিয়মিত সহানুভূতি ও অন্যান্য ভাবের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ বলেন সাধারণের সুখবৃদ্ধির ইচ্ছা ও মানসিক কোমল ভাবের উত্তেজনায় মনুষ্য ন্যায্য কর্ম্মে অগ্রসর হয়। কেহ বা বলেন যাহা সুখ বৃদ্ধি করে তাহাই নীতি তাহার বিপরীত দুর্নীতি, কেহ বা আর এক পদ অগ্রসর হইয়া বলেন যাহা আমার পক্ষে সুখকর তাহাও ন্যায্য নহে যাহা তোমার সুখকর তাহাও ন্যায্য নহে, কিন্তু যাহা বহু সংখ্যক লোকের বহু কল্যাণপ্রদ তাহাই নীতি তদ্বিরীত দুর্নীতি। এক হিতাহিত জ্ঞানাত্মক স্বতন্ত্র মানসিক বৃত্তির সত্ত্বা অস্বীকার করিতে গিয়া এরূপ নানা মতের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যতই কেন যৌগিক উপাদানে ইহার কলেবর গঠিত করিবার প্রয়াস পাওয়া হউক না, প্রভূতমনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের তর্কতরঙ্গের মধ্যে তাঁহারদের যুক্তিতেও প্রকৃত বিষয়ে এরূপ অনৈক্য দৃষ্ট হয় যে তাহাতে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। শেষোক্ত মতের এক একটিকে হইয়া তাহার খণ্ডনে প্রবৃত্ত হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। তবে তাহারদের বিরুদ্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে উপরিউক্ত মতের কোনটিই মনুষ্যের দায়িত্ব ও বাধ্যতা প্রমাণ করিতে পারে না। যদি ন্যায় অন্যায় বিবেচনা

আর এক দিকে আধ্যাত্মিক জীব। আমরা যতদূর সামাজিক ততদূর আমাদিগকে ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া পাত্র বিশেষে শ্রদ্ধা ভক্তি দয়া মৈত্রী ভাব প্রদর্শন করিতে হইবে, অপরের সুখশান্তিকে অব্যাহত রাখিতে হইবে, অসত্য পরদ্রোহ পরপীড়ন, চৌর্য্য নিষ্ঠুরতা ইন্দ্রিয়লৌল্য, ক্রোধ প্রতিহিংসা হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে। আবার যতদূর আধ্যাত্মিক জীব সংসারের অনিত্যতা সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া ঈশ্বরকে গতি মুক্তির নিদানভূত জানিয়া ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল লাভের জন্য তাঁহার উপর নির্ভর করিতে হইবে, কাতর প্রাণে বিমল হৃদয়ে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে, সম্পদে বিপদে স্থির থাকিয়া সেই ধ্রুবতারার উপর অনিমেষ আঁখি স্থাপন করিতে হইবে, তাঁহার সঙ্গে অক্ষয় যোগ নিবদ্ধ করিতে হইবে। জীবনকে গৃহী সন্ন্যাসীর অভিনয়ক্ষেত্র করিতে হইবে। ইহাই মনুষ্যের পক্ষে যার পর নাই উচ্চ লক্ষ্য, উন্নততম আদর্শ। এই আদর্শ জীবনে প্রতিফলিত করিতে না পারিলে শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকল লক্ষ্য অভাবে সহজেই উদ্দাম হইয়া মনুষ্যকে বিপদগামী করে। আবার বিশ্বাসের সঙ্গে অনুষ্ঠানের এমনই গূঢ়তম সম্বন্ধ যে কার্য্যক্ষেত্রে বিলক্ষণ দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে অগ্রসর হইতে না পারিলে বিপদপাতের সমধিক সম্ভাবনা। এই জন্যই ধর্ম্মগতপ্রাণ মহানুভব প্রভূতমনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ পৃথিবীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া মনুষ্যসমাজে সুপ্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়াও স্বার্থপরতা ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য বা অযথা ক্রোধের নিকট ধর্ম্মকে বলিদান দিতে সময় বিশেষে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই। একদিকে ঈশ্বরসাধন যেমনই কঠোর, নীতিসাধন তেমনই দৃঢ়তা তিতিক্ষা ও স্থৈর্য্যসাপেক্ষ। সংক্ষেপতঃ নৈতিক উন্নতিই ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তি, এবং ইহাই আধ্যাত্মিক বললাভের পরিচায়ক। চরিত্র সংগঠনের উপরেই ঈশ্বরলাভের আশা ভরসা নির্ভর করিতেছে।

ন্যায় অন্যায় জ্ঞান মনুষ্যের সহজ জ্ঞান সম্ভূত হইলেও কাল ও দেশ বিশেষে কেন যে কোন এক গর্হিত কর্ম্ম আদরের চক্ষে পরিলক্ষিত হয়, আবার কোন এক শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান ঘৃণার সহিত সমালোচিত হয়, এই বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে অনেক রহস্য প্রকাশিত হইতে পারে; নীতির মূলমন্ত্রে সকলে সমান ভাবে দীক্ষিত হইয়াও কেন যে বিসদৃশ ভাবের পরিচয় দেয়, ইহার রহস্য উদ্ভেদ বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। আমারদের বিবেচ্য বিষয়কে তিন ভাগে বিভক্ত করিলে অনেকটা বিষদ হইবার সম্ভাবনা (১) নীতিজ্ঞানের মূল কোথায় (২) সকল জাতির নীতি-জ্ঞান সম্বন্ধে কতদূর ঐক্য আছে (৩) কার্য্য ক্ষেত্রে ন্যায় অন্যায় বিবেচনার বিভিন্নতা কোথা হইতে আইসে।

১। নীতি জ্ঞানের মূল কোথায়। সদসৎ জ্ঞান মনুষ্য মাত্রেরই সহজ জ্ঞান হইতে উদ্ভূত। লোকে কোনটি ন্যায় কোনটি অন্যায় আপনা হইতেই বুঝিতে পারেন। ন্যায় অন্যায় বুঝিতে কোনরূপ শিক্ষার আবশ্যক করে না। বালকের জ্ঞান সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে সে কার্য্যের হিতাহিতত্ব বুঝিতে থাকে। বিনা কারণে পিতামাতা কর্ত্তৃক তাড়িত হইলে বা অন্যায় কার্য্য করিতে আদিষ্ট হইলে, অমনি তাহার অসন্তোষের কারণ উপস্থিত হয়। অন্যায় রূপে প্রহার করিলে অমনি সে বিরক্তি প্রকাশ করিতে থাকে। মিথ্যা কখন

তাহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। সরলতা পবিত্রতা তাহার প্রকৃতির মাধুর্য্য। নরহত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা চৌর্য্য অপহরণ প্রবঞ্চনা এই সকল কার্য্য চিরকালই ঘৃণার চক্ষে পরিলক্ষিত হয়। নীতিবিরোধী কার্য্য সকলের অনুষ্ঠানে তাহার চিরঘৃণা। তবে যে স্থলবিশেষে তাদৃশ ঘৃণা উৎপাদিত হয় না তাহার যে অন্য কারণ আছে তাহা পরে দর্শিত হইবে। আমরা যদি বাল্য কাল হইতে কাহাকে শিখাইতে থাকি যে চৌর্য্য প্রবঞ্চনা বিশ্বাসঘাতকতা দস্যুবৃত্তি বাস্তবিক হিতকর, অন্ন দরিদ্রকে দান, অসহায়কে সাহায্যকরণ, যারপর নাই নীতিবিরুদ্ধ, তবে এরূপ শিক্ষা কোন রূপেই অন্তরের ভিতর হইতে সায় প্রাপ্ত হয় না। মনুষ্য এরূপ শিক্ষায় কখনই আপনাকে নিয়মিত করিতে পারেন না। এরূপ শিক্ষায় না তিনি ভিতরের অনুমোদন পান, না বহির্জগতের সহানুভূতি পান। প্রতি অহিতাচরণে তাঁহাকে অন্তরে কোন এক অজানিত প্রভুর কশাঘাত সহ্য করিতে হইবেই হইবে। অনুতাপের গ্লানি সেই নরকাগ্নি হইতে কোন মতেই তাঁহার পরিত্রাণ নাই। এই প্রভুর নাম হিতাহিত জ্ঞান, ইহাই জড় প্রকৃতির রাজা; হস্তপদাদি ইহার সৈন্যদল, কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ ইহার একান্ত সেবক ও অধীন। এই হিতাহিত জ্ঞানই মনুষ্যহৃদয়ে সারবান ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি। ইহার অস্তিত্বে বিশ্বাস যার পর নাই ধর্ম্মানুগত ও ঈশ্বরানুগত বিশ্বাস।

উপরে যেমন হিতাহিত জ্ঞানের স্বাভাবিকত্ব প্রতিপন্ন হইল কিন্তু ইহাই যে একমাত্র অবিসম্বাদী মত তাহা নহে। ন্যায় অন্যায় জ্ঞানবিরোধী দলের মতে সহজ স্বাভাবিক আশৈশব ঈশ্বরদত্ত কোন এক মানসিক ক্ষমতা প্রসূত নহে। তাঁহারদের মতে এরূপ কোন রূঢ় বৃত্তি নাই; হিতাহিত জ্ঞান কয়েকটি মানসিক ভাবের সংঘাতে উৎপন্ন। কেহ বলেন ঈদৃশ জ্ঞানের ভিত্তিমূলে মনুষ্যের ভয়, কুসংস্কার, দেশীয় প্রচলিত রীতি, ইত্যাদি বিদ্যমান রহিয়াছে। কেহ বলেন ইহা ভবিষ্যদ্দৃষ্টি, প্রচলিত মতামত ও রাজদণ্ড দ্বারা নিয়মিত সহানুভূতি ও অন্যান্য ভাবের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ বলেন সাধারণের সুখবৃদ্ধির ইচ্ছা ও মানসিক কোমল ভাবের উত্তেজনায় মনুষ্য ন্যায্য কর্ম্মে অগ্রসর হয়। কেহ বা বলেন যাহা সুখ বৃদ্ধি করে তাহাই নীতি তাহার বিপরীত দুর্নীতি, কেহ বা আর এক পদ অগ্রসর হইয়া বলেন যাহা আমার পক্ষে সুখকর তাহাও ন্যায্য নহে যাহা তোমার সুখকর তাহাও ন্যায্য নহে, কিন্তু যাহা বহু সংখ্যক লোকের বহু কল্যাণপ্রদ তাহাই নীতি তদ্বিরীত দুর্নীতি। এক হিতাহিত জ্ঞানাত্মক স্বতন্ত্র মানসিক বৃত্তির সত্ত্বা অস্বীকার করিতে গিয়া এরূপ নানা মতের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যতই কেন যৌগিক উপাদানে ইহার কলেবর গঠিত করিবার প্রয়াস পাওয়া হউক না, প্রভূতমনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের তর্কতরঙ্গের মধ্যে তাঁহারদের যুক্তিতেও প্রকৃত বিষয়ে এরূপ অনৈক্য দৃষ্ট হয় যে তাহাতে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। শেষোক্ত মতের এক একটিকে হইয়া তাহার খণ্ডনে প্রবৃত্ত হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। তবে তাহারদের বিরুদ্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে উপরিউক্ত মতের কোনটিই মনুষ্যের দায়িত্ব ও বাধ্যতা প্রমাণ করিতে পারে না। যদি ন্যায় অন্যায় বিবেচনা

আমার উপর নির্ভর করে তবে কেন ন্যায়ের ব্যভিচারে ভিতরের তাড়না সহ্য করিতে হয়। পিতামাতাকে ভক্তি করিতে তুমি বাধ্য, আর্ত্তকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে তুমি বাধ্য, সময় বিশেষে আপনার জীবনের উপর কিছুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া অপরকে রক্ষা করিবার জন্য ভিতর হইতে যে দুর্দ্দম্য বল আইসে, কই আমরাত ইচ্ছা করিয়া তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারি না। অন্যায় কার্য্য করিলে কোথা হইতে বা অনুতাপ আইসে?

(খ) যদি সুখ ন্যায় কার্য্যের নিয়ামক হয়, তাহা হইলে সুখ আমাকে আকর্ষণ করিতে পারে, আমাদিগকে বাধ্য করিতে পারে না, আমাদিগকে শাসন করিতে পারে না। সুখ আমাদিগকে কেন ন্যায্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি করে ইহারও সদুত্তর পাওয়া কঠিন। বিশেষতঃ সুখও নানা প্রকারের, কতকগুলি বা উচ্চ অঙ্গের কতকগুলি বা নিম্ন অঙ্গের। কার্য্যক্ষেত্রে কোন্ প্রকার সুখ কখন বা গ্রাহ্য কখন বা ত্যজ্য তাহা কে নির্ণয় করিয়া দিবে। আবার সুখের মূল অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাই যে কতকগুলি সুখ মনুষ্যের সচেষ্ট অবস্থার কতকগুলি নিশ্চেষ্ট অবস্থার। শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার পরিচালনায় যে সুখ উৎপন্ন হয় তাহা সচেষ্ট অবস্থার সুখ। স্নিগ্ধ বায়ু সেবন মূল্যবান পদার্থ ও ধন ঐশ্বর্য্যের উপভোগে যে সুখ হয় তাহা আবার অন্য এক শ্রেণীর অন্তর্গত। এইরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে সুখ মাত্রেই আমারদের ন্যায় কার্য্যের নিয়ামক হইতে পারে না। প্রত্যুত তাহারা শারীরিক ও মানসিক শক্তির চালনা হইতে উৎপন্ন হয়। তাহারা শক্তি পরিচালনার অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া যায় না, কিন্তু সহচর অনুচর হইয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতে থাকে।

(গ) মনে কর সুখই যেন ন্যায্য কর্ম্মের নিয়ামক হইল, কিন্তু আমি ত সংসারী জীব, আমি কাহার সুখ দেখিব, আমার না পরের। কখন্ বা আমার সুখ দেখিব কখন বা পরের সুখ দেখিব এ সন্ধান আমাকে কে বলিয়া দিবে। যদি বহুল অংশ লোকের বহুল পরিমাণে সুখ দীপশলাকা হস্তে আমার পুরোবর্ত্তী হয়, তবে অন্ধকার বির্দ্ধস্ত না হইয়া বরং তাহার গাঢ়তা শত গুণ বর্দ্ধিত হইবে। কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিকর্ম্মের প্রারম্ভে কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে নিয়োজিত করিবার পূর্ব্বে "বহুল সংখ্যক লোকের বহুল পরিমাণে সুখ" তর্ক শাস্ত্রের এ জটিলতম প্রশ্নের কে মীমাংসা করিয়া দিবে। আমরা ত কার্য্য করিবার সময় স্বতঃসিদ্ধ সত্যের ন্যায় আশৈশব ন্যায় অন্যায় আপনা হইতে বুঝিতেছি; বাল্যে ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে যে বিশ্বাস হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিল, যৌবনে তর্কশাস্ত্রের সমূহ আলোচনার পর ত আপনাকে ভ্রান্ত বুঝিতেছি না। ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগকে নীতিমার্গ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে করুক, কিন্তু সদসৎ জ্ঞান যে জ্বলন্ত অক্ষরে আমারদের অন্তরে চিহ্নিত রহিয়াছে, কখনই তাহার ক্ষয় দেখিতেছি না।

(ঘ) আমরা দেখিতেছি নীতি-অনুমোদিত কার্য্য সকলেরই অনুষ্ঠানে হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়; কিন্তু যাহাতে সুখ হয় তাহাই ন্যায্য নহে। সুতরাং সুখ ও ন্যায় পরস্পরের প্রকাশক নহে। সুখের ক্ষেত্র ন্যায়ের অপেক্ষা প্রশস্ততর, সুতরাং সুখ ন্যায় কর্ম্মের পরিমাপক হইতে পারে না। সুখের কষ্টিপ্রস্তরে ন্যায়ের পরীক্ষা চলিতে পারে না। আবার যাহাতে দুঃখ জন্মে তাহাই অন্যায্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। এমন কোন কার্য্য নাই দুঃখ যাহার উদ্দেশ্য। দুঃখ পাইব এই মানসে কেহ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। মনুষ্যের অবিবেকিতা দোষে দুঃখ জন্মে। ইচ্ছা করিয়া কেহ আপনার মস্তকে দুঃখ আনয়ন করে না। আবার এমন কতকগুলি দুঃখ আছে, সুখ যাহার মর্ম্মে রহিয়াছে। শরীরে ব্রণ হইল, চিকিৎসক আসিয়া তাহাতে অস্ত্র-প্রয়োগ করিলেন, রোগী আরোগ্য লাভ করিল। এই দুঃখের মধ্যে অন্যায় কোথায়। সুতরাং স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে সুখও ন্যায়ের নিয়ামক নহে, দুঃখও অন্যায়ের প্রতিরূপ নহে।

ক্রমশঃ।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, প্রথম কল্প

অর্থাৎ ১৭৬৫ শকের ভাদ্র মাস হইতে ১৭৬৮ শকের চৈত্র পর্য্যন্ত চারি বৎসরের পত্রিকা অবিকল পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। মূল্য অগ্রিম ১২৲ টাকা; পশ্চাদ্দেয় ১৬৲ টাকা।

১৭৬১ শকে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠার পর হইতে ইহার সুপ্রসিদ্ধ সভ্যগণ ৪ বৎসর ধরিয়া যে সকল তত্ত্বালোচনা করিয়াছিলেন সেই সকল, এবং তাহার পর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ হইলে দেশ দেশান্তরবাসী মহামহোপাধ্যায় বিদ্বন্মণ্ডলী অসাধারণ উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে যে সকল তত্ত্বের বিচার ও সিদ্ধান্ত এবং ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় এই প্রথম চারি বৎসরের পত্রিকার মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে বেদান্তাদি শাস্ত্র সকলের মর্ম্ম এবং প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম বিচার সহকারে বিবৃত হইয়াছে। এদেশের আধুনিক অভ্যুদয়ের প্রথম সময়ের সকল বিদ্বান্ ব্যক্তি একত্রিত হইয়া এদেশে জ্ঞান ধর্ম্মের যে উজ্জ্বল আলোক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ পরিচয় এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্পে আছে।

এই কল্প এক্ষণে একান্ত দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে অনেক ব্যক্তি এতদন্তর্গত কোন কোন মূল্যবান প্রবন্ধ পৃথক্ মুদ্রিত করিবার মন্ত্রণা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে সকলের অভীষ্টমত ফল হইবে না ভাবিয়া আমরা সমুদায় কল্পটী পুনর্মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই কল্পের কয়েক খণ্ড ৫০ টাকা করিয়া মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। এক্ষণে এই নূতনমুদ্রাঙ্কিত পুস্তকের উপরোক্ত মূল্য নির্দ্ধারিত হইল। ইহাতে অনেক চিত্র, মানচিত্র এবং পারসী প্রভৃতি অক্ষরের আবশ্যক হওয়াতে ইহার মূল্য এতদপেক্ষা আর কমাইতে পারা গেল না। কলিকাতার গ্রাহকেরা মাসিক এক টাকা কিম্বা ত্রৈমাসিক তিন টাকা করিয়া দিলে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে এতদতিরিক্ত এক টাকা দিতে হইবে। এক বৎসরের মধ্যে এইরূপে অগ্রিম মূল্য প্রদান করিয়া গ্রাহকেরা খণ্ডে খণ্ডে পুস্তক প্রাপ্ত হইতে থাকিবেন। যাঁহারা ১২ টাকা একবারে দিবেন, তাহাদিগকে সাহায্যকারী স্বরূপ গণ্য করা যাইবে। তাঁহাদিগকে সমস্ত পুস্তক একত্রে বাঁধাইয়া দেওয়া যাইবে।

আমার নামে পত্র ও টাকা পাঠাইবেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ
যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেণ্টের এমন কোন বিশেষ নিয়ম নাই যাহাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের নৈতিক উন্নতি হয়। বর্ত্তমান কালের ছাত্রেরা অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতেছে সত্য কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই নৈতিক জ্ঞান কিছু শিথিল দেখিতে পাওয়া যায়। আবার বঙ্গভাষায় এমন পুস্তকও বিরল যদ্দ্বারা ছাত্রদিগের এই মহৎ অভাবটী দূর হইতে পারে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা এই উপহার নামক ক্ষুদ্র পুস্তকখানি ছাত্রদিগকে বিনামূল্যে প্রদান করিবার সংকল্প করিয়াছি। ১৮০৮ শকে পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বদেশের নৈতিক ও সামাজিক সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে অমূল্য উপদেশ দেন এই পুস্তকে তাহাই মুদ্রিত হইল। কিরূপে সৎপুত্র হওয়া যায়, কিরূপে সৎপতি ও সৎগৃহী হওয়া যায় এবং কিরূপে ধর্ম্মশীল ও সাধু হওয়া যায় এই পুস্তকে সংক্ষেপে সেই সমস্ত উপদেশ আছে। ফলত ইহা একখানি বঙ্গভাষার উজ্জ্বল রত্ন। প্রতি গৃহস্থেরই ইহার এক এক খণ্ড রক্ষা করা আবশ্যক, আমরা এই আশয়ে বহুল পরিমাণে ইহা মুদ্রিত করিলাম। কলিকাতায় বিতরণ করিবার কোনই ব্যয় নাই। মফস্বলে প্রতি ৫ খণ্ড পুস্তকে ৵১০ সামান্য ডাক মাশুল লাগিবে। যাঁহাদের আবশ্যক হইবে আমার নিকট ডাক মাশুলসহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলেই পাইবেন।

৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন যোড়াসাঁকো কলিকাতা। } শ্রীনীলকমল মুখোপাধ্যায়।

আগামী ৪ঠা ভাদ্র রবিবার ধর্ম্মপুর ব্রাহ্মসমাজের ষোড়শ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবেক।

শ্রীলালবেহারি দে।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	... ...	৫২৪৸৵০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৮৭৮৷৷৵১৫
সমষ্টি	... ...	৩৪০৩৷৷ ১৫
ব্যয়	...	৭৫১ ৵০
স্থিত	... ...	২৬৫২৷৵১৫

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৫৪৷৵০
সাম্বৎসরিক দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
" " যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	১০৲
" " ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৲
এককালীন দান।	
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী দানাধারে প্রাপ্ত	১৲ ৩১৷৵০
	৫৪৷৵০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৯২৷৷৵০
পুস্তকালয় ...	১২৸৵০
যন্ত্রালয় ..	১৬৬৷৵১০
গচ্ছিত ...	৮৮৸৵১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৯৸০
সমষ্টি	৫২৪৸৵০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	২৬০৸ ৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৩৯৸৵০
পুস্তকালয়	৩৮৸৵০
যন্ত্রালয় ...	২০৩৸৵১৫
গচ্ছিত	৯১৷৷৵১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৵১০
দাতব্য	১৬৲
সমষ্টি ...	৭৫১৵০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

ভ্রম সংশোধন।

বিগত মাসের "আত্মা ও পরমাত্মা" শিরস্ক প্রবন্ধে তৃতীয় পারাগ্রাফ নবম পংক্তিতে "আমি আছি" এবং "আমি সৃষ্ট" ইহাই জীবাত্মার নির্দ্দেশ, এইরূপ হইবে; ত্রয়োবিংশ পংক্তি "আত্মাকে" ইহার স্থানে "জীবাত্মাকে" হইবে; পঞ্চবিংশ পংক্তি "তিনি" ইহার স্থানে "যিনি" হইবে।

---

৫৪২ সংখ্যা

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
আশ্বিন ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯।

১৮১০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বং নিয়ন্তৃসর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া, পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আত্মশক্তি।

একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজি পণ্ডিত বলিয়াছেন—জ্ঞানই শক্তি;—কিন্তু কার্য্যতঃ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকলের পক্ষে নহে; যাঁহারা জ্ঞানকে কার্য্যে খাটাইতে জানেন তাঁহাদেরই জ্ঞান বিশিষ্টরূপে শক্তি নামের যোগ্য। মনে কর—দুই ব্যক্তিই রসায়ণ বিদ্যায় সুপণ্ডিত; তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি উক্ত বিদ্যার সাহায্যে ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে জানেন, আর এক ব্যক্তি সে বিষয়ে নিতান্তই অনভিজ্ঞ; রসায়ণ-জ্ঞান দুই ব্যক্তিরই সমান—কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির রসায়ণ-জ্ঞান শক্তি-নামের যোগ্য, শেষোক্ত ব্যক্তির রসায়ণ-জ্ঞান শুদ্ধ কেবল জ্ঞান মাত্রই সার। অতএব, সাধারণতঃ সকল জ্ঞানই যে, শক্তি, তাহা নহে; বিশেষ এক-জাতীয় জ্ঞান আছে—তাহাই শক্তি নামের যোগ্য, কি? না উপায়-জ্ঞান; উপায়-জ্ঞান—অর্থাৎ জ্ঞানকে কিরূপে কার্য্যে খাটাইতে হয় তদ্বিষয়ক জ্ঞান; এইরূপ জ্ঞানই শক্তি।

জ্ঞানকে কার্য্যে খাটাইতে হইলে জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক। বিদ্যা-শিক্ষার সময় জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা এবং জ্ঞানদাতা গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা দুয়ের মধ্যে এ-পিঠ ও-পিঠ সম্বন্ধ। বিদ্যার্থীর নিকটে গুরুই জ্ঞান মূর্ত্তিমান্। কিন্তু গুরু কেবল জ্ঞানের গুণেই গুরু—এই জন্য জ্ঞান গুরু অপেক্ষাও অধিক শ্রদ্ধেয়। তবে, বালকের পঠদ্দশায়—জ্ঞান যে কি বস্তু—সে তাহা জানে না; সুতরাং তখন জ্ঞান তাহার নিকটে কিছুই নহে—গুরুই তাহার নিকটে জীবন্ত জ্ঞান। বিদ্যার্থী ব্যক্তি যতই জ্ঞান-লাভে কৃতকার্য্য হইতে থাকেন, ততই তাঁহার গুরু-ভক্তি বাহিরের গুরু হইতে অন্তরের গুরুর প্রতি ফিরিয়া দাঁড়াইতে থাকে; ইতিপূর্ব্বে গুরুর প্রতি তাঁহার যতখানি শ্রদ্ধা ছিল, জ্ঞানোপার্জ্জনের পর জ্ঞানের প্রতি তাঁহার ততোধিক শ্রদ্ধা জন্মে। জ্ঞানের প্রতি যাঁহার যত শ্রদ্ধা বেশী—জ্ঞানকে কার্য্যে খাটাইতে তাঁহার তত উৎসাহ বেশী। কলম্বস্, নিউটন, প্রভৃতি মহাত্মাদিগের একদিকে যেমন জ্ঞানের প্রতি অসামান্য শ্রদ্ধা ছিল, আর এক দিকে তেমনি জ্ঞানকে কার্য্যে খাটা-

ইবার জন্য অসামান্য উৎসাহ ছিল। এই-রূপ শ্রদ্ধাবান্ উৎসাহী পুরুষেরা জ্ঞানকে কার্য্যে খাটাইবার উপায় আবিষ্কার করিয়া যা'ন, তাহার পরে তাঁহাদের অনুপন্থীরা তদনুসারে পুনঃপুনঃ কার্য্য করিয়া অভীষ্ট কার্য্যে অসাধারণ নিপুণতা লাভ করেন। এইরূপে জ্ঞানের সহিত যখন কার্য্য-দক্ষতা মিলিত হয়, তখনই জ্ঞান বিশিষ্টরূপে শক্তি-নামের যোগ্য হয়।

অধুনাতন কালের প্রধান একটি ভ্রম এই যে, বিজ্ঞানই কেবল জ্ঞান-নামের যোগ্য, বিশুদ্ধ-জ্ঞান-রূপী যে আত্মা, তাহা কিছুই নহে। ইহাঁদের মুখের কথাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, ইহাঁরা বিজ্ঞানের সবিশেষ পক্ষপাতী। কিন্তু পক্ষপাতকে আমরা অত্যন্ত ডরাই—এজন্য পারৎপক্ষে আমরা তাহার ত্রিসীমা মাড়াই না। বিজ্ঞা-নের পক্ষে হইয়া আত্মাকে নীচু করিতেও আমাদের প্রবৃত্তি হয় না—আত্মার পক্ষে হইয়া বিজ্ঞানকে নীচু করিতেও আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। এখানে এই সত্যটি সং-স্থাপন করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য যে, বিজ্ঞানের সহিত কার্য্য-দক্ষতা মিলিত হইয়া যেমন সাংসারিক শক্তি পরিস্ফুট হয়, সেইরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানের সহিত, অথবা যাহা একই কথা—আত্মার সহিত, কার্য্য-দক্ষতা মিলিত হইয়া আত্ম-শক্তি পরি-স্ফুট হয়।

ফরাসীস্ বিজ্ঞান-বেত্তা কমটি মনুষ্যত্ব-নামক একটা আবছায়া মূর্ত্তিকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন। তাঁহার সে মনুষ্যত্ব কতকগুলা মৃত মনুষ্যের সমষ্টি—তাহার শক্তি কি আর থাকিবে? কিন্তু যদি জাগ্রত জীবন্ত মনুষ্যত্ব দেখিতে চাও তবে তাহা তোমার অন্তরে বিরাজমান; প্রতি জ-নের বিশুদ্ধ জ্ঞানই—প্রতি জনের আত্মাই—জীবন্ত মনুষ্যত্ব; কম্‌টির ও-মনুষ্যত্ব এবং আমাদের এ-মনুষ্যত্ব দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। কম্‌টির মনুষ্যত্ব কি রূপ? না যেমন সেনার সেনাত্ব; সেনা-রাই যুদ্ধ করে—সেনাত্ব কিছুই করে না। আমাদের মনুষ্যত্ব কি রূপ? না যেমন সেনার সেনাপতি; সেনাপতির অধ্যক্ষতা ব্যতীত সেনা যুদ্ধ করিতে পারে না—আ-ত্মার অধ্যক্ষতা ব্যতীত কোন ব্যক্তিই মনু-ষ্যোচিত কার্য্য করিতে পারে না। আমা-দের অভ্যন্তরস্থিত বিশুদ্ধ জ্ঞানকেই আ-মরা বলি—আত্মা; আত্মাই জীবন্ত মনু-ষ্যত্ব—আত্মাই পরমাত্মার অনুকৃতি। ইহা যেমন সুনিশ্চিত যে, বিজ্ঞানকে যিনি যত কার্য্যে খাটাইতে পারেন তিনি তত সাং-সারিক শক্তি উপার্জ্জন করেন, ইহাও তেমনি সুনিশ্চিত যে, বিশুদ্ধ জ্ঞান-রূপী আত্মাকে যিনি যত কার্য্যে খাটাইতে পা-রেন তিনি তত আধ্যাত্মিক শক্তি উপার্জ্জন করেন।

জাহাজ চালাইতে হইলে সর্ব্ব-প্রথমে সমুদ্র-পথের একটি সমীচীন আদর্শ-লিপি প্রস্তুত করা আবশ্যক। সেইরূপ বিশুদ্ধ-জ্ঞানকে কার্য্যে খাটাইতে হইলে সর্ব্ব-প্রথমে সমীচীন একটি আদর্শ অবলম্বন করা আবশ্যক। পরমাত্মাই আত্মার সমী-চীন আদর্শ। সমুদ্র-পথও যেমন নির্জ্জীব; তাহার আদর্শ-লিপিও তেমনি নির্জ্জীব, কিন্তু পরমাত্মা জীবন্ত আত্মার জাগ্রত জী-বন্ত আদর্শ। জীবন্ত শরীরের অভ্যন্তরেই আমরা জীবন্ত মনুষ্যকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি, সেইরূপ জীবন্ত আত্মার অভ্যন্তরেই আমরা জীবন্ত পরমাত্মাকে সা-ক্ষাৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি। একজন মনু-ষ্যকে চিন্তা করা স্বতন্ত্র এবং তাহাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা স্বতন্ত্র,—তাহাকে

সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে হইলে তাহাকে তাহার জীবন্ত শরীরের অভ্যন্তরে উপলব্ধি করিতে হয়; তেমনি, পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে হইলে তাঁহাকে জীবন্ত আত্মার অভ্যন্তরে উপলব্ধি করিতে হয়। সকলেই আমরা পরমাত্মাকে আত্মার অভ্য-ন্তরে উপলব্ধি করিয়া থাকি; কেবল সে বৃত্তান্তটির প্রতি আমরা যথোচিত মনো-নিবেশ করি না বলিয়া অভীষ্ট ফল-লাভে বঞ্চিত হই। পিঞ্জরস্থিত পক্ষী আহারান্তে চাহিয়া দেখে যে, তাহার চতুর্দ্দিকে আ-কাশ উন্মুক্ত রহিয়াছে, তাই সে পিঞ্জরের যন্ত্রণা অনুভব করে; কিন্তু সে যদি অষ্ট প্রহর কেবল আহার পানেই নিযুক্ত থা-কিত তবে পিঞ্জরে থাকিয়াই সে স্বর্গ-ভোগ করিত। সেইরূপ পরম আনন্দ-ধামের প্রতি আমাদের লক্ষ রহিয়াছে বলিয়াই আমরা সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব করি; জ্বালা-যন্ত্রণার অর্থই এই, যে, যে আনন্দের প্রতি আমাদের লক্ষ রহিয়াছে, সে আনন্দকে আমরা সমুচিত পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা যদি আমা-দের আত্মার অভ্যন্তরে উন্মেষিত না হই-তেন, তবে আমরা পশুদিগের ন্যায় যাহাতে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতাম। আমাদের একদিকে দুঃখ-ক্লেশময় সংসার, আর-এক দিকে পরিপূর্ণ আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মা। সংসারের এই যে, দুঃখ শোক জরা ব্যাধি, ইহার একটা উল্টা পিট রহিয়াছে—তা-হাতে আর ভুল নাই; তাহা কি? না আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা আমাদের সমস্ত দুঃখ-শোক জরা-ব্যাধি পাপতাপের শান্তি-সুধা; তিনি আমাদের আত্মার সমগ্র অভা-বের পরিপূর্ত্তি এবং পরিশান্তি। কিন্তু সেই আনন্দধামে মনকে নিবিষ্ট করিতে শিক্ষা করা প্রয়োজন। সারথী যেমন অশ্বের গ্রীবা থাবড়াইয়া তাহাকে মিষ্ট বাক্যে শীতল করিয়া অল্পে অল্পে তাহাকে অশ্ব-শালার অভ্যন্তরে প্রবেশ করায়, সেইরূপ অবসর-ক্রমে মনকে প্রবোধ-বাক্যে শীতল করিয়া অল্পে অল্পে তাহাকে অন্তরতর অন্তরতম আনন্দ-ধামে ফিরাইয়া আনা সাধকের পক্ষে অতীব আবশ্যক। ইহাতে আত্মার মালিন্য ঘুচিয়া যায়, আত্মাতে শান্তির উদ্রেক হয়, ও আত্মার কার্য্য-শক্তি দ্বিগুণিত হয়।

এইরূপে পরমাত্মার আনন্দ-রস-পানে মন সুপ্রসন্ন প্রশান্ত এবং সবল হইলে অতঃপর তাহাকে সাংসারিক কর্ত্তব্য-সাধনে নিযুক্ত করা আবশ্যক। যাঁহারা এইরূপে কার্য্য করেন তাঁহারা ঈশ্বরের হইয়াই কার্য্য করেন—এইজন্য তাঁহাদের মন অল্প কিছুতে বিচলিত হয় না। এইরূপ করিয়া সাধকের যখন কর্ত্তব্য-সাধনে যথোচিত নিপুণতা জন্মে, তখনই তাঁহার বিশুদ্ধ ধী-শক্তি কার্য্য-শক্তিতে পরিণত হয়, তখন তাঁহার বিশুদ্ধ জ্ঞান জ্ঞান-মাত্র হইয়াই ক্ষান্ত থাকে না—তাহা একটা প্রবল-পরা-ক্রম শক্তি হইয়া উঠে। এইরূপ শক্তি-সমন্বিত বিশুদ্ধ জ্ঞানই সমগ্র আত্মা।

নিবৃত্তি।

আত্মার তৃপ্তি-সাধন নিজের দ্বারা যেমন হয় বাহ্যবস্তুর সাহায্যে তেমন হয় না। কিন্তু আমাদের এমনি থেকে থেকে ভুল হয় যে নিজের সুখানুসন্ধান করিতে বাহি-রেই ঘুরি, বাহিরের সংস্পর্শজনিত মোহে মনকে কতরূপে তৃপ্তি উপভোগ করাইবার জন্য ব্যস্ত হই, চেষ্টা পদে পদে বিফল হইয়া যায় কারণ জ্ঞান-স্বরূপের সুশীতল

ছায়া ভিন্ন আত্মার আর কোথাও শান্তি নাই ; সেইখানে বসিয়া সে স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিতে চায়। সেই বলেই আত্মা মলিন মনকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া পরমাত্মায় নিলীন রাখিতে চায়।

অগ্নিকণা নীরস দ্রব্যরাশিতে পতিত হইলে চকিতের মধ্যে মহাঅগ্নিরূপ ধারণ করত শেষে ভস্মাকারে পরিণত হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ আমাদের প্রবৃত্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক বিষয়ের দিকে ধাবিত হইয়া ক্ষণস্থায়ী মহাচমকে মাতিয়া ওঠে শেষে একেবারে অধঃপতন—কাজেই নিবৃত্তি। এরূপ নিবৃত্তি নিবৃত্তিই নহে। যেহেতু অবস্থা আমাদিগকে ঘাড় ধরিয়া নিবৃত্তিতে আনিল, আমরা স্বাধীন ভাবে বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিলাম না। স্বাধীন ভাবে যে নিবৃত্তি তাহাই প্রকৃত নিবৃত্তি, তাহাই বাস্তবিক জ্ঞানের লক্ষণ। আত্মা ইহাতেই ভাল থাকে। ইহাতেই আত্মার ধৈর্য্য প্রতিষ্ঠিত। সেই জন্য, নিবৃত্তিকে আমরা ভালরূপ অভ্যাস করিতে সমর্থ হইলে জগতের কি না উপকার আমাদের কর্ত্তৃক সাধিত হইতে পারে? সকল দেশেরই ধর্ম্মের মধ্যে ইহার পবিত্র মাধুর্য্য গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে তাহা সহজে কাহারো চক্ষে পতিত হয় না। যাঁহারা সাধনপ্রিয় সজ্জন তাঁহাদেরই জ্ঞানে নিবৃত্তির সূক্ষ্ম মাধুর্য্য ধরা দেয়। নিবৃত্তি রেবতু গরীয়সী নিবৃত্তিই গরীয়সী। ইহুদী গ্রীক আরবী পারসী প্রভৃতি কত জাতির মধ্যে নিবৃত্তির চর্চ্চা হইয়াছে। ইহুদীধর্ম্মে একটী অতি প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহা এই "মিস্মা দুমা মাস্সা" 'মিস্সা'র অর্থ শ্রবণ 'দুমা'র অর্থ নীরব 'মাস্মা'র অর্থ ধৈর্য্য। অর্থাৎ নীরব হইয়া সব শ্রবণ করিতে ধৈর্য্যচ্যুতি যেন না হয়। ইহাতে কতখানি নিবৃত্তির চর্চ্চা হইল! গ্রীসে জেনোইষ্টেরা কহিত "সহ্য কর এবং সংযত থাক।" কিন্তু আমাদের দেশে যেমন নিবৃত্তির চর্চ্চা হইয়া গিয়াছে এমন কোথাও হয় নাই। সংস্কৃত কাব্য নাটক বেদ বেদান্ত সমুদয়ের মধ্যে কেবল নিবৃত্তিরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। আমাদের এক মহাভারতে এক রামায়ণে কেমন নিবৃত্তির চরম শিক্ষা লাভ করা যায়। নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন "সন্তুষ্টস্য নিরীহস্য স্বাত্মারামস্য যৎসুখং। কুতস্তৎ কামলোভেন ধাবতোঽর্থেহয়া দিশঃ॥" যিনি সন্তুষ্টচিত্ত নিরীহ এবং স্বীয় আত্মাতে রমণ করেন তাঁহার যে সুখ সে সুখ যাহারা কামলোভের বশে বিষয়-রাজ্যে ধাবমান হইতেছে তাহাদের কোথায়? সনৎকুমার ঋষিমণ্ডলীকে উপদেশ দিবার সময় কহিয়াছিলেন "নাস্তিরাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখং" বিষয়াশক্তি তুল্য দুঃখ নাই ত্যাগের তুল্য সুখ নাই। এইরূপ আমরা নিবৃত্তিপূর্ণ ঋষিদের দেখিলে কি আরাম পাই! এই এমন নিবৃত্তি-সম্পন্ন দেশে থাকিয়া যদি আমরা বিষয়-মোহ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে না সক্ষম হইলাম—নিবৃত্ত থাকিয়া পরমাত্মার পবিত্র সহবাস না পাইলাম তবে আমরা অতিশয় মন্দভাগ্য। আমাদের অতিশয় লজ্জার বিষয়।

হে পরমাত্মন্। তুমি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে থাকিয়া এই পবিত্র নিবৃত্তি অহরহঃ শিক্ষা দাও তাহাহইলেই আমরা তোমার আদেশ পালনে কৃতকার্য্য হইব, তোমার পথের পথিক হইতে পারিব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রীহিতেন্দ্র

নীতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৬) পরিশেষে যদি রাজনিয়ম অথবা জনসাধারণের নিন্দাবাদ ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহা হইলে সভ্য সমাজের সামাজিক নিয়মাবলী (etiquette) নীতির অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে। কিন্তু কই সামাজিক নিয়মভঙ্গের জন্য মনের মধ্যে গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠানের ন্যায় অনুতাপ আইসে না। নীতি মনুষ্যের সৃষ্ট হইলে সামাজিক নিয়মাবলীর সহিত ন্যায্য কর্ম্মের ঐক্য অনুভূত হইত। লোকে কাহা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ না হইয়া আপনা হইতে ন্যায্য কর্ম্মে রত হয়। নীতি মনুষ্যের সৃষ্টি হইলে, সুখ ইহার প্রবর্ত্তক হইলে অথবা অন্যান্য উপাদানে নীতিজ্ঞান সংগঠিত হইলে পৃথিবীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে নীতির শ্রীবৃদ্ধি ও তারতম্য হইত, মনুষ্য ইচ্ছা করিলে আপনাকে নীতির হস্ত হইতে অব্যাহতি দিতে পারিতেন। উল্লিখিত যুক্তি পরম্পরার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ন্যায় অন্যায় জ্ঞান মনুষ্যের স্বাভাবিক হিতাহিতজ্ঞানপ্রসূত। বালকের জ্ঞান সঞ্চারের সঙ্গে ইহার উদ্দীপন হয়। সকল দেশের সকল মনুষ্যের অন্তরে এই জ্ঞান জাগরূক রহিয়াছে।

২। সকল দেশের সকল মনুষ্যেরই নীতির মূল সত্যে সমান বিশ্বাস রহিয়াছে। যে দেশের যে কোন লোককে জিজ্ঞাসা কর পরস্বাপহরণ উচিত কি না, অবালবৃদ্ধ বনিতা সকলে এক বাক্যে বলিবে কখনই না। সত্য কথা কহা উচিত কি না, উত্তরে বলিবে সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠরত্ন আর কি আছে। কিন্তু এই মূল সত্যে সমান বিশ্বাস থাকিলেও যদি আবার পরক্ষণে জিজ্ঞাসা কর, শত্রুর ধন অপহরণ করা উচিত কি না, কেহ বা মস্তক কণ্ডূয়ন করিয়া বলিবেন "উচিত" কেহ বলিবে "না"। উত্তরের বৈষম্যে ইহা বলা যাইতে পারে যে স্বার্থের নির্ম্মোক ধারণ করিয়া উত্তর দুইটি বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। মূল সত্যে অবিচলিত নিষ্ঠা থাকিলেও বিশেষ বিশেষ অবস্থায় উহাতে মানসিক দুষ্প্রবৃত্তির ছায়া পতিত হইয়া উহাকে ম্লান করিয়া ফেলে, কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ণসত্যের মর্য্যাদার কোনরূপ হানি হয় না। এই জন্য পূর্ণ সত্যে ও ব্যবহারে, বিশ্বাসে ও অনুষ্ঠানে চিরকাল সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে, এবং এরূপ সংগ্রাম যার পর নাই দুর্নিবার। মনুষ্য একে অপূর্ণ দুর্ব্বল জীব, যাহারদের সঙ্গে ব্যবহার করিবে তাহারাও ঐরূপ। অপূর্ণ বৃত্তের মধ্যগত হইয়া অপূর্ণ দুর্ব্বল জীব কেমন করিয়া পূর্ণসত্য সকল সময়ে জীবনে প্রতিফলিত করিতে সমর্থ হইবে।

অসভ্যাবস্থায় মনুষ্যগণ আপনার আহার বিহার লইয়াই ব্যতিব্যস্ত, এমন একটু অবসর নাই, এমন অনুকূল ক্ষেত্র নাই যে তাহারা মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সকলের পরিচালনা করিতে সমর্থ হয়। ক্রমে সভ্যতার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিনিময়ের পরিবর্ত্তে অর্থের ব্যবহার সমাজে প্রবেশ লাভ করে, তখন স্বচ্ছন্দে শরীর রক্ষা করিয়াও অন্যান্য শক্তি পরিচালনার যথেষ্ট সময় থাকে। সুতরাং ষোড়শকল চন্দ্রের ন্যায় ঈশ্বরপ্রদত্ত বৃত্তি সকল পূর্ণভাব ধারণ করিতে থাকে। এই জন্য অসভ্যজাতি অপেক্ষা সুসভ্য জাতিগণের মধ্যে নীতিসম্মত কার্য্যের বহুলতম বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ অন্তর্দ্দেশ অন্বেষণ করিলে সুসভ্য অসভ্য

উভয়ের মধ্যেই নীতির মূল মন্ত্রে সমান বিশ্বাস দেখা যায়।

৩। কার্য্যক্ষেত্রে নীতির বিলক্ষণ বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইলেও যদি তাহার কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তবে দেখিতে পাই যে মনুষ্যমাত্রেরই অন্তরে নীতির মূল-মন্ত্রের সত্ত্বা বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন এক কার্য্যের ন্যায্যতা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইবার পূর্ব্বে আমরা সেই আদর্শের সহিত কার্য্য বিশেষ মিলাইয়া লই। এই মিলনের জন্য একটা স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ার আবশ্যক হয় না। আমারদের প্রত্যেক বিশেষ কার্য্য সেই মূল আদর্শের অন্তর্ভূত হইয়া প্রকাশ পায়। "রামকে মারিব কি না" এই অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই নীতির মূলমন্ত্র অন্তর্দ্দেশ হইতে বলেন যে "নিরপরাধে কাহাকে প্রহার করা উচিত নয়।"

মনুষ্যের কার্য্যমাত্রই যে নৈতিক কর্ম্ম তাহা নহে। তাহাদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা শারীরিক মানসিক ও নৈতিক। ব্যায়াম ভ্রমণ সন্তরণ শারীরিক; মনোযোগ তর্ক স্মৃতি ইত্যাদি মানসিক কর্ম্মের অন্তর্ভূত। আবার শারীরিক ও মানসিক কার্য্য অবস্থাভেদে নৈতিক কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। পোত নিমজ্জনোন্মুখ দেখিয়া যদি সন্তরণ করিয়া পোতারোহিদিগকে রক্ষা করিবার প্রয়াস পাই তবে তাহা নৈতিক কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমারদের নীতি সম্বন্ধীয় কার্য্যগুলিকে ভাল বা মন্দ না বলিয়া যৌক্তিক বা অযৌক্তিক, ন্যায্য বা অন্যায্য বলাই উচিত। কেন না যৌক্তিকতা অযৌক্তিতা নিরূপণ জ্ঞান-প্রসূত ভাব-প্রসূত নহে। যৌক্তিকতা জ্ঞানে অথবা মূল আদর্শের সহিত মিলাইয়া জানিতে পারা যায়। ভাবে (feeling) জানা যায় না। কার্য্যের যৌক্তিকতা যেমন আমরা আপনা হইতে বুঝি, তেমনি আবার ইহার যাথার্থ্য পরীক্ষার অন্যতম উপায় আছে। যাহা আমার নিকট ন্যায্য তাহা জনসমাজের নিকটও ন্যায্য। যাহা আমার নিকট হেয় তাহা সকলেরই নিকট হেয়। রাজা অন্যায্য কর্ম্মের জন্য দণ্ডবিধান করেন; জনসমাজ তাদৃশ কার্য্যকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করে। তবে অন্যায্য কার্য্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে তারতম্য আছে। যাহা বিশেষ হানিজনক তাহার জন্য রাজদণ্ড উত্তোলিত রহিয়াছে, যাহা সমাজের পক্ষে তাদৃশ ভয়াবহ নহে তাহাই ঘৃণার কটাক্ষে পরিলক্ষিত হয়।

নীতিশিক্ষা ও হিতাহিত জ্ঞান-শক্তির শিক্ষা দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ, হিতাহিত জ্ঞান শক্তি আশৈশব মনুষ্যে রহিয়াছে। নীতিশিক্ষা অর্থে নীতির মূল মন্ত্রগুলিকে কার্য্যে পরিণত করা বুঝায়, ইহাই ব্যক্তিগত চেষ্টার ফল। নীচ প্রকৃতি গুলিকে দমন করিয়া উহাদিগকে হিতাহিত জ্ঞানের অধীনে আনয়ন করা। হিতাহিত বিবেচনা অর্থে আদর্শের সহিত বিশেষ কার্য্য বা অভিপ্রায় মিলাইয়া দেখা ভিন্ন আর কিছু বুঝায় না। মনুষ্য নানা প্রকার দুষ্প্রবৃত্তি ও সুপ্রবৃত্তির মিলন ক্ষেত্র ইহা স্বর্গ ও নরকের একাধার। সুপ্রবৃত্তি আমাদিগকে এক পদ অগ্রসর করিতে চেষ্টা করিতেছে, আবার দুষ্প্রবৃত্তি তৎক্ষণাৎ শত পদ পশ্চাতে লইয়া যাইবার অবসর অন্বেষণ করিতেছে। মনুষ্যের মন দেবাসুরের যুদ্ধ অবিরাম চলিতেছে। মনুষ্যের প্রত্যেক কার্য্যই এরূপ বিভিন্নমুখী ক্ষমতার ফল। সুপ্রবৃত্তি দ্বারা দুষ্প্রবৃত্তি সকলকে দমন করিতে পারিলে মনুষ্য

আপনার দেবভাবে পরিচালিত হইতে পারেন। দুষ্প্রবৃত্তি সকল যদি আমারদের উপর প্রভুত্ব খাটাইতে না পারিত তবেইত হিতাহিত জ্ঞানের রাজত্ব অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইত। সেই জন্য মনুষ্য একরূপ বুঝিয়াও দুষ্প্রবৃত্তির কুচক্রে অন্যরূপ করিয়া বসে।

হিতাহিত-জ্ঞান ও হিতাহিত বিবেচনা এই দুই বিষয় লইয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যাহা প্রকৃতরূপে ন্যায্য কেহই তাহাকে অন্যায়ের শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত করিতে পারেন না। বরং লোকের মধ্যে কোনটি ন্যায় তাহা অপেক্ষা কোনটি অন্যায় তাহা লইয়া বহুল পরিমাণে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। মনুষ্য প্রবঞ্চনাকে ক্ষমা করিতে পারে কিন্তু ন্যায়পরতাকে ঘৃণা করিতে পারে না! নিষ্ঠুর প্রতিশোধকে প্রশংসা করিতে পারে কিন্তু ক্ষমা ও মহত্ত্বকে তাহা অপেক্ষা অধিক আদরের সামগ্রী মনে করে। নীতির মূল সত্যে মনুষ্যের মতদ্বৈধ নাই, কিন্তু কার্য্যে তাহার প্রয়োগের বিভিন্নতা আছে। তাহার কারণ এক প্রকার পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, যে মনুষ্যের অন্তরে এরূপ কয়েকটি দুষ্প্রবৃত্তি আছে যাহারা হিতাহিত জ্ঞানের সহিত সৌহার্দ্দে কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহে। স্বার্থপরতা, হিংসা ইহাদের অগ্রণী। ইহারা মনুষ্যকে ভ্রান্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে আনয়ন করে। পৃথিবীতে এরূপ ব্যক্তি অতি বিরল, যাঁহারা হৃদয়তন্ত্রীগুলিকে হিতাহিত জ্ঞানানুমত করিয়া বাঁধিয়া লইতে পারেন। আবার নীতির মূল মন্ত্র সম্বন্ধে মতদ্বৈধ না থাকিলেও বর্ত্তমানে আমার কর্ত্তব্য কি তাহা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। যেমন কোন বলিষ্ঠ ভিক্ষুক ভিক্ষার্থ দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে আমরা কখন বা তাহাকে ভিক্ষা প্রদান করি, কখন বা আলস্যের আশ্রয় দান বিবেচনায় তাহাকে শূন্যহস্তে ফিরাইয়া দিই অথচ দানকে ঘৃণা করি না।

আমারদের এমন দুর্ব্বলতা আছে, যাহা আমাদিগকে সহিষ্ণুভাবে বিবেচনা করিতে দেয় না, বিশেষ বিবেচনার পূর্ব্বেই আমরা আপনা হইতে একদিকে নীয়মান হই। এ ভ্রম কুসংস্কার হইতে উৎপন্ন। স্বাধীন ভাবে যুক্তি অবলম্বন না করিয়া ভ্রমে পতিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। সমাজের মধ্যে যে সকল ভ্রম ও কুসংস্কার বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা আপনাপন যুক্তি তর্ক সম্বন্ধে নিশ্চেষ্টতার ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে অমূলক বিশ্বাস আমারদের হৃদয়কে এরূপ বিমোহিত করিয়া রাখে যে তাহার কোন সারবত্তা না থাকিলেও আমরা সহজে তাহাদিগকে বিদায় দিতে পারি না। পূর্ব্বে যখন নরবলি প্রচলিত ছিল তখন যদি সেই দুর্ভাগ্য নর দেবতার সম্মুখে ঘাতকের হস্ত হইতে কোনরূপে পলায়ন করিতে পারিত, তবে ঘাতক পূজক ও দর্শকবৃন্দের ক্ষোভের সীমা থাকিত না। বর্ত্তমানেও ঈদৃশ অযথা অসত্য হাস্যাস্পদ ধর্ম্মবিশ্বাসের অপ্রাচুর্য্য নাই।

এই সকল কারণে নীতির মূলসত্যে ও আচরণে এত প্রভেদ ও হিতাহিত জ্ঞানের স্বাভাবিকত্ব সম্বন্ধে এতদূর সন্দেহ। দুষ্ট প্রবৃত্তি দমন ভিন্ন সুনীতির অপরাজিত রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই। যতদিন না মনুষ্যগণ একমাত্র হিতাহিত জ্ঞানের আদেশে পরিচালিত হইতে শিক্ষা করিবে, ততদিন শান্তির রাজ্য সংস্থাপনের কালবিলম্ব হইবে। মনুষ্য হিতাহিত জ্ঞান-বিশিষ্ট জীব—

মনুষ্যের কার্য্যই কেবল হিতাহিত বিবেচনার ফল। মনুষ্য যতদূর স্বাধীন জীব ততদূর তাহার দায়ীত্ব আছে। যতদূর তাহার স্বাধীন ইচ্ছা আছে সে প্রাণীজগতের রাজা। কার্য্যাকার্য্যের উপর তাহার স্বাধীনতা না থাকিলে হিতাহিত জ্ঞান একথা আসিত না। ইতর প্রাণীরা আহার বিহার লইয়া ব্যতিব্যস্ত এবং উহারা স্বীয় প্রবৃত্তির অধীন। কিন্তু ব্যক্তিগত কার্য্য জ্ঞান ও ইচ্ছাপ্রসূত। নীতিশাস্ত্র ব্যক্তিগত কার্য্য লইয়া আলোচনা করে। মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের ব্যবহার নীতি শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হইলেও ইহা পশু পক্ষীর প্রতি সঙ্গত ব্যবহারের প্রতি উদাসীন নহে। বরং ক্রমশঃ এই বিষয় লইয়া বিলক্ষণ আন্দোলন চলিতেছে।

আমরা মর্ত্ত্যের জীব। পদে পদে আমারদের বাধা পদে পদে বিঘ্ন। চারিদিকে আমারদের শত্রু। অন্তরে শত্রুদল বাহিরে শত্রুদল আমাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। সংসার পথের প্রতি পদবিক্ষেপে আমারদের বিপদের সম্ভাবনা। এরূপ ভয়ানক অবস্থায় পতিত হইয়া কি আমরা কোন ধ্রুবতারার উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া অগ্রসর হইব না? অবস্থার দাস হইয়া কি রসাতলের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিব? আমারদের কি এখানে কোন সঙ্গী নাই, কোন হৃদয়বন্ধু নাই, যিনি বিপদের কাণ্ডারী হইয়া এই প্রবল তরঙ্গের মধ্যে মন-তরির হাল ধরিতে পারেন? যিনি কর্ত্তব্য পথে ন্যায় পথে আমাদিগকে বিচরণ করিবার উপদেশ দেন? ঐ যে অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কে আমাদিগের পৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়া আমাদিগকে সচকিত করেন? কে ন্যায় অন্যায়ের তৌলদণ্ড আমারদের সম্মুখে ধারণ করিয়া কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে পরামর্শ দান করিতেছেন? কে আত্মপ্রসাদ বিতরণ করিয়া নির্জ্জীব হৃদয়ে উৎসাহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিতেছেন? আমরা যেন এমন ইষ্টদাতা সদ্‌গুরুর পরামর্শ অবহেলা করিয়া উদ্দাম ভাবে সংসারে বিচরণ না করি। সকল অবস্থাতে সকল বিষয়ে সকল কার্য্যে এমন হিতৈষী বন্ধুর আদেশ পালনে দৃঢ়ব্রত হই। নীচ প্রবৃত্তি সকলকে দমন করিয়া একমাত্র হিতাহিত জ্ঞানের পরিচালনায় আপনাকে স্থাপন করি। অতুল প্রভাব নরপতি যেমন আপনার প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া দূরস্থ প্রদেশের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তেমনই সকল জগতের রাজা মনুষ্যদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য কর্ত্তব্য জ্ঞানকে অন্তরে নিহিত করিয়া দিয়া সকলকে ধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। আমরা ন্যায়ের রাজ্যে পদচারণা করিতে গিয়া যেন সেই ন্যায়রাজ্যের রাজাকে বিস্মৃত না হই। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে ন্যায় স্বার্থপরতা হইয়া পড়ে। ঈশ্বরকে ধরিয়া থাকিলে ন্যায়ের অর্থ থাকে। "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

জগতের কর্ত্তাকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। তাঁহাকে প্রীতি করিবার বিভিন্ন পথ থাকিলেও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ নাই! পৃথিবীতে নানা প্রকার ধর্ম্মপ্রণালী প্রচলিত থাকিলেও তাঁহার অনুমোদিত প্রিয়কার্য্য সম্পাদন লইয়াই মনুষ্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে এবং এই প্রিয়কার্য্য লইয়া সকল ধর্ম্মাবলম্বীরা পরস্পরকে প্রীতির আহ্বানে সম্ভাষণ করিতে

পারেন, প্রীতির বন্ধনে সকলকে আবদ্ধ করিতে পারেন, এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন নীতি পথে পদচারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব।

সিদ্ধান্ত ॥১০॥

কেবল-মাত্র ইন্দ্রিয়ের বিষয়, একাকী জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। জ্ঞানাভ্যন্তরে যাহাই কেন অবস্থিতি করুক না, তাহারই মধ্যে এমন একটি অবয়ব বর্ত্তমান থাকা চাই যাহা ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে কোনক্রমেই স্থান পাইতে পারে না। ইন্দ্রিয় স্বতঃ (অর্থাৎ দ্বিতীয় কোন-কিছুর সাহায্য ব্যতিরেকে) কোন জ্ঞেয় বিষয়কে জ্ঞানসমক্ষে উপস্থিত করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়—অর্থের নহে—কেবল অনর্থেরই গ্রহণকর্ত্তা। যাহা অর্থ-শূন্য এবং স্ববিরোধী—ইন্দ্রিয় কেবল তাহাই আনিয়া জ্ঞান-সমক্ষে উপস্থিত করে।

প্রমাণ।

জ্ঞানের বিষয় যাহাই হউক না কেন—অহম্পদার্থ তাহারই একতম অবয়ব (সিদ্ধান্ত ॥১॥২॥৬॥ দেখ); কিন্তু অহম্পদার্থ ইন্দ্রিয়ের গম্য নহে; অথবা যাহা একই কথা—অহম্পদার্থ ভৌতিক বলিয়া—ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বলিয়া—উপলব্ধি-গম্য নহে (৮ সিদ্ধান্ত দেখ)। অতএব কেবল-মাত্র ইন্দ্রিয়ের বিষয় জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না।

মন্তব্য এবং ব্যাখ্যান।

প্রমাণের গোড়া বাঁধুনি ॥ ১ ॥

বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য যদিচ ইহার পূর্ব্বে উচ্চ অঙ্গের দার্শনিকদিগের মনে অস্ফুট-ভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল, এমন কি তাহা লইয়া তাঁহারা বিরোধী পক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে পর্য্যন্ত পারৎপক্ষে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহই উহার প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। উহা প্রমাণ করিতে হইলে অগ্রে নিম্নলিখিত দুইটি তত্ত্বের সংস্থাপন দ্বারা প্রমাণের গোড়া বাঁধুনি করা চাই;—প্রথমে এইটি সংস্থাপন করা চাই যে, যাবতীয় ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের সঙ্গে সঙ্গে অনন্য একই কোন বস্তু, অথবা, যাহা আরো ঠিক—অনন্য একই কোন জ্ঞানের অবয়ব, জ্ঞাত হাওয়া চাই; তাহার পরে এইটি দেখানো চাই যে, সেই যে অনন্য একই অবয়ব তাহা ভৌতিক বলিয়া জ্ঞাত হইতে পারে না। বর্ত্তমান স্থলে এই দুইটি তত্ত্বের অবলম্বন ব্যতিরেকে প্রমাণ এক পদও চলিতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানের সেই অনন্য একই অবয়বটি যে কি—একাল পর্য্যন্ত কোন দার্শনিক তন্ত্রই তাহা স্পষ্ট করিয়া বলে নাই; এ তো দূরের কথা—জ্ঞানের ওরূপ একটি ধ্রুব অবয়ব যে, আছে, এ বিষয়েও কেহ কোন উচ্চবাচ্য করে নাই; এরূপ যখন—তখন জ্ঞানের সেই ধ্রুব অবয়বটি যে, ভৌতিক বলিয়া জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে, এ তো আরো দূরের কথা—এ কথাটির প্রমাণ পূর্ব্বতন কোন তন্ত্রের নিকট হইতে প্রত্যাশা করাই ভুল। বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের প্রমাণের যে দুইটি অলঙ্ঘনীয় সোপন-পংক্তি আমরা উপরে প্রদর্শন করিলাম, তাহা পূর্ব্বতন কোন তন্ত্রেই নাই; পূর্ব্বতন কোন তন্ত্রে বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের যে, উল্লেখ মাত্রও নাই, তাহা আমরা বলিতেছি না—তাহার ভূরি ভূরি উল্লেখ থাকিতে পারে—কিন্তু ঐ দুইটি অলঙ্ঘনীয় সোপান পংক্তি বিরহে প্রমাণের যে, বিন্দু-বিসর্গও তথায় থাকিতে পারে না, ইহা দেখিতেই

পাওয়া যাইতেছে। আবার, প্রমাণের ঐ দুইটি সোপান-পংক্তির একটিকে ছাড়িয়া আর-একটি কোন কার্য্যেরই নহে; প্রমাণের পক্ষে দুইটিই সমান অপরিহার্য্য। মনে কর যেন আমরা স্পষ্ট করিয়া দেখাইলাম যে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়-মাত্রেরই সঙ্গে আত্মাকে জানা চাই; কিন্তু আত্মা নিজেই যদি ভৌতিক বলিয়া—ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বলিয়া—জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য হয়, তবে এ কথার কোন আর দাঁড়াইবার স্থান থাকে না যে, কেবল-মাত্র ইন্দ্রিয়ের বিষয় জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। তেমনি আবার মনে কর যেন আমরা স্পষ্ট করিয়া দেখাইলাম যে, আত্মা ভৌতিক বলিয়া—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে; কিন্তু তাহার সঙ্গে এটাও যদি না সত্য হয় যে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় সকলের সঙ্গে আত্মাকে না জানিলেই নয়—তাহা হইলেও এ কথার কোন অর্থ থাকে না যে, কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়ের বিষয় জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। কিন্তু ঐ দুইটি অধিকরণই (অর্থাৎ প্রমাণের অলঙ্ঘনীয় সোপান-পংক্তি premise) আমাদের এখানকার ধ্রুব সিদ্ধান্ত—এখানে দুইটিই রীতি-মত প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা ধ্রুব-রূপে সংস্থাপিত হইয়াছে; এ-জন্যই বলি যে, দুয়ে মিলিয়া বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের একটি অকাট্য প্রমাণ—তদ্ভিন্ন তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ নাই।

দশম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত ॥ ২ ॥

"শুদ্ধ কেবল ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে—তদ্ভিন্ন আর কিছুই জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। যাহা কোন্-না-কোন সময়ে ইন্দ্রিয়াভ্যন্তরে স্থান পাইয়াছে, তাহাই কেবল জ্ঞানের অভ্যন্তরে স্থান পাইতে পারে। একা কেবল ইন্দ্রিয়ই জ্ঞেয় বস্তুকে জ্ঞানাভ্যন্তরে উপস্থিত করিতে পারে।" আমাদের চিরাভ্যস্ত আপামর-সাধারণ-সুলভ অশাস্ত্রীয় চিন্তার সহিত এই প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটির খুবই মিল খায়।

লাইব্‌নিট্‌জের প্রতিষেধ-বাক্য ॥ ৩ ॥

লক্ নামক দর্শন-কারের একটি প্রসিদ্ধ বচন এই যে, "পূর্ব্বে যাহা ইন্দ্রিয়াভ্যন্তরে ছিল না—এরূপ কোন কিছুই জ্ঞানের অভ্যন্তরে স্থান পাইতে পারে না।" তাহার প্রত্যুত্তরে লাইব্‌নিট্‌জ্ বলিলেন—"জ্ঞান আপনি ব্যতীত" অর্থাৎ জ্ঞান নিজে ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। লাইব্‌নিট্‌জের এই কথাটির টীকা আবশ্যক। লাইব্‌নিট্‌জ্ যদি আমাদের ন্যায় বলিতেন যে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়-সকলের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান আপনাকে আপনি জানিতেই চায়, আর যদি তিনি দেখাইতেন যে, জ্ঞান আপনাকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে না, তবে তাহার উপর আর কাহারো কোন কথা চলিতে পারিত না—হয় তো তাহাই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়; কিন্তু বাস্তবিকই যদি তাহাই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় হয়, তবে তাঁহার ভিতরের ভাবটি যেমন—তাঁহার কথাটি তাহার ঠিক্ উপযুক্ত হয় নাই। তিনি কেবল বলিতেছেন যে, জ্ঞান আপনি ভিন্ন আর-কোন-কিছুই ইন্দ্রিয়ের দ্বারস্থ না হইয়া জ্ঞানাভ্যন্তরে স্থান পাইতে পারে না। এ কথাটিতে কিছু আর এরূপ বুঝায় না যে, জ্ঞান আপনাকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে না, আর, এমনও বুঝায় না যে, কেবল-মাত্র ইন্দ্রিয়ের বিষয় একাকী জ্ঞানাভ্যন্তরে স্থান পাইতে পারে না। "জ্ঞান আপনার অভ্যন্তরে আপনি আছে" শুদ্ধ এই কথাটিতেই আমাদের

আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না; তাহার সম্বন্ধে আরো এই জিজ্ঞাস্য যে, জ্ঞান আপনার অভ্যন্তরে আপনি জ্ঞাত-সারে আছে কি অজ্ঞাত-সারে আছে? যদি বল যে, কখন বা জ্ঞাতসারে আছে—কখনও বা অজ্ঞাত-সারে আছে; তবে তাহা হইলেই দাঁড়াইবে যে, বাহ্য-বস্তু-বিশেষ যখন আমার জ্ঞাত-সারে আমার জ্ঞানাভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছে তখন আমি আমার অজ্ঞাত-সারে আমার জ্ঞানাভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছি—এরূপ হইবারও কোন বাধা নাই; এক কথায়—আপনাকে না জানিয়াও বাহ্য বস্তুকে জানিতে পারিবার কোন বাধা নাই; লাইব্‌নিট্‌জের কথার ফল তবে আর কি হইল?

প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের আকার সম্বন্ধে টীকা ॥ ৪ ॥

প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটি সচরাচর যে আকারে প্রদর্শিত হয় তাহার ভাষা বড়ই গোলমেলে। আমরা উহাকে যেরূপ তীব্র আকারে প্রদর্শন করিয়াছি—তাহা আমরা বুঝিয়া সুঝিয়াই করিয়াছি; পাছে অর্থের কোন ইতস্ততঃ হয়—এ জন্যই আমরা তাহা করিয়াছি। আমাদের কথার সঙ্গে এবং তাহার অর্থের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। পরে প্রকাশ পাইবে যে, প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটি এখানে যে আকারে প্রদর্শিত হইয়াছে—তাহা আগা গোড়া সুসঙ্গত; কিন্তু সচরাচর তাহা যে আকারে প্রদর্শিত হয় তাহার আগা'র সহিত গোড়া'র মিল নাই। এ যাবৎকাল প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটির তীব্রতা ঘুচাইয়া তাহাকে শোধন করিবার যত প্রকার চেষ্টা পাওয়া হইয়াছে, তাহাতে লাভের মধ্যে কেবল—এক গুণ গোলমালকে দশ-গুণ করিয়া তোলা হইয়াছে। প্রতিপক্ষ সিদ্ধন্তটিকে কতক-মতক সংশোধন করিয়া তাহাকে দোষ-মুক্ত করিবার কোন উপায় নাই—তাহাকে সমূলে নিপাত করা আবশ্যক; আর, তাহা যদি করিতে হয় তবে বর্ত্তমান দশম সিদ্ধান্তই তাহার একমাত্র অমোঘ অস্ত্র।

প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটি শোধিত এবং অশোধিত দুই অবস্থাতেই স্ববিরোধী ॥ ৫ ॥

প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের ভ্রম শুদ্ধ কেবল তাহার এই কথাটিতেই আবদ্ধ নহে যে, আমাদের সমস্ত জ্ঞানই কেবল-মাত্র ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান; তদ্ব্যতীত, তাহার এ কথাটিও ভ্রমাত্মক যে, আমাদের একটি'ও-কোন জ্ঞান কেবল-মাত্র ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান। পূর্ব্বোক্ত কথাটি যেমন অসত্য এবং স্ববিরোধী, শেষোক্ত কথাটিও তেমনি অসত্য এবং স্ববিরোধী। কেন না এটি এখানকার স্থির-সিদ্ধান্ত যে, আমাদের প্রত্যেক জ্ঞানেই এমন একটি উপাদান বর্ত্তমান থাকা চাই যাহা ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া আসিতে পারে না—কি? না অহম্পদার্থ। অতএব প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের প্রয়োগ-ক্ষেত্র বিস্তীর্ণই হউক্ আর সঙ্কীর্ণই হউক্—উভয়-স্থলেই তাহা স্ববিরোধী;—সমস্ত জ্ঞানের সম্বন্ধে যদি তাহাকে প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলেও তাহা স্ববিরোধী, আর, বিশেষ কোন-জাতীয় জ্ঞানের সম্বন্ধে যদি তাহাকে প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলেও তাহা স্ববিরোধী।

প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটিই ইন্দ্রিয়-বাদের বীজ-মন্ত্র ॥ ৬ ॥

এই যে একটি কথা যে, ইন্দ্রিয়ের দ্বার না মাড়াইয়া কোন কিছুই জ্ঞানাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, ইহাই ইন্দ্রিয়-বাদের বীজ-মন্ত্র। "ইন্দ্রিয়-বাদ" এ শব্দটি প্রয়োগ করাতে ইন্দ্রিয়-বাদীর উপরে প্রকারান্তরে এরূপ দোষারোপ করা হইতেছে না যে, ইন্দ্রিয়-বাদী অন্যান্য ব্যক্তি

অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয়াসক্ত; "ইন্দ্রিয়-বাদী" বলিতে শুদ্ধ কেবল এই পর্য্যন্তই বুঝায় যে, তাঁহার মতানুসারে মনুষ্যের সমস্ত জ্ঞানই আপাদ মস্তক ইন্দ্রিয়-মূলক। ইন্দ্রিয়-বাদীরা কখনো কখনো এই একটি অসাধারণ গুণের জন্য আপনাদিগকে শ্লাঘান্বিত মনে করেন—এবং লোকের নিকটেও প্রতিপত্তি লাভ করেন যে, দার্শনিকদিগের মধ্যে তাঁহারাই কেবল পরীক্ষা-লব্ধ সত্যের উপরে জ্ঞানের মূল-পত্তন করেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, সকল সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরাই তাহাই করেন; তবে যদি কাণ্ট্‌কে ব্যতিরিক্তের কোটায় গণ্য করা যায়—সেই যা এক। কাণ্টের মতানুসারে, এক জাতীয় জ্ঞান বাহির হইতে আসিতেছে এবং আর-এক জাতীয় জ্ঞান ভিতর হইতে আসিতেছে; আর, এই দুই জাতীয় জ্ঞানের ভেদ নিরূপণ করিতে গিয়া কাণ্ট পূর্ব্বোক্তকেই (বহির্মূলক জ্ঞানকেই) কেবল পরীক্ষা-লব্ধ জ্ঞান (experience) বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। কিন্তু পরীক্ষা শব্দের এরূপ অর্থ-সংকোচ নিতান্তই স্বকপোল-কল্পিত ও অযৌক্তিক। যদি আমাদের মনোমধ্যে বাস্তবিকই কোন-প্রকার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান থাকে, তবে অবশ্য তাহার স্বতঃসিদ্ধতা আমরা পরীক্ষাতেই উপলব্ধি করি—তাহা কিছু-আর আমরা গায়ের জোরে মানিয়া লই না। প্রকৃত কথা এই যে, কি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান—কি পরতঃসিদ্ধ জ্ঞান—সকল জ্ঞানই পরীক্ষা-লব্ধ। জ্ঞানকেই পরীক্ষা বলে, আর, পরীক্ষাকেই জ্ঞান বলে। বস্তু যাহা—তাহা একই; তবে কি না—তাহার একটি নাম "পরীক্ষা," আর-একটি নাম জ্ঞান, এই যা কেবল প্রভেদ। "সমস্ত জ্ঞানই পরীক্ষা-লব্ধ" এ কথার অর্থ শুদ্ধ কেবল এই যে, সমস্ত জ্ঞানই জ্ঞান; এ তো ধরা কথা, ইহার উপরে আর কাহারো কোন বাদানুবাদ চলিতে পারে না। কিন্তু যদি বলা যায় যে, সমস্ত জ্ঞানই ঐন্দ্রিয়ক পরীক্ষা হইতে সমুদ্ভূত, তবে দাঁড়ায় এই যে, সমস্ত জ্ঞানই ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান,—এ কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। এ কথা লইয়া অনেক বাদানুবাদ চলিয়া গিয়াছে এবং এখনো চলিতেছে। এটি আমাদের প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তেরই কথা। তাহার জন্য কোন চিন্তা নাই—বর্ত্তমান দশম সিদ্ধান্ত উহাকে জ্ঞানের দুইটি অবশ্যম্ভাবী সত্যের বিরোধী বলিয়া অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছে—সুতরাং আর যে, কখনও উহা মাথা তুলিবে, সে পথ জন্মের মত বন্ধ হইয়া গেল।

অতীন্দ্রিয়-বাদী মনোবিজ্ঞান প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের ব্যাপ্তি কমাইয়া দেয়—এই মাত্র, কিন্তু তাহার স্ববিরোধ অব্যাহত রাখিয়া দেয় ॥৭॥

প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটির বলবত্তার বিরুদ্ধে মনোবিজ্ঞান অনেক কথা বলিয়াছেন; কিন্তু মনোবিজ্ঞানের সমস্ত চেষ্টা শুদ্ধ কেবল ঐ সিদ্ধান্তটির ব্যাপ্তি-সংকোচেই নিয়োজিত হইয়াছে; উহার ব্যাপ্তি—মনে কর যেন—অতীব সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে অবরুদ্ধ হইল, তাহাতেই বা কি? তাহাতে তো আর উহার স্ববিরোধিতা ঘুচে না; কেন না ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি যে, উহার ব্যাপক অর্থেও উহা যেমন স্ববিরোধী—উহার সঙ্কীর্ণ অর্থেও উহা তেমনি স্ববিরোধী; আমাদের সমস্ত জ্ঞানই কেবল মাত্র ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান—ইহা যেমন স্ববিরোধী, আমাদের কোন কোন জ্ঞান কেবল-মাত্র ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান—ইহাও তেমনি স্ববিরোধী। মনোবিজ্ঞানের কৃত ব্যাপ্তি-সংকোচ এইরূপ, যথা;—মনোবিজ্ঞানী বলেন যে, আমাদের সমস্ত জ্ঞানই যে, ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া আসে, এ কথা সত্য নহে; কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, বিশেষ এক জাতীয় জ্ঞান শুদ্ধ কেবল ঐন্দ্রিয়ক উপরাগ ভিন্ন আর কিছুই নহে; ইঁহাদের অভিপ্রায় এরূপ নহে যে, ঐন্দ্রিয়ক উপরাগ উক্ত "বিশেষ এক জাতীয় জ্ঞানের" আংশিক উপাদান—ইঁহাদের মতে ঐ-জাতীয় জ্ঞানের সর্ব্বাংশই ঐন্দ্রিয়ক উপাদানে পরিগঠিত। প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটির ব্যাপ্তিকে এইরূপে সীমাবদ্ধ করিলে কতক অংশে উহার প্রতিবাদ করা হয় বটে কিন্তু তেমনি আবার কতক অংশে উহাকে অনুমোদনও করা হয়; ইহাতে তাহার স্ববিরোধিতার তিলমাত্রও উপশম হয় না।

সকল রোগের মূল ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বতন তত্ত্বজ্ঞেরা জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয় এ দুয়ের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের সুব্যবস্থা এবং সুগতির পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজনীয়; এখনকার দর্শনকারেরা সেই প্রভেদটিকে একেবারেই উড়াইয়া দে'ন—ইহাই সমস্ত রোগের মূল। তত্ত্ব-জ্ঞানক্ষেত্রে দ্বিতীয় এমন একটি গুরুতর প্রভেদ নিরূপিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। এই জন্য প্রভেদটির কালে কালে যেরূপ ভাল মন্দ গতি ঘটিয়াছে ও তাহাকে গোলে ফেলা'তে যেরূপ নানা প্রকার জটিল তর্কবিতর্কের তুমুল কোলাহল দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; তাহার একটি ইতিবৃত্ত এখানকার স্থানোচিত; বিশেষত যখন—সমস্ত দার্শনিক টীকা ও ভাষ্যের মূল-সূত্র বাহির করিয়া দেখানো বর্ত্তমান সংহিতার প্রধান একটি সংকল্প।

গ্রীস্ দেশীয় দর্শনকারদিগের উদ্দেশ্য এবং তাহার সাধন প্রণালী ॥ ৯ ॥

ইতি পূর্ব্বে আমরা একস্থানে বলিয়াছি যে, গ্রীস্ দেশীয় প্রাচীন দর্শন-শাস্ত্র যে অংশে জ্ঞান-তত্ত্বের লক্ষণাক্রান্ত সে অংশে এইটি বুঝানোই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে, অবিদ্যা কিরূপে বিদ্যাতে পরিণত হয়—অজ্ঞেয় কি প্রণালীতে জ্ঞেয়ত্ব প্রাপ্ত হয়—যাহা কোন-ক্রমেই বোধায়ত্ত হইবার নহে তাহা কিরূপ পরিবর্ত্তনের বশবর্ত্তী হইয়া বোধগম্য পদবীতে সমুত্থান করে। এইজন্য যাহা একেবারেই জ্ঞানের অগম্য—বুদ্ধির অতীত—তাহাই উক্ত দর্শন-শাস্ত্রের যাত্রারম্ভের প্রথম পঁইটা ছিল, তাহা কি? না অবিদ্যা—স্ববিরোধী অর্থ-শূন্য অবিদ্যা। এরূপ যদি মনে করা যায় যে, যাহা পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞেয় হইয়া বসিয়া আছে তাহা কিরূপে জ্ঞেয়ত্ব প্রাপ্ত হয় ইহারই প্রণালী প্রদর্শন করা উক্ত দর্শন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল, তবে নিতান্তই ভুল মনে করা হয়; কেননা, শুধু শুধু ওরূপ একটা বৃথা কর্ম্ম-ভোগে ব্যাপৃত হওয়া এখনকার কালেরই ধর্ম্ম। প্রাচীন-দর্শন-শাস্ত্রের যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাহা আর কিছু নয়—স্ববিরোধী কেমন করিয়া—অর্থাৎ কিরূপ পরিবর্ত্তনের বশবর্ত্তী হইয়া—জ্ঞানের গম্য হয়, সংক্ষেপে—অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া তাহা কিরূপে বিদ্যাতে পরিণত হয়, এইটি বুঝানো; আর, তাহার কার্য্য-পদ্ধতি ছিল এইরূপ, যথা;—উক্ত দর্শন-শাস্ত্র বলে যে, ইন্দ্রিয় কেবল অবিদ্যারই গ্রহণ-কর্ত্তা—ইন্দ্রিয়ের অর্থই হ'চ্চে অনর্থ। অবিদ্যা, অর্থাৎ একটা স্ববিরোধী ব্যাপার, সহজ কথায়—একটা পাগ্‌লামি কাণ্ড। ইন্দ্রিয়—জ্ঞান-বহির্ভূত জড়-জগৎকে আঁকড়িয়া ধরে; এরূপ অঙ্গহীন জড়জগৎ একটা স্ববিরোধী অর্থ-শূন্য পাগ্‌লামি কাণ্ড বই আর কিছুই নহে—উহা কোন জ্ঞানেই উপলব্ধি-

গম্য নহে। এখন প্রশ্ন এই যে, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত সেই যে, অনর্থ-জগৎ—পাগলামি কাণ্ড—অবিদ্যা, তাহা কিরূপে জ্ঞানের বিষয়ীভূত সত্যে—বিদ্যাতে—পরিণত হয়? প্রাচীন দর্শনকারেরা ইহার মীমাংসা এইরূপ করেন যে, জ্ঞান তাহার আপনার ভাণ্ডার হইতে অঙ্গহীন জড়-জগতের অভাব পূরণ করিয়া অবিদ্যাকে বিদ্যাতে পরিণত করে; জ্ঞানের নিকট হইতে এইরূপ সাহায্য লাভ করিয়াই—জড়জগৎ অবিদ্যায় নিশা হইতে বিদ্যার (অর্থাৎ সমীচীন জ্ঞানের) দিবালোকে সমুত্থান করে। কিন্তু যাহা দিয়া জ্ঞান অঙ্গহীন জড়জগতের অঙ্গ-পূরণ করে তাহা যে, কি, প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞেরা তাহা স্থির করিয়া ওঠা তেমন সহজ পা'ন নাই।

ইতিহাস লেখকের অবলম্বনীয় একটি নিয়ম॥ ১০॥

দার্শনিক মতামতের ইতিহাসের আন্দোলন-কালে, সুস্পষ্ট এবং সন্তোষ-জনক ফল-লাভ করিবার এক যাহা উপায় তাহা এই;—প্রথমে, দর্শনকারের সমুদায় কথাগুলির মোট তাৎপর্য্যটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাই তাঁহার আয়ের কোটায় নিক্ষেপ করা, এবং তাহার পরে তাঁহার দ্ব্যর্থ-সূচক অস্পষ্ট উক্তি সকলকে ব্যয়ের কোটায় নিক্ষেপ করা। ফলে, প্রথমে তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায়টিকে এই-ভাবে দেখা উচিত যে, যেন তিনি তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন; এবং তাহার পরে তখন বিবেচ্য যে, বিভ্রান্তির গতিকে তিনি তাঁহার অভীষ্ট ফল-লাভে কতদূর বঞ্চিত হইয়াছেন। দর্শন-শাস্ত্রের সুবিচার-সঙ্গত ইতিহাস লিখিতে হইলে এইরূপ প্রণালীর অবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কেননা, দার্শনিক চিন্তার প্রথম উদ্যমে তাহা অতীব অপক্ব এবং অস্পষ্ট আকারে লিপিবদ্ধ হইবারই কথা; কাজেই, শুদ্ধ কেবল তাহা দৃষ্টে দর্শন-কারের প্রকৃত মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্যের ভিতর প্রবেশ করিতে পারা অসম্ভব। দার্শনিক মতামতের ইতিহাস-লেখকেরা সচরাচর যেরূপ অস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থসূচক মত-সকলকে তথৈব অস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থসূচক বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিয়া থাকেন তাহাতে কোন ফলই দর্শে না।

বর্ত্তমান সংহিতায় এই প্রণালীটি অবলম্বিত হইয়াছে॥ ১১॥

এটুকু যখন আমরা বুঝিয়াছি, তখন আমাদের কর্ত্তব্য এখন এই যে, এখানকার আলোচ্য দার্শনিক মতটিকে আমরা অতীব সুস্পষ্ট আকারে প্রদর্শন করি, আর, আপাতত এইরূপ মনে করি—যেন সেইরূপ আকারেই তাহা গ্রীস্ দেশীয় প্রাচীন দার্শনিকদিগের লেখনী হইতে বিনির্গত হইয়াছিল; কেননা, ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ মতটি বাস্তবিকই তাঁহাদেরই মত—তবে কি না—উহাতে তাঁহারা স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন নাই। তাঁহাদের দ্ব্যর্থ-ভাব এবং সেই দ্ব্যর্থ-ভাবের ফল যাহা পরপরবর্ত্তী দার্শনিক আলোচনা-ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ফলিত হইয়াছে, তাহা যখন আমরা বাহির করিয়া দেখাইব, তখন কোন্ বিষয়ে উঁহাদের ন্যূনতা ছিল তাহা ধরা পড়িতে বাকি থাকিবে না।

ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞানের প্রভেদের ইতিহাসে প্রত্যাবর্ত্তন॥ ১২॥

এতক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহাতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞেরা ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞানের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ নিরূপণ করিয়াছেন তাহা প্রভেদের পরাকাষ্ঠা। এ নহে যে, তাঁহারা ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞান এ দুইটি ব্যাপারকে অন্তঃকরণের দুইটি সহোদর বৃত্তি ঠাহরিয়াছিলেন; তাঁহাদের অবধারিত প্রভেদ আরো ব্যাপক এবং তল-স্পর্শী। বরং তাঁহারা ও দুইটি ব্যাপারকে একই মনোবৃত্তির দুইটি বিপরীত পৃষ্ঠ বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রিয় অবিদ্যাকে ধরিয়া আনিয়া জ্ঞানের সমক্ষে উপস্থিত করে, আর, জ্ঞান সেই অবিদ্যাকে বিদ্যাতে পরিণত করে। ঐন্দ্রিয়ক উপাদান-গুলি যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞান-কর্ত্তৃক শোধিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে-গুলি অবিদ্যাবস্থায় (অর্থাৎ স্ববিরোধী অবস্থায়) বর্ত্তমান থাকে। সে অবস্থায় সে-গুলি একান্ত পক্ষেই জ্ঞানের অগম্য। পরে যখন জ্ঞান জাগিয়া উঠিয়া আপনার ভিতর হইতে আর-একটি উপাদান বাহির করিয়া সে-গুলির গাত্রে সংলগ্ন করিয়া দেয় তখনই সে-গুলি জ্ঞানের গম্য হয়। এই অতিরিক্ত উপাদানটির সাহায্যেই জ্ঞানের বিষয়-সকল জ্ঞানাভ্যন্তরে স্থান প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়ের প্রদত্ত অবিদ্যা-উপাদান, এবং জ্ঞানের প্রদত্ত অতিরিক্ত আর-একটি উপাদান, এ দুই উপাদান এক সঙ্গে জানার গতিকেই জ্ঞান আপনার বিষয়-রাজ্যে অধিকার প্রাপ্ত হয়। এই প্রণালী অনুসারেই ইন্দ্রিয়ের স্ববিরোধী বস্তু-সকল জ্ঞানের বিজ্ঞেয় বস্তুতে পরিণত হয়; এই প্রণালীটির কার্য্য যতক্ষণ না পরিসমাপ্তি হয় ততক্ষণ তাহা জ্ঞানে ধরা পড়ে না বটে—কিন্তু পরে তাহা দার্শনিক চিন্তাতে সুব্যক্ত আকারে প্রতিভাত হয়। মনুষ্যের জ্ঞান-সমক্ষে জড়জগতের যেরূপ চাঁচা-চোঁচা পরিষ্কার মূর্ত্তি সুপরিস্ফুট হয়, তাহা ঐ প্রণালী-অনুসারেই হইয়া থাকে। জড়জগৎ যে অংশে জ্ঞানগম্য এবং ধ্যান-গম্য সে অংশে তাহাতে ইন্দ্রিয়ের কোন সম্পর্ক নাই, কেবল যে অংশে তাহা জ্ঞানের অগম্য এবং স্ববিরোধী সেই অংশেই ইন্দ্রিয় তাহা লইয়া ব্যাপৃত হয়। এইটিই প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞানের মর্ম্ম-নিহিত অভিপ্রায় ইহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। জ্ঞানের যাহা কার্য্য তাহা জ্ঞানই করিতে পারে—ইন্দ্রিয় তাহা কোন অংশেই পারে না; ইন্দ্রিয় নিছক স্ববিরোধী ব্যাপারেই ব্যাপৃত থাকে। কাজেই—স্ববিরোধিতার ভঞ্জন-কার্য্যেও ইন্দ্রিয়ের কোন হস্ত নাই, আর, স্ববিরোধিতা অপগত হইলেও বিরোধ-মুক্ত বিষয়ের উপলব্ধি কার্য্যেও তাহার কোন হস্ত নাই। স্ববিরোধী বিষয়-সকলকে জ্ঞান-সমক্ষে উপস্থিত করাই ইন্দ্রিয়ের একমাত্র কার্য্য; আর, তাহা জ্ঞান-সমক্ষে উপস্থিত হইলেও জ্ঞান যতক্ষণ না আপনাকে তাহার সঙ্গে একত্র উপলব্ধি করে ততক্ষণ তাহার বিরোধ-ভঞ্জন হয় না সুতরাং ততক্ষণ তাহা জ্ঞানের উপলব্ধি-যোগ্য হয় না।

প্রাচীন মত-সম্বন্ধে একটি উপমা॥ ১৩॥

এখানকার এই কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য্য যে কি তাহা নিম্ন-লিখিত উপমা-দৃষ্টে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে;—মনে কর যেন স্ববিরোধী অবিদ্যা কিছু-না অপেক্ষা (০ অপেক্ষা) অধিক, কিন্তু একটা-না-একটা কিছু অপেক্ষা (১ অপেক্ষা) কম। কিন্তু সেই যে অবিদ্যা—যাহা শূন্যও নয়, একও নয়, তাহা কোন জ্ঞানেই উপলব্ধি-গম্য নহে; কেননা জ্ঞানে যাহা উপলব্ধি-গম্য, হয়—তাহা একটা-না-একটা কিছু, (যমন আলোক); নয়—তাহা একটা-না-একটা কিছুর অভাব (যেমন অন্ধকার—নিঃস্তব্ধতা ইত্যাদি), সাঙ্কেতিক ভাষায়—হয় তাহা ১, নয় তাহা ০, ইহার অন্যথায় কোন-কিছুই জ্ঞানে প্রকাশ পাইতে পারে

না। এইটিই প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞদিগের মন্তব্য কথা; কি? না, জড়জগৎকে যদি জ্ঞানের সহিত একেবারেই সম্পর্ক-রহিত বলিয়া ভাবা যায়, তবে সমস্ত জড়জগৎই এইরূপ দাঁড়ায় যে, তাহা শূন্যও নয়, একও নয়, কিন্তু দুয়ের মাঝামাঝি একটা অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার। জড়বস্তুর স্বরূপ (অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত সম্পর্ক-চ্যুত জড়বস্তু স্বয়ং) শূন্য অপেক্ষা অধিক অথচ এক-অপেক্ষা (অর্থাৎ একটা-কোন-কিছু অপেক্ষা) কম। কিন্তু এ তো একটা অর্থ-শূন্য স্ববিরোধী ব্যাপার। বটেই তো;—উহা যদি অর্থশূন্য না হইবে, তবে প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞেরা উহাকে অর্থবত্তায় উত্তোলন করিবার জন্য এত যে আয়াস পাইয়াছেন—তাহা কি শুদ্ধ কেবল তেলা-মাথায় তেল দিবার জন্য! কেননা, অগ্রে অর্থ-শূন্য সামগ্রী হস্ত-গত হইলে তবে তো তাহাকে অর্থবান্ করিয়া গড়িয়া তোলা—একটা কার্য্যের মধ্যে গণ্য হইতে পারে। মৃত্তিকা হইতে ইষ্টক নির্ম্মাণ করিতে হইলে, অগ্রে মৃত্তিকার যোগাড় করা চাই তো। এইজন্য প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞেরা বলেন যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ সমস্ত জড়জগৎ—অর্থশূন্য এবং স্ববিরোধী। কিন্তু অর্থ-শূন্য সামগ্রী জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে। প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞেরা বলেন, ঠিক্ই বটে—তাহা জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের কার্য্যই এই যে, তাহা সেই অর্থ-শূন্য অবিদ্যাকে গ্রহণ করে—এবং তাহাকে জ্ঞানের হস্তে সঁপিয়া দেয়; জ্ঞান তখন আপনার মাল্ মস্‌লা তাহাতে সংযোগ করিয়া তাহাকে অর্থ-বিশিষ্ট জ্ঞেয়-বস্তু করিয়া গড়িয়া তোলে—অবিদ্যাকে 'বিদ্যাতে 'পরিণত করে, যাহা এক অপেক্ষা কম (মনে কর যেন অর্দ্ধাংশ) তাহাতে অবশিষ্ট অংশ সংযোগ করিয়া তাহাকে একে পরিণত করে। ঐন্দ্রিয়ক জগৎকে জ্ঞান-গম্য করিয়া তুলিবার জন্য যাহা আবশ্যক—জ্ঞান তাহা নিজের ভাণ্ডার হইতেই যোগাইয়া দেয়; এইরূপে জ্ঞান স্ববিরোধী অবিদ্যাকে আপন অধিকারাভ্যন্তরে টানিয়া লইয়া বিদ্যাতে পরিণত করে।

প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞেরা এ যাহা করিয়াছেন তাহা ঠিক্ই করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

প্রাচীন দর্শন-কারেরা যে, তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃত প্রশ্নটির সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং তাঁহারা যে, প্রকৃত প্রণালী অনুসারে তাহার মীমাংসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। অবোধ্যকে বোধ্য করিয়া গড়িয়া তোলা—এইটি কিরূপে হইতে পারে, ইহাই তাঁহাদের অন্বেষণের বিষয় ছিল; তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য প্রশ্নটিকে নানা আকারে দাঁড় করানো যাইতে পারে কিন্তু তাঁহারা তাহাকে খুব একটি ভাল আকারে দাঁড় করাইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাদের কার্য্য ছিল এই যে, সেই যে, একটা অবোধ্য এবং স্ববিরোধী ব্যাপার—তাহা যে, বস্তুটা কি, তাহা স্থির করা; কারণ, যদি অবোধ্য না থাকে, অথবা তাহাকে যদি খুঁজিয়া পাওয়া না যায়, তবে সেই খানেই উক্ত প্রশ্ন এবং মীমাংসা উভয়েরই প্রাণ ত্যাগ হয়। এইরূপ বিবেচনায় তাঁহারা জড়বস্তুর স্বরূপকে স্ববিরোধী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু যদি এই স্ববিরোধীকে অবিরোধী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়, তবে তাহাকে কোন-না-কোন প্রকারে জ্ঞান-সমক্ষে উপস্থিত করা আবশ্যক। এই জন্য অতঃপর তাঁহাদের কার্য্য ছিল এই—কি উপায়ে সেইটি সুসিদ্ধ হইতে পারে তাহা অবধারণ

করা। তাঁহাদের মতে সে উপায়—ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের কার্য্যই হ'চ্চে—ঐকান্তিক অবোধ্য ব্যাপারকে—অবিদ্যাকে—আনিয়া জ্ঞানের হস্তে সঁপিয়া দেওয়া। এইরূপ, জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়ের প্রভেদের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান করিয়া আমরা পাইতেছি যে, প্রাচীন দর্শনের মীমাংস্য প্রশ্নের আকার প্রকার এবং তাহার মীমাংসা কার্য্যের প্রণালী-পদ্ধতি দুইই এ বিষয়ে একবাক্য যে, ইন্দ্রিয় ঐকান্তিক অবোধ্য-রূপী অবিদ্যারই গ্রাহক; আর, এ মতটির সহিত বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন দর্শনকারেরা ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞানের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—তাহা যেমন-তেমন প্রভেদ নহে, তাহা স্বরূপ-গত এবং মূল-গত প্রভেদ।

কেন যে এই সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য সহসা প্রতীয়মান হয় না তাহার কারণ নির্দ্দেশ ॥ ১৫ ॥

কেন যে, এই সিদ্ধান্তটির যাথার্থ্য বলিবামাত্রই লোকের হৃদয়ঙ্গম হয় না; তাহার কারণ আর কিছু নয়—শুদ্ধ কেবল এই যে, বাস্তবিক ধরিতে গেলে যদিচ আমরা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি অতীন্দ্রিয় বিষয় উপলব্ধি করি, কিন্তু আমরা মনে করি—যেন আমরা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় ছাড়া অপর কোন-কিছুই উপলব্ধি করিতেছি না; অন্ততঃ আমাদের আটপহুরিয়া মনের দশা ঐরূপ। এই জন্য আমরা মনে করি যে ইন্দ্রিয় আমাদের জ্ঞান-সমক্ষে অবোধ্য সামগ্রী উপস্থিত করে না—বোধ্য সামগ্রীই উপস্থিত করে। এটা তখন আমাদের মনে থাকে না যে, জ্ঞানের গুণেই বস্তু-সকল বোধ্য হয়—ইন্দ্রিয়ের গুণে নহে। বোধ্য বস্তু হইতে যদি জ্ঞানকে টানিয়া লওয়া যায় তবে অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাকে ঐকান্তিক অবোধ্য ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কেননা জ্ঞানের প্রকৃতিই এই—শুদ্ধ কেবল আমার জ্ঞানের বা তোমার জ্ঞানের নহে কিন্তু জ্ঞান-মাত্রেরই প্রকৃতি এই—যে, তাহা আপনাকে না জানিয়া কোন বস্তুকেই জানিতে পারে না। এ কথা যদি সত্য হয় যে, নিকৃষ্ট জীবেরা আপনাকে আপনি জানে না (ইহা খুবই সম্ভব, যদিচ এ বিষয়ে এখানে আমরা কোন মতামত প্রকাশ করিতে চাই না) তাহা হইলে, সমস্ত ইন্দ্রিয় সত্ত্বেও তাহারা অর্থ-শূন্যতা মূর্ত্তিমান, আর, নিছক্ অবিদ্যার প্রতিই তাহারা অষ্ট প্রহর ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহে।

জ্ঞান কি দিয়া অবোধ্যকে বোধ্য করিয়া তুলে এইটিই কঠিন প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥

প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞেরা জ্ঞানের ঐন্দ্রিয়ক অবয়বটির সম্বন্ধে এইরূপ তো স্থির করিলেন যে, তাহা স্ববিরোধী অর্থশূন্য অবিদ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে; কিন্তু জ্ঞানের অপর অবয়বটি যে, কি, অতীন্দ্রিয় অবয়বটি যে, কি—যাহার সংস্পর্শ-মাত্রে অবিদ্যার আবর্ত্তে ঘূর্ণায়মান স্ববিরোধী এবং অর্থশূন্য জগৎ সৌন্দর্য্য সুশৃঙ্খলা এবং জ্ঞানের আলোকে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে তাহাই বা কি, আর, তাহার প্রকৃতিই বা কিরূপ, তাহা স্থির করিতে তাঁহাদিগকে অধিকতর আয়াস পাইতে হইয়াছিল। পিথাগোরাসের মত এই যে, সংখ্যা—যাহা জ্ঞানের একটি নিজের প্রদত্ত সামগ্রী, তাহারই প্রসাদে ঐরূপ সুপরিণাম সংঘটিত হয়। প্লেটো বলেন—মৌলিক ভাব-সকলের গুণেই ঐরূপ হয়। বর্ত্তমান সংহিতার মতানুসারে, বিষয়-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-জ্ঞানের স্ফুরণ বশতই ঐরূপ হয়।

আত্মজ্ঞানই অন্ধকারের আলোক—স্ববিরোধী বিবাদ-বিসম্বাদের প্রশামক, বিভ্রান্তকারী অব্যবস্থার ব্যবস্থাপক—একত্ব এবং অনেকত্ব উভয়েরই মূল; এইটিই সেই অমূল্য স্পর্শমণি যাহার গুণে অবিদ্যা বিদ্যাতে পরিণত হয়। উপরে যে তিনটি মতের উল্লেখ করা হইল পিথাগোরাসের মত—প্লেটোর মত—ও আমাদের এখানকার মত, তিনই এই বিষয়টিতে একবাক্য যে, উক্ত অতীন্দ্রিয় অবয়বটি জ্ঞানের সার্ব্বভৌমিক বৃত্তি—ঐন্দ্রিয়ক অবয়ব-গুলি জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ বৃত্তি; কেবল সেই সার্ব্বভৌমিক বৃত্তিটি যে, কি, ইহা লইয়াই তিনের মধ্যে যত কিছু মত-ভেদ; পিথাগোরাসের মতে তাহা সংখ্যা, প্লেটোর মতে তাহা মৌলিক ভাব, আমাদের মতে তাহা আত্মজ্ঞান।

মৌন ব্রতের প্রকৃত তাৎপর্য্য।

শাস্ত্রে আছে

"মৌনান্নস মুনির্ভবতি নারণ্যবসনান্মুনিঃ।
স্বলক্ষণন্তু যোবেদ স মুনিশ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥"

মৌন প্রযুক্তও লোকে মুনি হয় না, অরণ্যবাস প্রযুক্তও লোকে মুনি হয় না; যিনি আপনার লক্ষণ জানেন, তিনিই মুনিদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইহাতে বুঝা যাইতেছে এই যে, মৌনব্রত শুদ্ধ কেবল একটি উপলক্ষ মাত্র; আপনার লক্ষণ জ্ঞাত হওয়াই তাহার প্রকৃত লক্ষ। আপনার লক্ষণ আপনার নিকট হইতেই জানিবার কথা, অন্যের নিকট হইতে শুনিয়া শিখিবার কথা নহে। যাহা অন্যের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয়, তাহারই জন্য ভাষা-ব্যবহার আবশ্যক; কিন্তু যাহা আপনার নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয়, তাহার জন্য ভাষা ব্যবহারের বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বাক্য এমনি আমাদের মুখস্থ যে, যখন আমরা মনোমধ্যে কোন একটি বিষয়ের তোলা পাড়া করি, তখনও আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা করিতে পারি না। অন্যের সঙ্গে বাক্যালাপ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত থাকি না, আমরা আপনার সঙ্গেও বাক্যালাপ করিতে প্রবৃত্ত হই। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আমরা যখন আপনার সঙ্গে আপনি পরিচিত হইতে ইচ্ছা করি, তখন তাহার মধ্যেও আবার বাক্যের আড়াল কেন? আপনার মনের ভাব অন্যকে বুঝাইতে হইলে অথবা অন্যের মনের ভাব আপনি বুঝিতে হইলে, বাক্যের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা হইতে পারে না—ইহা যেন বুঝিলাম, কিন্তু আপনার নিকট হইতে আপনার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে হইলে বাক্য উচ্চারণে কি লাভ? লাভ দূরে থাকুক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে—শেষোক্ত স্থলে বাক্য অভীষ্ট সাধনের অনুকূল তত নহে যত প্রতিকূল। অনেক সময়ে আমরা বাক্যের মোহিনী শক্তিতে এমনি অথর্ব্ব বনিয়া যাই যে, তাহার প্রকৃত মর্ম্মের ভিতরে যে, একটু স্থির চিত্তে তলাইয়া দেখিব, সে শক্তি আমাদের ত্রিসীমা হইতে পলায়ন করে। মনে কর যে, আমাকে লক্ষ করিয়া চতুর্দ্দিকের সংবাদ পত্র হইতে এই একটি মোহিনী বাণী উত্থিত হইল যে, অমুক ব্যক্তি অসামান্য জ্ঞানী; অমনি, আমার মনোমধ্যে "আমি জ্ঞানী আমি জ্ঞানী" এই কথাটিই ক্রমাগত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; শুদ্ধ কেবল ঐকথাটি মনোমধ্যে চর্ব্বিত চর্ব্বন করিয়া আমি পরম আনন্দ অনুভব করিতেছি—তাহার অর্থ

যে, কি, সে দিকে আমার ভ্রুক্ষেপ মাত্রও নাই; তখন আমি সেই ধ্বনি-টা'র তোড়ের মুখে এমনি সবেগে ভাসিয়া চলিয়াছি যে, একটু যে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া বলিব যে "লোকে আমার অসামান্য জ্ঞান ঘোষণা করিতেছে বটে, কিন্তু আমার নিজের জ্ঞান তো আমার নিজের অগোচর নহে—আমার জ্ঞান যে, কতটুকু, তাহা আমি নিজেই কেন একবার অন্তরে চক্ষু মেলিয়া দেখি না?" এ কথা যে, বলিব, এ বোধ তখন আমার মূলেই নাই। তখন "জ্ঞানী" এই শব্দটাতেই আমার জ্ঞান-স্পৃহা সম্যক্ চরিতার্থ হইতেছে—জ্ঞান অন্বেষণের আবশ্যকতাই মনে হইতেছে না। "জ্ঞান" এই শব্দটিকে ছাড়িয়া দিয়া আমার জ্ঞান যে, বাস্তবিক কি প্রকার, তাহার প্রতি যদি আমি প্রণিধান করি, তাহা হইলে আমি আপনার লক্ষণের পরিচয় লাভ করি—কিন্তু তাহা করিতে আমার অবকাশও নাই—রুচিও নাই—প্রবৃত্তিও নাই; "আমার জ্ঞানের তুলনা নাই" এই অর্থহীন শব্দ-মাত্রেই আমি স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইতেছি। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, আত্ম-লক্ষণের পরিচয় প্রাপ্ত হইতে হইলে আপাততঃ বাক্যকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া যথার্থ সত্যের প্রতি তদ্‌গত ভাবে অভিনিবিষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। বাইবেলের একটি প্রসিদ্ধ বচন এই যে, "Letter killeth but spirit giveth life" বাক্য বধ করে (অর্থাৎ কার্য্য নষ্ট করে), কিন্তু ভাব জীবন দান করে (অর্থাৎ কার্য্য-সামর্থ্য প্রদান করে)। সুবিখ্যাত ইংসাজি সাহিত্যকার গোল্‌ড্ স্মিথ্ একস্থানে বলিয়াছেন যে, বাক্যের ব্যবহার মনের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য তত নহে—যত মনের ভাব গোপন করিবার জন্য। মিথ্যা নহে—একজন নিতান্ত মূর্খ চাসাও ভদ্র সমাজে আপনার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে গিয়া সাধুভাষাকে মুচ্‌ড়াইয়া কত না বিকলাঙ্গ করিয়া তুলে। আমাদের দেশের একজন অতীব সুবিখ্যাত দেশহিতৈষী সংবাদ পত্রের সম্পাদক স্বকার্য্যে অদ্বিতীয় পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া এমন একটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন—যাহার তিনি ক অক্ষরও জানেন না; তিনি কাণ্টের দর্শন-শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া অনভিজ্ঞ লোকের নিকটে আপনার দার্শনিকতার পরিচয় না দিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। ভদ্রসমাজে আমরা এইরূপ ভাবে কথা বার্ত্তা কহি যে, আমরা যাহার কিছুই জানি না—তাহা যেন আমাদের বিলক্ষণই জানা আছে। এইরূপে অন্যের চক্ষে ধূলি প্রদান করিতে করিতে অবশেষে আমরা আপনার চক্ষে ধূলি দিয়া বসি; আমরা যাহা মূলেই জানি না—আমরা মনে করি যেন সত্যসত্যই আমরা তাহা জানি। এই সকল বাক্য-দোষ হইতে মুক্তি পাইবার জন্যই আমাদের দেশের বিশেষ এক শ্রেণীর সাধক-সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌন ব্রতের প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার অর্থ এ নহে যে, বোবা হইয়া বসিয়া থাকাই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ। নিদ্রা যাওয়াই কিছু আর নিদ্রার উদ্দেশ্য নহে—জাগ্রৎকালের শারীরিক স্ফূর্ত্তি-বর্দ্ধনই নিদ্রার চরম উদ্দেশ্য; মৌন ব্রতই কিছু আর মৌনব্রতের উদ্দেশ্য নহে—মনের সহিত বাক্যের ঐক্য সংস্থাপনই মৌনব্রতের চরম উদ্দেশ্য। কথায় বলে যে, "আটেপিটে দড় তো ঘোড়ার উপর চড়," ঘোড়ায় চড়িতে গেলে তাহার পূর্ব্বে আটে পিটে দড় হওয়া চাই। বাক্য অশ্ব, আর, মন অশ্বারোহী; এই অশ্বকে

WORM EATEN.

রীতিমত চালনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে মনকে কতককাল ধরিয়া সত্যের হস্তে পরিগঠিত হওয়া আবশ্যক।

"তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।"

সেই পরমাত্মাকেই জানো, অন্য বাক্য সকল পরিত্যাগ কর, ইনিই অমৃতের সেতু। সমস্ত বাক্য পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মাতে মনকে তদ্গত ভাবে নিবিষ্ট করিতে শিক্ষা করাই মৌন ব্রতের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

আমরা আমাদের আপনার লক্ষণ অন্যের নিকটে শিক্ষা করিতে যাই। কাহারো নিকটে শুনি যে, তোমার মস্তকের ভিতরে যে মস্তিষ্ক আছে—সেই মস্তিষ্কই তুমি; ইহাতে হয় কেবল এই যে, কতক কাল ধরিয়া "মস্তিষ্ক—মস্তিষ্ক—মস্তিষ্ক" এই একটা শব্দ আমাদের মনোমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে; ক্রমে আমরা আমাদের মনকে গড়িয়া পিটিয়া এইরূপ করিয়া দাঁড় করাই যে, মস্তিষ্ক এই শব্দটি শুনিবামাত্র আমাদের মনে হয় যে, এই তো আমি—এ ছাড়া আর তো কিছুই দেখি না; ইহাতে আমরা আপনার লক্ষণেরও পরিচয় পাই না, মস্তিষ্কের লক্ষণেরও পরিচয় পাই না, শুদ্ধ কেবল "মস্তিষ্ক" এই শব্দটিকে অহং-শব্দের স্থলাভিষিক্ত করি—এই পর্য্যন্তই সার। কাহারো নিকট শুনি যে, তোমার শরীরের সর্ব্বশুদ্ধ ধরিয়া যে একটি সাধারণ অবস্থা—তাহাই তুমি। কিন্তু সাধারণ অবস্থা একটা শব্দ-মাত্র—তাহা যে, কি, তাহার কোন অর্থই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইত্যাদি। আমরা এটা বুঝি না যে, আমাদের গোড়াতেই ভুল—অন্যের নিকটে আপনার লক্ষণের পরিচয় প্রাপ্ত হইতে যাওয়াটাই ভুল। আপনার লক্ষণের পরিচয় পাইতে হইলে মন হইতে মস্তিষ্ক প্রভৃতি সমস্ত বাক্য সমূলে প্রক্ষালিত করিয়া ফেলাই উচিত—বাক্য হইতে মনকে একেবারেই অবসৃত করিয়া তাহাকে আপনার অভ্যন্তরে তদ্গত ভাবে নিবিষ্ট করাই উচিত; কেন না, Letter killeth but spirit giveth life বাক্য হানি-জনক—আত্মা জীবন্-প্রদ। এই প্রণালী অনুসারেই আমরা আপনার লক্ষণ অবগত হইতে পারি; ইহাতে করিয়া—আমরা যে, বস্তুটা কি, তাহা আমাদের অন্তশ্চক্ষে ধরা পড়ে; আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, আমরা চৈতন্যরূপী আত্মা। আমাদের লক্ষ যে, কি, তাহাও আমাদের অন্তশ্চক্ষে ধরা পড়ে; আমরা বুঝিতে পারি যে, আমরা জ্ঞানের প্রয়াসী—প্রেমের প্রয়াসী—মঙ্গলের প্রয়াসী। আমাদের অপূর্ণতাও আমাদের চক্ষে ধরা পড়ে;—আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের যতটা জ্ঞান প্রেম এবং মঙ্গল প্রয়োজন তাহার কিছুই আমাদের নাই বলিলেই হয়—যাহা আছে তাহা অতীব যৎসামান্য। ইহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের লক্ষ পরিপূর্ণ জ্ঞানের প্রতি—পরিপূর্ণ আনন্দের প্রতি—পরিপূর্ণ মঙ্গলের প্রতি নিগূঢ় বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে, তাই অল্প কিছুতেই আমাদের তৃপ্তি হয় না। পরাধীন ব্যক্তি যেমন স্বাধীন ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থিতি করে, সেইরূপ অপূর্ণ সত্য পূর্ণ সত্যের আশ্রয়ে অবস্থিতি করে; সাবলম্ব সত্য নিরালম্ব সত্যের আশ্রয়ে অবস্থিতি করে। অপূর্ণ সত্য সত্যের প্রতিরূপ মাত্র—পূর্ণ সত্যই সত্যের স্বরূপ। কিন্তু প্রতিরূপ বলিবা-মাত্রই বুঝায় যে, তাহা স্বরূপেরই প্রতিরূপ; প্রতিরূপের মূলে—প্রতিরূপের অন্তরে—প্রতিরূপের সঙ্গে সঙ্গে—স্বরূপের বিদ্যমানতা একান্তপক্ষেই অপরিহার্য্য। এই সূত্রেই আমরা আমাদের জ্ঞানের অভ্যন্তরে জ্ঞান-স্বরূপকে—প্রেমের অভ্যন্তরে আনন্দ-স্বরূপকে—মঙ্গল ইচ্ছার অভ্যন্তরে মঙ্গল স্বরূপকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধি করি; এই নিগূঢ় বন্ধন-সূত্রেই আমরা অপূর্ণ আত্মার অভ্যন্তরে পরাৎপর পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া—আত্মার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার অটল আশ্রয়কে প্রাপ্ত হইয়া—অপার তৃপ্তি-সাগরে নিমগ্ন হই।

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বাদশ কল্প.
দ্বিতীয় ভাগ
কার্ত্তিক ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯।

৫৪৩ সংখ্যা ১৮১০ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সঙ্গীত।

বেহাগ—তাল একতালা।

১

এ ঘোর আঁধারে, বিজন কন্দরে, একাকী এ কোন্ যোগী।
নীরব প্রকৃতি, না হেরি আকৃতি, নাহি জাগে রোগী ভোগী।
গভীরতা যেন পেয়েছে চেতন, ঘোষিছে চৌদিকে নিশান আপন,
আকার ছাড়িয়া, রয়েছে বসিয়া, মহাশূন্যে প্রাণ জাগি।
কি তপ প্রভাবে জ্বলে দীপ শিখা! অসীম সুন্দর আছে তায় লেখা,
মুগধ পরাণ, যতি এক-ধ্যান, এক প্রেমে অনুরাগী।

২

কীর্ত্তন ভাঙ্গা যাত্রার সুর।

দেশের ছেলে দেশে যাব এই আনন্দ আস্‌ছে মনে,
(সে দেশ স্বদেশ আমার—বাপের বাড়ী)
সেই বাপের বাড়ী নৃত্য করি বেড়াইব বাপের সনে।
এ দেশের কাজ হলো সারা ভাঙ্গলো এ ঘর কাল-তুফানে,
(এদেশ কালে গড়ে, কালে ভাঙ্গে, কালের অধীন এ)

স্বদেশ সে নহে এ ভব,
নিত্য সেথাকার বিভব,
মৃত্যু সেথা পরাভব অমৃত সত্য শাসনে;
সেথা চাইলে আমি সকল পাব,
পিতার প্রেমে পুলোকিত রব,
এখন এ ভাঙ্গায় আর নাই প্রয়োজন
করবো রতি উন্নবীনে।

মানবীকরণই বটে।

তৃতীয় প্রস্তাব।

আমরা অতি দীর্ঘকাল পরে আমাদের প্রতিশ্রুত প্রস্তাব লইয়া পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত হইতেছি। এত বিলম্ব করিবার বিশেষ কারণও ছিল। আমরা বিষয় কার্য্য এবং পারিবারিক পীড়া নিবন্ধন এত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে ইতিপূর্ব্বে আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাবের প্রতিবাদগুলিও মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে পারি

নাই। সম্প্রতি কিছু অবকাশ হওয়াতে আমাদের পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাবের আলোচনা করিতে গিয়া দ্বিজেন্দ্র বাবু সর্ব্ব প্রথমেই বলেন যে, "যাঁহারা বাস্তবিক মনে করেন যে, ঈশ্বর চেতন পদার্থও নহেন—অচেতন পদার্থও নহেন, অথবা যাহা একই কথা—ঈশ্বর অচেতন চেতন পদার্থ তাঁহাদের মনের কথা তাঁহারাই জানেন। ইত্যাদি।" এই স্থলে দ্বিজেন্দ্র বাবু যে, কেবল "ঈশ্বর চেতনও নহেন এবং অচেতনও নহেন"—এই কথার অর্থ "ঈশ্বর অচেতন চেতন পদার্থ" করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন এমত নহে, তিনি ডাঃ ড্রিস্‌ডেল প্রভৃতি ব্যক্তিগণের প্রতি তীক্ষ্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় দ্বিজেন্দ্র বাবু এই স্থলে বাতাসের গলায় দড়ি দিয়া ঝগড়া করিয়াছেন! আমরা জিজ্ঞাসা করি "ঈশ্বর চেতনও নহেন এবং অচেতনও নহেন"—এই কথার অর্থ কি "ঈশ্বর অচেতন চেতন পদার্থ?" যদি আমি বলি যে, আমার হস্তের কলমটী উষ্ণও নহে এবং শীতলও নহে তাহা হইলে কি দ্বিজেন্দ্র বাবু এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবেন যে, আমার হস্তে একটী উষ্ণ শীতল কলম আছে?

[প্রভাত বাবুর হস্তের কলম যদি শীতল না হয় তবে তাহা অশীতল তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু অশীতল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) উষ্ণ এবং (২) না শীতল না উষ্ণ। অতএব এই পর্য্যন্তই বলিতে পারা যায় যে, কলমটি প্রথম শ্রেণীর অশীতল নহে—উষ্ণ নহে; কিন্তু তাহা বলিয়া তাহা যে মূলেই অশীতল নহে, তাহা নহে; কলমটি যখন—না শীতল না উষ্ণ—তখন তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর অশীতল তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। কলমটিকে চাই দুই শ্রেণীতে বিভাগ কর, যথা,

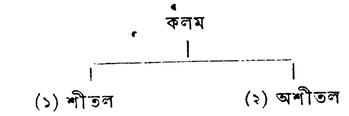

চাই তিন শ্রেণীতে বিভাগ কর, যথা,

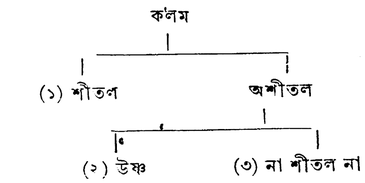

তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। প্রভাত বাবুর এইটি কেবল জানা উচিত যে, কলম পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীতেই বিভক্ত হউক্, আর শেষোক্ত তিন শ্রেণীতেই বিভক্ত হউক্—উভয়-পক্ষেই এটা স্থির যে, কলমটি যদি শীতল না হয় তবে নিশ্চয়ই তাহা অশীতল। এটাও তেমনি সুনিশ্চিত যে, কলমটি যদি উষ্ণ না হয় তবে তাহা অনুষ্ণ; কিন্তু অনুষ্ণও দুইটি অবান্তর শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে, যথা,—

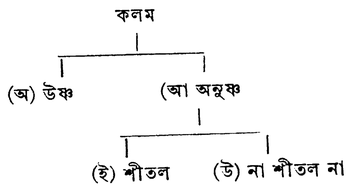

স্পৃশ্য বস্তু অ আ এই দুই শ্রেণীতেই বিভক্ত হউক, আর, অ ই উ এই তিন শ্রেণীতেই বিভক্ত হউক্ তাহাতে কিছুই আইসে যায় না; উভয় পক্ষেই এ কথাটির এক চুলও ব্যতিক্রম হইতে পারে না যে, কলমটি যদি উষ্ণ না হয়, তবে নিশ্চয়ই তাহা অনুষ্ণ। এ যেমন, তেমনিই সচেতন কিম্বা অচেতন যতই অবান্তর শ্রেণীতে

বিভক্ত হউক্ না কেন—এ কথাটি কিছুতেই টলিবার নহে যে, যাহা সচেতন নহে তাহা নিশ্চয়ই অচেতন ও যাহা অচেতন নহে তাহা নিশ্চয়ই সচেতন।

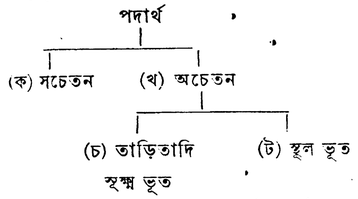

পদার্থ সমূহ ক খ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও যেমন, আর, ক চ ট এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও তেমনি, উভয়-পক্ষেই এ কথাটি যৎপরোনাস্তি সুনিশ্চিত যে, যে কোন পদার্থই হউক না কেন তাহা যদি সচেতন না হয় তবে তাহা অচেতন। এত কথায় কাজ কি—প্রভাত বাবুর ন্যায় একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি অবশ্য বীজগণিত জানেন তাহাতে আর ভুল নাই। বীজগণিতের নিয়মানুসারে এইরূপ ধার্য্য করা হউক্ যে, চেতন-পদার্থ=চে, অচেতন পদার্থ=অচে, এবং নিখিল সমস্ত—যাহার বাহিরে অন্য কোন সামগ্রী নাই—সেই নিখিল সমস্ত=নিখি; এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, নিখিল সমস্ত হইতে চেতনকে বাদ দিলে কি অবশিষ্ট থাকে? একজন পাঠশালার বালকও ইহার এইরূপ উত্তর দিবে যে, নিখিল সমস্ত হইতে চেতন অপহৃত হইলে অচেতনই অবশিষ্ট থাকে; বীজ-গণিতের ভাষায়—

নিখি—চে=অচে;

অতএব, অচে+চে=(নিখি—চে)+চে=নিখি

(১) কিন্তু নিখিল সমস্তের বাহিরে অন্য কোন সামগ্রীই নাই।

(২) উপরে পাওয়া গেল যে, চে+অচে=নিখি।

(৩) অতএব প্রমাণ হইল যে, চে+অচে, ইহার বাহিরে অন্য কোন পদার্থই নাই; কাজেই, যে-কোন পদার্থই হউক্ না কেন—তাহা হয় চেতন পদার্থ—নয় অচেতন পদার্থ—তা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

প্রভাত বাবুর একটি কথা শুনিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছি না; তিনি অম্লান-বদনে বলিতেছেন যে, "ঈশ্বর চেতনও নহেন এবং অচেতনও নহেন—এই কথার অর্থ কি ঈশ্বর অচেতন চেতন পদার্থ?" হায়! এটাও কি প্রভাত বাবুকে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে যে, চেতনও নহেন অচেতনও নহেন—এ কথাও যা, আর, অচেতনও বটেন চেতনও বটেন (এক কথায়—অচেতন চেতন) এ কথাও তা, দুইই অবিকল সমান? প্রভাত বাবু তবে নিম্নে একটু প্রণিধান করুন;—এই মাত্র আমরা বীজগণিতের নিয়মানুসারে প্রমাণ করিলাম যে, যাহা চেতন নহে তাহা অচেতন এবং যাহা অচেতন নহে তাহা চেতন; অতএব—

চেতনও নহেন=অচেতন

অচেতনও নহেন=চেতন

অতএব, চেতনও নহেন অচেতনও নহেন=অচেতন চেতন।

অথবা

না চেতন=অচেতন (যেহেতু না=অ)

না অচেতন=চেতন (যেহেতু দুই না=এক হাঁ)

অতএব প্রমাণ হইল যে, না চেতন না অচেতন=অচেতন চেতন। শ্রীদ্বি]

বাস্তবিক আমরা কোথায়ও ঈশ্বরকে অচেতন চেতন পদার্থ বলিয়া উল্লেখ করি নাই। আমরা এই মাত্র বলিয়াছি যে, এক প্রকার ঈশ্বরবিশ্বাসী মনুষ্য আছেন

যাঁহারা ঈশ্বরকে চেতন ও অচেতন ইহার কিছুই বলেন না কিন্তু এমত গুণবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন যাহার কোনও রূপ জ্ঞান জগৎ দর্শন করিয়া উপলব্ধি করিতে পারা যায় না।

[জগৎ যে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন ইহা সকলেই স্বীকার করে। কিন্তু তাহার সঙ্গে এ কথাটিও স্বীকার্য্য যে, জগৎ ঈশ্বর হইতেই আসিয়াছে—সুতরাং জগৎ ঈশ্বরেরই প্রতিরূপ। "মানবী করণ" প্রবন্ধে আমরা স্পষ্টই বলিয়াছি যে, জড়জগৎ সত্যমাত্র, মনুষ্য—সত্য এবং জ্ঞান দুইই একাধারে, ঈশ্বর—সত্য জ্ঞান এবং অনন্ত তিনই একাধারে। অতএব জগৎও সত্য, ঈশ্বরও সত্য—প্রভেদ কেবল এই যে, জগৎ অপূর্ণ সত্য ঈশ্বর পরিপূর্ণ সত্য। তেমনি, মনুষ্যও চেতন পদার্থ,ঈশ্বরও চেতন পদার্থ—প্রভেদ কেবল এই যে, মনুষ্য অপূর্ণ চৈতন্য, ঈশ্বর পরিপূর্ণ চৈতন্য। কিন্তু প্রভাত বাবু ইহার বিপরীতে এইরূপ বলেন যে, জগতের মধ্যে এমন একটিও লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না—যাহা ঈশ্বরেতেও আছে; প্রভাত বাবুর এ কথাটি যদি সত্য হয়, তবে ফলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, অস্তিত্ব বলিয়া যে একটি লক্ষণ—যাহা জগতের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ঈশ্বরেতে স্থান পাইতে পারে না—ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না;—যেহেতু জগতের মধ্যস্থিত কোন লক্ষণই ঈশ্বরেতে স্থান পাইতে পারে না! এ কিরূপ কথা! স্বয়ং ঈশ্বরের যদি অস্তিত্ব নাই তবে জগতের অস্তিত্ব কিসের উপর দাঁড়াইয়া আছে? জগতের সকলই তো আপেক্ষিক; আপেক্ষিক সত্তা কি আপনার উপর আপনি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে? তাহা যদি সে পারে—তবে আর তাহা আপেক্ষিক কিসে? তবে তাহাই তো পূর্ণ সত্তা। আপেক্ষিক সত্তা যদি আপনার উপরে দাঁড়াইয়া নাই তবে কিসের উপরে দাঁড়াইয়া আছে? পূর্ণ সত্তার উপরে—তাহাতে আর ভুল কি? অতএব, জগতের সত্তা আছে বলিয়া এরূপ প্রমাণ হয় না যে, ঈশ্বরের সত্তা নাই—তাহাতে উল্টা আরো এইরূপ প্রমাণ হয় যে, ঈশ্বরের সত্তা পরিপূর্ণ সত্তা। কিন্তু জগৎ দুইভাগে বিভক্ত—চেতন এবং অচেতন; অচেতনের সত্তাকে যদি একগুণ সত্তা বলিয়া ধরা যায়, তবে দাঁড়ায় এই যে, চেতনের সত্তা দ্বিগুণ সত্তা। কেননা অচেতনের আপনার সত্তা তাহার আপনার নিকটে প্রকাশ পায় না—তাহার আপনার সত্তা তাহার আপনার ভোগে আসে না; অচেতনের সত্তা পরভোগ্য। চেতনের সত্তা নিজ-ভোগ্য, কেননা চেতনের আপনার সত্তা আপনার নিকটে প্রকাশ পায়। অতএব সত্তা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত যথা

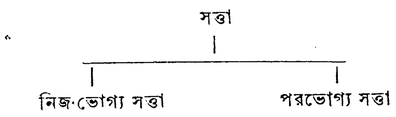

পরভোগ্য সত্তাতে সত্তার শুদ্ধ কেবল ভোগ্য অবয়বটিই—জ্ঞেয় অবয়বটিই—দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ভোক্তৃ-অবয়বের বা জ্ঞাতৃ-অবয়বের কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না; এই জন্য বলি যে, তাহা একগুণ-মাত্র সত্তা। নিজভোগ্য সত্তা আপনিই আপনার ভোগ্য এবং আপনিই আপনার ভোক্তা—অতএব নিজভোগ্য সত্তাতে সত্তার ভোগ্য অবয়ব এবং ভোক্তৃ-অবয়ব দুইই একাধারে বর্ত্তমান; এইজন্য আমরা বলি যে, নিজভোগ্য সত্তা দ্বিগুণ সত্তা। পূর্ব্বোক্তরূপ একগুণ সত্তাকেই আমরা বলি অচেতন সত্তা, আর, শেষোক্ত

রূপ দ্বিগুণ সত্তাকেই আমরা বলি চেতন সত্তা। ঈশ্বরের সত্তা পরিপূর্ণ সত্তা, সুতরাং তাঁহাতে শুধু যে কেবল একগুণ সত্তাই আছে—দ্বিগুণ সত্তা নাই—ইহা অসম্ভব। অতএব ঈশ্বরের সত্তা যখন পরিপূর্ণ সত্তা, তখন তিনি অবশ্য জ্ঞান-স্বরূপ। মনুষ্যেরও জ্ঞান আছে—কিন্তু মনুষ্য সর্ব্বজ্ঞ নহে, মনুষ্যের জ্ঞান অপূর্ণ জ্ঞান। অপূর্ণ জ্ঞানের দ্বিগুণ সত্তা অবশ্য জড়পদার্থের একগুণ সত্তা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্, তথাপি তাহাতেও সত্তার অভাব আছে; কেবল, যিনি পূর্ণজ্ঞান তিনিই পূর্ণ সত্য, যেহেতু তাঁহাতে কিছুরই অভাব নাই। সমস্ত কুড়াইয়া এইরূপ পাওয়া যাইতেছে; জগতে আমরা দুইরূপ সত্তা অবলোকন করি নিজ-ভোগ্য এবং পরভোগ্য। জগতের মধ্যস্থিত এই উভয়-প্রকার সত্তাই আপেক্ষিক সুতরাং উভয়ই পূর্ণ সত্তার আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতেছে। পূর্ণসত্তাতে কোন সত্তারই অভাব নাই সুতরাং তাহা একগুণ-মাত্র সত্তা নহে, তাহা পরভোগ্য অচেতন সত্তা নহে;—তাহা নিজভোগ্য চেতন-সত্তা। আবার ঈশ্বরের পূর্ণ সত্তা মনুষ্যের ন্যায় অল্পজ্ঞ চেতন-সত্তা নহে, তাহা পরিপূর্ণ চেতন-সত্তা; কেননা পরিপূর্ণ জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুতেই সত্তার পূর্ণতা হইতে পারে না। এইরূপে আমরা পাইতেছি যে, পূর্ণ সত্তাই চেতনাচেতন সমস্ত আপেক্ষিক সত্তার মূলাধার, আর, পূর্ণজ্ঞান ব্যতিরেকে আর কিছুতেই সত্তার পূর্ণতা হইতে পারে না; অতএব যিনি সর্ব্বমূলাধার পরমেশ্বর তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞান-স্বরূপ। শ্রী দ্বি]

যদি দ্বিজেন্দ্র বাবু নাস্তিকতা রক্ষা করিয়া বলিতেন যে তিনি জগতে চেতন ও অচেতন এই দুই পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না, তাহা হইলে তাঁহার যুক্তিটীর মূলে যে কোনও দোষ আছে ইহা আমরা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিতাম না। কারণ নাস্তিকগণ পার্থিব পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই স্বীকার করেন না। সেই পার্থিব পদার্থ সকল হয় চেতন, না হয় অচেতন এই দুয়ের এক হইবে।

[অনতিপূর্ব্বে আমরা কঠোর গণিতশাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি যে, কি পার্থিব পদার্থ কি অপার্থিব পদার্থ—সকলই—যে-এক নিখিল সমস্তের অন্তর্ভূত, সেই নিখিল সমস্ত হইতে চেতন পদার্থ অপহৃত হইলে শুদ্ধ কেবল অচেতন পদার্থই অবশিষ্ট থাকে; অতএব ইহা যেমন সুনিশ্চিত যে, যাহা চতুষ্কোণ নহে তাহা অচতুষ্কোণ, ইহাও তেমনি সুনিশ্চিত যে, যাহা চেতন নহে তাহা অচেতন। শ্রী দ্বি]

পরন্তু দ্বিজেন্দ্র বাবু যখন আপনাকে ঈশ্বর বিশ্বাসী আস্তিক বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন তখন অন্যবিধ আস্তিকগণ যে বাস্তবিক ঈশ্বরকে কি বলিয়া মনে করেন তাহা তাঁহার পক্ষে অনুসন্ধান না করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারি না।

[সাধারণতঃ সকল আস্তিকই এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ; তবে যদি এক আধ জন আস্তিক উহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন তবে তাহার উত্তর আমাদের যাহা দিবার তাহা আমরা যথেষ্টই দিয়াছি। আমরা বারম্বার প্রতিবাদীর চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়াছি যে, পূর্ণ জ্ঞান ভিন্ন সত্যের পূর্ণতা হয় না, আর, পূর্ণ সত্যের আশ্রয় ব্যতীত আপেক্ষিক সত্যের দাঁড়াইবার স্থান নাই। শ্রী দ্বি]

এখন ডাঃ ড্রিস্‌ডেল প্রভৃতি ব্যক্তিগণের উক্তরূপ বিশ্বাসের কোনও যুক্তি আছে কি না তাহার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। পাঠক! বোধ করি তোমার পাঁচটী ইন্দ্রিয়

সমুদয়ই আছে। যদি তোমাকে ইন্দ্রিয় কয়টী—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে তুমি দর্শন, শ্রবণ আদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ করিবে। কিন্তু জোঁক বা শকুনি যদি কথা কহিতে এবং আমার কথা বুঝিতে পারিত এবং আমি যদি উহাদিগকে কয়টী ইন্দ্রিয় আছে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, তবে তাহার কি উত্তর প্রাপ্ত হইতাম? জোঁক সম্ভবতঃ বলিত যে, ইন্দ্রিয় তিনটী এবং শকুনি বলিত যে তাহা ৪ টী মাত্র! জোঁক ও শকুনির এমত উত্তর দিবার কারণ কি? বাস্তবিক সীমাবদ্ধ জ্ঞানই ইহার একমাত্র কারণ। জোঁকের জ্ঞানে ৩টী এবং শকুনির জ্ঞানে ৪টী মাত্র ইন্দ্রিয় আছে। তদ্রূপ মনুষ্যের মতেও ৫টী মাত্র ইন্দ্রিয়। কিন্তু ইহাই কি অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত? পাঠক! তুমি পাঁচের অধিক ইন্দ্রিয় দেখ না বলিয়াই কি নিশ্চয় বলিতে পারে যে কোন ষষ্ঠ বা সপ্তম ইন্দ্রিয় নাই? এখন মনে কর চেতন এবং অচেতন এই দুই প্রকার পদার্থ মাত্র তোমার দৃষ্টিগোচর হয়। তাহা হইলেই কি তোমার পক্ষে এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসা উচিত যে এই দুয়ের অতিরিক্ত কোনও পদার্থ হইতে পারে না? কোন অতিরিক্ত পদার্থ যে নাই তাহা তুমি কিরূপে অবগত হইয়াছ? তোমার নিজের জ্ঞানই কি জগতের সীমা?

[আমার না হয় পাঁচটা ইন্দ্রিয় আর এক জনের না হয় দশটা ইন্দ্রিয়; আমার না হয় হিমবিন্দু-পরিমাণ জ্ঞান, আর এক জনের না হয় সাগর-পরিমাণ জ্ঞান; সে কথা এখানে হইতেছে না। এখানে কথা হইতেছে কেবল এই যে, অচেতন চেতন পদার্থ কেবল যে, আমার ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে ধরা দেয় না, তাহা নহে, তাহা সকল জ্ঞানেরই অগ্রাহ্য। যেমন, দু-কুড়ি পঞ্চাশ, মাথা নাই মাথা ব্যথা, পরিধি-বিহীন চক্র, সকল জ্ঞানেরই অগ্রাহ্য, অচেতন চেতন সেইরূপ একটা নিতান্তই অর্থশূন্য অসঙ্গত কথা। কোন এক জন জ্ঞানী ব্যক্তি যদি একটা কথা বলে, আর, তাহা যদি আমি বুঝিতে না পারি, তবে সেটি আমারই বুদ্ধির দোষ; কিন্তু এক জন পাগল যদি একটা প্রলাপোক্তি করে, আর, তাহা যদি আমি বুঝিতে না পারি, তবে সেটা কিছু আর আমার বুদ্ধির দোষ নহে, তাহার সে প্রলাপোক্তির ভিতর বুঝিবার কিছুই নাই বলিয়া আমি তাহা বুঝিতে পারি না। একজন দেবতা আসিয়া যদি আমাকে বলেন যে, "আমার পঞ্চাশ ইন্দ্রিয় এবং তাহাতে আমি এত বিচিত্র বিষয় অবলোকন করি যে, তাহা তোমার স্বপ্নের অগোচর; তুমি যদি চাও, তবে তোমাকেও আমি সেই সকল ইন্দ্রিয় প্রদান করিতে পারি"; তবে আমি তাঁহাকে বলি যে, তাহা হইলে আমি কৃতকৃতার্থ হই। কিন্তু যদি আর এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে বলে যে, আমার ধ্যান-চক্ষু এমনি প্রস্ফুটিত হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা আমি তমোময় আলোক, অচেতন চেতন, জ্যোতির্ম্ময় অন্ধকার প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তবে তাঁহাকে আমি বলি যে "এই বই নয়? এ তো অতি সামান্য বিষয়; আমি এক ব্যক্তিকে জানি—তিনি সোণার পাথরে ভাত খা'ন; তিনি হস্ত-পদ-বিহীন অথচ অসি-যুদ্ধে এমনি সুনিপুণ যে, বড় বড় যোদ্ধারা তাঁহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে না; তিনি একেবারেই মূক ও বধির, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত যদি একবার শোনো তবে সেই দণ্ডেই মোহিত হইয়া যাও।". এ সকল কথার কি কোন মাথা

আছে, না মুণ্ড আছে? অচেতন চেতন পদার্থ এইরূপ একটা অসঙ্গত কথা! আগে একটা কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে, তাহার পরে তবে তো তাহার সত্য-মিথ্যার বিচার হইবে—কিন্তু "অচেতন চেতন" এ কথাটির মূলেই কোন অর্থ নাই;—অতএব মিছামিছি আর কেন! যাহা চেতন নহে তাহা অচেতন—এই সহজ সত্যটি একজন বালকেও বুঝিতে পারে; আর যাহা চেতন নহে তাহা অচেতন নহে—ইহা স্বয়ং বৃহস্পতিও বুঝিতে পারেন না—যেহেতু ইহা অর্থশূন্য প্রলাপোক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। শ্রী দ্বি]

তবে তুমি বলিতে পার যে, চেতন ও অচেতন এই দুইভিন্ন যে কোন তিন হইতে পারে তাহা আমি চিন্তাই করিতে পারি না। তাহা হইলে শকুনিও তো বলিতে পারে যে, চারির অধিক যে ইন্দ্রিয় হইতে পারে তাহা সে চিন্তা করিতেও পারে না। শকুনির এই উক্তি কি বিশ্বাস করা যাইতে পারে?

[শকুনি যদি মনুষ্যের ন্যায় জ্ঞানবান জীব হইত তবে সে এইরূপ বলিত—"আমার পক্ষ আছে বলিয়াই যে, সকল জীবেরই পক্ষ থাকিতেই হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই; তেমনি আমার চারিটির অধিক ইন্দ্রিয় নাই বলিয়া যে, সকল জীবেরই সেইরূপ হইতেই হইবে তাহারও কোন অর্থ নাই; কিন্তু এটা সুনিশ্চিত যে, কোন জীবেরই অনিন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় থাকিতে পারে না, অর্থাৎ এরূপ একটা অবয়ব থাকিতে পারে না—যাহা ইন্দ্রিয়ও নয়—অনিন্দ্রিয়ও নয়। শ্রী দ্বি]

এস্থলে বলা যাইতে পারে যে মনুষ্য পাঁচ ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব অবগত আছে বলিয়াই শকুনির কথা স্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু এমন কি কেহ আছে যে, সে চেতন ও অচেতনের অতিরিক্ত কোন বস্তু দেখিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য দিতে পারে?

[যে ব্যক্তি বলে যে, আমি শিরোনাস্তি-শিরঃপীড়া অনুভব করিয়াছি আর যে ব্যক্তি বলে যে, আমি চেতন এবং অচেতনের অতিরিক্ত পদার্থ—অচেতন চেতন পদার্থ—দেখিয়াছি, উভয়েরই কথা সমান বিশ্বাস-যোগ্য। যাঁহারা শব্দের কাঙ্গালী কিন্তু অর্থের কোন ধারই ধারেন না, তাঁহাদের মুখেই ঐ সকল অর্থ-শূন্য প্রলাপোক্তি শোভা পায়। শ্রী দ্বি]

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিতেছি যে, পৃথিবীতে এরূপ মনুষ্য অনেকই আছে। বাস্তবিক আস্তিকগণই এরূপ মনুষ্য। দ্বিজেন্দ্র বাবু নিজেই এরূপ অতিরিক্ত পদার্থ বিশ্বাসকারী আস্তিক। যদি আমি একটী আম্র-অষ্টি হস্তে লইয়া দ্বিজেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করি যে, ইহা চেতন না অচেতন? তিনি মুক্ত কণ্ঠে বলিবেন যে ইহা অচেতন বস্তু। কিন্তু যদি আবার জিজ্ঞাসা করি যে, এই আম্র-অষ্টি ভূমিতে রোপণ করিলে যে, তাহা হইতে আম্র-বৃক্ষ উৎপন্ন হয় তাহা কে উৎপাদন করে? চেতনে? না, অচেতনে? দ্বিজেন্দ্র বাবু ইহার কি উত্তর দিবেন তাহা না জানা পর্য্যন্ত আমরা আর কিছু বলিতে পারি না।

[আমরা তো গত বারেই ইহার উত্তর দিয়া চুকিয়াছি, যথা; বৃক্ষোৎপত্তির মূল কারণ পরমাত্মা—তিনি সচেতন; বৃক্ষোৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণ প্রকৃতি—তাহা অচেতন। যিনি চেতন তিনি চেতন—যাহা অচেতন তাহা অচেতন; চেতনও অচেতন নহে—অচেতনও চেতন নহে! শ্রীদ্বি]

তবে এইস্থলে আমরা রামানুজ দর্শনের পদার্থ বিভাগের কথা উল্লেখ করি-

তেছি। রামানুজ মতে পদার্থ তিন প্রকার—চিৎ অচিৎ এবং ঈশ্বর। দ্বিজেন্দ্র বাবু রামানুজের এইরূপ পদার্থ বিভাগের কি অর্থ করিবেন?' যদি তিনি বলেন যে এইরূপ পদার্থ বিভাগের কোনও 'ভিত্তি নাই, তাহা হইলে ভরসা করি তিনি এরূপ উত্তরের যুক্তি প্রদর্শন করিবেন।

[রামানুজের ঐ কথাটি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত শিরোধার্য্য করি; চিৎ অচিৎ এবং ঈশ্বর ইহার অর্থ আস্তিক মাত্রেই এইরূপ বুঝেন যে, চিৎ কিনা অল্পজ্ঞ জীব-চৈতন্য; অচিৎ কিনা অচেতন জড়-পদার্থ, ঈশ্বর কিনা সর্ব্বজ্ঞ পরিপূর্ণ চৈতন্য। মানবী-করণ প্রবন্ধে এ তিনের প্রভেদ আমরা অতীব সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছি, যথা;—অচিৎ শুদ্ধ কেবল সত্যং; চিৎ—সত্যং জ্ঞানং; ঈশ্বর—সত্যং জ্ঞানং অনন্তং। শ্রীদ্বি]

এই তোগেল আস্তি কের কথা। নাস্তিকের মতে চেতন এবং অচেতনের অতিরিক্ত কোন বস্তু আছে কি না? নাস্তিক বাস্তবিক অচেতন অতিরিক্ত কোনও পদার্থই স্বীকার করে না তাহার মতে চেতনা কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। কিন্তু চেতন ও অচেতন জড়পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র। একই মানবদেহ এক সময়ে চেতন এবং আর এক সময়ে অচেতন পদার্থ বলিয়া গণ্য। এই দ্বিবিধ অবস্থা যে কেবল জীবন থাকিতে এবং মৃত্যু হইলেই হয় এমত নহে, জীবিত কালের ভিন্ন ভিন্ন সময়েও হইয়া থাকে।

[এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, দেহ মূলেই চেতন পদার্থ নহে—দেহীই চেতন পদার্থ—আত্মাই চেতন-পদার্থ। আর, দেহের যে কোন অবস্থাই হউক্ না কেন—সেই অবস্থার সাক্ষী স্বরূপ যে, আত্মা, সেই আত্মাই চেতন পদার্থ, সে অবস্থা নিজে চেতন পদার্থ নহে; কেননা অবস্থার সাক্ষী অবস্থাহইতে ভিন্ন। শ্রীদ্বি]

দ্বিজেন্দ্র বাবু অন্য এক স্থলে "ঈশ্বর চেতনও নহেন এবং অচেতনও নহেন" এই বাক্যকে আলঙ্কারিক ভাষা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তদুপলক্ষে বলেন যে, "প্রতিবাদীর জানা উচিত যে, এরূপ আলঙ্কারিক ভাষা এক শোভা পায় কবিতাতে—আর শোভা পায় ঘরাও কথা বার্ত্তায়—এ ভিন্ন বিজ্ঞানে বা তত্ত্বজ্ঞানে তাহা কোন ক্রমেই শোভা পায় না।"

[শুধু যে উল্লেখ করিয়াছি তাহা নহে, উহার প্রমাণও দেখাইয়াছি; যথা; যাঁহারা ঐরূপ কথা বলিয়াছেন তাঁহাদের অভিপ্রায় শুদ্ধ কেবল এই যে, ঈশ্বর অচেতনও নহেন এবং আমাদের ন্যায় অপূর্ণ চেতনও নহেন; কিন্তু ঈশ্বর যে, সর্ব্বজ্ঞ, তিনি যে, পরিপূর্ণ চেতন, ইহা তাঁহারা নিজ মুখেই স্পষ্টাক্ষরে বারম্বার ব্যক্ত করিয়াছেন। তবেই হইতেছে যে, "ঈশ্বর অচেতনও নহেন চেতনও নহেন" এটা কঠোর বৈজ্ঞানিক ভাষা নহে কিন্তু ভাবে বুঝিয়া লইবার ভাষা—আলঙ্কারিক ভাষা। শ্রী দ্বি]

দ্বিজেন্দ্র বাবুর এই বাক্য হইতে আমরা এই ভাব গ্রহণ করিতেছি যে, ডাঃ ড্রিস্‌ডেল ও মেং প্রকটারের ভাষা আমরা বুঝিতে পারি নাই। আর যদি আমরা তাহা সত্য সত্যই বুঝিয়া থাকি তবে এরূপ ভাষা বিজ্ঞান ও তত্ত্ব জ্ঞানের অনুমোদিত নহে। আমরা বিজ্ঞানের কথা কিছু কিছু বুঝি এবং তত্ত্বজ্ঞান এমন কঠিন বিষয় যে তাহাতে আমাদের বুদ্ধি প্রবেশই করিতে পারে না। অতএব এতদ্রূপ ভাষা বিজ্ঞানের অনুগত কি না তাহা আমরা সত্বরেই

প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব এবং তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুই বলিব না।

আমরা ডাক্তর ড্রিস্‌ডেল এবং মেং প্রক্‌টারের ভাষা বুঝিতে পারিয়াছি কি না প্রথমে তাহারই আলোচনা করিতেছি। ডাঃ ড্রিস্‌ডেল "প্রোটোপ্লাজ্‌মিক থিওরী অব্ লাইফ" নামক গ্রন্থের ২৭৯ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন;—"I am content to belive in no God, angel, or spirit, or the immortal soul of man except as made known to us through the miraculous specific revelation contained in our scriptures. At the same time these beings are of a nature to us wholly incomprehensible and inconceivable. The cardinal doctrines of revealed religion are thus dogmas, not resting on any proofs derived from observation or science at all. These dogmas are also mysteries, not only incapable of scientific proof or disproof, but also above and beyond the comprehension of the human intellect."

এই বাক্যের অবিকল অনুবাদ অতি কঠিন বোধ হওয়াতে আমরা এস্থলে স্থূল মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম। বাইবলের প্রকাশিত ঈশ্বর, ঈশ্বরানুচর, অথবা প্রেত, বা অমর মানবাত্মা ভিন্ন আমি আর কোনও ঈশ্বর, ঈশ্বরানুচর আদিতে বিশ্বাস করি না। আবার এই সমস্ত ব্যক্তির প্রকৃতি আমাদের নিকট সম্পূর্ণ রূপে অবোধ্য এবং অননুভবনীয়। আর বাইবল প্রকাশিত ধর্ম্মের মূল সত্য সকল এইরূপে পর্য্যবেক্ষণ বা বিজ্ঞান কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত কোনও প্রমাণের উপর সংস্থিত নহে। এই সমস্ত মত প্রকৃত রূপে এমন রহস্য যাহা যে, কেবল বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত বা অপ্রমাণ হইতে পারে না এমত নহে, তাহা আবার মানব বুদ্ধির অগম্য।

মেং প্রক্‌টার ১৮৮৭ সালের জুলাই সংখ্যা "নলেজ" নামক পত্রিকার ১৯৩ পৃষ্ঠায় আপনাকে এক প্রকার অজ্ঞেয়তাবাদী বলিয়া স্বীকার করেন এবং আরো বলেন যে, "A God understood is no God at all" পরিজ্ঞাত ঈশ্বর ঈশ্বরই নহে। এরূপ ভাষাকে সরল ভাব ব্যঞ্জকই বলা যাইবে, না অলঙ্কারযুক্তই বলা যাইবে তাহা পাঠকবর্গই বিচার করিবেন।

[ঈশ্বর সম্বন্ধে ব্যাসদেব কি বলিয়াছেন—শঙ্করাচার্য্য কি বলিয়াছেন—রামানুজ কি বলিয়াছেন—প্রক্টর তাহার বিন্দু বিসর্গেরও উল্লেখ করেন নাই;—কেনই বা করিবেন! আমরাও প্রক্টর কি বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ করি নাই—করিতে চাহিও না। কোন্ আস্তিক কি বলিয়াছেন না বলিয়াছেন তাহা বিবৃত করিয়া বলা মানবীকরণের উদ্দেশ্যই নহে; শুদ্ধ কেবল এইটি প্রমাণ করাই মানবীকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য যে, ঈশ্বরকে জ্ঞান-স্বরূপ বা সর্ব্বজ্ঞ বলিলে মানবীকরণের দোষে লিপ্ত হইতে হয় না, আর, ঈশ্বরকে মনুষ্যের ন্যায় অল্পজ্ঞ চেতন বলা মানবীকরণই বটে; ডিস্‌ডেল-সম্মত বাইবেল শাস্ত্র অনেক স্থানে এইরূপ মানবীকরণ দোষে লিপ্ত হইয়াছে। মানবীকরণ প্রবন্ধের একটিও কোন কথায় প্রভাত বাবু যদি কোন প্রকার যুক্তি-দোষ দেখিয়া থাকেন তবে তাহাই তিনি আমাদিগকে বলুন্—তাহার আমরা উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি। তিনি এ'র ও'র তা'র দোহাই দে'ন কেন? আমরা বীজ-গণিতের নিয়মানুসারে—অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি-অনুসারে—দেখাইয়াছি যে, চেতনও নহে অচেতনও নহে=অচেতন চেতন—যাহার কোন অর্থই হয় না। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইহাকে বলে Reductio ad

WORM EATEN.

absurdum অর্থাৎ অর্থ-শূন্য প্রলাপ বাক্যে পরিসমাপ্তি! প্রক্টর বা অন্য কেহ যদি আমাদের এই অকাট্য যুক্তির কোন প্রকার প্রতিযুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন তবে সেই প্রতিযুক্তিটি যে, কি, প্রভাত বাবু নিজেই তাহা আমাদিগকে বলুন না কেন, তাহা হইলেই তদ্বিষয়ে আমাদেরও যাহা বলিবার আছে আমরা তাহা বলিতে পারি—তাহা হইলেই গোল মিটিয়া যায়; কিন্তু প্রভাত বাবু সেরূপ কোন প্রতিযুক্তির কথাই উল্লেখ করিতেছেন না—কেবল বলিতেছেন যে, প্রক্টরের মতানুসারে অচেতন চেতন থাকিলেও থাকিতে পারে। গণিত শাস্ত্রীয় অকাট্য যুক্তি আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে—প্রক্টর প্রভৃতির শুদ্ধ কেবল একটি মুখের কথা প্রভাত বাবুর পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে—এখন জিজ্ঞাসা করি যে, অকাট্য যুক্তি বড় না মুখের কথা বড়? পাঠক কি বলেন? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তো এইটিই বিচার-সঙ্গত মনে হয় যে, যুক্তিহীন মুখের কথা অপেক্ষা অকাট্য যুক্তির মূল্য শত সহস্র গুণ অধিক। তবে, প্রক্টর সাহেবের এই যে একটি কথা যে, "A God understood is no God at all" ইহার অর্থ স্বতন্ত্র; ইহার অর্থ শুদ্ধ কেবল এই যে, ঈশ্বরকে আমরা রীতিমত বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিতে পারি না—এ নহে যে, ঈশ্বরকে আমরা সচেতন বলিয়াও জানি না। ক্ষুদ্র বালক অবশ্য পিতার মনের ভাব রীতিমত বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিতে পারে না, কিন্তু পিতা যে সচেতন ইহা সে খুবই জানে—ইহাও জানে যে, তাহার পিতার জ্ঞান তাহার নিজের জ্ঞান অপেক্ষা অনেক বেশী। এইরূপ, আস্তিক মাত্রই জানেন যে, ঈশ্বর সচেতন এবং তদপেক্ষা অনন্তগুণে অধিক—ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ; কিন্তু তাহা বলিয়া কোন্ আস্তিক এত বড় একটা স্পর্দ্ধার কথা মুখে উচ্চারণ করিতে—এমন কি মনের এক কোণেও স্থান দিতে—আপনাকে পাপ-ভারে প্রপীড়িত মনে না করেন যে, ঈশ্বরকে আমি রীতিমত বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিয়াছি? আর-একদিকে এইরূপ দেখা যায় যে, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই এক-বাক্যে এইরূপ উপদেশ দে'ন যে, "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব" পরব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর, Seek and ye shall find, অন্বেষণ কর—পাইবে; ইত্যাদি। ইহা দৃষ্টে কি মনে হয়? ইহাই মনে হয় যে, পিতার মনের ভাব আমি সমস্তই বুঝি—ইহাই বালকের অনুচিত স্পর্দ্ধাবাক্য; কিন্তু পিতার মনের ভাব বুঝিতে চেষ্টা করা উল্টা আরো বালকের কর্ত্তব্য; এবং যত সে চেষ্টা করিবে ততই তাহার চক্ষু ফুটিবে। এইরূপ, ঈশ্বরকে যতই আমরা জানিতে চেষ্টা করিব ততই আমাদের জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবে; এ ভিন্ন, অনন্ত পরব্রহ্মের অন্ত কেহ কখন পায়ও নাই পাইবেও না। অতএব ঈশ্বরকে রীতিমত বুদ্ধিতে আয়ত্ত করা স্বতন্ত্র এবং ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জানা স্বতন্ত্র; উহা কেহ করেও নাই করিবেও না—ইহা আস্তিক মাত্রেই করিয়া থাকেন। অতএব ইহা যেমন সত্য যে, A God understood is no God at all, ইহাও তেমনি সত্য যে, A God without knowledge is no God at all.

শ্রীদ্বি]

এখন মনে করা যাউক যে ডাঃ ড্রিস্ডেল এবং মেং প্রকটারের ভাষা আলঙ্কারিকই বটে। তাহা হইলে আমরা যে, ঈশ্বরকে চেতন এবং অচেতন ইহার কিছুই নহে বলিয়াছি তাহা বিজ্ঞান অনুগত কি না সে বিষয়ের আলোচনা করা যাউক।

বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশিষ্ট জ্ঞান। এই কথা হইতে দুইটী প্রশ্ন হইতে পারে। ১। বিশিষ্ট জ্ঞান কাহাকে বলে? এবং ২। কি বিষয়ের জ্ঞান? হার্ব্বার্ট স্পেন্সরের মতে "সামান্য জ্ঞানের উচ্চতর বিকাশের নাম বিজ্ঞান।" এই সংজ্ঞাও পরিষ্কার রূপে বুঝিতে হইলে "সামান্য জ্ঞান" এবং "উচ্চতর বিকাশ" এই দুই শব্দের ব্যাখ্যা জানা আবশ্যক। সামান্য জ্ঞান বলিতে এমত জ্ঞান বুঝা যায়, যাহা কোন বস্তু দর্শনে সহসাই উদিত হয়। যথা, সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত দর্শন করিলে সহসা এই প্রতীতি জন্মে যে, সূর্য্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। ইহাই সামান্য জ্ঞান, কিন্তু বিজ্ঞান নহে। কারণ, ইহা প্রমাণ ও পরীক্ষা দ্বারা পরিশোধিত হইয়া উচ্চতর বিকাশ প্রাপ্ত না হইলে বিজ্ঞানে উন্নীত হইতে পারে না। কিন্তু পৃথিবী এত বৃহৎ এবং সূর্য্য এত দূরবর্ত্তী যে উহাদিগকে পরীক্ষার অধীন করিয়া উক্ত সামান্য জ্ঞানকে বিকসিত করা সহজ কার্য্য নহে। এজন্য এস্থলে কেবল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াই পরিতুষ্ট থাকিতে হইবে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ সর্ব্বপ্রথমে কেবল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই এই সামান্য জ্ঞানকে বিজ্ঞানে উন্নীত করিয়াছিলেন। সেই প্রমাণ এই ঃ—গ্রহ ও নক্ষত্রগণও সূর্য্যের ন্যায় প্রত্যহ উদিত এবং অস্তগত হয়। এই হেতু গ্রহ ও নক্ষত্রগণের পরিভ্রমণ সূর্য্যের পর্য্যটনের প্রমাণ মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত। যদি গ্রহ ও নক্ষত্রগণের পরিভ্রমণ আলোচনা করিয়া দেখা যায় তবে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, গ্রহ ও নক্ষত্রগণ যে, কেবল পৃথিবীকে দৈনিক প্রদক্ষিণ করে এমত নহে উহারা বাস্তবিক বার্ষিকও পরিবেষ্টন এবং তদতিরিক্ত গ্রহগণ আবার স্থির নক্ষত্র মধ্যে নানা রূপ বিশৃঙ্খল ভাবে পর্যটন করিয়া থাকে। গ্রহ ও নক্ষত্রগণের এতদ্রূপ গতির সহিত সূর্য্যের পরিভ্রমণের তুলনা করিলে আর পৃথিবীকে সূর্য্যের দৈনিক প্রদক্ষিণ করিবার সিদ্ধান্ত স্থির থাকিতে পারে না। তখন ইহা পরিশোধিত হইয়া এইরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয় যে, পৃথিবীই ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করে। ইহারই নাম বিশিষ্ট অর্থাৎ উচ্চতর বিকাশ প্রাপ্ত জ্ঞান, সুতরাং তখন উহা বিজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া দাঁড়ায়।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্নটীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। কোন্ বিষয়ের জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান? যখন সামান্য জ্ঞান পরীক্ষা ও প্রমাণ দ্বারা পরিশোধিত হইলে বিজ্ঞানে উন্নীত হয়, তখন তাহা এমত বিষয়ের হওয়া চাই, যাহার উপর পরীক্ষা ও প্রমাণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু জড় পদার্থই পরীক্ষণীয় ও প্রমেয় বস্তু। অতএব জড় পদার্থের জ্ঞানই বিজ্ঞান মধ্যে গণ্য। বাস্তবিক এক মাত্র জড় পদার্থই জগতে দেখিতে পাওয়া যায় এবং যাহা কিছু জ্ঞান আমরা উপলব্ধ করি তাহা জড় পদার্থের মাত্র। এজন্য আমরা কোনও কথাই চিন্তা বা কল্পনা করিতে পারি না যাহা এ জড় জগতে কদাপি দর্শন আদি করিতে পারি নাই।

[আমি স্বচ্ছন্দে চিন্তা করিতে পারি যে, প্রভাত বাবু আমার লিখিত এই কথাটি বুঝিতেছেন; অথচ, জড় জগতের কোন স্থানেই আমি বোধক্রিয়ার চিহ্ন মাত্রও দেখি নাই—চেতন রাজ্যেই আমি বুদ্ধি ক্রিয়া উপলব্ধি

করিয়া থাকি। সভ্য মনুষ্য-মাত্রেই বারো আনা অংশ চেতন লইয়াই ব্যাপৃত থাকে—কেননা তাহার পরিবারবর্গ, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি-কুটুম্ব সকলেই চেতন-পদার্থ। জন-শূন্য উপদ্বীপের রবিন্‌সন্ ক্রুসো—যাঁহার ত্রিসংসারে কেহই ছিল না, তিনিও মানব-চেতনের জন্য হাহাকার করিয়া কাল-যাপন করিতেন—তবে আর কেমন করিয়া বলিব যে, মনুষ্যের চিন্তা শুদ্ধ কেবল জড়জগতেই আবদ্ধ। প্রভাত বাবু বলিতে পারেন যে, লোকের কথাবার্ত্তা শুনিলে এবং কার্য্যাদি দর্শন করিলে তবেই আমরা তাহাদের বুদ্ধি-ক্রিয়ার পরিচয়-প্রাপ্ত হই;—কিন্তু কথা-বার্ত্তা মুখের বায়ু-মাত্র ও আচার ব্যবহার অঙ্গ-চালনা মাত্র, সুতরাং দুইই জড়জগতের অন্তর্গত। ইহার প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা যদি আমাদের নিজের নিজের বুদ্ধি-ক্রিয়াকে চেতন-রাজ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধি না করিতাম তবে অন্যের বুদ্ধি-ক্রিয়া আমাদের ধ্যানের অগোচর হইত। অতএব বুদ্ধি-ক্রিয়াকে যখন আমরা আপনার অভ্যন্তরে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি, তখন চেতনরাজ্যেই তাহাকে আমরা উপলব্ধি করি। বুদ্ধি-ক্রিয়া তো দূরের কথা—সামান্য ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াও চেতন-জগতের অন্তর্গত; ধর যেন—উত্তাপ; উত্তাপ অবশ্য জড়জগতেরই অন্তর্গত; তাহা এক প্রকার আণব (Molicular) গতি ভিন্ন আর কিছুই নহে—সুতরাং তাহা ভৌতিক ক্রিয়া; কিন্তু উত্তাপ যেমন ভৌতিক ক্রিয়া উত্তাপের অনুভবও কি সেইরূপ ভৌতিক ক্রিয়া? কখনই না—উত্তাপের অনুভব এক প্রকার মানসিক ক্রিয়া সুতরাং তাহা চেতন-জগতেরই অন্তর্গত।

যদি সেই উপার্জ্জিত জ্ঞান কার্য্য কারণ আদি সম্বন্ধ শূন্য হয়, তবে তাহা সামান্য জ্ঞান এবং কার্য্য কারণ আদি সম্বন্ধযুক্ত হইলেই বিজ্ঞান নামে অভিহিত।

এখন ঈশ্বর চেতনও নহেন এবং অচেতনও নহেন—এই বাক্যটী বিজ্ঞানের অনুগত কি না আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতে জগতে চেতন ও অচেতন এই দ্বিবিধ পদার্থ মাত্র বিদ্যমান আছে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি চেতনের স্বাধীন বিদ্যমানতা কে দর্শন করিয়াছে? তাহা কি অচেতন জড় পদার্থের আশ্রয় ভিন্ন স্বাধীন অবস্থায় দর্শন করিতে পারা যায়? যদি উহা জড় পদার্থে ভিন্ন স্বাধীন ভাবেই দৃষ্টিগোচর না হয় তবে তাহা যে জড় পদার্থেরই গুণ নহে ইহা কে প্রতিপাদন করিতে পারে? বস্তুত্বের লক্ষণ কি? যাহা এখন আছে, পরক্ষণে নাই, পরে আবার দেখা দেয় এবং পুনরায় অন্তর্হিত হয় তাহাকে কি বস্তু বলা যাইতে পারে? যথা, বীণা যন্ত্রের ধ্বনি। তাহা এই উৎপন্ন হইল, এই রহিত হইয়া গেল, আবার উৎপন্ন হইল এবং পুনরায় বিলয় প্রাপ্ত হইল। এরূপ ধ্বনি কি বাস্তবিক কোন বস্তু, না তাহা ক্রিয়াবিশেষের প্রকাশিত ফল। বিজ্ঞান মতে ইহা ক্রিয়াবিশেষের ফলই বটে। পাঠক! এখন চিন্তা করিয়া দেখ দেখি বীণাধ্বনির সহিত চৈতন্যের তুলনা হইতে পারে কি না? চৈতন্য এই আছে, এই নাই, আবার আসিল এবং পুনরায় অন্তর্হিত হইল; এতদ্রূপ পুনঃ পুন বিনাশশীল চৈতন্য কি স্বাধীন বস্তু বলিয়া গণ্য হইতে পারে? ইহা কি ধ্বনির ন্যায় ক্রিয়া বিশেষের ফল নহে।

[কালিকের বীণা ধ্বনি ভিন্ন, এবং আ-

শ্রীদ্বি]

জিকের বীণাধ্বনি ভিন্ন; কিন্তু যে প্রভাত বাবু প্রথম সংখ্যক প্রতিবাদের লেখক, সেই প্রভাত বাবুই তৃতীয় সংখ্যক প্রতিবাদের লেখক—প্রভাত বাবু একই প্রভাত বাবু; পাঠক কি বলিবেন যে, না তাহা নহে—কালিকের তোপধ্বনি যেমন আজিকের তোপধ্বনি নহে, তেমনি কালিকের সে প্রভাত বাবু আজিকের এ প্রভাত বাবু নহে? কল্যও আমি সুখে ছিলাম—অদ্যও আমি সুখে আছি; অদ্যকার সুখের অবস্থা কল্যকার সুখের অবস্থা হইতে ভিন্ন, কেননা, কল্যকার সে সুখ অদ্যকার এ সুখ নহে; কিন্তু অদ্যকার আমি কল্যকার আমি হইতে ভিন্ন নহি, কেননা কল্যকার সেই আমিই অদ্যকার এই আমি। "আমার বিভিন্ন অবস্থার সাক্ষী-স্বরূপ যে চৈতন্য, তাহা কি ধ্বনির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন? না ধ্রুব পদার্থের ন্যায় সকল মুহূর্ত্তেই একই অভিন্ন?" এ কথা পাঠককে জিজ্ঞাসা করাও যা', আর, এ কথাও তা, যে "আমার কি জিহ্বা আছে—না মূলেই আমার জিহ্বা নাই?—একবার দেখ তো হে বাপু!" যদি আমার জিহ্বা না থাকিত তবে আমি ও-কথাটি উচ্চারণ করিতেই পারিতাম না। প্রভাত বাবুর সাক্ষী চৈতন্য যদি ধ্বনির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন হইত, তবে কে-ই বা পাঠককে প্রশ্ন করিতেছে—কাহাকেই বা পাঠক উত্তর প্রদান করিবেন? পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের প্রভাত বাবুই প্রশ্ন করিয়াছেন; পর-মুহূর্ত্তের আর-এক প্রভাত বাবুকে তাহার উত্তর প্রদান করিয়া ফল কি? যিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাঁহাকে উত্তর প্রদান করাই তো বিধেয়! ইহাকেই বলে Reductio ad absurdum! আর একটি কথা এই যে, জ্ঞানের মূল প্রদেশে এরূপ কতকগুলি সত্য রহিয়াছে যাহা একেবারেই অকাট্য এবং অপরিবর্ত্তনীয়—যেমন পরিবর্ত্তন-মাত্রেরই কারণ আছে—পরিপূর্ণ সত্য অপূর্ণ সত্যের আশ্রয়—ইত্যাদি; সুতরাং জ্ঞানের সেই বিশুদ্ধ মূল প্রদেশটি পরিবর্ত্তন কাহাকে বলে তাহা জানে না। জ্ঞানের প্রান্ত-স্থানীয় শারীরিক এবং মানসিক অবস্থাই পরিবর্ত্তনশীল—কিন্তু জ্ঞানের কেন্দ্র-স্থানীয় আত্মা অটল এবং অপরিবর্ত্তনীয়; যেমন ঘূর্ণায়মান চক্রের কেন্দ্র যেখানকার সেইখানেই থাকে, কিন্তু তাহার পরিধির প্রত্যেক অংশ ক্রমাগতই স্থান পরিবর্ত্তন করে—উহাও সেইরূপ। প্রভাত বাবু জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, জীব-চৈতন্য স্বাধীন কি না? ইহার উত্তর এই যে, জীব-চৈতন্য কোন্ অংশে স্বাধীন কোন্ অংশে পরাধীন—ইহা প্রতি মনুষ্যেরই আপনি বুঝিবার কথা—অন্যকে বুঝাইবার কথা নহে; লোহার সিন্ধুকের মধ্য হইতে টাকা বাহির করিয়া দর্শনার্থী ব্যক্তিকে তাহা দেখানো যাইতে পারে, কিন্তু আত্মার স্বাধীনতাকে বক্ষ চিরিয়া বাহির করিয়া কেহ কাহাকেও দেখাইতে পারে না; তবুও যদি বল যে, আত্মার স্বাধীনতার প্রমাণ কি? তবে তাহার উত্তর এইরূপ যথা;—আপনার অধীনতাই স্বাধীনতা, অন্যের অধীনতাই পরাধীনতা; পরাধীনতা জড়জগতের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, স্বাধীনতা জড়জগতের কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না;—তবে "স্বাধীনতা" এ কথা আমরা পাইলাম কোথা হইতে? অবশ্য আমরা আপনার অভ্যন্তরে কোন না-কোন-প্রকার স্বাধীনতার ভাব উপলব্ধি করি, তাই সেই ভাবটি অন্যের নিকটে জ্ঞাপন করিবার জন্য "স্বাধীনতা" এই শ-

ব্দটি ব্যবহার করি। "আমি আপনি যাহা বুঝি—তাহা আমি প্রভাত বাবুকে বুঝাইব" আমি আপনিই এইরূপ একটি নিয়ম স্থির করিয়াছি এবং আমার আপনার সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আমি অদ্যকার এই প্রস্তাবটি লিখিতেছি;—তাই আমি বলি যে, আমি স্বাধীনভাবে লিখিতেছি। কিন্তু এক অংশে যেমন আমি স্বাধীন—আর এক অংশে তেমনি আমি পরাধীন; দোয়াত কলম না থাকিলে আমি লিখিতে পারিতাম না—আমার শরীর সুস্থ না থাকিলে আমি লিখিতে পারিতাম না—ইত্যাদি। অতএব, স্বাধীনতায় ভাব আমি আপনার অভ্যন্তরে উপলব্ধি করিতেছি বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও আমি জানিতেছি যে, আমি সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন নহি;—কোন আপেক্ষিক সত্যই আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে সুতরাং সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন নহে; পরমাত্মাই সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন। শ্রী দ্বি]

ধ্বনির সহিত চৈতন্যের সাদৃশ্য যে এই স্থলেই শেষ হইয়াছে এমত নহে। ধ্বনির উৎপত্তি জন্য যেরূপ বীণা এবং বাদক আবশ্যক, চৈতন্যের উদ্রেক জন্যও মস্তিষ্ক এবং আলোক আদি উত্তেজন আবশ্যক। ইহা বাস্তবিক বিজ্ঞানেরই কথা, কল্পনার কথা নহে। মস্তিষ্কই যে বাস্তবিক চৈতন্যের যন্ত্র ইহা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা না করিয়া আমরা ডাং ফেরিয়ার কৃত "মস্তিষ্কের ক্রিয়া" নামক গ্রন্থের ৪২৪ পৃষ্ঠা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিলাম। "মস্তিষ্কই যে মনের যন্ত্র ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত স্বতঃসিদ্ধ। দ্ব্যর্দ্ধ মস্তিষ্কের ক্রিয়া হইতে যে চৈতন্যের কোনও অবস্থার স্বাতন্ত্র্য আছে এমত প্রমাণ নাই। পরন্তু কোন কিছু যে (মস্তিষ্কে) অতিরিক্ত সংযুক্ত আছে অথবা সরলতম স্নায়বিক যন্ত্রের ক্রিয়া হইতে যে বাল্‌কল (cortical) কেন্দ্র সকলের ক্রিয়ার কোন পার্থক্য ভাব আছে তাহাও বিশ্বাস করিবার কারণ নাই; কিন্তু সরলতম প্রতিক্ষেপিকা ক্রিয়া এবং জটিলতম মানসিক কার্য্য মধ্যে যে ধারাবাহিক অচ্ছিন্ন প্রকার (gradation) আছে তাহারই বরং প্রমাণ পাওয়া যায়।"

[মস্তিষ্ক যে একটা যন্ত্র, ইহা কেহই অস্বীকার করে না, কিন্তু মস্তিষ্ক কাহার যন্ত্র? সাক্ষী চৈতন্যের—আত্মার। সুতরাং সাক্ষী চৈতন্য মস্তিষ্ক হইতে ভিন্ন—যন্ত্রী যন্ত্র হইতে ভিন্ন। আলোক কাহার চক্ষুরিন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে? সাক্ষী চৈতন্যের—আত্মার। সুতরাং সাক্ষী চৈতন্য আলোক এবং চক্ষুরিন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন। সরলতম স্নায়বিক ক্রিয়ারই বা কে ফলভোক্তা, আর, জটিলতম কৈন্দ্রিক ক্রিয়ারই বা কে ফলভোক্তা? না সাক্ষী-চৈতন্য; সুতরাং সাক্ষী চৈতন্য স্নায়বিক এবং কৈন্দ্রিক ক্রিয়া হইতে ভিন্ন। অতএব প্রভাত বাবু ঐ সকল বিভিন্ন ক্রিয়ার সহিত সাক্ষী চৈতন্যকে জড়াইয়া ঝোলে অম্বলে মিশাইবেন না। শ্রী দ্বি]

আলোক আদির উত্তেজন ব্যতীত যে চৈতন্য উৎপন্ন হয় না এখন সেই বিষয়ের আলোচনা করা যাউক। আমাদের শারীরিক প্রকৃতি এরূপ দেখা যায় যে, কিছু কাল পরিশ্রম করিলে শ্রমশক্তি ক্রমে লাঘব হইতে থাকে, অবশেষে এরূপ হইয়া দাঁড়ায় যে, আর পরিশ্রম করিতে পারা যায় না। তখন সমুচিত কাল বিশ্রাম না করিলে আর শ্রমক্ষম হইতে পারা যায় না। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে যে, বিশ্রাম দ্বারা স্নায়ু ও মাংসপেশীতে

এক প্রকার শক্তি সঞ্চিত হয়। সেই সঞ্চিত শক্তির বিকাশ প্রভাবেই পরিশ্রম করিতে পারা যায় এবং পরিশ্রম সহকারে তাহার ক্ষয় হইলে পুনরায় ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয়। (শারীর বিধান বিদ্যা মতে পরিশ্রম দ্বারা এক প্রকার ক্লান্তিজনক পদার্থও মাংসপেশীতে উৎপন্ন হইয়া পরিশ্রম-শক্তি লাঘব হয়। সুতরাং ক্লান্তিজনক পদার্থের উৎপত্তিও পরিশ্রম-শক্তি লাঘবের এক উপাদান।) চিন্তাশক্তি এবং চৈতন্য সম্বন্ধেও তদ্রূপ। চেতনা থাকিলে চিন্তা শক্তির কিছু কিছু চালনা হয়ই হয়। তদ্ধেতু সময়ে সময়ে এরূপ অবস্থা দাঁড়ায় যে, নিদ্রিত হইয়া সমুচিত বিশ্রাম না করিলে সুবিধা ও শৃঙ্খলার সহিত চিন্তা করা দূরে থাকুক দীর্ঘকাল জাগ্রৎ থাকিতেও পারা যায় না। এই হেতু চিন্তা করিবার এবং চেতন থাকিবার জন্যেও মস্তিষ্ক মধ্যে বিশেষ প্রকার শক্তি সঞ্চিত হওয়া আবশ্যক। পরন্তু শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা যেরূপ পেশী মধ্যে ক্লান্তিজনক পদার্থ জন্মে মানসিক পরিশ্রম দ্বারা সেইরূপ কোন পদার্থ মস্তিষ্ক মধ্যে উৎপন্ন হয় এমত প্রমাণ নাই। অতএব কেবল মস্তিষ্কের শক্তিক্ষয়ই চিন্তা ও চেতনা শক্তি লাঘবের একমাত্র কারণ।

[অত কথা না বলিয়া এক কথায় বলিলেই হয় যে, শরীর ভাল থাকিলেই চিন্তাশক্তি রীতিমত স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে। কিন্তু বাহ্য বস্তুও যেমন—মানসিক চিন্তাও তেমনি—উভয়ের কোনটিই সাক্ষী চৈতন্য নহে; হস্তীও আমি নহি—হস্তিচিন্তাও আমি নহি; শরীরও আমি নাহি—শরীরচিন্তাও আমি নহি, তবে কি? না সেই সকল বস্তুর এবং সেই সকল চিন্তার সাক্ষী পুরুষই আমি-শব্দের বাচ্য। সাক্ষী চৈতন্য সাদা বস্তু দেখিবার সময় সাদা হয় না—কালো বস্তু দেখিবার সময় কালো হয় না; দুই বস্তু দেখিবার সময় দুই হয় না—তিন বস্তু দেখিবার সময় তিন হয় না; সাক্ষী চৈতন্য হস্তি-চিন্তার সময়েও হস্তী হয় না—অশ্ব-চিন্তার সময়েও অশ্ব হয় না; বস্তু-বৈচিত্র্যে সাক্ষী-চৈতন্যের বৈচিত্র্য হয় না; সুতরাং চিন্তার হ্রাস বৃদ্ধিতে সাক্ষী চৈতন্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। সাক্ষী চৈতন্য আপনার সতেজ চিন্তা-শক্তিরও সাক্ষী—নিস্তেজ চিন্তা-শক্তিরও সাক্ষী। নিদ্রাকর্ষণের সময় তো চিন্তাশক্তি খুবই নিস্তেজ হয়, কিন্তু তখনও সাক্ষী চৈতন্য এক প্রকার সূক্ষ্ম আরামের অবস্থায় প্রবেশ করিয়া পরম সুখ উপলব্ধি করে; এই জন্যই নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির মুখে এ কথা শোভা পায় যে, "কল্য রাত্রে আমি পরম সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম"; কারণ, নিদ্রাকালে যদি সে ব্যক্তি পরম সুখের অবস্থা উপলব্ধি না করিত, তবে পরবর্ত্তী কালে সে বৃত্তান্তটি কখনই তাহার স্মৃতি-পথে আবির্ভূত হইতে পারিত না; কেননা পূর্ব্বে যে-বিষয় সাক্ষাৎ জ্ঞানে উপস্থিত হইয়াছে, সেই বিষয়ই কেবল পশ্চাতে স্মরণে উপস্থিত হইতে পারে; অতএব নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির যখন দিব্য স্মরণ হইতেছে যে, কল্যরাত্রে আমি পরম সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, তখন নিদ্রাকালে সে সুখ অবশ্যই তাহার সাক্ষাৎ জ্ঞানে বিদ্যমান ছিল। আমার বেস্ স্মরণ হইতেছে যে, অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে আমি প্রভাত বাবুর প্রতিবাদ পাঠ করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিয়াছি—ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে উক্ত সময়ে (স্মরণে নহে কিন্তু সাক্ষাৎ জ্ঞানে) বাস্তবিকই আমি আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। এইরূপ নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির এই যে একটি

বৃত্তান্ত স্মরণ হইতেছে যে, কল্য রাত্রে আমি পরম সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে নিদ্রাকালে সে ব্যক্তি (স্মরণে নহে কিন্তু সাক্ষাৎ জ্ঞানে) পরম সুখ অনুভব করিয়াছিল। অতএব নিদ্রাবস্থায় যখন চিন্তা-শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে—সাক্ষী চৈতন্য তখনকারও সুখাবস্থার সাক্ষী—সুতরাং সে আপনি সে-অবস্থা হইতে ভিন্ন। সাক্ষী চৈতন্য নিজে জাগ্রদবস্থাও নহে, স্বপ্নাবস্থাও নহে, সুষুপ্তি অবস্থাও নহে—পরন্তু তিন অবস্থারই সাধারণ সাক্ষী। শ্রীদ্বি]

মাংসপেশী ও মস্তিষ্কে যে শক্তি সঞ্চয়ের উল্লেখ করা গেল সেই সঞ্চিত শক্তি বাস্তবিক কিরূপ তাহারও আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা অণুক্ষণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ এবং প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছি। এই দ্বিবিধ ক্রিয়া দ্বারা দুইটী কার্য্য সম্পন্ন হয়। নিঃশ্বাস দ্বারা অভ্যন্তরস্থ নিষ্প্রয়োজনীয় পদার্থ পরিত্যক্ত এবং প্রশ্বাস দ্বারা বায়ু হইতে অম্লযান গৃহীত হয়। * পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, নিদ্রাকালে যে পরিমাণ (মুক্ত ও মিশ্রিত) অম্লজান নিঃশ্বাস যোগে বহির্গত হয় তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ প্রশ্বাস যোগে গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ গৃহীত অতিরিক্ত অম্লজান শোণিত আদিতে সঞ্চিত থাকে। সেই সঞ্চিত অম্লজান শারীর পদার্থের সহিত রাসায়নিক আদিরূপে মিশ্রিত হইয়া তাপ উৎপাদন করে। সেই উৎপন্ন তাপই বাস্তবিক সর্ব্বপ্রকার শারীর শক্তির মূল। এ জন্য যদি কোন কারণবশতঃ অম্লজান গ্রহণের ব্যাঘাত হয় তবে শারীর ক্রিয়া এবং মানসিক কার্য্য সমুদয়েরই ব্যত্যয় জন্মে। এই হেতুই পীড়া বিশেষে মানসিক বিকার এবং প্রলাপ আদিও হইতে দেখা যায়।

[নিশ্বাস প্রশ্বাসজ উত্তাপ ব্যতিরেকে শরীর কিছুতেই রক্ষা পাইতে পারে না—ইহা খুবই সত্য; কিন্তু তাহা বলিয়া সে উত্তাপকে সাক্ষী চৈতন্য বলা যাইতে পারে না; কে তবে সাক্ষী চৈতন্য? না সেই উত্তাপের ফলভোক্তা—সেই উত্তাপের উপলব্ধিকর্ত্তা—সেই উত্তাপের জ্ঞাতা। শ্রী দ্বি]

জীব-শরীরে দুই প্রকার পদার্থ আছে। মৃত এবং জীবিত। যথা, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলের মধ্যস্থ শ্বেত ও ধূসর পদার্থ। শ্বেত পদার্থ মৃত এবং ধূসর পদার্থ জীবিত। শারীর মৃত এবং জীবিত পদার্থের সহিত এক দিকে কাষ্ঠ ও দহনোৎপন্ন জল আদি এবং অন্য দিকে অনলের তুলনা হইতে পারে। যখন কাষ্ঠস্থিত ইন্ধন বায়ুস্থ অম্লজানের সহিত রাসায়নিক রূপে মিশ্রিত হইতে থাকে, তখন সেই মিশ্রণশীল অবস্থার নাম অনল। উক্ত মিশ্রণ সমাপ্ত হইয়া যে বস্তুর উৎপত্তি হয় তাহা জল আদি। এস্থলে কাষ্ঠ ও জলকে মৃত এবং অনলকে জীবিত বলা যাইতে পারে। কারণ শারীর মৃত পদার্থ সকল কাষ্ঠ বা জলের ন্যায় শরীরান্তর্গত বিশেষ প্রকার মিশ্রণ কার্য্যের পূর্ব্ব এবং শেষ এবং দৈহিক জীবিত পদার্থ অনলের ন্যায় সেই বিশেষ প্রকার মিশ্রণশীল অবস্থা। আর

* প্রভাত বাবু এখানে একটি শব্দের ভুল করিয়াছেন; নিশ্বাস না লিখিয়া তিনি নিঃশ্বাস লিখিয়াছেন, এবং তাহার অর্থ এইরূপ করিয়াছেন যে, যে শ্বাস নির্গত হয় তাহাই নিঃশ্বাস। কিন্তু আমাদের দেশীয় ভাষায় নিঃশ্বাসের নি বিসর্গ-যুক্ত নহে। নির্ব্বাসের নি বিসর্গ যুক্ত বটে কিন্তু নিবাসের নি বিসর্গ-যুক্ত নহে। সংস্কৃত ভাষার নিঃ=ল্যাটিন ভাষার ex; কিন্তু সংস্কৃত ভাষার নি=লাটিন ভাষার in। নিশ্বাস-কিনা inbreathing। সংস্কৃত ভাষার প্র=Latin ভাষার pro=ইংরাজি ভাষার forth; প্রশ্বাসকিনা প্রক্ষিপ্ত propelled শ্বাস—breathing forth; অতএব, যে শ্বাস নির্গত হয় তাহাই প্রশ্বাস। শ্রী দ্বি]

যেরূপ দহন হইতে তাপ উৎপন্ন হইয়া সংলগ্ন কাষ্ঠকেও দগ্ধ অর্থাৎ দহনে পরিবর্ত্তিত করে, সেইরূপ জৈবনিক মিশ্রণ হইতেও বিশেষ প্রকার বল উৎপন্ন হইয়া সংলগ্ন মৃত পদার্থকে জীবিত পদার্থে পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকে। অর্থাৎ অনলে যেরূপ সদৃশ অনল উৎপাদন করিবার বল উৎপন্ন করে, শারীর জীবিত পদার্থেও সেইরূপ সদৃশ জীবিত পদার্থ উৎপাদন করিবার বল উৎপন্ন করিয়া থাকে। অতএব অনল এবং জীবিত পদার্থ উভয়েই বিশেষ বিশেষ বলের আকর। কিন্তু কাষ্ঠ এবং মৃত পদার্থে বিশেষ বিশেষ প্রকার বল আবদ্ধ থাকিলেও উহারা অনল ও জীবিত পদার্থের ন্যায় বলশালী নহে।

[প্রভাত বাবু এতগুলা কথা কি উদ্দেশে বলিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার অভিপ্রায় যদি এইরূপ হয় যে, ধূসর পদার্থই সাক্ষী চৈতন্য বা আত্মা, তবে তাঁহার সে কথায় আমরা কোন ক্রমেই সায় দিতে পারি না। আমরা বলি যে সেই ধূসর পদার্থের জৈবনিক কার্য্যের ফলভোক্তাই আত্মা; কেননা ধূসর পদার্থ নিজে কিছু আর তাহার নিজের কার্য্যের ফল-ভোগ করে না। শ্রীদ্বি]

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলির শ্বেত পদার্থ মৃত এবং ধূসর পদার্থ জীবিত। শ্বেত পদার্থ আবার সূত্রাকৃতি। সূত্র সকল স্নায়বীয় কেন্দ্র হইতে বহির্গত হইয়া শাখায় প্রশাখায় বিভক্ত হইতে হইতে পারিধ (peripheral) প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত আছে। স্নায়বীয় সূত্র সকল আবার অল্প অল্প দূর অন্তর জীবিত ধূসর পদার্থের পুঞ্জ সম্বলিত। ইহাতে স্নায়বীয় বল চালনার এই সুবিধা হয়ঃ—কোন স্থানে একটী বল উৎপন্ন হইলে তাহা প্রবাহমান হইতে থাকে আর বাহক সূত্রের মধ্যস্থিত ধূসর পদার্থ পুঞ্জ সকল হইতে বল গ্রহণ করিয়া ক্রমে পোষিত হইতে হইতে চলিতে আরম্ভ করে। এখন মনে কর তোমার হস্তাঙ্গুলিতে আমি চিমটি কাটিলাম। ইহাতে চিমটির স্থানে একটী বল উৎপন্ন হইল। সেই বল স্নায়ুযোগে প্রবাহিত হইয়া বোধ-গ্রাহক স্নায়ুকেন্দ্রে যাইয়া কার্য্য করিল তাহাতে তথায় আর একটী বল উৎপন্ন এবং অঙ্গুলিতে প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া উহাকে চিমটির উত্তেজনা হইতে অপসারিত করিল। এস্থলে যদি তুমি জাগরিত থাক তবে সেই বোধ-গ্রাহক কেন্দ্রের উৎপন্ন বল তোমার কর্ত্তৃত্বাধীন হওয়াতে তাহাকে প্রবাহিত হইতেও দিতে পার এবং না হইতেও দিতে পার। কিন্তু যদি তুমি নিদ্রিত থাক তবে উক্ত বল তোমার আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই অঙ্গুলীকে চিমটি হইতে অপসৃত করিবে। যদি ভেকের মস্তিষ্ক ফেলিয়া দিয়া এই পরীক্ষাটী করা যায়, তবে আমাদের এই উক্তি আরো বিশদ রূপে প্রতিপন্ন হইবে। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে, স্নায়বীয় উত্তেজনা গ্রহণ, পরিচালনা ও তদনুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য চেতনা আবশ্যক নহে।

[প্রভাত বাবু এইমাত্র বলিলেন যে "যদি তুমি জাগরিত থাক, তবে তোমার বোধ-গ্রাহক কেন্দ্রের উৎপন্ন বল তোমার কর্ত্তৃত্বাধীন হওয়াতে তাহাকে প্রবাহিত হইতেও দিতে পার এবং না হইতেও দিতে পার।" তাই আমরা বলি যে, স্নায়বিক কার্য্যের উপর আমাদের ঐ যে কর্ত্তৃত্ব—উহা স্নায়ু যন্ত্রেরও নহে—মস্তিষ্ক যন্ত্রেরও নহে, কিন্তু স্বয়ং সাক্ষী চৈতন্যের। নির্দ্দিষ্ট যন্ত্র নির্দ্দিষ্ট কার্য্যই করিতে

পারে; এ ভিন্ন, স্বকার্য্য করা না করা কোন যন্ত্রেরই কর্ত্তৃত্বাধীন হইতে পারে না। অতএব ঐরূপ কর্ত্তৃত্ব যাহার আছে, তাহা স্নায়বীয় যন্ত্র নহে কিন্তু স্নায়বীয় যন্ত্রের যন্ত্রী—সাক্ষী চৈতন্য আত্মা। শ্রীদ্বি]

যে চৈতন্য স্নায়বীয় উত্তেজনা গ্রহণ করে তাহা বাস্তবিক কিরূপ দ্রব্য এখন সেই বিষয়ের আলোচনা করা যাউক। বিজ্ঞান মতে বলের (তাহা তাপাদির আকারেই হউক, বা সামান্য জড় কণিকার গতিরূপেই হউক) কর্ত্তৃত্ব ভিন্ন কোন বস্তুর গতি জন্মিতে পারে না। এবং কোন গতি উৎপন্ন হইলে তাহা আপনা হইতে বিলুপ্ত হইতে পারে না। এই প্রাকৃতিক নিয়ম অবলম্বন করিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে চিমটি কাটার দরুণ যে বল উৎপন্ন হইয়া স্নায়ু যোগে মস্তিষ্কে নীত হয় তাহা সর্ব্বতোভাবেই জড়ীয় গতি।

[এইরূপ জড়ীয় গতি ভৌতিক রাজ্যেই দেখা গিয়া থাকে—আধ্যাত্মিক রাজ্যে নহে। ঘড়ির নিজের চলা-ফেরা'র উপরে যেমন তাহার নিজের কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না, প্রকৃতির নিজের জড়ীয় গতির উপরে তেমনি প্রকৃতির নিজের কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না; আত্মাই কেবল প্রকৃতির গতি'কে অভীষ্ট পথে নিয়মিত করিতে পারে। শ্রী দ্বি]

ক্রমশঃ

ব্যাখ্যানমঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্যের ব্যাখ্যান মূলক পদ্য।

চতুর্বিংশ ব্যাখ্যান।

শ্রেয় প্রেয় নাম, পুণ্য পাপ ধাম, দুটী পথ বিদ্যমান।
প্রেয় পরিহরি, শ্রেয় পথ ধরি, সাধুজন তা'তে যান॥

এ ঘোর সংসারে, মোহের পাথারে,
যবে তুমি দিশাহারা।
বিষম তুফানে, যাইতে উজানে,
হয়েছিলে প্রায় সারা॥

হেন দুরদিনে, তোমা দীন হীনে,
কে চাহিল দয়া করি।
পদতরী দিল, কূল দেখাইল,
উদ্ধারিল দয়া করি॥

পাপীর শরণ, অধম তারণ,
দয়াময় তিনি হ'ন।
পাপীরে তারিতে, শুভ মতি দিতে,
কত তাঁর আকিঞ্চন॥

প্রেয় বিনা সার, না ছিল তোমার,
মাতিলে বিষয় রসে।
জীবন ধারণ, কর কি কারণ,
ভুলিলে মায়ার বশে॥

অমৃতের কথা, সে পথ বারতা,
না শুনিলে তুমি কানে।
যিনি প্রেমদাতা, পিতা মাতা পাতা,
চাহিলে না তাঁর পানে॥

শ্রেয়ের সোপান, মঙ্গল নিদান,
কে তবে দেখায়ে দিল।
"পাপেতে মগন, আত্মার নিধন,"
কানে কানে কে বলিল॥

"কেন এলে ভবে, কোথা যে'তে হবে"
কে তোমারে সুধাইল।
"লইয়া জঞ্জাল, কেন হর কাল"
কে তোমারে প্রবোধিল॥

যে চাহেনা তাঁরে, ভোলে আপনারে,
পাপেতে অসাড় হিয়া।
তারেও ফেরান, হৃদয় গলান,
অনুতাপ অশ্রু দিয়া॥

তিনি অনুক্ষণ, করেন চেতন,
পাপীর হৃদয়ে আসি।
তিনি না শোধিলে, কৃপা না করিলে,
বাড়িত পাপের রাশি॥

মোরা অভাজন, তবু কদাচন,
ত্যজ্য পুত্র নহি তাঁর।
কাছেতে ডাকিয়া, মল মুছি দিয়া,
কোল দেন আপনার॥

পাপেরে রোধিতে, সুমতি পালিতে,
কর দেখি তুমি পণ।
অমনি সে পণ, করিতে রক্ষণ,
তিনি দেন সুঘটন॥

শ্রেয়েতে চলিতে, পর্ব্বত লঙ্ঘিতে,
প্রয়োজন যদি হয়।
তাহাও পারবে, অসাধ্য সাধিবে,
ঘুচাবেন তিনি ভয়॥

তাঁহারে ছাড়িলে, সংসারে সেবিলে,
ফাঁপরে পড়িবে হায়।
মৃগ তৃষ্ণিকায়, বল কে কোথায়,
অমৃতের কণা পায়॥

ক্রমশঃ।

—০—

সমালোচন।

Philosophy of the Bhagavadgita. A Lecture by Baboo Radhanath Basak B. A.

গীতা-তত্ত্ববিষয়ক বক্তৃতা শ্রীযুক্ত রাধানাথ বসাক বি, এ, কর্ত্তৃক প্রণীত। গ্রন্থকার এই বক্তৃতাটীতে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের সারার্থ বিশুদ্ধ ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করিয়া গীতার ভাব সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা ও তৎসঙ্গে spiritual culture অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অনুশীলন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটী প্রকটিত আছে তাহাতে তাঁহার ভক্তি প্রবণতা, সহৃদয়তা, ও পরমার্থ তত্ত্ব বিষয়ে গাঢ়াভিনিবেশ দেখিয়া আমরা সাতিশয় প্রীত হইলাম। পাঠকদিগের তৃপ্তিসাধন জন্য আমরা ঐ প্রবন্ধ হইতে একটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

From the commencement of spiritual culture, with the first glimpse of faith, to the state of constant communion with God, there are clearly two peculiar phases; to external appearance the first is a busy life; the second a comparatively secluded life. In regard to the internal state, the first shows the state of war with passions, their subjugation, the predominance of the highest motives in the performance of works tending to the welfare of men in general, a view of all mankind with an equal eye in regard to the relationship of God as Father, and a state of increasing happiness in consequence of internal peace. The second shows constant equanimity of mind and entire devotion to God. During the whole period of these stages, there is only one force at work—that of faith, holding God always in view. Man has to do nothing more than to leave himself to God, and then God does the rest in drawing man towards Himself.

ইহার মর্ম্মার্থ এই। সাধনের প্রথমাবস্থায় আত্মাতে নিকৃষ্ট রিপুদিগের সহিত সংগ্রাম—দেবাসুরের যুদ্ধ ক্রমে রিপুগণের উপর প্রভুত্ব, ঈশ্বরে একান্ত মতি, তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন অনুরাগ তৎপরে শান্তি ও আনন্দ ও ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর। নির্ভরের অবস্থায় সাধক আপনাকে ঈশ্বরের প্রতি একান্তে সমর্পণ করেন, ঈশ্বর তাঁহাকে অলক্ষিতরূপে আপনার দিকে আকর্ষণ করেন ও আপনার অমৃত ধামে স্থান দেন।

সুরাপান বা বিষপান। শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বসাক কর্ত্তৃক প্রণীত।

গ্রন্থকার সুরাপানের বিষময় ফল বিস্তারিতরূপে বিশুদ্ধ সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়া বঙ্গীয় জনসমাজের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। সুরাপান দ্বারা মানুষের কাইক মানসিক আধ্যাত্মিক প্রভৃতি কত প্রকার বিজাতীয় ঘোরতর অনিষ্ট হয়, মানুষ কিরূপ মনুষ্যত্ব হীন পশুবৎ হইয়া যায়, দেশ বিদেশ উৎপন্ন অনেক বাস্তব ঘটনা উদাহরণ দিয়া তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। সুরাপান যে বাস্তবিক বিষপান তাহা তিনি বিলক্ষণ রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহাকে সাধুবাদ। তাঁহার গ্রন্থখানি বঙ্গবাসীর গৃহে গৃহে সমাদরে রক্ষিত হইলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, প্রথম কল্প

অর্থাৎ ১৭৬৫ শকের ভাদ্র মাস হইতে ১৮৭৬ শকের চৈত্র পর্য্যন্ত চারি বৎসরের পত্রিকা অবিকল পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। মূল্য অগ্রিম ১২৲ টাকা; পশ্চাদ্দেয় ১৬৲ টাকা।

১৭৬১ শকে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠার পর হইতে ইহার সুপ্রসিদ্ধ সভ্যগণ ৪ বৎসর ধরিয়া যে সকল তত্ত্বালোচনা করিয়াছিলেন সেই সকল, এবং তাহার পর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ হইলে দেশ দেশান্তরবাসী মহামহোপাধ্যায় বিদ্বন্মণ্ডলী অসাধারণ উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে যে সকল তত্ত্বের বিচার ও সিদ্ধান্ত এবং ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় এই প্রথম চারি বৎসরের পত্রিকার মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে বেদান্তাদি শাস্ত্র সকলের মর্ম্ম এবং প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম বিচার সহকারে বিবৃত হইয়াছে। এদেশের আধুনিক অভ্যুদয়ের প্রথম সময়ের সকল বিদ্বান্ ব্যক্তি একত্রিত হইয়া এদেশে জ্ঞান ধর্ম্মের যে উজ্জ্বল আলোক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ পরিচয় এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্পে আছে।

এই কল্প এক্ষণে একান্ত দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে অনেক ব্যক্তি এতদন্তর্গত কোন কোন মূল্যবান প্রবন্ধ পৃথক্ মুদ্রিত করিবার মন্ত্রণা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে সকলের অভীষ্টমত ফল হইবে না ভাবিয়া আমরা সমুদায় কল্পটী পুনর্মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই কল্পের কয়েক খণ্ড ৫০ টাকা করিয়া মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। এক্ষণে এই নূতনমুদ্রাঙ্কিত পুস্তকের উপরোক্ত মূল্য নির্দ্ধারিত হইল। ইহাতে অনেক চিত্র, মানচিত্র এবং পারসী প্রভৃতি অক্ষরের আবশ্যক হওয়াতে ইহার মূল্য এতদপেক্ষা আর কমাইতে পারা গেল না। কলিকাতার গ্রাহকেরা মাসিক এক টাকা কিম্বা ত্রৈমাসিক তিন টাকা করিয়া দিলে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে এতদতিরিক্ত এক টাকা দিতে হইবে। এক বৎসরের মধ্যে এইরূপে অগ্রিম মূল্য প্রদান করিয়া গ্রাহকেরা খণ্ডে খণ্ডে পুস্তক প্রাপ্ত হইতে থাকিবেন। যাঁহারা ১২ টাকা একবারে দিবেন, তাহাদিগকে সাহায্যকারী স্বরূপ গণ্য করা যাইবে। তাঁহাদিগকে সমস্ত পুস্তক একত্রে বাঁধাইয়া দেওয়া যাইবে।

আমার নামে পত্র ও টাকা পাঠাইবেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ
যোড়াসাঁকো, কলিকাতা। } শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজে অনুসন্ধান করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক বুধবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিন ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রী শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
অগ্রহায়ণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯। ১৮১০ শক
৫৪৪ সংখ্যা

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

মানবীকরণই বটে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যদি চৈতন্য না থাকে তবে সেই গতি নিবন্ধন মস্তিষ্কের সঞ্চার-বিশেষ হইতেই আর একটী গতি উৎপন্ন হইয়া তথা হইতে অঙ্গুলী পর্য্যন্ত প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি চৈতন্য থাকে তবে উক্ত দ্বিতীয় গতি মস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন হইতেও পারে এবং না হইতেও পারে।

[অতএব প্রমাণ হইল যে, এরূপ কর্ত্তৃত্ব চৈতন্যেরই কর্ত্তৃত্ব—স্নায়ু-যন্ত্রেরও নহে—মস্তিষ্ক যন্ত্রেরও নহে। কেননা, কোন যন্ত্রই আপনার গতিকে আপনি নিয়মিত করিতে পারে না; এক কেবল চৈতন্যই তাহা পারে। শ্রীদ্বি]

গতি যদি উৎপন্ন হয় তবে কিসে তাহা উৎপন্ন হয়? প্রথম গতিতে? না, চৈতন্যে? যদি প্রথম গতিতেই দ্বিতীয় গতি উৎপন্ন হয়, তবে তাহা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই হয়। আর যদি চৈতন্যের প্রভাবে গতি উৎপন্ন হয়, তবে তাহার প্রক্রিয়া কিরূপ? বিজ্ঞান মতে কোন জড় পদার্থ একবার গতিবিশিষ্ট হইলে যে পর্য্যন্ত অন্য কোন জড় বস্তু আসিয়া তাহা গ্রহণ না করিবে সেই পর্য্যন্ত তাহা গমনই করিতে থাকিবে এবং কোন গতির কর্ত্তৃত্ব ভিন্ন কোন জড়ের গতি উৎপন্ন হইতেও পারে না। সুতরাং চৈতন্য যদি কোন জড়াতীত ব্যক্তিই হয়, তবে তাহা যে কিরূপে প্রথম গতি রহিত করিয়া দ্বিতীয় গতি উৎপাদন করে ইহা চৈতন্যবাদীরাই বলিতে পারেন, বিজ্ঞানে বলিতে পারে না।

[প্রভাত বাবুকে জিজ্ঞাসা করি যে, একটা মৃৎপিণ্ডের গতি কিরূপে আর একটা মৃৎপিণ্ডে সঞ্চারিত হয়—এই সোজা বৃত্তান্তটিও বিজ্ঞানে বলিতে পারে কি? আর, বিজ্ঞানে তাহা বলিতে পারে না বলিয়াই কি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, একটা মৃৎপিণ্ডের গতি আরেকটা মৃৎপিণ্ডে সঞ্চারিত হইতে পারে না? আশ্চর্য্য ব্যাপার! বৈজ্ঞানিক চূড়ামণি স্পেন্সর কি বলিতেছেন তাহার প্রতি একবার প্রণিধান করা হৌক্;—

"It is an established mechanical truth that if a body moving at a given velocity

strikes an equal body at rest in such wise that the two move on together, their joint velocity will be but half that of the striking body. Now it is a law of which the negative is inconceivable that in passing from any one degree of magnitude to another all intermediate degrees must be passed through, or in the case before us, a body moving at velocity 4 cannot by collision, be reduced to velocity 2, without passing through all velocities between 4 and 2. But were matter truly solid—were its units absolutely incompressible and in unbroken contact—this "law of continuity" would be broken in every case of collision. For when of two such units, one moving at velocity 4 strikes another at rest, the striking unit must have its velocity 4 instantaneously reduced to velocity 2; must pass from velocity 4 to velocity 2 without any lapse of time. and without passing through intermediate velocities; must be moving with velocities 4 and 2 at the same instant, which is impossible." ইহার ভাবার্থ এই;

বিজ্ঞানের একটি স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, একই ওজনের দুইটি গোলা যদি ঐকান্তিক—নিরেট হয় অর্থাৎ যদি কোন অংশেই স্থিতিস্থাপক না হয়, আর, একটির স্থির অবস্থায় আর একটি যদি তাহাকে চারি-মাত্রা বেগে আঘাত করে তবে তৎক্ষণাৎ আঘাতকারী গোলাটির চারিমাত্রা বেগ ঘুচিয়া গিয়া দুইটি গোলাই দুই মাত্রা বেগে চলিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু চারিমাত্রা বেগ ক্রমে ক্রমে না কমিয়া এক মুহূর্ত্তেই কেমন করিয়া দুই মাত্রা হইয়া দাঁড়ায় ইহা কোন বিজ্ঞানেই বলিতে পারে না। এই তো গেল স্পেন্সরের কথা। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, বিজ্ঞান যাহা বলিতে পারে তাহা সে বলিতে পারে, যাহা সে বলিতে পারে না তাহা সে বলিতে পারে না; কিন্তু যাহা সে বলিতে পারে না, তাহা বলিতে না পারিবার অপরাধে যাহা সে বলিতে পারে তাহা কাঁচিয়া যায় না। বিজ্ঞান এটা যদিও বলিতে পারে না যে, কেমন করিয়া আঘাতকারী গোলার চারিমাত্রা বেগ এক মুহূর্ত্তেই দুই মাত্রা হইয়া দাঁড়ায় অথবা কেমন করিয়া স্থির গোলাটিতে এক মুহূর্ত্তেই দুই মাত্রা বেগ সঞ্চারিত হয়, তথাপি বিজ্ঞানের এটা একটি স্থির সিদ্ধান্ত যে, গোলাদ্বয়ের ঐরূপ অবস্থায় তাঁহাদের গতি ঐরূপ হইতেই হইবে। পূর্ব্বোক্ত কথাটি বিজ্ঞান বলিতে পারে না বলিয়া বিজ্ঞানের শেষোক্ত স্থির সিদ্ধান্তটিও কি কিছুই নহে? অতএব, এ কথা যদি সত্যও হয় যে, চৈতন্য নিজে গতি-শূন্য হইয়া কেমন করিয়া হস্তপদাদির গতি পরিবর্ত্তিত করে—ইহা আমরাও বলিতে পারি না—বিজ্ঞানও বলিতে পারে না, তথাপি, চৈতন্য বাস্তবিকই যে ঐরূপ করে—ইহা স্বীকার করিতে আমাদেরও কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই, বিজ্ঞানেরও কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। সূর্য্য লক্ষ যোজন দূরে থাকিয়াও কেমন করিয়া পৃথিবীকে আকর্ষণ করে—বিজ্ঞান তাহা বলিতে পারে না, অথচ বিজ্ঞান বলে যে, সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করে; তেমনি চৈতন্য গতিহীন হইয়াও কেমন করিয়া হস্তপদাদির গতি পরিবর্ত্তন করে—তাহা আমরা বলিতে পারি না, অথচ এটি আমরা ধ্রুব রূপে উপলব্ধি করি যে, চৈতন্য বাস্তবিকই তাহা করে। কেন না, যিনিই যখন আপনার হস্তপদ চালনা করেন, তিনিই তখন অন্তঃকরণে ধ্রুবরূপে উপলব্ধি করেন যে, আমিই আমার হস্তপদ চালনা করিতেছি। আমি যখন এই প্রবন্ধটি লিখিতেছি তখন স্বয়ং বৃহস্পতি আসিয়াও যদি আমাকে বলেন যে, তোমার লেখনীটিকে তুমি চালাইতেছ না—আর কেহ চালাইতেছে, তবে তাঁহার কথা আমি প্রাণান্তেও বিশ্বাস করিব না। আমার আপনার কর্ত্তৃত্ব-মূলক কার্য্যে আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চৈতন্যের কর্ত্তৃত্ব উপলব্ধি করি; অন্যের কর্ত্তৃত্ব-মূলক কার্য্যে আমি অনুমান-বলে চৈতন্যের কর্ত্তৃত্ব উপলব্ধি করি। এটা যখন সুনিশ্চিত যে, জড়বস্তুর আপনার গতির উপর তাহার আপনার কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না, তখন কাজেই ঐরূপ কর্ত্তৃত্ব-কার্য্য দেখিবামাত্রই আমরা তাহাতে চৈতন্যেরই হস্ত উপলব্ধি করি। চৈতন্য কোন রূপ গতি দ্বারা নহে—শুদ্ধ কেবল ইচ্ছা দ্বারা—হস্তপদাদির গতি পরিবর্ত্তিত করে। প্রভাত বাবুর এই যে, একটি যুক্তি যে, চৈতন্য কেমন করিয়া হস্তপদাদি চালনা করে তাহা যখন আমরা বলিতে পারি না তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, চৈতন্য হস্তপদাদি চালনা করে না, এ যুক্তি কোন কার্য্যেরই নহে। কালিদাসকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তুমি কেমন করিয়া শকুন্তলার ন্যায় এমন একটা নিরুপম কাব্য-মাধুরী উদ্ভাবন করিলে? কালিদাস হয় তো তাহা বলিতে পারিবেন না; তাহা হইলেই কি প্রমাণ হইল যে, তাহা যখন তিনি বলিতে পারেন না, তখন তিনি শকুন্তলার রচয়িতা নহেন? আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, কেমন করিয়া তুমি লেখ? আমি বলিব "লেখনী চালনা দ্বারা। কেমন করিয়া তুমি লেখনী চালনা কর? অঙ্গুলি চালনা-দ্বারা। কেমন করিয়া তুমি অঙ্গুলি চালনা কর? স্নায়ুবলের উত্তেজনা-দ্বারা। কেমন করিয়া স্নায়ুবলের উত্তেজনা কর? ইচ্ছা দ্বারা। কেমন করিয়া ইচ্ছা কর? এই স্থানটিতে "কেমন করিয়া" এ কথাটি জিজ্ঞাসা করা নির্বোধের কার্য্য; কেন না, কেমন করিয়া ইচ্ছা-কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়, তাহা পরকে বুঝাইবার কথা নহে, আপনি বুঝিবারই কথা। শ্রীদ্বি]

পরন্তু উহাঁরা যদি এই কথা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া বলেন তবে তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। আর যদি বিজ্ঞান-মূলক বলেন তবে আমরা সেই বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করি।

এখন মনে কর যে, চৈতন্য জড়াতীত ব্যক্তি নহে, কিন্তু জড় শক্তি বিকাশের ফল মাত্র। এই অভ্যুপগম অনুসারে বিচার করিলে জানা যাইবে যে চিমটি কাটিলে যে প্রথম গতি উৎপন্ন হয় তাহা মস্তিষ্কে যাইয়া বিলুপ্ত হয় না, কিন্তু তথায় এমত ভাবে ক্রিয়া করে যাহাতে সঞ্চিত শক্তির বিকাশ হইয়া চৈতন্য উৎপন্ন হয় অথবা চৈতন্য বিদ্যমান থাকিলে বিশেষ বেদনা জন্মিয়া থাকে।

[আমরা তো জানি—বিজ্ঞান শুধু বলে যে, গতি হইতে (সমজাতীয় বা ভিন্ন জাতীয়) গতিই কেবল উৎপন্ন হয় (যেমন, সামান্য গতি হইতে সামান্য গতিও উৎপন্ন হইতে পারে, আর, বৈদ্যুতিক, ঔত্তাপিক, প্রভৃতি আণবিক (molicular) গতিও উৎপন্ন হইতে পারে) এ ভিন্ন কোন্ বিজ্ঞানে এরূপ কথা বলে জানি না যে, গতি হইতে গতির ফলভোক্তা, বা গতির নিয়ামক, বা গতির উপলব্ধি-কর্ত্তা, উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞান-বেত্তা পণ্ডিতেরা যদি গতি-সম্বন্ধীয় অমন একটি নিগূঢ় তত্ত্ব সত্য সত্যই আবিষ্কার করিয়া থাকেন—তবে এত দিনে তাহা গতি বিজ্ঞানে (Dynamics) স্থান পাইত—তাহাতে আর সন্দেহ-মাত্র নাই। কিন্তু কই? কোথাও তো তাহা দেখিতে পাই না। কাজেই আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, যাঁহারা বিজ্ঞানের ক-অক্ষরও

WORM EATEN.

জানেন না—তাঁহাদের মুখেই ঐ সকল অমূলক কথা শোভা পায়, প্রভাত বাবুর ন্যায় কৃতবিদ্য লোকের মুখে তাহা কোন-ক্রমেই শোভা পায় না। শ্রীদ্বি]

অতএব চৈতন্য এবং বেদনা বোধ যখন সঞ্চিত জড় শক্তির বিকাশ মাত্র, তখন তাহাতে যে একটী দ্বিতীয় গতি উৎপাদন করিবে ইহা সিদ্ধান্ত করা বিজ্ঞান বহির্ভূত নহে।

[পূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি যে, একটা ধাবমান গোলাতে তো যথেষ্ট জড়-শক্তির বিকাশ আছে—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তো বিজ্ঞান বলিতে পারে না যে, কেমন করিয়া তাহা একটা স্থির গোলাতে গতির সঞ্চার করে। অতএব কেমন করিয়া গতি সঞ্চারিত হয়—ইহা বিজ্ঞানও বলিতে পারে না—আমরাও বলিতে পারি না; কিন্তু বিজ্ঞানেরও এ কথা সত্য যে, বাস্তবিকই গতিশীল বস্তু হইতে স্থির বস্তুতে গতি—সঞ্চারিত হয়, আমাদেরও এ কথা সত্য যে, বাস্তবিকই গতিশূন্য চৈতন্য কর্ত্তৃক হস্ত পদাদির গতি পরিবর্ত্তিত হয়। আমরা যদি বলিতাম যে গতিশূন্য চৈতন্য হইতে গতির সৃষ্টি হয়; তাহা হইলে অবশ্য প্রভাত বাবু বলিতে পারিতেন যে, ও কথাটি নিতান্তই বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। কেননা বিজ্ঞানের ইহা একটি ধ্রুব সিদ্ধান্ত যে, সমস্ত জড়জগতের মোট গতির হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভবে না। আমরা কেবল বলিতেছি এই যে, চৈতন্য শুদ্ধ কেবল গতির পরিবর্ত্তন কর্ত্তা—গতির নিয়ামক। আমরা যদি বলিতাম যে, গতিশূন্য চৈতন্য বহির্জগতে গতি প্রদান করে তাহা হইলেই প্রভাত বাবু বলিতে পারিতেন যে, চৈতন্যের নিজেরই যখন গতি নাই তখন সে কিরূপে গতি প্রদান করিবে? যাহার ধন নাই সে কিরূপে ধন-দান করিবে? কিন্তু আমরা আদবেই তাহা বলি না; আমরা বলি এই যে, সমস্ত জড় জগতের মোট গতি যাহা আছে—তাহার ইয়ত্তা (Quantity) চিরকালই সমান; কোন-কালেই তাহার ন্যূনাধিক হয়ও না হইতে পারিবেও না। ইহা সত্ত্বেও গতির পরিবর্ত্তন দুইরূপে সংঘটিত হইতে দেখা যায়, যথা;—(১) এক জড়বস্তুর গতি অন্য জড়বস্তুর গতি দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয়; (২) চৈতন্য দ্বারা জড়বস্তু বিশেষের গতি পরিবর্ত্তিত হয়। গতির পরিবর্ত্তন বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ নহে—গতির নূতন-সৃষ্টিই বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। চৈতন্য নিজে বর্ণহীন হইয়াও যদি শ্বেতাদি বর্ণ দর্শন করিতে পারিল তবে সে নিজে গতিহীন হইয়াও হস্ত পদাদির গতি পরিবর্ত্তন করিবে—ইহাতে আশ্চর্য্যই বা কি? শ্রীদ্বি]

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, চৈতন্য স্থির পদার্থ নহে। তাহা কখন কখন বিদ্যমান থাকে ও কখন কখন অন্তর্হিত হইয়া যায়। এবং কিছু কাল বিদ্যমান থাকিলে এরূপ অবস্থা দাঁড়ায় যে আর বিদ্যমান থাকিতে পারে না; তখনই নিদ্রা আবশ্যক হয়। সেই নিদ্রা নিবন্ধন বিশেষ শক্তি সঞ্চিত হইলে চৈতন্যের পুনরুৎপত্তি হইয়া থাকে।

[নিদ্রাবস্থাতেও যে সাক্ষী চৈতন্য অন্তর্হিত হ'ন না, তাহার প্রমাণ এই যে, নিদ্রার সময়ে এক প্রকার সূক্ষ্ম আরামের অবস্থা জ্ঞানে অনুভূত হয় তাই নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির স্মরণ হয় যে, আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। নিদ্রাকালে যদি আমার জ্ঞান একেবারেই বিলুপ্ত হইত, তবে জাগিয়া উঠিবার সময় আমি নিছক অজ্ঞানের গর্ত্ত হইতে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইতাম,—সুতরাং তাহা হইলে আবার আমাকে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় ক খ শিক্ষা করিতে হইত। শ্রীদ্বি]

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি চৈতন্য জড় শক্তিরই বিকাশ হয়, তবে তাহা কিরূপে আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে? বাস্তবিক আলোক আদির উত্তেজনাই চৈতন্য বিকাশের কারণ। প্রাণিগণ সর্ব্বদাই আলোক তাপ আদিতে পরিবেষ্টিত। সেই পরিবেষ্টক আলোক আদি নিয়তই প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়-যন্ত্রে ক্রিয়া করে। সেই ক্রিয়া নিবন্ধন মস্তিষ্কের কার্য্য হইতে থাকে আর তথাকার সঞ্চিত শক্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। তাহা অবশেষে এরূপ লাঘব হইয়া পড়ে যে আলোক আদির সামান্য উত্তেজনায় চেতনা রক্ষা করিতে পারে না। এই হেতুই শীত কালের দুর্ব্বল তাপে মর্ম্মট প্রভৃতি শীতাসহ জন্তুগণকে জাগরিত রাখিতে পারে না। পক্ষান্তরে সমুচিত নিদ্রা হইয়া শক্তির পুনঃ সঞ্চয়ের সহিত মস্তিষ্ক সতেজ হইয়া উঠিলে উক্ত সামান্য উত্তেজনেই আবার চৈতন্য উৎপাদন করিতে পারে। এই হেতুই সুস্থ ব্যক্তিগণ দিবালোক প্রকাশিত হইলে আর নিদ্রিত থাকিতে পারে না।

[বিজ্ঞান যাহা বলে তাহা শুদ্ধ কেবল এই যে, জড় শক্তির বিকাশ দ্বারা গতি উৎপন্ন হয়; যেমন, সূর্য্যের আকর্ষণ-শক্তির বিকাশ হয় কোথায়—ফল ফলে কোথায়? না পৃথিবীর বাৎসরিক গতিতে; জড়-শক্তি যদিও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে, যথা;—যান্ত্রিক রাসায়নিক এবং জৈবনিক; তথাপি; সাক্ষী চৈতন্যকে পৃথক্ রাখিয়া—শুদ্ধ যদি কেবল জড়-বস্তুর প্রতিই লক্ষ নিবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যান্ত্রিক (Mechanical) শক্তিই কেবল জড় বস্তুর নিজস্ব সম্পত্তি; কেননা, যান্ত্রিক শক্তি-দ্বারাই জড়বস্তু-সকল পরস্পরের গতি-পরিবর্ত্তন করে; আর এই যে গতি-পরিবর্ত্তন—ইহা শুদ্ধ কেবল জড়-বস্তুরই গতি-পরিবর্ত্তন—চেতনের নহে। কিন্তু রাসায়নিক অথবা জৈবনিক শক্তি দ্বারা জড়-বস্তুর গুণ-পরিবর্ত্তন যাহা কিছু হয়—সমস্তই ইন্দ্রিয়-মূলক; সুতরাং তাহা জড়বস্তুর নিজের গতি-পরিবর্ত্তন নহে, কিন্তু জীব চৈতন্যের অবস্থা-পরিবর্ত্তন। উদজন এবং অম্লজন বাষ্প যথা-পরিমাণে মিশ্রিত হইলে আমাদের নেত্র-সমক্ষেই তাহা জলরূপে প্রতিভাত হয়; কিন্তু উক্ত বস্তু দ্বয়ের নিজের অভ্যন্তরে শুদ্ধ কেবল যান্ত্রিক শক্তিই কার্য্য করে, এবং তাহার ফল শুদ্ধ কেবল আণবিক গতি-পরিবর্ত্তনেই পর্য্যবসিত হয়। এ যাহা বলিলাম—মোটামুটি বলিলাম। কিন্তু সূক্ষ্ম ধরিতে গেলে—সাক্ষী-চৈতন্যকে পৃথক্ রাখিয়া জড়-বস্তুকে স্বতন্ত্ররূপে ভাবা—মনুষ্যের শুধু নয়—দেবতারও সাধ্যাতীত। যখন আমি আলোক ভাবি, তখন আমি চক্ষে দেখা আলোক ভাবি; যাহা কেহ কখন চক্ষে দেখে নাই ও দেখিতে পারে না—এরূপ আলোক আলোকই নহে। শূন্য আকাশকে আমরা চর্ম্মচক্ষে দেখি না বটে—কিন্তু তথাপি তাহাকে আমরা মনশ্চক্ষে দেখি। গতি কাহাকে বলে? না সেই মনশ্চক্ষে দেখা আকাশের স্থান-পরিবর্ত্তন। কিন্তু মোটামুটি এরূপ বলিলে বিশেষ কোন দোষ হয় না যে, যান্ত্রিক শক্তি-প্রবর্ত্তিত গতিই কেবল জড়-বস্তুর নিজস্ব সম্পত্তি তা ভিন্ন জড়-বস্তুর আর যত প্রকার গুণ আছে সমস্তই ঐন্দ্রিয়ক গুণ—সুতরাং চেতন-সা-

পেক্ষ। অতএব শুদ্ধ কেবল জড়-শক্তি দ্বারা—যান্ত্রিক শক্তি দ্বারা—গতি ভিন্ন আর কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না; আলোকাদির উত্তেজনা চেতন-সাপেক্ষ। অগ্রে প্রাণী এবং তাহার চক্ষুরিন্দ্রিয় থাকিলে তবে তো আলোক দ্বারা তাহার দৃষ্টি-শক্তি উত্তেজিত হইবে! অতএব আলোকাদি-জনিত উত্তেজনার পূর্ব্বে প্রাণীর বিদ্যমানতা আবশ্যক; কেন না, অগ্রে প্রাণী না থাকিলে আলোকাদি দ্বারা কাহার ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হইবে? তবেই হইতেছে যে, প্রাণী আলোকাদির উত্তেজনার ফল-স্বরূপ নহে—প্রত্যুত তাহা উক্ত উত্তেজনার আধার-স্বরূপ। যদি বল যে, আলোকাদির উত্তেজনার পূর্ব্বে প্রাণী ছিল বটে কিন্তু তখন সে জড় পদার্থ মাত্র ছিল, তবে তাহার উত্তর এই যে, যে বস্তু আলোকাদির উত্তেজনা অনুভব করে না—সে বস্তু আলোকাদি-দ্বারা উত্তেজিত হইতেও পারে না; এক কথায়, জড়বস্তু আলোকাদি দ্বারা উত্তেজিত হইতে পারে না; কেবল যে বস্তু আলোকাদির উত্তেজনা অনুভব করে সেই বস্তুই (এক কথায় সচেতন বস্তুই) আলোকাদি দ্বারা উত্তেজিত হইতে পারে। কিন্তু "উত্তেজিত" এই শব্দের অর্থ ভুল বুঝিলে চলিবে না; দপ্ করিয়া যখন অগ্নি জ্বলিয়া উঠে, তখন আমরা বলিতে পারি যে, অগ্নি উত্তেজিত হইল; উত্তেজনা একটি মাত্র কথা, কিন্তু ইহাতে দুইরূপ অর্থ বুঝাইতে পারে; এক অর্থ—আণবিক (Molicular) গতির বেগাধিক্য—যাহা অগ্নির অভ্যন্তরে কার্য্য করিতেছে; আর এক অর্থ—গতি নহে কিন্তু দীপ্তি-বোধ—যাহা সচেতন জীবের ইন্দ্রিয়াভ্যন্তরে কার্য্য করিতেছে। এখানে আলোকাদির উত্তেজনা বলিতে পূর্ব্বোক্তরূপ উত্তেজনা (কিনা গতি-বেগ [illegible] বুঝিলে চলিবে না। কেন না, উত্তা[illegible] বস্তুতে তীব্রবেগসম্পন্ন গতি উৎপাদন করিতে পারে ইহা আমরা অস্বীকার করিতেছি না; আমাদের মন্তব্য কথা শুদ্ধ কেবল এই যে, উত্তাপ সচেতন প্রাণী ভিন্ন কোন প্রকার অচেতন পদার্থে তাপবোধ উৎপাদন করিতে পারে না। উত্তাপের অনুভব শক্তি যাহায় আছে এমন যে সচেতন জীব, উত্তাপ কেবল তাহারই স্পর্শেন্দ্রিয়কে তাপানুভব দ্বারা উত্তেজিত করিতে পারে। অতএব অগ্রে অনুভব-শক্তি-সম্পন্ন সচেতন জীব—তাহার পরে আলোকাদির উত্তেজনা; এ নহে যে, অগ্রে আলোকাদির উত্তেজনা—তাহার পরে সচেতন জীব। তবেই হইতেছে যে, সচেতন জীব আলোকাদির উত্তেজনার ফল-স্বরূপ নহে কিন্তু আধার-স্বরূপ। শ্রীদ্বি]

অতএব বিজ্ঞান মতে মস্তিষ্কই চিন্তার যন্ত্র। অর্থাৎ মস্তিষ্কের ক্রিয়া-বিশেষ হইতেই মানসিক কার্য্য সম্পন্ন হয়। আর মানসিক কার্য্য সমঞ্জস ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে মস্তিষ্কের এমত অবস্থা থাকারই নাম চৈতন্য। অতএব মস্তিষ্কের সহিত চৈতন্যের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। যেখানে মস্তিষ্ক আছে সেইখানেই চৈতন্য জন্মিতে পারে। যেখানে মস্কিষ্ক নাই তথায় চৈতন্য থাকিতে পারে না। সুতরাং মস্তিষ্কের অভাবে চৈতন্যের উৎপত্তি হয় এমত বলা "সৃষ্টি ছাড়া কার্য্য" এবং বিজ্ঞান বহির্ভূত।

[প্রমেয় বিষয় দুইরূপ—(১) পরীক্ষাসিদ্ধ এবং (২) স্বতঃসিদ্ধ। পরীক্ষাসিদ্ধ বিষয়ের যাথার্থ্য অকাট্যরূপে প্রমাণ করিতে হইলে সমস্ত জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা আবশ্যক; কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ের যাথার্থ্য ঘরে বসিয়াই প্রমাণ করা যাইতে

পারে। প্রভাত বাবুর এই যে একটি কথা যে, সমস্ত সৃষ্ট জীবের চৈতন্য মস্তিষ্ক যন্ত্রবিশিষ্ট ইহা বাস্তবিকই যদি পরীক্ষাসিদ্ধ হয় তবে তাহা শিরোধার্য্য করিতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু সমস্ত জগতের তুলনায় পৃথিবী ক্ষুদ্র একরত্তি বালু কণাও নহে; আমরা কেবল এইটুকু মাত্র জানি যে, পৃথিবীস্থ জীবগণেরই মস্তিষ্ক যন্ত্র আবশ্যক—তাহাও আবার সকল জীবের নহে; আমীবিয়া নামক জীব শুদ্ধ কেবল একটা তল্‌তলে পিণ্ড মাত্র—তাহার না আছে মস্তিষ্ক—না আছে কিছু। প্রভাত বাবু যদি সমস্ত জগতের সমস্ত জীবের তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া এইরূপ একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন যে, জীবমাত্রই মস্তিষ্ক যন্ত্র-বিশিষ্ট, তবে আমরা শুদ্ধ কেবল এই বলিব যে, তাঁহার পরীক্ষা শক্তির পক্ষ প্রলয় বিস্তীর্ণ; আমাদের পরীক্ষা শক্তি পিপীলিকার ন্যায় ক্ষুদ্র কাজেই এ'র অত বড় একটা পালখ উঠিলে—এ তাহার ভারে চাপা পড়িয়া তদ্দণ্ডেই প্রাণত্যাগ করিবে। বহুপূর্ব্বে এক কালে যখন প্রায় সমস্ত পৃথিবী জলে জলময়-ছিল তখন পৃথিবীতে মেরুদণ্ডধারী প্রাণীদিগের মধ্যে শুদ্ধ কেবল মৎস্য কুম্ভীরাদি শীতলশোণিত জীবদিগেরই একাধিপত্য ছিল—পৃথিবীতে তখন এইরূপ ছিল বলিয়া কিছু আর এটা প্রমাণ হয় না যে, তখন সমস্ত জগতেরই মেরুদণ্ডধারী জীব শীতল শোণিত ছিল। তেমনি অদ্যকার এই পৃথিবীতে উচ্চ শ্রেণীর জীব মাত্রেই মস্তিষ্ক যন্ত্র-বিশিষ্ট ইহা যৎপরোনাস্তি সুনিশ্চিত হইলেও তাহাতেই কিছু আর এটা প্রমাণ হয় না যে, সমস্ত জগতের সমস্ত উচ্চশ্রেণীর জীবই মস্তিষ্ক যন্ত্র-বিশিষ্ট; কেননা, সমস্ত জগতের তুলনায় পৃথিবী ক্ষুদ্র একরত্তি বালুকণাও নহে। এরূপ সত্ত্বেও আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, এমন হইলেও হইতে পারে যে, সমস্ত জগতের সমস্ত জীবই মস্তিষ্ক যন্ত্র-বিশিষ্ট; তবে কি—না তাহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ; সমস্ত জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া না দেখিলে আমরা সে বিষয়ে হাঁ কি না কোন কথাই বলিতে পারি না। অতএব প্রভাত বাবু যে কথাটি বলিতেছেন তাহা নিতান্তই পরীক্ষা-সাপেক্ষ। কিন্তু আমরা যে কথাটি বলিতেছি তাহা স্বতঃসিদ্ধ সুতরাং পরীক্ষা-নিরপেক্ষ; তাহা এই;—জগতের সকল বস্তুই পরের আকর্ষণে বিধৃত, সুতরাং পরাধীন; সুতরাং সমস্ত জগৎই পরাধীন বস্তুর সমষ্টি; প্রত্যেক সেনাই যদি পরাধীন হয়, তবে সমস্ত সৈন্যমণ্ডলী কাজে কাজেই পরাধীন। অতএব, জগতের সমস্ত বস্তুই যখন পরাধীন, তখন অবশ্য সমস্ত জগৎই পরাধীন। অতএব সমস্ত জগৎ কাহারো না কাহারো আশ্রয়াধীন; সমস্ত জগৎ যাঁহার আশ্রয়াধীন, তিনি নিজে পরাধীন হইতে পারেন না; কেননা এক পরাধীন অন্য পরাধীনকে আশ্রয় দান করিতে পারে না, ভীরু ভয়ার্ত্তকে অভয়-দান করিতে পারে না, অন্ধ অন্ধকে পথ প্রদর্শন করিতে পারে না। অতএব ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, যিনি সমস্ত জগতের মূলাধার তিনি সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন পুরুষ, সুতরাং তিনি মস্তিষ্কের অথবা বাহিরের অন্য কোন সামগ্রীর সাহায্য-নিরপেক্ষ। পরিপূর্ণ দ্বিগুণ সত্তাই—অর্থাৎ পরিপূর্ণ সচেতন সত্তাই—যে, সমস্ত অপূর্ণ সত্তার মূলাধার, ইহা স্বতঃসিদ্ধ, তাই পরীক্ষা-নিরপেক্ষ। খণ্ড আকাশ-মাত্রই অসীম আকাশের ক্রোড়ীভূত এ সত্যটি প্রমাণ করিবার জন্য অশেষবিধ খণ্ড আকাশ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই,—

আমরা ঘরে বসিয়াই অকুতোভয়ে বলিতে পারি যে, খণ্ড আকাশ মাত্রই অসীম আকাশের ক্রোড়ীভূত। পুনশ্চ, এক-স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইতে হইলে সরল পথই সর্ব্বাপেক্ষা হ্রস্বতম পথ, এই সত্যটি প্রমাণ করিবার জন্য উক্ত স্থান দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী অসংখ্য বক্র পথ মাপিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই; কারণ, উহা স্বতঃসিদ্ধ। সেইরূপ, অপূর্ণ পরাধীন জগৎ যে, পূর্ণ স্বাধীন পুরুষের আশ্রয় সাপেক্ষ, ইহা স্বতঃসিদ্ধ—তাই পরীক্ষা-নিরপেক্ষ। অতএব, যিনি সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন পুরুষ তিনি মস্তিষ্ক যন্ত্রের অধীন নহেন। শ্রীদ্বি]

এরূপ স্থলে আমরা জিজ্ঞাসা করি মস্তিষ্কহীন ঈশ্বরে চৈতন্য আরোপ করাই বিজ্ঞানে শোভা পায়, না আরোপ না করাই বিজ্ঞানে শোভা পায়? সুতরাং ডাক্তার ড্রিস্‌ডেল্ প্রভৃতি যে, ঈশ্বর অপরিজ্ঞেয় বলিয়া তাঁহাতে চৈতন্য আরোপ করিতে চাহেন না তাহাই বিজ্ঞান অনুগত? না, দ্বিজেন্দ্র বাবুর মস্তিষ্কহীন ঈশ্বরে চৈতন্য আরোপ করাই বিজ্ঞান-সঙ্গত? যদি দ্বিজেন্দ্র বাবু ঈশ্বরকে মস্তিষ্কযুক্ত ব্যক্তিই বলেন তবে তাঁহার ঈশ্বর আমাদের ন্যায় মনুষ্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। আর যদি তিনি ঈশ্বরকে মস্তিষ্কহীন বলিয়া তাহাতে চেতনা আরোপ করিতে চাহেন তবে তিনি এরূপ ব্যক্তির আদর্শ কোথায় দর্শন করিয়াছেন? যাহার কোন আদর্শ পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায় না তাহার কল্পনা যে বিজ্ঞান-সঙ্গত ইহা তিনি কোন্ বিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থন করিবেন?

[নিউটন কি কোথাও দেখিয়াছেন যে, কোন একটি জড়পিণ্ড অবাধিত গতিতে চলিয়া অনন্তকাল সরল-রেখা পথ পরিভ্রমণ করিয়াছে? তিনি তাহা কস্মিন্ কালেও দেখেন নাই—আর-কেহও তাহা দেখে নাই দেখিবে না। অথচ তিনি এই সত্যটি কৃতবিদ্য-সমাজে প্রচার করিতে একটুও কুণ্ঠিত হ'ন নাই যে, কোন একটি চলমান বস্তু কোন প্রকার বল দ্বারা বাধিত না হইলে তাহা অনন্তকাল সরল-রেখা পথে চলিবে। নিউটনের এ কথাটি এরূপ নহে যে, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না; তাহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ নহে; এক কথায়—তাহা স্বতঃসিদ্ধ; যথা;—পরিবর্ত্তন-মাত্রেরই কারণ থাকা চাই—কারণ ব্যতিরেকে পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না— এ তত্ত্বটি স্বতঃসিদ্ধ; সুতরাং বিনা কারণে চলমান বস্তুর দিক্ পরিবর্ত্তন সম্ভবে না; অতএব চলমান বস্তু বল দ্বারা বাধিত না হইলে একই সরল-রেখা পথে চলিবে। নিউটন্ কোন জড়পিণ্ডকেই অনন্ত কাল সরল রেখা পথে চলিতে দেখেন নাই ইহা খুবই সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়াই কি তাঁহার উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তটি একেবারেই নস্যাৎ হইয়া গেল? আমরা জগতের কুত্রাপি পরিপূর্ণ সত্য দেখি নাই দেখিবও না, ইহা তেমনিই সত্য; কিন্তু তাহা বলিয়াই কি এই সুস্পষ্ট স্বতঃসিদ্ধ সত্যটি একেবারেই কিছুই না যে, অপূর্ণ সত্য পরিপূর্ণ সত্যের আশ্রয়াধীন? স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান সকল-প্রমাণেরই মূলাধার; যাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকে প্রমাণ দ্বারা আয়ত্ত করিতে যা'ন, তাঁহাদের উপর শ্লেষ দিয়া আমাদের- দেশের একজন প্রসিদ্ধ দর্শনকার বলিয়াছেন যে তাঁহারা এমনি মহাপণ্ডিত যে, যে জ্ঞান প্রমাণের প্রমাণত্ব-সাধন করে সেই জ্ঞানকে (অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকে) তাঁহারা প্রমাণ-দ্বারা আয়ত্ত করিতে যা'ন; যে অগ্নি

কাষ্ঠকে দহন করে সেই অগ্নিকে তাঁহারা কাষ্ঠ দিয়া দহন করিতে যা'ন।" ইহার একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত;—মনে কর চন্দ্রলোক হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে বলিল যে, চন্দ্র-লোকে সমস্ত কাকই শ্বেতবর্ণ; ইহার আমি এই উত্তর দিব যে, সাদা কাক আমিও দেখি নাই পৃথিবীস্থ অন্য কোন মনুষ্যও দেখে নাই, কিন্তু তুমি যখন বলিতেছ যে, চন্দ্র-লোকের সকল কাকই শ্বেতবর্ণ তখন তোমার কথায় অবিশ্বাস করিবার আমি কোন কারণ দেখি না; তুমি যাহা বলিতেছ তাহা হইলেও হইতে পারে—তাহাতে কিছুই বিচিত্র নাই। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি বলে যে, চন্দ্র-লোকে একটা গোলাকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে গড়াইয়া দিলে কিয়ৎদূর পশ্চিমাভিমুখে গিয়াই তাহা বিনা কারণে উত্তরাভিমুখে গমন করে, তাহা হইলে তদ্দণ্ডেই আমি বলিব যে, কখনই না—তাহা কোন ক্রমেই হইতে পারে না; কারণ-ব্যতিরেকে কোন পরিবর্ত্তনই যখন ঘটিতে পারে না, তখন কারণ ব্যতিরেকে চলমান বস্তুর দিক্ পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া ঘটিবে? কাক সাদা হয় এটাও আমি বা পৃথিবীস্থ আর কেহ দেখে নাই, আর, বিনা কারণে পরিবর্ত্তন ঘটে এটাও আমি বা পৃথিবীস্থ আর কেহ দেখে নাই; তবে, ওটার বেলায়ই বা আমি বলি কেন যে, "হইলেও হইতে পারে" আর এটার বেলায়ই বা আমি বলি কেন যে, "কখনই না!" এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হয় কেন? ইহার কারণ শুদ্ধ কেবল এই যে, যাহা কেবল-মাত্র পরীক্ষাসিদ্ধ কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ নহে—দেশ-বিশেষে বা কাল-বিশেষে তাহার অন্যথা হইলেও হইতে পারে; কিন্তু যাহা স্বতঃসিদ্ধ তাহার কুত্রাপি এবং কস্মিন্ কালেও অন্যথা সম্ভবে না; তাহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ হওয়া দূরে থাকুক—তাহা সকল পরীক্ষারই ভিত্তিভূমি; কেননা, পরিবর্ত্তন-মাত্রেরই কারণ থাকা চাইই-চাই এই তত্ত্বটি পরীক্ষার পূর্ব্ব হইতে আমাদের মনে বদ্ধমূল আছে বলিয়াই পরীক্ষার সাহায্যে আমরা বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তনের বিশেষ বিশেষ কারণ অন্বেষণ করিতে তৎপর হই। এ যেমন, তেমনি অপূর্ণ সত্য মাত্রই পূর্ণ সত্যের আশ্রয়-সাপেক্ষ—ইহা একটি পরীক্ষা-নিরপেক্ষ স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়াই ভক্ত সাধকেরা নিঃশংসয়ে এবং অকুতোভয়ে ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করিয়া চলেন। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে কি বিজ্ঞান—কি তত্ত্বজ্ঞান—স্বতঃসিদ্ধ সত্যের আশ্রয়-ব্যতিরেকে কেহই এক পদও চলিতে পারে না। শ্রী দ্বি]

যদি তিনি তাহা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সমর্থন করিতে যান, তবে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কারণ তাহা তাঁহার নিজেরই সম্পত্তি। তিনি আপন সম্পত্তিকে যাহা ইচ্ছা তাহাই মনে করিতে পারেন, ইহাতে আমাদের কোনও ক্ষতি হইতে পারে না।

[জগৎশুদ্ধ জীবের মস্তিষ্ক যদি প্রভাত বাবুর সম্পত্তি হইতে পারিল তবে একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য যাহা বাস্তবিকই জ্ঞানবান জীব মাত্রেরই (কাজেই প্রভাত বাবুরও) পৈতৃক সম্পত্তি—তাহার অংশ আমাতেও যৎকিঞ্চিৎ বর্ত্তিবে—ইহা তো হইবারই কথা। শ্রী দ্বি]

এখন দ্বিজেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি ডাং ড্রিস্‌ডেলের মতাবলম্বীগণ ঈশ্বরকে চেতন ও অচেতন ইহার কিছুই না বলেন এবং তিনি যে কিরূপ পদার্থ তাহাও বলিতে না পারেন, তবে তাঁহারা কিরূপে জানিতে পারিয়াছেন যে

ঈশ্বর বিদ্যমান আছেন? ইহার উত্তরে আমরা বলিতেছি যে, উঁহাদের ঈশ্বরজ্ঞান বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুগত নহে। তাহা কেবল বিশ্বাসেই অনুগত। বিশ্বাস বাস্তবিক চক্ষুহীন অন্ধ। সে বিজ্ঞানের কথা গ্রহণ করিতে চাহে না, এবং গ্রহণ করিতে সক্ষমও নহে। এই অন্ধ বিশ্বাস দ্বিজেন্দ্র বাবুতেও বলবান্ রহিয়াছে। তাহাতেই তিনি বিজ্ঞানের সমস্ত উপদেশ ও যুক্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া ঈশ্বরের অনুকূলে অবৈজ্ঞানিক কথারও যোজনা করিতেছেন। এবং অন্য কেহ বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগ করিলে তাহার প্রতি কটূক্তি করিতেও ত্রুটি করিতেছেন না।

[স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান স্বতন্ত্র, আর অন্ধ বিশ্বাস স্বতন্ত্র। "অমুক বড়লোক (যেমন প্রক্টর বা ডিস্‌ডেল) এই কথা বলিয়াছেন অতএব ইহা বেদবাক্য" ইহারই নাম অন্ধ বিশ্বাস। কিন্তু পরিবর্ত্তন মাত্রেরই কারণ আছে—খণ্ড আকাশ মাত্রই অসীম আকাশের ক্রোড়ীভূত—অপূর্ণ সত্য মাত্রই পরিপূর্ণ সত্যের আশ্রয়াধীন—এরূপ ধ্রুব তত্ত্ব-সকল অন্ধ বিশ্বাস নহে কিন্তু জাগ্রত জ্ঞান। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে বিশ্বাস করিলে যদি লোককে অবৈজ্ঞানিক হইতে হইত, তাহা হইলে নিউটন্‌ও অবৈজ্ঞানিক; যেহেতু, এটা তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, পরিবর্ত্তন-মাত্রেরই কারণ আছে। স্বতঃসিদ্ধ সত্য-সকল সমস্ত বিজ্ঞানেরই ভিত্তিমূল। কাজেই, যাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের প্রতি বিমুখ হইয়া বিজ্ঞানের অনুশীলন করেন তাঁহারা গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালেন; তাঁহারা বিজ্ঞানের প্রকৃত মর্ম্মের অভ্যন্তরে তলাইতে পারেন নাই; এ সম্বন্ধে বেকন যাহা বলিয়াছেন তাহাই ঠিক্, যথা,

—A little philosophy inclineth man's mind to atheism; but depth in philosophy bringeth men's minds about to religion. অল্প জ্ঞান মনুষ্যের মনকে নাস্তিক্যের দিকে টানে; গভীর জ্ঞান লোকের মনকে ঈশ্বর-ভক্তির দিকে টানে। শ্রী দ্বি]

আমরা সম্প্রতি এই স্থলেই ক্ষান্ত হইলাম। কারণ একত্রে আর অধিক বিষয়ের আলোচনা হইতে পারে না। আমরা এই প্রস্তাবে যাহা কিছু বলিয়াছি তাহারই যে, কত ডাল পালা বহির্গত হয় তাহা বলা যাইতে পারে না।

কাণ্টের দর্শন
এবং
বেদান্ত দর্শন।

সত্য নিরূপণ করাই জ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য। সত্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) মনোগত সত্য এবং (২) বস্তুগত সত্য। যাহার নিকটে যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহার নিকটে তাহাই সত্য—এইরূপ যত কিছু সত্য, অর্থাৎ যাহার সত্যতা ব্যক্তি-বিশেষের মনের অবস্থার উপরে নির্ভর করে, তাহাই মনোগত (subjective) সত্য; আর, যে সত্য মনের অবস্থা-পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হয় না সুতরাং সত্যবাদিসম্মত, তাহাই বস্তুগত (objective) সত্য। বস্তুগত সত্যের আর এক নাম বাস্তবিক সত্য; মনোগত সত্যের আর এক নাম প্রাতিভাসিক সত্য; প্রাতিভাসিক সত্য—অর্থাৎ যাহার ইন্দ্রিয় সমক্ষে যাহা যেরূপ প্রতিভাসিত হয়—ঐন্দ্রিয়ক অবভাস।

একজন অনভিজ্ঞ কৃষকের নিকটে সকলই বাস্তবিক সত্য। তাহার নিকটে চন্দ্র একখানি থালা অপেক্ষা অধিক দেশ ব্যাপে না; পৃথিবী পর্ব্বতের ন্যায় অচল; সূর্য্য সাগর-গর্ভ হইতে গাত্রোত্থান করে এবং সাগর-গর্ভে নিলীন হয়। সমস্তই তাহার নিকটে যৎপরোনাস্তি ধ্রুব সত্য। দৈবাৎ যদি কখন ভূমি-কম্প হইল—তখন পৃথিবীর স্থায়িত্বের উপরে তাহার বিশ্বাস কিয়ৎকাল স্তব্ধীভূত হয়, তাহার পরেই তাহার মনোমধ্যে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাহাকে বুঝাইয়া দেয় যে, পৃথিবী বাসুকীর মাথার উপরে ভর করিয়া আছে—বাসুকী মাথা নাড়িলেই পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে; এই কথাটি শুনিবা-মাত্রই কৃষকের সমস্ত সংশয় তিরোহিত হইয়া যায়। "পৃথিবী অটল" ইহা যেমন—"তাহা বাসুকীর মস্তকের উপর ভর করিয়া আছে" ইহাও তেমনি—দুইই তাহার নিকটে বাস্তবিক সত্য—ধ্রুব সত্য। পৃথিবীকে সে অষ্ট প্রহর দর্শন করিতেছে স্পর্শ করিতেছে, বাসুকীকে কেহই দেখে নাই—স্পর্শ করে নাই, কৃষকের তাহাতে কিছুই আইসে যায় না; তাহার নিকটে প্রত্যক্ষ সত্যও যেমন বাস্তবিক—আনুমানিক সত্যও তেমনি বাস্তবিক;—চক্ষে দেখা সত্যও যেমন—কর্ণে শুনা সত্যও তেমনি—উভয়ই ধ্রুব সত্য। তাড়কা রাক্ষসীর মুখব্যাদানের ন্যায় তাহার বিশ্বাসের পরিধি আকাশ-পাতাল-ব্যাপী, তাহার অভ্যন্তরে সংশয়ের একবিন্দুও অবকাশ নাই। তুমি আজিকের কালের এক জন কৃতবিদ্য ব্যক্তি—কৃষকের মনের এইরূপ সংশয়-শূন্য নির্ভীক অবস্থা দেখিয়া তুমি মনে মনে হাস্য করিতেছ, কিন্তু হাস্যে ক্ষান্ত হও। কৃষকের নিকট সকলই বাস্তবিক সত্য—এ যেন খুবই হাস্যাস্পদ, কিন্তু তোমার নিকট কিছুই বাস্তবিক সত্য নহে অথচ তুমি মনে করিতেছ যে, তুমি যাহা স্থির করিয়াছ তাহাই বাস্তবিক সত্য,—ইহা কি উহা অপেক্ষা কম হাস্যাস্পদ? তুমিও বাস্তবিক সত্য জান না, কৃষকও বাস্তবিক সত্য জানে না; তুমিও বলিতেছ যে, আমি যাহা বুঝি তাহাই বাস্তবিক সত্য, কৃষকও তাহাই বলিতেছে; কিন্তু কৃষকের মন সংশয়শূন্য প্রশান্ত—তোমার মন সংশয়ের বিষ-দংশনে অস্থির; এ বিষয়ে তোমা-অপেক্ষা কৃষক পরম ভাগ্যবান্—তাহাতে আর ভুল নাই। কৃষক সত্য না জানিয়াও যেমন সত্যে নিঃসংশয়, তুমি সত্য জানিয়া যদি সত্যে তেমনি নিঃসংশয় হইতে পার, তবেই বলিব যে, তুমি কৃষক অপেক্ষা জ্ঞানে বড়, কেননা তুমি বাস্তবিক সত্য জান—কৃষক তাহা জানে না; তাহা যতক্ষণ না হইতেছে, ততক্ষণ তুমিও যা, কৃষকও তা সমানই; বরং কৃষক তোমা অপেক্ষা ভাল, কেননা তাহার মনে শান্তি বিরাজ করিতেছে—তোমার মনে শান্তি নাই। এই স্থলে কৃতবিদ্য ব্যক্তি উষ্ণ হইয়া এইরূপ প্রত্যুত্তর দিবেন সন্দেহ নাই যে, "বিজ্ঞান বলিয়া যে, একটা সামগ্রী আছে, তাহা কি তুমি একেবারেই ভুলিয়া গেলে? তোমার মস্তকের উপরে মধ্যাহ্ন দিবাকর দেদীপ্যমান—তাহাও কি তোমাকে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে? কি আশ্চর্য্য! বাস্তবিক সত্যের পথপ্রদর্শক বিজ্ঞান নহে তো আর কে?" ইহার উত্তরে আমরা বলি,—থামো! তোমাদের পরম গুরু এবং নেতা কম্‌টি বলিয়াছেন যে, আপেক্ষিক সত্য ভিন্ন বাস্তবিক সত্যে হস্ত প্রসারণ করা বিজ্ঞানের পক্ষে নিতান্তই অনধিকার চর্চ্চা। কম্‌টি বলেন "বিজ্ঞানের আপেক্ষিক সত্যকেই বাস্তবিক সত্য বলিয়া মানিয়া লও—তাহাতেই জনসমাজের সমস্ত কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত

হইতে পারে। তাহার সাক্ষী—সূর্য্যের আকর্ষণ; সূর্য্যকে কেহ পৃথিবী আকর্ষণ করিতে দেখেও নাই দেখিবেও না; কে তবে বলিল যে, সূর্য্য পৃথিবী আকর্ষণ করিতেছে? ভেক যেমন জিহ্বা প্রসারণ করিয়া কীট আকর্ষণ করে, সূর্য্য কি সেইরূপ কোন সূক্ষ্ম বস্তু প্রসারণ করিয়া পৃথিবী আকর্ষণ করে? না দৈবজ্ঞ যেমন মন্ত্র দ্বারা বাটি চালনা করে, সূর্য্য সেইরূপ বাহ্যবস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকেও শূন্যের মধ্য-দিয়া পৃথিবী আকর্ষণ করে? বিজ্ঞান নিরুত্তর! সুতরাং এখানে আকর্ষণ কথাটাই অপ্রামাণ্য; অতএব আকর্ষণ বিকর্ষণ এ সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া "পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এইটুকু জানিয়াই নিশ্চিন্ত থাক—বেশী বাড়াবাড়ি করিও না!" এই তো দেখা যাইতেছে যে, কম্‌টির মতে বাস্তবিক সত্য বিজ্ঞানের অধিকার-বহির্ভূত—ব্যবহারিক সত্যই বিজ্ঞানের একমাত্র আলোচ্য বিষয়। কম্‌টির এ কথার বিরুদ্ধে আমরা বলি যে, পৃথিবী যে, সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, তাহার কি কোন কারণ আছে—না কারণ নাই? কিয়ৎ মাস ধরিয়া পৃথিবী সূর্য্য হইতে ক্রমশই দূরে প্রস্থান করে, তাহার পরে সেরূপ না করিয়া ঠিক্ তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করে কেন? অবশ্যই তাহার কোন না কোন কারণ আছে। অতএব পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে ইহা যেমন সত্য—তাহার একটা না একটা কারণ আছে ইহা তেমনিই সত্য; পৃথিবীর প্রদক্ষিণ-কার্য্য এবং তাহার কারণ—দুয়ে মিলিয়া তবে একটা সমগ্র সত্য দাঁড়ায়। কম্‌টি ঐ সমগ্র সত্যটির প্রতি হাত বাড়াইতে মানা করেন; তিনি পৃথিবীর প্রদক্ষিণ কার্য্য মাত্রটিতেই—আধখানা সত্যেই—সন্তুষ্ট থাকিতে বলেন। এটা তিনি দেখিতেছেন না যে, বিজ্ঞানকে অর্দ্ধ সত্যে সন্তুষ্ট থাকিতে বলা, আর, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে আধ-পেটা অন্নে সন্তুষ্ট থাকিতে বলা, দুইই সমান। ধরিতে গেলে—বিজ্ঞান অর্দ্ধ সত্যও বোঝে না—সিকি সত্যও বোঝে না—বাস্তবিক সত্যই তাহার একমাত্র অন্বেষণের বিষয়; তবে কি না—অপার্য্যমানে সে অর্দ্ধ সত্যেই আপাততঃ সন্তোষ অবলম্বন করে এবং মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দেয় যে,নেই-মামা অপেক্ষা কাণা মামা ভাল। কিন্তু তাহা বলিয়া অর্দ্ধ সত্য কি বাস্তবিক সত্য? সত্য বটে যে, আমার নিকটে চন্দ্রের এক পিট মাত্র প্রকাশ পায়—কিন্তু তাহা বলিয়া বাস্তবিকই কি চন্দ্রের সেই দৃশ্যমান পৃষ্ঠই তাহার সর্ব্বস্ব? সমগ্র সত্যই বাস্তবিক সত্য। অর্দ্ধ সত্যে বিজ্ঞানের এবং সংসারের কার্য্য খুবই চলিতে পারে; এমন কি প্রতি বৎসর সূর্য্য স্বয়ং উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে যাতায়াত করে—ইহার উপরে ভর করিয়াই কৃষকের কৃষি-কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে; অথচ বিজ্ঞান শেষোক্ত সত্যকে আপন রাজ্য হইতে বহিষ্কার করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু কম্‌টি যদি বলিতে পারিলেন যে, পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে—এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট, কেন করে কি বৃত্তান্ত তাহা জানিবার প্রয়োজন করে না, কৃষক তবে এ কথা না বলিতে পারিবে কেন যে, সূর্য্যের উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন হইতেছে এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট—কেন তাহা হইতেছে তাহা জানিবার প্রয়োজন করে না? পণ্ডিতের জ্যোতির্বিদ্যাই শুধু যে, বিজ্ঞান, কৃষকের জ্যোতির্বিদ্যা যে, আদবেই বিজ্ঞান নহে, এরূপ কথা নিতান্তই

অত্যুক্তি। এই পর্য্যন্তই বলা যাইতে পারে যে, কৃষকের কৃষি-বিদ্যা অতীব স্থূল রকমের বিজ্ঞান, উদ্ভিদ্‌বেত্তার কৃষি-বিজ্ঞান অতীব সূক্ষ্ম রকমের বিজ্ঞান, কিন্তু দুইই বিজ্ঞান তাহাতে আর সন্দেহ নাই—কেননা প্রণালী-পদ্ধতি দুয়েরই সমান। পণ্ডিতেরাও যে প্রণালীতে উদ্ভিদ্ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন—কৃষকেরাও সেই প্রণালীতে কৃষি বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছে; সে প্রণালী কি? না ভূয়োদর্শন এবং বহুদর্শন। কম্‌টির অর্দ্ধ সত্য নয় ষোলো আনা বৈজ্ঞানিক, কৃষকের সিকি সত্য নয় আট আনা বৈজ্ঞানিক—কিন্তু তাহাতে কি? অর্দ্ধ হউক—সিকি হউক্—বৈজ্ঞানিক তো বটে! উপকারিতা দুয়েরই সমান—বরং কৃষকের কৃষি-বিদ্যা জন-সমাজের বেশী উপকারী; মূল পদ্ধতিও দুয়েরই সমান—ভূয়োদর্শন এবং বহু-দর্শন। বিদ্যার তবে কিসে এত মাহাত্ম্য? ইহার উত্তর এই যে, বিদ্যার মাহাত্ম্য তাহার পদ্ধতি-নিবন্ধনও নহে—উপকারিতা-নিবন্ধনও নহে; বাহিরের নিয়ম সকলকে মনের ভাবের ন্যায় অন্তরে পাওয়া—ইহাই বিজ্ঞানের চমৎকারিতা; আর, মনের ভাবকে বাহিরে মূর্ত্তিমান করা ইহাই শিল্প বিদ্যার চমৎকারিতা। যাহাই হউক্—কৃষকেরাও কতক-পরিমাণে বাহিরের নিয়ম সকলকে মনোমধ্যে আয়ত্ত করে—এ জন্য কৃষকের কৃষি-বিদ্যাও মোটামুটি বিজ্ঞান-শব্দের বাচ্য।

উপরে দেখানো হইল যে, সত্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) বাস্তবিক (যথা পৃথিবী নিয়ত ঘূর্ণমান), (২) প্রতিভাসিক (যথা পৃথিবী অটল); এখন বক্তব্য এই যে, প্রাতিভাসিক সত্য এবং বাস্তবিক সত্য উভয়ই মিশ্র এবং অমিশ্র (বা বিশুদ্ধ) এই দুই অবান্তর শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। "পৃথিবী অটল" এই প্রাতিভাসিক সত্যের ভিতরেও বাস্তবিক সত্য আছে, আর, "পৃথিবী নিয়ত ঘূর্ণমান" এই বাস্তবিক সত্যের মধ্যেও প্রাতিভাসিক সত্য আছে। মনুষ্যের ইন্দ্রিয়-সমক্ষে যেমন পৃথিবী প্রকাশমান, পশুদিগেরও সেইরূপ; কিন্তু "পৃথিবী সচল কি অচল" এ ভাবনার দায়ে কোন পশুরই একদিনের জন্যও নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না। পশুদিগের ইন্দ্রিয়ে রূপরসাদি প্রকাশ পায়—এই মাত্র; কিন্তু তাহাদের বুদ্ধিতে সত্য প্রকাশ পায় না। পশুরা ভীষণ মূর্ত্তি দেখিলে দূরে পলায়ন করে, ভক্ষ্য দ্রব্য দেখিলে নিকটে অগ্রসর হয়, এইরূপ অনেক কার্য্য জ্ঞাতসারে করে বটে; কিন্তু কোন কিছুকেই সত্য বলিয়া অবধারণও করে না এবং মনোমধ্যে যত্ন পূর্ব্বক পোষণও করে না। পশু-দিগের ইন্দ্রিয়-সমক্ষে পৃথিব্যাদি যেরূপ প্রতিভাসিত হয়, তাহাই অমিশ্র প্রাতিভাসিক সত্য। কিন্তু "পৃথিবী অটল" এ যে প্রাতিভাসিক সত্য, ইহার মধ্যে বাস্তবিক সত্য রহিয়াছে; "পৃথিবী অটল" ইহা বলিবা মাত্রই প্রতিপন্ন হয় যে, পৃথিবী বস্তু-বিশেষ। অতএব, "পৃথিবী অটল" এই প্রাতিভাসিক সত্যের মূলে, "পৃথিবী বস্তু-বিশেষ" এই বাস্তবিক সত্যটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। পশুরা সত্যাসত্যের কোন ধারই ধারে না—মানসিক সংস্কারই তাহাদের সকল কার্য্যের প্রবর্ত্তক। কিন্তু কি কৃষক, কি পণ্ডিত, সকল মনুষ্যই (অন্ততঃ কার্য্যের সুবিধার জন্য) সত্য নিরূপণ করিতে বাধ্য হয়। কৃষকের এই যে একটি কথা যে, পৃথিবী বস্তু-বিশেষ, এটি তো বাস্তবিক সত্য? তবেই হইতেছে যে, "পৃথিবী অচল" বলিতে যে অংশে বুঝায় যে, পৃ-

থিবী বস্তু-বিশেষ, সেই অংশে উহা বাস্তবিক সত্য, আর, যে অংশে বুঝায় যে, "পৃথিবী আমাদের চক্ষে অটল বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে" সেই অংশে উহা প্রাতিভাসিক সত্য। কৃষকের অল্প দর্শনে প্রকাশ পাইতেছে যে, পৃথিবী অচল; পণ্ডিতের বহু দর্শনে প্রকাশ পাইতেছে যে, পৃথিবী ঘূর্ণমান; কিন্তু "পৃথিবী কেন ঘুরিতেছে" তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহা মহা পণ্ডিতেরাও তাহার সম্যক্ উত্তর প্রদানে পরাভব মানেন; অগাধ সমুদ্রে কেহ বা হাঁটু-জল পর্য্যন্ত—কেহ বা কোমর-জল পর্য্যন্ত—অগ্রসর হ'ন, তাহার পরে কোথাও আর থই পা'ন না। পণ্ডিত ব্যক্তি মনশ্চক্ষে—কল্পনাতে—দেখিতেছেন যে, পৃথিবী ঘুরিতেছে; অতএব, পৃথিবী-শুদ্ধ কেবল ঘুরিতেছে—আপনা আপনি ঘুরিতেছে, এটিও কল্পনার প্রাতিভাসিক সত্য; তাহার মধ্যে বাস্তবিক সত্য এই যে, পৃথিবী কারণ-বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া ঘুরিতেছে। অতএব, কি চাসার মোটামুটি সিদ্ধান্ত, কি পণ্ডিতের সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত, উভয়েরই মূলে বাস্তবিক সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; আর উভয় সিদ্ধান্তই বাস্তবিক সত্য এবং প্রাতিভাসিক সত্য এই দুইরূপ সত্যের সম্মিশ্র। এইরূপ মিশ্র বাস্তবিক সত্য যদিচ পূর্ণ-মাত্রায় বাস্তবিক নহে, তথাপি তাহাতেই লোক-সমাজের কার্য্য কোন-না-কোন প্রকারে চলিয়া যায়। বৈজ্ঞানিক সত্যের এ যেমন—নৈতিক সত্যেরও তেমনি—কোনটিরই বিশুদ্ধ মূর্ত্তি জন-সমাজের কার্য্য-কলাপে দেখিতে পাওয়া যায় না; স্বার্থের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচ্ছন্ন থাকে—ধর্ম্মের মধ্যে স্বার্থ প্রচ্ছন্ন থাকে—এক প্রকার মিশ্র নৈতিক সত্য লোক-সমাজের প্রবর্ত্তক।

এইরূপ মিশ্র বাস্তবিক সত্য দ্বারা সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ হয় বলিয়া, তাহা ব্যাবহারিক সত্য বলিয়া উক্ত হয়। ব্যাবহারিক সত্যের মধ্য হইতে তাহার প্রাতিভাসিক অংশটি টানিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই অমিশ্র বাস্তবিক সত্য; ঐকান্তিক অমিশ্র বাস্তবিক সত্য বেদান্ত দর্শনে পারমার্থিক সত্য বলিয়া অভিহিত হয়। তেমনি আবার, ব্যবহারিক সত্যের মধ্য হইতে বাস্তবিক সত্য টানিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই অমিশ্র প্রাতিভাসিক সত্য—তাহা ঐন্দ্রিয়ক অবভাস ভিন্ন আর কিছুই নহে; তাহা সত্য নামেরই অযোগ্য; এইরূপ অমিশ্র প্রাতিভাসিক সত্য বেদান্ত-দর্শনে মায়া এবং অবিদ্যা এই দুই নামে অভিহিত হয়। মায়া ঈশ্বরের শক্তি এবং অবিদ্যা জীবের বন্ধন। এইরূপে পাওয়া যাইতেছে যে, বাস্তবিক সত্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) অমিশ্র বাস্তবিক সত্য, এক কথায়—পারমার্থিক সত্য এবং (২) মিশ্র বাস্তবিক সত্য—এক কথায় ব্যাবহারিক সত্য; তেমনি আবার, প্রাতিভাসিক সত্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) অমিশ্র প্রাতিভাসিক সত্য, এক কথায়—ঐন্দ্রিয়ক অবভাস, (২) মিশ্র প্রাতিভাসিক সত্য, এক কথায়—ব্যাবহারিক সত্য। অতএব ব্যাবহারিক সত্যের একদিকে পারমার্থিক সত্য আর একদিকে ঐন্দ্রিয়ক অবভাস—উহা দুয়ের সম্মিশ্র।

এখন, কথা হ'চ্চে এই যে, বাস্তবিক সত্য—দর্শন এবং বিজ্ঞান দুয়েরই অন্বেষণের বিষয়। কিন্তু উপরে দেখা গেল যে, বাস্তবিক সত্য—অমিশ্র কিনা পারমার্থিক এবং মিশ্র কিনা ব্যাবহারিক—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; তাহার মধ্যে পারমার্থিক

সত্য দর্শনের মুখ্য অন্বেষ্য বিষয়, ব্যাবহারিক সত্য বিজ্ঞানের (বস্তু-বিজ্ঞানেরও বটে নীতি-বিজ্ঞানেরও বটে) মুখ্য অন্বেষ্য বিষয়। ব্যাবহারিক সত্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—বস্তু-ঘটিত এবং কর্ত্তব্য-ঘটিত, এক কথায় বৈজ্ঞানিক এবং নৈতিক। পারমার্থিক সত্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক অর্থাৎ দেবতা সম্বন্ধীয় এবং মনুষ্য সম্বন্ধীয়; আধিদৈবিক কি? না ব্রহ্ম; আধ্যাত্মিক কি? না জীবের মুক্তি। ঐন্দ্রিয়ক প্রাতিভাসিক সত্যও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক; ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের মধ্যে যাহা আধিদৈবিক (অর্থাৎ ঈশ্বর-সম্বন্ধীয়) তাহা মায়া বলিয়া উক্ত হয়; মায়া কি? না প্রকৃতি (অর্থাৎ ঐশী-শক্তি); আর, ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের মধ্যে যাহা আধ্যাত্মিক (অর্থাৎ মনুষ্য-সম্বন্ধীয়) তাহা অবিদ্যা বলিয়া উক্ত হয়; অবিদ্যা অর্থাৎ জীবের মোহ-বন্ধন। মায়া বা প্রকৃতি ব্রহ্মের বিপরীত পৃষ্ঠ; আর, অবিদ্যা বা মোহ-বন্ধন মুক্তির বিপরীত পৃষ্ঠ। অতএব সত্যের শ্রেণী বিভাগ সর্ব্ব সমেত এইরূপ;—

সত্য

বাস্তবিক প্রাতিভাসিক

পারমার্থিক ব্যাবহারিক ঐন্দ্রিয়ক

ব্রহ্ম মুক্তি বৈজ্ঞানিক নৈতিক মায়া অবিদ্যা

এতক্ষণ ধরিয়া এই যাহা ভূমিকা করা হইল, ইহার তাৎপর্য্য শুদ্ধ কেবল—কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত দর্শন এ দুয়ের প্রবেশ-দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেওয়া। কাহাকে বলে পারমার্থিক সত্য তাহা আমরা জানিলাম—বিশুদ্ধ (অর্থাৎ অমিশ্র) বাস্তবিক সত্যই পারমার্থিক সত্য। কাহাকে বলে ব্যাবহারিক সত্য তাহাও আমরা জানিলাম—যাহাতে সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ হয় এইরূপ মিশ্র সত্যই ব্যবহারিক সত্য, যেমন—নৈতিক সত্য এবং বৈজ্ঞানিক সত্য। প্রাতিভাসিক সত্য কাহাকে বলে তাহাও আমরা জানিলাম—যাহার ইন্দ্রিয় সমক্ষে যাহা যেরূপ প্রকাশ পায় তাহাই প্রাতিভাসিক সত্য। দর্শন শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য কি তাহাও আমরা জানিলাম—পারমার্থিক সত্য নিরূপণ করাই দর্শন-শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। এখন প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হওয়া যাক্।

কাণ্টের মতে পারমার্থিক সত্য তিনটি—(১) ঈশ্বর, (২) মুক্তি (Freedom), (৩) আত্মার অমরত্ব। কাণ্ট তাঁহার প্রথম গ্রন্থে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পারমার্থিক সত্য আমাদের জ্ঞানের অতীত। সে গ্রন্থের নাম বিশুদ্ধ জ্ঞানের সত্যাসত্য বিচার। কিন্তু তিনি তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পারমার্থিক সত্য আমাদের কর্ত্তব্য-জ্ঞানের পক্ষে নিতান্তই অবলম্বনীয়। এ গ্রন্থের নাম ব্যবহারিক জ্ঞানের সত্যাসত্য বিচার। কাণ্ট একবার এককথা না বলিয়া দুইবার দুই কথা বলিলেন কেন—এই প্রহেলিকাটির ভিতর তলাইতে হইলে তাঁহার মূলগত অভিপ্রায়টি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। কাণ্টের মূল অভিপ্রায়টি অতীব সহজ; আর, সহজ বলিয়াই তাহা পাঠক-বর্গের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। অনেকের বিশ্বাস এই যে, সহজ সত্য তো সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়—তাহার জন্য আবার দর্শনের প্রয়োজন কি? দর্শনের কাজই এই যে, দর্শন আমাদিগকে জটিল সত্য বুঝাইয়া দিবে। ইহাঁদের জানা উচিত যে, বিজ্ঞান-মাত্রেরই প্রথম পঁইটা গুলি অতীব সহজ; তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া

BLEED THROUGH.

কেহ যদি এক লম্ফে বিজ্ঞান আয়ত্ত করিতে যা'ন, তবে তিনি তাহাতে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারেন না;—ইতর ভাষায় যাহাকে বলে "গাছে না উঠিতেই এক কাঁধি" তাঁহার আশার দশা সেইরূপ হয়। অতএব কাণ্টের দর্শন রীতিমত আয়ত্ত করিতে হইলে কাণ্টের মূল অভিপ্রায়টির প্রতি সবিশেষ প্রণিধান করা কর্ত্তব্য; অভিপ্রায়টি অতীব সরল এবং পরিষ্কার—তাহার মধ্যে কূট-কচালিয়া কিছুই নাই, তাহা এই;—বাস্তবিক সত্যই অন্বেষ্য বিষয়। মনে কর যেন বাস্তবিক সত্য আমি মুষ্টি মধ্যে পাইয়াছি,—তবে তাহা কি সত্য-সত্যই বাস্তবিক, না কেবল আমার নিকটেই বাস্তবিক বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে? ইহা আমি কিরূপে জানিতে পারিব? অতএব বিশুদ্ধ বাস্তবিক সত্যের, এক কথায় পারমার্থিক সত্যের, প্রমাণাভাব; তাই বলি যে, পারমার্থিক সত্যের সম্বন্ধে আপাততঃ কোন কথার উচ্চ-বাচ্য না করিয়া বাস্তবিক সত্য কতদূর প্রামাণিক তাহারই প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যা'ক্। বিজ্ঞান তো বাস্তবিক সত্য অনেকটা আয়ত্ত করিয়াছে—বিজ্ঞান তো দিন দিনই বাস্তবিক সত্যের পথে এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতেছে; বিজ্ঞান সত্যের যতখানি প্রদেশ জয় করিয়াছে, তাহা তো খিলক্ষণই সুনিশ্চিত—তাহা তো বাস্তবিকই সত্য। আর এক দিকে দেখা যায় যে, মনুষ্যের কর্ত্তব্য-জ্ঞানের মূলে এমনি কতক গুলি প্রবল সত্য আছে যে, সেগুলি যদি অবাস্তবিক হয় তবে মনুষ্যের সকল কর্ত্তব্য কার্য্যই বৃথা পণ্ডশ্রম হইয়া যায়। বাস্তবিক সত্যকে যে, কোন্ পথে অন্বেষণ করিতে হইবে—সমগ্র সভ্যসমাজ তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছে। সভ্য সমাজকে জিজ্ঞাসা কর—সে বলিবে যে, বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব এবং নৈতিক মূলতত্ত্ব এ দুইটি বিষয় যদি বাস্তবিক না হয়, তবে বিজ্ঞান মিথ্যা—ধর্ম্ম মিথ্যা—সভ্যতা মিথ্যা। বিজ্ঞানের সত্য এবং কর্ত্তব্য-জ্ঞানের সত্য—এ দুয়ের বাস্তবিকতার উপরে সভ্য-সমাজের ভরপুর বিশ্বাস; মুখের বিশ্বাস নহে কিন্তু কাজের বিশ্বাস। সভ্যসমাজ ওদুয়ের বাস্তবিকতার উপরে যেমন বিশ্বাস করে, তেমনি কার্য্য-কালে তাহার উপরে একান্তঃকরণে নির্ভর করে। মুখে যদিও কেহ স্পর্দ্ধা করিয়া বলেন যে, বিজ্ঞান কিছুই নহে, কর্ত্তব্য জ্ঞান কিছুই নহে; কিন্তু কাজের সময়ে তাঁহাকে অগত্যা বিজ্ঞানের উপরেও নির্ভর করিতে হয়—কর্ত্তব্য-বুদ্ধির উপরেও নির্ভর করিতে হয়; কেননা, তাহা না করিলে তাঁহাকে বিপদে পড়িতে হয়; দেখিয়া না শিখিলে তাঁহাকে ঠেকিয়া শিখিতে হয়। বিজ্ঞানকে অমান্য করিয়া যিনি জাহাজ চালাইতে যা'ন তিনি গম্যস্থান হইতে বিচ্যুত হ'ন; কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে অমান্য করিয়া যিনি সংসার নির্ব্বাহ করিতে যা'ন তিনি পুরুষার্থ হইতে—মনুষ্যের মনুষ্যত্ব হইতে—বিচ্যুত হ'ন। সভ্য সমাজে তাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পারৎপক্ষে কেহই বিজ্ঞানকেও অবহেলা করে না, কর্ত্তব্য-জ্ঞানকেও অবহেলা করে না। স্বাস্থ্য-রক্ষার উপায় স্থির করিবার জন্য পারৎপক্ষে সকলেই বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করে—কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য সৎলোকের পরামর্শ গ্রহণ করে। কাণ্টের মনোগত অভিপ্রায় এই যে, বাস্তবিক সত্যের অন্বেষণ করিতে হইলে তজ্জন্য শূন্যে হাত বাড়াইবার প্রয়োজন করে না; মনুষ্য সমাজের বিজ্ঞান এবং ধর্ম্ম-জ্ঞানের

মধ্যেই তাহার অন্বেষণ-কার্য্যের গোড়াপত্তন করা বিধেয়। কেননা, সত্য সত্যই লোকে যাহাকে বাস্তবিক বলিয়া বিশ্বাস করে, ও যাহার উপর নির্ভর করিয়া অভীষ্ট পথে সত্য সত্যই অগ্রসর হয়, তাহার মধ্যে বাস্তবিক সত্য কতটুকু আছে তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। যাহা লইয়া আজ পর্য্যন্ত তর্ক বিতর্ক চলিতেছে—তাহার মধ্যে বাস্তবিক সত্য অন্বেষণ করিতে যাওয়া না যাওয়া পরের কথা; প্রথম উদ্যমেই তাহাতে হস্ত-ক্ষেপ করা শোভা পায় না; কেন না তাহা করিলে উপস্থিত ছাড়িয়া অনুপস্থিতে আশা করা হয়।

এইরূপ বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া কাণ্ট্ সর্ব্ব প্রথমে বিজ্ঞানের মধ্যে বাস্তবিক সত্যের মূলান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমেই ইন্দ্রিয়ের অবভাস এবং জ্ঞানের সত্য এই দুয়ের মধ্যে—(বৈদান্তিক ভাষায়) অবিদ্যা এবং বিদ্যা এই দুয়ের মধ্যে—প্রভেদ নিরূপণ করিলেন। পশুদিগের ইন্দ্রিয়-সমক্ষে যেমন শব্দ স্পর্শাদি দেশকালে প্রতিভাত হয়—মনুষ্যেরও সেইরূপ; কিন্তু মনুষ্য দেশকালের আবির্ভাব-মাত্রে সন্তুষ্ট না থাকিয়া তাহার মধ্য হইতে সত্য বাহির করিবার চেষ্টা করে; বরাহ অবতারের ন্যায় অবিদ্যার সাগর-গর্ত্ত হইতে বিদ্যা উদ্ধার করিবার চেষ্টা করে। বিদ্যার সত্য সম্বন্ধে কাণ্টের মন্তব্য কথা এই যে, যেমন তেমন সত্য হইলে চলিবে না, তাহা সুনিশ্চিত হওয়া চাই—তবেই তাহাকে বাস্তবিক সত্য বলিব। একটা জন্তু যদি তোমার বুদ্ধিতে সর্প বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আমার বুদ্ধিতে মৎস্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আর এক জনের বুদ্ধিতে কীট বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তবে বাস্তবিক তাহা যে কি—তাহা বলিতে পারা সুকঠিন; কিন্তু যাহা সকলের বুদ্ধিতেই সর্প বলিয়া প্রতীয়মান হয়—তাহা বাস্তবিকই সর্প। তেমনি আবার, মাঠের মধ্যে যদি আমি জলের মতো একটা আবির্ভাব দেখিয়া বলি যে, উহা জল হইলেও হইতে পারে, মরীচিকা হইলেও হইতে পারে; তবে, কি যে বাস্তবিক—তাহার ঠিকানা হয় না; কিন্তু যদি আমি অকাট্য প্রমাণ দ্বারা বুঝিতে পারি যে, উহা জল ভিন্ন আর, কিছুই হইতে পারে না, তবে তাহা যে বাস্তবিকই জল, সে বিষয়ে আমার কোন সংশয় থাকে না। এইরূপ লৌকিক ব্যবহার কালেও—তাহাকেই আমরা বলি বাস্তবিক সত্য যাহা সকলের নিকটেই সত্য, এক কথায়—সর্ব্ববাদিসম্মত বা সার্ব্বভৌমিক; ও যাহা না হইলেই নয়, এক কথায়—অবশ্যম্ভাবী বা নির্বিকল্প। কিন্তু এটা একটা মোটামুটি রকমের সত্য-নিরূপণ। বাস্তবিক সত্য নিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি সূক্ষ্মের পরাকাষ্ঠা।

প্রথম দৃষ্টিতে ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের মধ্যে—অবিদ্যার মধ্যে—সত্যাসত্য স্থান পাইতে পারে না; কিন্তু তাহার মধ্যে হইতেও কাণ্ট্ দুইটি অবশ্যম্ভাবী সত্য খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন—কি? না দেশকালে অবস্থিতি। ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের মধ্যে হইতে রূপ রসাদি সমস্তকেই ভাবনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে—কিন্তু তাহা আকাশের যে প্রদেশটিকে এবং কালের যে সময়টিকে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান আছে তাহা ভাবনা হইতে কিছুতেই বহিষ্কার করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না। ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের পক্ষে দেশকালে অবস্থিতি নিতান্তই অবশ্যম্ভাবী। দেশ-কাল-রূপী অবিদ্যা-ক্ষেত্রে আমরা আমাদের জ্ঞানকে খাটাইয়া সেখান হই-

তেও আমরা গণিতের ধ্রুব সত্য সকল উপার্জ্জন করি; আর, এই দুইটি অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্ব প্রাপ্ত হই যে, ব্যাপ্তি এবং মাত্রা নির্দ্ধারণ ব্যতিরেকে কোন ঐন্দ্রিয়ক অবভাসকেই জ্ঞানে আয়ত্ত করা যাইতে পারেনা; যে কোন ঐন্দ্রিয়ক অবভাসকে আমরা জ্ঞানে উপলব্ধি করি তাহারই ব্যাপ্তি এবং মাত্রা অবশ্যম্ভাবী, যথা;—গীত-ধ্বনি কতক-পরিমাণ কাল ব্যাপিয়া এবং কতক পরিমাণ উচ্চ নীচ স্বর-মাত্রা পূরণ করিয়া তবে আমাদের জ্ঞানের আয়ত্তাভ্যন্তরে ধরা দেয়; আলোক কতক পরিমাণ দেশ ব্যাপিয়া এবং কতক পরিমাণ ঔজ্জ্বল্যের মাত্রা পূরণ করিয়া আমাদের জ্ঞানের আয়ত্তাভ্যন্তরে ধরা দেয়। কিন্তু এটা যেন মনে থাকে যে, ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের ব্যাপ্তি-নিরূপণ এবং মাত্রা-নিরূপণ অন্ধ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নহে—অবিদ্যার কার্য্য নহে, কেবল—জ্ঞানেরই তাহা কার্য্য; তাহা যদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হইত তাহা হইলে পশুরাও তাহা করিত—ও সেই সূত্রে গণিত বিদ্যা উপার্জ্জন করিত। গণিত বিদ্যার সত্য-সকল যদিও আপাততঃ দেশ-কালরূপী অবস্তুকে আশ্রয় করিয়াই নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারে, কিন্তু বহির্ব্বস্তুর অবলম্বন ব্যতিরেকে কোন প্রকারেই তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না। গণিতের মনঃকল্পিত চতুষ্কোণ-ক্ষেত্রে কিছু আর বীজ বপন করা যাইতে পারে না,—বাস্তবিক ক্ষেত্রই গণিতের শূন্য ক্ষেত্রের চরম পর্য্যাপ্তি-স্থান। আমাদের মনোমধ্য-স্থিত গণিতের সত্যকে যদি বহির্জগতে প্রয়োগ করা সম্ভব্ না হইত তবে তাহার কোন মূল্যই থাকিত না। শুধু কেবল মনোরাজ্যে নহে কিন্তু তা ছাড়া—বস্তু-রাজ্যে সংলগ্ন হয় বলিয়াই, গণিতের সত্য বাস্তবিক সত্য নামের যোগ্য। ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের মধ্য দিয়া—মনোরাজ্যের মধ্য-দিয়া—বস্তু-রাজ্যে উপনীত হইতে হইবে, গণিত-বিদ্যা তাহারই দ্বার স্বরূপ। ব্যাপ্তি এবং মাত্রা নিরূপণ দ্বারা যখন আমরা কোন ঐন্দ্রিয়ক অবভাসকে জ্ঞানে আয়ত্ত করি, তখন সেই সঙ্গে আমরা এই তত্ত্বটি ধ্রুবরূপে উপলব্ধি করি যে, ঐন্দ্রিয়ক অবভাসটি গুণ-মাত্র—তাহা বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিতি করিতেছে; এই স্থানটিতে এই একটি অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায় যে, গুণ পরিবর্ত্তনশীল—বস্তু অপরিবর্ত্তনীয়। তাহার পরে আমরা লক্ষ্য বস্তুটির গুণ-পরিবর্ত্তনে অন্যান্য বস্তুর কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করি; এখানকার মূলতত্ত্ব এই যে, পরিবর্ত্তন মাত্রেরই কারণ আছে; এবং সর্ব্ব-শেষে আমরা সমস্ত জগৎ জুড়িয়া পরস্পরাধীনতার প্রকাণ্ড একটা বাণিজ্য ব্যাপার জ্ঞানে উপলব্ধি করি; এখানকার মূলতত্ত্ব এই যে, যেমন ক্রিয়া তেমনি তাহার প্রতিক্রিয়া। সর্ব্ব-শুদ্ধ ধরিয়া পাওয়া যাইতেছে যে, গণিত বিদ্যার মূলতত্ত্ব এই যে, ঐন্দ্রিয়ক অবভাস-মাত্রেরই ব্যাপ্তি এবং মাত্রা অবশ্যম্ভাবী; ভৌতিক বিদ্যার মূলতত্ত্ব এই যে, ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের আধার বস্তু, এবং সেই আধার বস্তুর উপরে আর আর বিভিন্ন বস্তুর বল-ক্রিয়া ও অন্যের বল-ক্রিয়ার উপরে সেই আধার-বস্তুর নিজের প্রতিক্রিয়া, এই তিনটি ব্যাপার অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ করিয়া কাণ্ট পাইলেন যে, বিজ্ঞানের অভ্যন্তরেই এরূপ কতকগুলি তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—যাহা একান্ত-পক্ষেই বাস্তবিক; আর ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, এক ব্যক্তিও তাহার বাস্তবিকতার বিপক্ষে একটি কথারও

দ্বিরুক্তি করে না—সকলেই তাহা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত শিরোধার্য্য করে। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে;—বাস্তবিক বলি কাহাকে? যাহা বস্তু-গত তাহাই বাস্তবিক; কিন্তু কাণ্টের ঐ মূলতত্ত্ব গুলি—জ্ঞানেরই মূলতত্ত্ব সুতরাং তাহা জ্ঞান-গত। এই কথাটির তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে নিম্ন-লিখিত দৃষ্টান্তটির প্রতি সবিশেষ মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। উপরি-উক্ত মূলতত্ত্ব-গুলি (যেমন কার্য্য-কারণের মূলতত্ত্ব) যদি আমরা বহির্বিষয়ের ভূয়োদর্শন হইতে সংগ্রহ করিয়া পাইতাম, তবে ভূয়োদর্শনের ব্যাপ্তির সহিত তাহার নিশ্চয়তার মাত্রা অবিকল সমতুল্য হইত; অর্থাৎ যত অধিকবার আমরা কার্য্য-কারণের ভাব বাহিরে দেখিতাম, ততই আমাদের অন্তঃকরণে কার্য্য-কারণের মূলতত্ত্বটি অধিকতর নিশ্চয় বলিয়া প্রতীয়মান হইত, তা ছাড়া—তাহার নিশ্চয়তা একেবারেই অকাট্য বলিয়া প্রতীয়মান হইত না। কাক কালো ইহা আমরা ভূয়োভূয় দেখিয়াছি বলিয়া তাহার নিশ্চয়তা-বিষয়ে আমরা খুবই নিঃসংশয়, কিন্তু তবুও আমরা এ কথা বলি না যে, এই প্রকাণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন স্থানেই সাদা কাক থাকিতে পারে না। ইহার বিপরীতে এইরূপ দেখা যায় যে, সকলেই এ কথা অকুতোভয়ে বলিতে পারে যে, অসীম ব্রহ্মাণ্ডের কোন-একটি স্থানেও বিনা-কারণে পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না। যদি আগন্তুক বস্তু-সকলের ভূয়ো-দর্শন হইতে আমরা ঐ মূলতত্ত্বটি সঙ্গ্রহ করিয়া পাইতাম, তাহা হইলে ঐ মূল-তত্ত্বটিও আগন্তুক-মাত্র হইত (যেমন কাক কালো এই তত্ত্বটি)—অবশ্যম্ভাবী হইত না; তাহা আমাদের জ্ঞানের একটি নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়াই—তাহা জ্ঞানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলিয়াই—তাহা অবশ্যম্ভাবী। বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব-গুলি যদি এইরূপ জ্ঞান-গত ব্যাপার মাত্র হইল, তবে সে-গুলিকে আমরা বস্তু-গত বলি কেন—বাস্তবিক বলি কেন? ইহার প্রতি কাণ্টের প্রত্যুত্তর এই যে, আমরা যে-কোন বস্তু জ্ঞানে উপলব্ধি করি তাহাতেই আমরা ঐ তত্ত্ব-গুলির প্রয়োগ দেখিতে পাই; তা শুধু নয়—ঐ তত্ত্বগুলিই বস্তু-সকলের বাস্তবিকতার মূল উপাদান। ঐ তত্ত্ব-গুলি যদি কোন বস্তুতেই প্রয়োগ করিতে পারা না যাইত—তাহারা যদি আমাদের মনোমধ্যেই চাবি দেওয়া থাকিত—তাহা হইলেই তাহাদের বাস্তবিকতা সংশয়-গর্ত্তে নিপতিত হইত; তাহা হইলে তাহারা বস্তু-গত না হইয়া আমাদের স্ব স্ব মনোগত হইয়াই ক্ষান্ত থাকিত। বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব-সকলের কার্য্যই এই যে, তাহারা বস্তু-সকলেতে অভিসর্পিত হয়—তদ্ভিন্ন তাহাদের দ্বিতীয় কার্য্য নাই। বস্তু-সকলেতে সংক্রামিত হওয়াই যখন তাহাদের একমাত্র কার্য্য, আর সে কার্য্য যখন তাহারা আবহমান কাল অভ্রান্ত-রূপে নিষ্পাদন করিয়া আসিতেছে, তখন তাহারা বাস্তবিক (বস্তু-গত) নহে তো আর কি? তাহারা আমাদের মনোমধ্যে এক-দণ্ডও চাবি দেওয়া থাকে না—তাহারা সর্ব্ব-বস্তুতে মুক্তভাবে পরিব্যাপ্ত হয়, তাহারা যদি বাস্তবিক নহে তবে—আর কে?

এই স্থানটিতে—কাণ্ট মনে করিলেই পারমার্থিক সত্যের কূলে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি কিনারায় আসিয়া নৌকাডুবি করিয়া বসিলেন। কাণ্ট প্রথমে এই বলিয়া যাত্রারম্ভ করিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়ে যাহা প্রকাশ

পায় তাহা বাস্তবিক সত্য নহে—বিশুদ্ধ জ্ঞানে যাহা প্রকাশ পায় তাহাই বাস্তবিক সত্য! আমরা বলি যে, তাঁহার এই কথাই ঠিক্। কিন্তু এখন তিনি বলিতেছেন যে, যাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানে প্রকাশ পায় তাহা জ্ঞানগত-সত্য মাত্র;—তাহা বস্তুগত সত্য নহে—বাস্তবিক সত্য নহে; ঐন্দ্রিয়ক অবভাসই বাস্তবিকতার মূল; এইখানে তাঁহার দার্শনিক নৌকা একেবারেই বিপর্য্যস্ত হইল—নৌকার মাস্তুর নীচে চলিয়া গেল ও নৌকার তলদেশ উপরে উঠিল। কাণ্ট বলেন যে, বিশুদ্ধ জ্ঞান ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের মূলে বস্তু যাহা অবধারণ করে তাহা ব্যবহারিক সত্য মাত্র, তা ভিন্ন তাহা পারমার্থিক সত্য নহে;—অর্থাৎ তাহা প্রকৃত পক্ষে বস্তু নহে; তবে কিনা—তাহাকে বস্তু বলিয়া বিশ্বাস না করিলে লোক-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না, এমন কি—বিজ্ঞান একপদও চলিতে পারে না; এই জন্য তাহাকে বস্তু বলিয়া স্বীকার না করিলেই নয়। কাণ্টের এই কথার বিরুদ্ধে বেদান্ত দর্শন বলেন—তুমি আপনিই তো বলিয়াছ যে, ঐন্দ্রিয়ক অবভাস—অবিদ্যা—আমাদিগকে বাস্তবিক সত্য দিতে পারে না, বিশুদ্ধ জ্ঞানই কেবল আমাদিগকে বাস্তবিক সত্য দিতে পারে; আবার তবে তুমি বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া এ কথা বল কিরূপে—যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের সত্য শুদ্ধ কেবল জ্ঞান-গত সত্য, তা ভিন্ন তাহা বস্তু-গত নহে—বাস্তবিক নহে? কাণ্ট ইহার এইরূপ প্রত্যুত্তর দে'ন যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের সত্য (যেমন বিশুদ্ধ বস্তু-তত্ত্ব) ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের সহিত জড়িত ভাবেই আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হয়, কাজেই—সে যাহা প্রতিভাত হয় তাহাতে বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং ঐন্দ্রিয়ক অবভাস দুয়েরই কার্য্য-কারিতা সমান মাত্রায় বিদ্যমান; তাই বলি যে, তাহা মিশ্র সত্য—বিশুদ্ধ সত্য নহে; ব্যবহারিক সত্য—পারমার্থিক সত্য নহে। ইহার উত্তরে বেদান্ত দর্শন এইরূপ বলেন যে, সেই মিশ্র সত্যের মধ্য হইতে যদি ঐন্দ্রিয়ক অংশটি (অবিদ্যাত্মক অংশটি) বর্জ্জিত করিয়া অবশিষ্ট অংশটি অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক অংশটি গ্রহণ করা যায়—তবে তাহাই তো অমিশ্র বাস্তবিক সত্য—পারমার্থিক সত্য; তাহা কি তাহাই তুমি আমাকে বল—বাজে কথা ছাড়িয়া দেও; কেননা অমিশ্র সত্য পাইলে কেহ আর তাহাকে ছাড়িয়া মিশ্র সত্যের আকাঙ্ক্ষী হয় না;—এক ভরি খাঁটি সুবর্ণের বিনিময়ে একভরি তাম্র মিশ্রিত সুবর্ণ ক্রয় করিতে যায়—এমন নির্ব্বোধ্ কে আছে? ইহার উত্তরে কাণ্ট বলেন যে, খাঁটি সত্য আমাদের জ্ঞানে ধরা দেয় না—যদি বা ধরা দেয় তাহা হইলেও তাহা আমাদের কোন ব্যবহারে আসে না। বেদান্ত বলেন, ব্যবহারে আসা না আসা পরের কথা—আপাততঃ তাহা জ্ঞানে ধরা দেয় কি না, তাহাই স্থির করা হউক্। খনি হইতে যে সুবর্ণ পাওয়া যায়, তাহা তো আর তাম্র-মিশ্রিত নহে; খাঁটি সুবর্ণকে তাম্র-মিশ্রিত করিলেই তাম্র-মিশ্রিত হয়; তাহা না করিলে তাহা—যেমন বিশুদ্ধ তেমনি বিশুদ্ধ থাকে। বিশুদ্ধ জ্ঞানের খাঁটি সত্যকে অবিদ্যার সহিত মিশ্রিত করিলেই তাহা মিশ্র সত্য হইয়া দাঁড়ায়,—তাহা না করিলেই তাহা যেমন তেমনি অবিকৃত-ভাবে জ্ঞানে প্রতীয়মান হয়। আমরা আপনারাই খাঁটি-সত্যকে অবিদ্যার সহিত মিশ্রিত করি, আবার, আপনারাই বলি যে, তাহা আমাদের জ্ঞানে ধরা দেয় না;

গোয়ালারা আপনারাই দুগ্ধের সহিত জল মিশায়, আবার—আপনারাই বলে যে, নির্জ্জলা দুগ্ধ পৃথিবীর কুত্রাপি পাওয়া যায় না—তুমিও যে দেখিতেছি সেইরূপ কথা বলিতেছ! আসল কথা এই যে, কাণ্ট্ পারমার্থিক-সত্যকে প্রাতিভাসিক রাজ্যে প্রাতিভাসিক সত্যের মতো করিয়া দেখিতে গিয়াছেন—তাই তিনি প্রকৃত পারমার্থিক সত্যের পরিবর্ত্তে এমনি একটা অপদার্থ-রকমের সত্য পাইয়াছেন যাহা অসত্যেরই সামিল; তাহা এমনি একটি তমসাচ্ছন্ন ব্যাপার যে, জ্ঞান-জ্যোতির সঙ্গে তাহার কস্মিন্ কালেও দেখা সাক্ষাৎ নাই, দেখা সাক্ষাৎ হইবেও না—হইতে পারেও না। কাণ্ট্ বহু কষ্টে কূলের কাছাকাছি আসিয়া "কূল দেখিতে পাওয়া যায় কি না—দেখা যা'ক্", এই অভিপ্রায়ে দূর-বীক্ষণ যোগে কূলাভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু একটি অত্যাবশ্যক কার্য্য তিনি ভুলিয়া গেলেন;—দূর-বীক্ষণের রন্ধ্র-দ্বারের কপাট উত্তোলন করিতে ভুলিয়া গেলেন! এই জন্য তিনি পারমার্থিক সত্যের কূল প্রগাঢ় তমসাচ্ছন্ন দেখিয়া হতাশ হইয়া বলিয়া উঠিলেন যে, পারমার্থিক সত্যকে জ্ঞানে ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না। জ্যোতির্ম্ময় জাগ্রত জীবন্ত পারমার্থিক সত্যের পরিবর্ত্তে কাণ্ট্ কি দেখিলেন? না একটা অন্ধ অনির্দ্দেশ্য মৃত বস্তু—তাহা কি যে তাহার ঠিকানা নাই, আর, তাহার তিনি নাম দিলেন "The thing in itself" "বস্তু-স্বরূপ" অথবা "তৎ-স্বরূপ"। বেদান্ত দর্শনের পারমার্থিক সত্য যেমন সত্য-স্বরূপ—তেমনি জ্ঞান-স্বরূপ,—সেখানে সত্য এবং জ্ঞান একাধারে বর্ত্তমান। কিন্তু কাণ্টের সেই যে "বস্তু-স্বরূপ" সেখানে জ্ঞানের একেবারেই প্রবেশ নিষেধ; জ্ঞান প্রবেশ করিলে পাছে বস্তু-গত সত্য জ্ঞান-গত হইয়া উঠে এই ভয়েই কাণ্ট্ সর্ব্বদা সশঙ্কিত। কিন্তু কাণ্টের এ ভয় নিতান্তই নিষ্কারণ—একটা রোগ-বিশেষ। কাণ্টের নিজের দর্শন-শাস্ত্রই আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছে যে, যাহা ইন্দ্রিয়ে প্রকাশ পায় তাহা বাস্তবিক সত্য নহে—অতএব যাহা ইন্দ্রিয়ে প্রকাশ পায় না, তাহার মধ্যেই বাস্তবিক সত্যের অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য; পুনশ্চ যাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানে প্রকাশ পায় তাহাই বাস্তবিক সত্য, অতএব যাহা জ্ঞানে প্রকাশ পায় না—তাহার মধ্যে বাস্তবিক সত্যের অন্বেষণ করা বৃথা পণ্ডশ্রম। কাণ্টের নিজেরই সিদ্ধান্ত এই যে, যাহাকে আমরা বস্তু বলিয়া আমাদের বাহিরে নির্দ্দেশ করি তাহাও আমাদের একটি জ্ঞানগত ব্যাপার—ঐন্দ্রিয়ক ব্যাপার নহে; অতএব কাণ্টের নিজের মতানুসারেই দাঁড়াইতেছে এই যে, তিনি যাহাকে "বস্তুস্বরূপ" বলিতেছেন, তাহা জ্ঞানাত্মক ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না; কেননা জ্ঞানই তাহার মূল—জ্ঞানই তাহার সর্ব্বস্ব—জ্ঞান-ব্যতিরেকে তাহা কিছুই নহে। এখানে যে জ্ঞানের কথা হইতেছে তাহা তোমার জ্ঞান বা আমার জ্ঞান বা আর কোন জীবের জ্ঞান—নহে; প্রাতিভাসিক সত্যের অধিষ্ঠান-ভূত আকাশ যেমন তোমার আকাশ নহে—আমার আকাশ নহে—কিন্তু সর্ব্বজগতের আকাশ,—কাল যেমন সর্ব্বজগতের কাল, তেমনি পারমার্থিক সত্যের অধিষ্ঠান-ভূত জ্ঞান সর্ব্বজগতের জ্ঞান,—জ্ঞান-স্বরূপ; অথচ, আকাশ এবং কাল তোমার জ্ঞানে প্রকাশমান, আমারও জ্ঞানে প্রকাশমান, সকলের জ্ঞানেই প্রকাশমান; জ্ঞান-স্বরূপ

পরব্রহ্ম তোমার আমার এবং সকলের জ্ঞানেই প্রকাশমান। পরব্রহ্ম সর্ব্বজগতের বলিয়াই তিনি সূর্য্যের ন্যায় তোমারও—আমারও—এবং সকলেরই। চক্ষের পরম বিষয় কি?—অন্ধকার নহে কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য; তেমনি জ্ঞানের পরম বিষয়—পরম অর্থ কি? পারমার্থিক সত্য কি? অন্ধ সত্তা নহে কিন্তু পরিপূর্ণ জ্ঞানময়-সত্তা—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

কাণ্ট্ তাঁহার নিজের পথে আর এক পদ অগ্রসর হইলেই পারমার্থিক সত্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন। কিন্তু ব্যবহারিক রাজ্যকে, সুপরীক্ষিত বিজ্ঞানরাজ্যকে, পশ্চাতে ফেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে তাঁহার মন নিতান্তই অন্ধকার দেখিল। তিনি দেখিলেন যে, ঐন্দ্রিয়ক অবভাসকে—অবিদ্যাকে যদি সমূলে পরিত্যাগ করা যায়, তবে বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব-সকলের আর দাঁড়াইবার স্থান থাকে না;—কেননা, মানিলাম কার্য্য-কারণের মূলতত্ত্ব আমাদের জ্ঞানাভ্যন্তরে বীজভাবে অবস্থিতি করে; কিন্তু কার্য্য দেখিলে তবে তো তাহার কারণ অবধারণ করিব? শুদ্ধ কেবল প্রাতিভাসিক রাজ্যেই কার্য্য উপস্থিত হয়—প্রাতিভাসিক রাজ্য বিলুপ্ত হইলে কার্য্যের নাম গন্ধও থাকে না; কাজেই কার্য্য-কারণ সম্বন্ধেরও কোন অর্থ থাকে না। কাণ্ট্ তাই বলেন যে, বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব-সকল প্রাতিভাসিক সত্যকে বাস্তবিক করিয়া দাঁড় করায়—এইটিই তাহার বাস্তবিকতা; এক কথায়—তাহার বাস্তবিকতা ব্যবহারিক—পারমার্থিক নহে; এ নহে যে, প্রাতিভাসিক রাজ্য ছাড়িয়া উহা স্বয়ং বাস্তবিক। কাণ্টের মতানুসারে বিশুদ্ধ জ্ঞানের তত্ত্ব বলিয়া বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব-সকলের কোন মূল্য নাই—বহির্জগতে তাহাদিগকে খাটানো যায় বলিয়াই তাহাদের যত কিছু মূল্য;—হীরকের নিজের কোন মূল্য নাই—তাহা দ্বারা কাচ কাটা যায় বলিয়াই তাহার যত কিছু মূল্য; কেননা বিজ্ঞানের চক্ষে হীরক অঙ্গার-বিশেষ—বিশুদ্ধ জ্ঞান যন্ত্র-বিশেষ!

এইরূপ যান্ত্রিক নাগপাশ হইতে বিশুদ্ধ জ্ঞানকে পরিত্রাণ করিবার জন্য, কাণ্ট্ মনুষ্যের ধর্ম্মভাবকে সহায় ডাকিলেন; বিজ্ঞানের প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে তিনি যন্ত্রের ভাব ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পা'ন নাই, ধর্ম্ম-নিয়মের মধ্যে তিনি যন্ত্রীর ভাব দেখিতে পাইলেন। ধর্ম্মের মধ্য হইতে তিনি সুখ দুঃখ প্রভৃতি প্রাতিভাসিক ব্যাপার-সকলকে (বেদান্ত-দর্শনের অবিদ্যাকে) বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া, তাহার মধ্যে বাস্তবিক সত্য কি—তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে এইরূপ স্থির করিলেন যে, প্রাকৃতিক নিয়ম যেমন মনুষ্যের বন্ধনের ভিত্তি মূল, ধর্ম্মের নিয়ম সেইরূপ মনুষ্যের মুক্তির (Freedom) ভিত্তি-মূল। মনুষ্য যে, অবিদ্যার প্রতিকূলে মুক্তির পথে চলিবার অধিকারী—ধর্ম্মের নিয়মই তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ। ধর্ম্মের নিয়ম শুধু যে, আমার নিয়ম বা তোমার নিয়ম তাহা নহে—উহা ব্যক্তি-বিশেষের বা জাতি-বিশেষের ঘরগড়া নিয়ম নহে—যে-কোন জীবের বিবেচনা-শক্তি আছে সেই জীবই বুঝিতে পারে যে, মুক্তিতেই আত্মার পুরুষার্থ হয়—সুখ দুঃখের বন্ধনে পুরুষার্থ হয় না। কেননা সুখ দুঃখ প্রাতিভাসিক মাত্র—পারমার্থিক নহে। সুখ দুঃখ নিয়তই আসিতেছে যাইতেছে—তাহা কাহারো নির্ভর-স্থল হইতে পারে না—তাহা বালির বাঁধ। সুখ দুঃখ পরিবর্ত্তনের মুখেই নিয়ত দণ্ডায়মান। ছায়ার সুখ উপভোগ করিতে হইলে রৌদ্রের তাপ উপভোগ করা আবশ্যক; অরোগ্যের সুখ উপভোগ করিতে হইলে, পীড়ার দুঃখ উপভোগ করা আবশ্যক; অন্ন ভোজনের সুখ উপভোগ করিতে হইলে ক্ষুধার জ্বালা উপভোগ করা আবশ্যক;—সুখ অন্তর্হিত না হইলে তাহা উদিত হইতে পারে না। পরিবর্ত্তনের মুখেই সুখ-দুঃখের বুদ্‌বুদ্ উত্থিত এবং বিলীন হয়। প্রকৃতির পরিবর্ত্তন-শীল ঘটনা-সকল যেমন আগন্তুক অস্থায়ী এবং প্রাতিভাসিক—মনুষ্যের সুখ দুঃখও সেইরূপ। আর প্রকৃতির মূলতত্ত্ব-সকল যেমন অবশ্যম্ভাবী, অটল, বাস্তবিক এবং সর্ব্ববাদি-সম্মত, ধর্ম্মের মূল নিয়মও সেইরূপ। প্রভেদ কেবল এই যে, প্রাকৃতিক মূলতত্ত্ব সকল বস্তু-ঘটিত, ধর্ম্মের মূল নিয়ম কর্ত্তব্য-ঘটিত। সকল বস্তুই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে চলে, সকল মনুষ্যেরই ধর্ম্মের নিয়মানুসারে চলা কর্ত্তব্য। সুখ দুঃখ জীব-মাত্রেরই ধর্ম্ম—ধর্ম্ম শুদ্ধ কেবল মনুষ্যেরই ধর্ম্ম। প্রকৃত কথা এই যে, মনুষ্য অন্ধ বস্তু হইতে চায় না—জাগ্রত আত্মা হইতে চায়। অবিদ্যা মনুষ্যকে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া অন্ধ বস্তু করিয়া ফেলিতে চায়—মনুষ্য সেই বন্ধন-পাশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া জাগ্রত আত্মা হইতে চায়। মনুষ্য যখন অন্ধ প্রকৃতির প্রতিকূলে ধর্ম্ম-পথে চলে—তখন কাজেই সে প্রকৃতির নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্যের প্রত্যাশা করিতে পারে না; অন্ধ প্রকৃতি যে, আপনার গলায় আপনি ছুরি দিয়া মনুষ্যকে মুক্তি-পথে অগ্রসর করিয়া দিবে—ইহা হইতেই পারে না; এই জন্য ধর্ম্ম-পথে চলিবার সময় মনুষ্য অন্ধ প্রকৃতির নিকট হইতে নহে কিন্তু ঈশ্বরের নিকট হইতে সাহায্যের প্রত্যাশা করে। ঈশ্বরই ধর্ম্মের সিদ্ধিদাতা বিধাতা। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, বাহির হইতে—প্রকৃতি হইতে—যে ব্যক্তি যত সুখের প্রত্যাশা করে, প্রকৃতি তাহাকে ততই সুখে বঞ্চিত করে; আর, প্রকৃতির নিকট হইতে যে বড় একটা সুখের প্রত্যাশা রাখে না, প্রকৃতি তাহাকে সুখী করিবার জন্য ব্যস্ত হয়।

মনুষ্য যখন কোমর বাঁধিয়া ধর্ম্মের পথে দণ্ডায়মান হয়, তখন দেখিতে পায়—বড়ই সে কঠিন স্থান—প্রকৃত সংগ্রাম-ক্ষেত্র—শুধু কেবল মুখের কথা নহে। মনে কর একজন ধনী ব্যক্তি এবং এক জন দরিদ্র ব্যক্তি দুইজনেই মনে মনে সংকল্প করিল যে, আমার মনকে আমি কিছুতেই বিচলিত হইতে দিব না—সর্ব্বদাই তাহাকে ধর্ম্মপথে স্থির রাখিব; আর, উভয়েই পরস্পরের সহিত সুপরিচিত। হঠাৎ একদিবস পথে দুই জনের দেখা সাক্ষাৎ হইল; দরিদ্র ব্যক্তির মনে তদ্দণ্ডেই অর্থের প্রত্যাশা জাগিয়া উঠিল—ধনী ব্যক্তির মনে পালাইবার চেষ্টা জাগিয়া উঠিল;—ধর্ম্ম-পথ হইতে মন বিচলিত হইবার এই প্রথম সূত্র। দরিদ্র-ব্যক্তিটি ধনী ব্যক্তির গৃহে দুই চারি দিন যাতায়াত করাতে ধনী ব্যক্তি এক দিন বিরক্ত হইয়া দরোয়ান্‌কে দিয়া তাহাকে বাহির করিয়া দিল। মনের স্থৈর্য্য কত না বিচলিত হইল! দরিদ্র ব্যক্তি যখন দেখিল যে, সহজে কিছুই হইল না, তখন সে প্রতারণা এবং প্রবঞ্চনা দ্বারা কার্য্য আদায় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কত না পদ-স্খলন! এইরূপ লাখো লাখো দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ধর্ম্ম-পথে এইরূপ অল্প সূত্র হইতেই ক্রমে

ক্রমে বিপর্য্যয় ফলাও কাণ্ড হইয়া দাঁড়ায়। উক্ত ব্যক্তি-দ্বয়ের পথে মিলন-কালে এক-জনের মনে অর্থ-কামনা এবং আর এক জনের মনে পলায়ন-কামনা—ইহার পরি-বর্ত্তে যদি উভয়েরই মনে পরস্পরের মঙ্গল-কামনা জাগ্রত হইয়া উঠিত, তাহা হইলে সেই অল্প সূত্র হইতে রাশি রাশি ধর্ম্ম ফল ফলিতে পথ পাইত—সন্দেহ নাই। ধনী ব্যক্তি হয় তো প্রসন্ন চিত্তে দরিদ্র ব্যক্তিকে সাহায্য প্রদান করিত—দরিদ্র ব্যক্তি ধনী ব্যক্তির নানাবিধ কার্য্যের সহায়তা করিত; এবং দিন দিন উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব প্রব-র্দ্ধিত হইত। যে ব্যক্তি জগৎকে ছাড়িয়া দিয়া আপনাতে আপনি স্বাধীন ভাবে দ-ণ্ডায়মান থাকিতে চেষ্টা করেন—সাংখ্য-দর্শনের উপদিষ্ট কৈবল্য-লাভের প্রার্থী হ'ন—সমস্ত জগৎ সংসার তাঁহার মনকে স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য সচেষ্ট হয়;—একটি সামান্য কথা—একটি সামান্য দৃশ্য—একটি সামান্য ঘটনা—হয় তো চকিতের মধ্যে তাঁহার মনকে আকাশ হইতে পাতালে ফেলিয়া দিবে। অত-এব শূন্য স্বাধীনতায় ভর করিয়া দণ্ডায়মান থাকা মনুষ্যের পক্ষে যেমন সুদুষ্কর এমন আর কিছুই নহে। সমস্ত জগৎকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া যিনি স্বাধীন হইতে যা'ন, সমস্ত জগৎ তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়ায়;—তিনি একা কত দিক্ সামলাইবেন! চারি-দিকে শত্রু পক্ষ—তাহার মধ্যে স্বাধীন-তাকে নির্বিঘ্নে রক্ষা করা নিতান্তই অসাধ্য ব্যাপার; এরূপ স্থলে পরীক্ষা-উত্তীর্ণ মহা মহা ধর্ম্মবীর হাবু ডুবু খাইয়া যা'ন—যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথে নূতন ব্রতী তাহার তো কথাই নাই। অতএব জগতের উপর চটিয়া এবং জগৎকে চটাইয়া চারিদিকের শত্রুতার মধ্যে স্বাধীন হইতে যাওয়া নি-তান্তই পাগ্‌লামি, কেননা সেরূপ করিয়া কেহই এক মুহূর্ত্তও স্বাধীনতাতে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না; শত্রুতা নহে—দ্বেষ হিংসা নহে—প্রেমই স্বাধীন-তার উর্ব্বরা ভূমি। কিন্তু আর এক দিকে দেখা যায় যে, গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় জগতের মতে মত দিয়া চলিলে স্বাধীনতা সমূলে নির্ম্মূল হইয়া যায়। এখন উপায় কি? উপায় আমাদের প্রতি জনের হস্তে। সত্যসতই যদি আমি জগতের মঙ্গল কামনা করি, তবে জগৎও ভিতরে ভিতরে আমার মঙ্গল কামনা করিবে; আমি যদি জগতের মঙ্গল কামনা করি—তবেই জগৎ আমার বন্ধু, আমি যদি জগতের অমঙ্গল কামনা করি তবেই জগৎ আমার শত্রু; এইরূপ, জগৎকে বন্ধু করা এবং শত্রু করা আমার আপনারই হস্তে; আমি যদি আমার শত্রুর মঙ্গল-কামনা এবং মঙ্গল চেষ্টা করি, তবে আমার সে শত্রুরও ক্রমে চক্ষু ফুটিবে;—যদিও স্বার্থের অনুরোধে বাহিরে বাহিরে সে আমার সহিত শত্রুতা করিতে বাধ্য হয়, তথাপি ভিতরে ভিতরে সে আমার বন্ধু হইয়া দাঁড়াইবে; তাহার শরীর আমার শত্রু হইলেও তাহার অন্তরাত্মা আমার বন্ধু হইবে—তাহার কার্য্যের সহিত তাহার অন্তরাত্মার বিবাদ উপস্থিত হইবে। অত-এব, ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইতে হইলে জগ-তের মঙ্গল-কামনা এবং মঙ্গল-চেষ্টা দ্বারা সর্ব্ব জগতের সহিত এবং সর্ব্ব জগতের সাধারণ কেন্দ্রের সহিত মনকে একতান করিয়া মনের সুর বাঁধা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। তাহা হইলে ক্রমে আমাদের মঙ্গল-ভাবের তেজঃপ্রভাবে জগতের দ্বেষ হিংসা এবং শত্রুতা আমাদের নিকটে আসিবা-মাত্রই অমনি নতশির হইয়া পড়িবে। এইরূপ সা-ধারণ মঙ্গল-কামনা এবং মঙ্গল চেষ্টা সাধা-

রণতঃ সকল মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য; তা ছাড়া আবার—বিশেষ বিশেষ মনুষ্যের বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপযোগী বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য রহিয়াছে, যেমন—তোমার স্ত্রী পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ তোমার কর্ত্তব্য—আ-মার স্ত্রী-পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ আমার ক-র্ত্তব্য। গার্হস্থ্য কর্ত্তব্যের মূলে যেমন গার্হস্থ্য প্রেম, সাধারণ কর্ত্তব্যের মূলে তেমনি ঈশ্বর-প্রেম; কিন্তু স্বাধীনতা ব্যতিরেকে প্রেমের কোন অর্থই হয় না,—ক্রীত দাসের নিকট হইতে বল পূর্ব্বক প্রেম আদায় করা সম্ভবে না;—যে যা-হাকে প্রীতি করে, সে তাহাকে স্বাধীন-ভাবেই প্রীতি করে—বলের বাধ্য হইয়া কেহ কাহাকেও প্রীতি করিতে পারে না। অতএব সমস্ত জগতের সহিত প্রেমে মি-লিতে হইলে—মনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের মায়াজাল হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। যে স্বাধীনতা জগ-তের মঙ্গল-সাধনে পরাঙ্মুখ—যাহার অভ্য-ন্তরে প্রেম নাই—সেরূপ ফাঁকা স্বাধীনতা কোথাও হইতে পারে কি না—এক তো তাহাই সন্দেহ; তাহাতে আবার, যদি বা কাহারো দুরদৃষ্টে তাহা ঘটিয়া থাকে—তবে সেরূপ প্রেম-শূন্য কঠিন-প্রাণ শুষ্ক কাষ্ঠ অপেক্ষা, একটি নব-বিকসিত সরস গোলাব ফুল যাহা আজ আছে কা'ল নাই—তাহা সহস্র-গুণে ভাল। জগতের মঙ্গল-কামনা প্রেম-মূলক হইলে তবেই তাহা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়;—এটি কাণ্টের কথা নহে—এটি সকল দেশেরই ভক্ত-জনের হৃদয়ের কথা। কাণ্ট কর্ত্তব্য-কার্য্যকে—মঙ্গল ইচ্ছাকে—কঠোর আ-দেশ করিয়া দাঁড় করাইয়াছেন,—এবং সেই আদেশ-পালনের প্রবৃত্তিকে তিনি প্রেমের উপরে নহে কিন্তু ভক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কাণ্টের এ কথা আমাদের শিরোধার্য্য; কিন্তু তথাপি আ-মরা বলি এই যে, কর্ত্তব্য-সাধন প্রথম প্রথম যেমন নীরস দেখায়—চিরকাল কিছু আর সেরূপ থাকে না; অভ্যাসের গুণে কঠোর কর্ত্তব্য-সাধন ক্রমে সহজ এবং মধুময় হইয়া দাঁড়ায়—আদিষ্ট কার্য্য জ্ঞানের কার্য্য এবং প্রাণের কার্য্য হইয়া দাঁড়ায়—শ্রদ্ধা (অর্থাৎ বিশ্বাস) জ্ঞানে পরিণত হয় এবং ভক্তি প্রেমে পরিণত হয়। তবে কি—না কাণ্ট ভক্তি এবং প্রেমের মাঝখানে যেরূপ একটা অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সায় দিতে পারি না। যাহাই হো'ক্—এটা একটি ধ্রুব সত্য যে, আমরা জগতের মঙ্গল-কামনা এবং মঙ্গল চেষ্টা করিলে আমাদের কখনই অমঙ্গল হইবে না—অবশ্যই মঙ্গল হইবে; শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি" কোন কল্যাণ-কারীই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না;—এইটিই ধর্ম্মের সর্ব্ববাদি-সম্মত মূল-তত্ত্ব। যেমন ক্রিয়া তেমনি তাহার প্রতি-ক্রিয়া—ইহা যেমন বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল—ইহা তেমনি ধর্ম্মের মূল-তত্ত্ব; উভয়ই ধ্রুব এবং অল-ঙ্ঘনীয়। তবে, প্রভেদ এই যে, বিজ্ঞানের ঐ মূল তত্ত্বটি ভৌতিক নিয়ম, ধর্ম্মের এ মূলতত্ত্বটি আধ্যাত্মিক নিয়ম; বিজ্ঞানের ঐ মূলতত্ত্বটির বলে আমরা কেবল পাই যে, সমস্ত জগৎ একই মূল-প্রকৃতির অধীন; ধর্ম্মের এ মূলতত্ত্বটির বলে আমরা পাই যে, সমস্ত জগৎ একই পরমাত্মার অধীন। এইরূপ বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া কাণ্ট স্থির করিলেন যে ধর্ম্ম-জ্ঞানই পারমার্থিক সত্যের সোপান। পারমার্থিক সত্য সম্বন্ধে কাণ্টের চরম সিদ্ধান্ত এই যে, জগৎ ধর্ম্মের সংগ্রাম-ক্ষেত্র; ঈশ্বর ধর্ম্মের জয়দাতা বা সিদ্ধিদাতা; ধর্ম্মের সাহায্যে মনুষ্য অবি-দ্যার কার্য্য কারণ শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পারমার্থিক জ্ঞান-রাজ্যে—ঈশ্বরের প্রসন্নতা রাজ্যে—ক্রমশই অগ্রসর হয়।

কাণ্টের মতানুসারে এইরূপ দাঁড়াই-তেছে যে, বিজ্ঞানের সহিত পারমার্থিক সত্যের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই; শুধু কেবল ধর্ম্ম-জ্ঞানেরই সহিত তাহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি বলেন যে, পারমার্থিক সত্যের নিকট হইতে কোন সাহায্যের প্রত্যাশা না করিয়াও

বিজ্ঞান এ যাবৎকাল স্বীয় অভীষ্ট পথে দিব্য নিরাপদে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে; বিজ্ঞানের ভিতর পারমার্থিক সত্যকে প্রবেশ করাইলে তাহাতে তাহার লাভ কিছুই হয় না, বরং তাহাতে তাহার কার্য্যের ব্যাঘাত হয়। কিন্তু ধর্ম্মের বেলায় এই রূপ দেখা যায় যে, পারমার্থিক সত্যে বিশ্বাস-ব্যতিরেকে ধর্ম্মজ্ঞান নিতান্তই অঙ্গহীন হয়। কাণ্টের এ কথাটি মিথ্যা নহে; তাহার সাক্ষী—কম্‌টির নিরীশ্বর বিজ্ঞান-তন্ত্র বিজ্ঞানের পক্ষে সবিশেষ উপযোগী; কিন্তু তাঁহার নিরীশ্বর ধর্ম্ম-তন্ত্র ধর্ম্মের পক্ষে এমনি অনুপযোগী যে, তাহা সহৃদয় বিজ্ঞ সমাজে ভক্তি রসের পরিবর্ত্তে শুধু কেবল হাস্য রসেরই উদ্দীপন করে।

প্রথম দৃষ্টিতেই সহৃদয় পাঠকের মনে হইতে পারে যে, কাণ্ট দুই নৌকায় পা দিয়াছেন; বিজ্ঞানের ভিতরে পারমার্থিক সত্যের দর্শন-লাভে পরাভব মানিয়া তিনি প্রথমে বলিয়াছেন যে, পারমার্থিক সত্যের প্রমাণাভাব; তাহার পরে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্ম-জ্ঞানের মধ্যে আমরা পারমার্থিক সত্যের অব্যর্থ পরিচয় পাই। এখানে কাণ্টের সপক্ষে এই একটি কথা বলিবার আছে যে, দুই নৌকা যদি অবিচ্ছেদ্য ভাবে গায়ে গায়ে জোড়া লাগানো থাকে, তবে তাহাকে ঝড়ে শীঘ্র কাবু করিতে পারে না; তাই সিংহলবাসীরা সমুদ্র-বিচরণের সময় ঐরূপ জোড়া নৌকা ব্যবহার করিয়া থাকে। দুই দিক্ যেখানে বিবেচ্য, সেখানে একদিকে ঝোঁক দেওয়া সময়-বিশেষে আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু সকল সময়ে নহে; সজোরে যখন পূর্ব্ব বাতাস বহিতেছে, তখন নৌকার পূর্ব্ব পার্শ্ব ঘেঁসিয়া বসা যাত্রীদিগের কর্ত্তব্য তাহাতে আর ভুল নাই; কিন্তু অন্য সময়ে নহে। ধর্ম্ম-সাধন-কালে প্রবৃত্তির বায়ু বহির্বিষয়ের অভিমুখে সজোরে বহিতে থাকে, এই জন্য তখন তাহার বিপরীত দিকে সর্ব্বপ্রযত্নে ঝুঁকিয়া পড়া সাধকের কর্ত্তব্য; কিন্তু বিজ্ঞানের আলোচনা-কালে প্রবৃত্তির বায়ু প্রশান্ত ভাব ধারণ করে, এজন্য তখন দুই দিকের কোন দিকে ঝোঁক না দিয়া মধ্য পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়। কিন্তু কাণ্টের সপক্ষে এই যাহা বলা হইল—এস্থলে তাহা খাটে না; কারণ, কাণ্টের দুই নৌকার মধ্যে যোগবন্ধন এমনি শিথিল যে, এক নৌকা পশ্চিমে—আর এক নৌকা পূর্ব্বে—দুই নৌকা দুই দিকে ধাবমান। এক স্থানে যাহাকে অপ্রামাণিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, আর এক স্থানে তাহাকে প্রামাণিক বলিয়া সংস্থাপন করা হইয়াছে; ধর্ম্ম-জ্ঞানের সিদ্ধান্ত এবং বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত দুইকে পরস্পরের প্রতিকূলে দাঁড় করানো হইয়াছে। তিনি যদি বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব-সকলকে অন্ধ "বস্তু-স্বরূপের" উপরে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া জ্ঞান-স্বরূপের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতেন—তাহা হইলে তাঁহার দুই নৌকা অতীব দৃঢ় বন্ধনে এক সঙ্গে বাঁধা পড়িয়া যাইত। তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়াইত যে, বিজ্ঞানের এই যে আধিভৌতিক মূলতত্ত্ব—যেমন ক্রিয়া তেমনি প্রতিক্রিয়া, এবং ধর্ম্মের এই যে আধ্যাত্মিক মূলতত্ত্ব—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, এ দুইটি মূলতত্ত্ব একই মূলতত্ত্বের এ-পিট ও-পিট। জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা উভয়েরই ভিত্তি-মূল। সূর্য্য যেমন আলোকের এবং উত্তাপের উভয়েরই কেন্দ্রস্থল; পরমাত্মা সেইরূপ বিজ্ঞানের এবং ধর্ম্ম-জ্ঞানের—ভৌতিক জগতের এবং আধ্যাত্মিক জগতের—উভয়েরই কেন্দ্র-স্থল। অতঃপর বেদান্ত-দর্শনের সহিত কাণ্টের দর্শনের কিরূপ ঐক্যানৈক্য তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যা'ক্।

বেদান্ত-দর্শন যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সে সময়ে বিজ্ঞানের এখনকার মতো এরূপ হাঁক ডাক ছিল না; গুটি দুই তিন বিজ্ঞান যাহা লোকযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য নিতান্তই আবশ্যক—যেমন পর্ব্বাহ প্রভৃতি নিরূপণের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞান, রোগপ্রতীকারের জন্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান (তাহাও আবার ঠিক্ বিজ্ঞান science নহে—বিদ্যা art মাত্র) গণনা কার্য্যের জন্য গণিত বিজ্ঞান, তান্ত্রিক মতের একরূপ রসায়ণ বিজ্ঞান, এইরূপ লোকসমাজের ব্যবহারোপযোগী কতকগুলি বিজ্ঞান তখন না ছিল এমন নহে। এরূপ সত্ত্বেও আমরা বলিতে পারি না যে, প্রকৃত বিজ্ঞান তখন আলোক দর্শন করিয়াছিল। প্রকৃত বিজ্ঞানের অর্থাৎ প্রামাণিক বিজ্ঞানের ভিত্তিমূল দুইটি—জ্যামিতি এবং যন্ত্র-বিজ্ঞান। এ দুইটি বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত-গুলি প্রত্যক্ষের ন্যায় নিঃসংশয়। বরং প্রত্যক্ষের মধ্যে ভ্রম থাকিতে পারে (যেমন মরীচিকা দর্শন), কিন্তু এ দুইটি বিজ্ঞানের কোন স্থানে এমন একটিও ছিদ্র নাই যাহার মধ্য দিয়া ভ্রম প্রবেশ পাইতে পারে—এমন একটিও ঝোপ নাই যাহার আড়ালে ভ্রম লুকাইয়া থাকিতে পারে। এ দুইটি বিজ্ঞান পরস্পরের সহোদর-তুল্য;—জ্যামিতির যেমন ঋজুরেখা, যন্ত্র-বিজ্ঞানের তেমনি শলাকা বা ধারা; জ্যামিতির যেমন বিন্দু, যন্ত্র-বিজ্ঞানের তেমনি রেণু বা অণু; জ্যামিতির যেমন বৃত্ত, যন্ত্র-বিজ্ঞানের তেমনি চক্র; উভয়ের মধ্যে এ-পিট ও-পিট সম্বন্ধ;—প্রভেদ কেবল এই যে, জ্যামিতির আলোচ্য বিষয়—শূন্য আকাশ-খণ্ড, যন্ত্র-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়—ভৌতিক বস্তু। নব্য অব্দের বিজ্ঞান কিছু আর আকাশ হইতে পড়ে নাই—অবশ্য তাহা পুরাতন অব্দ হইতেই আসিয়াছে; কিন্তু সেই সকল পুরাতন সামগ্রীকে নব্য অব্দ জ্যামিতি এবং যন্ত্র-বিজ্ঞানের সাহায্যে কালোচিত নূতন করিয়া গড়িয়া লইয়া প্রামাণিক বিজ্ঞানের মূল পত্তন করিয়াছে। কাণ্ট্ জ্যামিতি এবং যন্ত্র-বিজ্ঞানের অভ্রান্তির উপরেই তাঁহার বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব সকল দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কাণ্ট্ যদি শঙ্করাচার্য্যের কালে জন্ম গ্রহণ করিতেন, তবে ওরূপ একটা কাণ্ড তাঁহার মনের ত্রিসীমার মধ্যেও স্থান পাইতে পারিত না। ফলেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, শঙ্করাচার্য্যের কোন গ্রন্থের কোন স্থানেই প্রামাণিক বিজ্ঞানের একটি কথারও সাড়া-শব্দ নাই। এরূপ সত্ত্বেও ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, তাঁহার দর্শনের সত্য-নিরূপণ-পদ্ধতি আগাগোড়াই প্রামাণিক পদ্ধতি—সেকেলে শাস্ত্রীয় পদ্ধতি বলিয়া তাহাকে যে, কেহ উড়াইয়া দিবেন, তাহার জো নাই। তিনি উপনিষদাদি শাস্ত্র অবলম্বন করিয়াছেন বটে কিন্তু সে কেবল একটা উপলক্ষ মাত্র;—তিনি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন কথাই বলিতে ইচ্ছা করেন নাই,—যেখানে শাস্ত্রীয় কোন কথার উল্লেখ করিয়াছেন, সেইখানেই তিনি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের অথবা যুক্তির এরূপ একটা আলোক নিক্ষেপ করিয়াছেন যে, সেই আলোকেই গম্য-পথের ঠিকানা পাওয়া যাইতে পারে। শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক রাজসভায়—শাস্ত্র ইংলণ্ডের অধীশ্বরের ন্যায় (সোজা কথায়—সাক্ষী গোপালের ন্যায়) সিংহাসনে উপবিষ্ট; বিচারাদি কার্য্য যাহা নির্ব্বাহ করিবার তাহা দুই মন্ত্রী মিলিয়া নির্ব্বাহ করে; প্রধান মন্ত্রী স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান, দ্বিতীয় মন্ত্রী যুক্তি। ইংলণ্ড-বাসীরা যেমন লোকরক্ষার্থে রাজার মান রক্ষা করিয়া থাকে, শঙ্করাচার্য্য সেইরূপ শাস্ত্রের মান রক্ষা করিয়াছেন—এই পর্য্যন্ত। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ধান্যার্থী যেমন ধান্যের সারাংশ গ্রহণ করিয়া অসার পলাল-অংশ পরিত্যাগ করে, জ্ঞানার্থী সেইরূপ শাস্ত্র-সকলের মধ্য হইতে সারাংশ গ্রহণ করিয়া শাস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিবে।

ক্রমশঃ।

শান্তিনিকেতন।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

জেলা বীরভূমের অন্তর্গত বোলপুরের রেলওয়ে ষ্টেষণের অনতিদূরে ভক্তিভাজন শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "শান্তিনিকেতন" নামক একটি সুন্দর উদ্যান ও উদ্যান মধ্যস্থ শোভাময় পরম রমণীয় প্রকাণ্ড প্রাসাদ আছে। এই উদ্যান বাটির চারি-

দিকেই উন্মুক্ত আকাশ ও সুপ্রশস্ত প্রান্তর। উদ্যানের চতুর্দ্দিকে শাল প্রভৃতি বৃক্ষ শ্রেণী মুক্ত বায়ুতে সদাই ক্রীড়াশীল। উদ্যানে আম, জাম, নারিকেল প্রভৃতি তরুরাজি বিহঙ্গ কূজিত হইয়া সংসার তাপিত হৃদয়ে শান্তিবর্ষণ করিতেছে; নিকটে নির্ম্মল তোয়া সুপ্রশস্ত বাঁধ ও উদ্যান ভিতরে সুগভীর প্রশস্ত ইন্দারা। এই স্থান সাধনার অতীব অনুকূল, যেমন নির্জ্জন, তেমনি শান্তিময় পবিত্র ও রমণীয়। এখানে আসিলে সংসার কোলাহল আপনিই অন্তর্হিত হয়, মানব হৃদয় স্বভাবতই ঈশ্বর চিন্তার জন্য ব্যাকুল হয়। এই নিকেতন যথার্থই শান্তিনিকেতন, ধর্ম্ম পিপাসু নির্জ্জন সাধকের অতি প্রিয় পদার্থ। এই স্থানে পূজ্যপাদ মহর্ষি মহাশয় বহুকাল ঈশ্বরের ধ্যানধারণায় অতিবাহিত করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি এই উদ্যান ও উদ্যান মধ্যস্থ প্রাসাদ প্রভৃতি বহু অর্থব্যয়ে মেরামত ও সুসজ্জিত করিয়া সাধারণের আধ্যাত্মিক কল্যাণোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছেন; এবং এই শান্তিনিকেতনে নিয়মমত ব্রহ্মোপাসনা, ধর্ম্মবিচার, ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন, পুস্তকালয় ও অতিথি সেবার অভিপ্রায়ে, এই সুসজ্জিত শান্তিনিকেতন ও বার্ষিক ১৮০০ শত টাকা আয়ের সম্পত্তি নিঃস্বার্থভাবে কেবল ধর্ম্মার্থে উপযুক্ত ট্রাষ্টীগণের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। এখানে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর এক পরমেশ্বরে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ ঈশ্বরোপাসনা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সাদরে স্থান প্রাপ্ত হইবেন। রাজা জমিদার হইতে দরিদ্র সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত সকল অবস্থার লোকই যাহাতে এখানে পরম যত্নে অবস্থান করিয়া ঈশ্বরোপাসনা ও অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা করিতে পারেন, এই প্রকার সাজ সজ্জা আসবাবাদি ভূরি পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে।

এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিগত ৪ ঠা কার্ত্তিক শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় এক সভা আহূত হয়। শ্রদ্ধাস্পদ সুকবি শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, যিনি ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মোন্নতির জন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স্ আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বহুকাল ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, ইহাঁরা দুই জনে উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। মোহিনী বাবুর বক্তৃতা ও ব্যাখ্যান পাঠ এবং রবীন্দ্র বাবুর প্রাণস্পর্শী সুমধুর সঙ্গীতে সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার মজুমদার মহাশয়ও ২।৪ টি সঙ্গীত করিয়া তৃপ্ত করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে মোহিনী বাবু শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া উপস্থিত বন্ধুগণকে এই স্থানে আসিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করিলেন। বোলপুর রাইপুর সুরুল প্রভৃতি ভদ্রপল্লি হইতে সকল শ্রেণীর প্রায় ২০০ শত ভদ্রলোক আগ্রহের সহিত এই কার্য্যে যোগদিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। ভক্তিভাজন মহর্ষির নামে আকৃষ্ট হইয়া হিন্দু সমাজের সকল শ্রেণীর লোকেই যোগ দিয়াছিলেন। হিন্দু সাধারণের তাঁহার প্রতি অগাধভক্তিই ইহার কারণ। সভাভঙ্গের পর সমাগত বন্ধুগণকে সরবত ও তাম্বুল দিয়া অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল।

পূজ্যপাদ মহর্ষি মহোদয়ের দানশীলতার পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। তিনি জীবনের প্রথম হইতেই বিষয় ব্যাপার হইতে দূরে থাকিয়া পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন আছেন। যাহাতে দেশ মধ্যে ধর্ম্মচিন্তা জাগ্রত হয়, দেশবাসী লোকের মন ধর্ম্মপ্রবণ হয়, সে জন্য সহস্র সহস্র টাকা অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন ও করিতেছেন। তিনি স্বদেশের আধ্যাত্মিক উন্নতির কামনায় সদাই ব্যাকুল, তাই বহু মূল্যের ভূসম্পত্তি ও তাঁহার এই প্রিয় শান্তিনিকেতন, যাহা লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত ও সুসজ্জিত, হইয়াছে কেবল ধর্ম্মোন্নতির জন্য দান করিলেন। এপ্রকার সাধু দৃষ্টান্ত এদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। তাঁহার মহর্ষি নাম সার্থক, পরমেশ্বর তাঁহার শুভ সংকল্প সিদ্ধ করুন।

এই শান্তিনিকেতন আশ্রম দ্বারা এতদ্দেশের ধর্ম্মোন্নতির বিশেষ সাহায্য হইবেক। এই আশ্রম ভক্তিভাজন মহর্ষি মহাশয়ের সাধনভূমি। তাঁহার সাধনাতে এই আশ্রমের প্রত্যেক ধূলিরেণু পবিত্র হইয়াছে। যাঁহারা বিষয়কোলাহলে উদ্ভ্রান্ত, সংসারের শোক দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া আত্মার শান্তি অন্বেষণ করিতেছেন, যাঁহারা ধর্ম্ম পিপাসু ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ও সাধনশীল, পাপতাপের যন্ত্রণা দূর করিতে যাঁহারা যত্নবান, তাঁহারা পবিত্র হৃদয়ে, পূজ্যতম মহর্ষি প্রতিষ্ঠিত এই পবিত্র শান্তি-নিকেতন আশ্রমে আগমন করুন, বিমল আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন, যথার্থ ঋষি-জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইবেন।

পরিশেষে মহর্ষি মহাশয়ের পৌত্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শান্তিনিকেতন আশ্রমের উন্নতিকল্পে অটল অনুরাগ ও গভীর উৎসাহের কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঈশ্বর করুন, তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে এই আশ্রমের যথেষ্ট উন্নতি হউক। শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু দ্বিপেন্দ্র বাবু, মোহিনী বাবু রমণী বাবু প্রভৃতি যাঁহারা এই আশ্রমের উন্নতির জন্য এখানে আগমন করিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা হৃদয়ের সদ্ভাব ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বোলপুর
৬ কার্ত্তিক ৫৯ ব্রাঃ সং } নিবেদক
শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ পৌষ বুধবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার পর বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজের একত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজ
সরস্বতী তীর
১৮১০ শক। } শ্রীমহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
পৌষ ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯।

৫৪৫ সংখ্যা ১৮১০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়মর্ব্বিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত দর্শন।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

এত ক্ষণের পর তবে আমরা বেদান্ত-দর্শনের স্বক্ষেত্রে উপস্থিত; কিন্তু যিনিই যাহা বলুন—এখনো আমরা কাণ্টকে ছাড়িয়া দিতে পারিতেছি না; আমরা দেখিতেছি যে, কাণ্টের দর্শনের মধ্য হইতে বেদান্ত-পথের যেমন স্পষ্ট ঠিকানা পাওয়া যাইতে পারে এমন আর কোথা হইতেও নহে; কাণ্টের দর্শনের মধ্য-হইতে সংশয়ের ইতস্তত-গুলা পরিত্যাগ করিয়া তাহার সার মন্থন করিয়া লইলে তাহাই বেদান্ত হইয়া দাঁড়ায়। কাণ্ট এক জন কলম্বস্ বিশেষ; তিনি বেদান্তের আমেরিকায় ঠিকঠাক উত্তীর্ণ হইলেন; কিন্তু ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে যে, তিনি প্রাণান্তেও ডাঙায় নাবিলেন না; তিনি ডাঙায় নাবিলেই কে যেন তাঁহার জাহাজ কাড়িয়া লইবে! আমরা তাঁহারই জাহাজের কয়েকজন যাত্রী—কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা তাঁহার ন্যায় জাহাজের মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া দম আটকিয়া মারা যাইতে সম্মত নহি; আমরা কূলে অবতরণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় আছি। কাণ্ট বলিতেছেন "খবরদার কূলে নাবিও না—মারা যাইবে।" আমরা দেখিতেছি যে, মারা যদি যাইতেই হয়—তবে জাহাজের বদ্ধ বায়ুতে মারা যাওয়া অপেক্ষা কূলের মুক্ত বায়ুতে মারা যাওয়া পরম শ্রেয়।

যাহাই হৌক্—বেদান্ত-পথের অব্যর্থ সন্ধান কাণ্ট যেমন স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, এমন আর কেহই নহে। কাণ্ট প্রথমে দেখাইয়াছেন যে, সমস্ত বিজ্ঞানের মূলে এই তিনটি অকাট্য মূলতত্ত্ব ধ্রুবরূপে প্রতীয়মান হয়—(১) সমস্ত গুণ-প্রবির্ত্তনের মধ্যে বস্তু অপরিবর্ত্তনীয়, (২) পরিবর্ত্তন মাত্রেরই কারণ অবশ্যম্ভাবী, (৩) যেমন ক্রিয়া তেমনি প্রতিক্রিয়া; তাহার পরে কাণ্ট ঐ তিনটি বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্বের অভ্যন্তরেই পারমার্থিক সত্যের তিনটি সুড়ঙ্গ পথ সন্ধান করিয়া পাইয়াছেন। কিরূপে পাইলেন—তাঁহার অন্বেষণ পদ্ধতি কি রূপ? ইহার উত্তর এই যে, ঐ তিনটি মূলতত্ত্বের প্রয়োগ-পদ্ধতি বিজ্ঞান-রাজ্যে এক রূপ—পরমার্থ-রাজ্যে আর-একরূপ, যথা;—

WORM EATEN.

বিশুদ্ধ জ্ঞানের মূলতত্ত্বকে ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের সহিত—অবিদ্যার সহিত—মিশ্রিত করা, খাঁটি সুবর্ণকে তাম্রের সহিত মিশ্রিত করা, ইহাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি; আমাদের স্বদেশীয় ভাষায় ইহার নাম অন্বয়-পদ্ধতি (অর্থাৎ সংযোগ-পদ্ধতি)—ইউরোপীয় ভাষায় method of synthesis; আর, বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব হইতে অবিদ্যা-অংশ বর্জ্জিত করিয়া তাহার বিশুদ্ধ অংশটি ছাঁকিয়া লওয়া, সোণার মোহর হইতে তাঁবা বাদ দিয়া খাঁটি সোণা বাহির করিয়া লওয়া, ইহাই পারমার্থিক পদ্ধতি; আমাদের স্বদেশীয় ভাষায় ইহার নাম ব্যতিরেক-পদ্ধতি বা বিবেক-পদ্ধতি—ইউরোপীয় ভাষায় method of analysis। কাণ্ট অন্বয়-পদ্ধতিটিরই—সবিশেষ রসজ্ঞ; বিবেক-পদ্ধতিটি বড় একটা তাঁহার মনঃপূত নহে। কাণ্টের মনোগত ভাব এই যে খাঁটি সুবর্ণ তো আছেই—বাড়ার ভাগ তাহার সঙ্গে যদি তাম্র মিশ্রিত থাকে, তবে সে তো এক্টা উপরিলাভ—তাহা ছাড়ি কেন? এই ভাবিয়া তিনি পারমার্থিক রাজ্যেও অন্বয়-পদ্ধতি খাটাইতে নিতান্তই ইচ্ছুক,—যখন দেখিলেন যে, তাহা কোন-ক্রমেই হইবার নহে—তখন তিনি পারমার্থিক সত্যের অনুশীলনে বিশেষ কোন লভ্য দেখিতে না পাইয়া বিজ্ঞানের উপদ্বীপে ফিরিয়া আইলেন—ও সেইখানেই রীতিমত আড্ডা গাড়িয়া বসিলেন। আমাদের দেশের দর্শন-কারদিগের মনের ভাব আর একরূপ; তাহা এই যে, চিনির সঙ্গে বালি মিশাইলে—বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে অবিদ্যা মিশাইলে—তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন লভ্য কিছুই নাই; কেননা, এক তো বালির নিজের কোন মূল্য নাই, তাহাতে আবার তাহা চিনির মূল্য কমাইয়া দেয়; অতএব চিনিকে বালি হইতে পৃথক্ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পারমার্থিক তত্ত্ব নিরূপণের সময় আমাদের দেশের দর্শনকারেরা আহ্লাদের সহিত বিবেক-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন; কাণ্ট অগত্যা তাহা করিতে বাধ্য হইয়াছেন; এই জন্যই পারমার্থিক সত্যের প্রতি কাণ্টের এত অনাস্থা। কিন্তু আপাতত আমরা কাণ্টের অনাস্থা দ্বৈধ এবং সংশয়—এ সব ব্যাপার ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনিব না—তাঁহার মূল কথাটিতেই কেবল আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করিব।

আমরা দেখিতেছি যে, বৈজ্ঞানিক সত্যের অনুশীলন-কালেই অন্বয় এবং ব্যতিরেক এই দুইটি পদ্ধতি দুইটি বিভিন্ন স্থলে—একটি একরূপ স্থলে এবং আর-একটি আর একরূপ স্থলে—অবলম্বনীয়; যথা;—যখন আমি অশ্বের সাধারণ তত্ত্বগুলির পরিচয় লাভ করিতে ইচ্ছা করি, তখন আমি বিশেষ বিশেষ জাতীয় অশ্বের (যেমন আরব অশ্বের, বর্মা অশ্বের, তাতার অশ্বের) বিশেষ বিশেষ লক্ষণ-গুলি বর্জ্জন করিয়া, অশ্ব-জাতির সাধারণ লক্ষণ-গুলিই গ্রহণ করি; ইহারই নাম ব্যতিরেক-পদ্ধতি। কিন্তু যখন আমি আরব অশ্বের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় লাভ করিতে ইচ্ছা করি, তখন অশ্ব-জাতির সাধারণ লক্ষণের সঙ্গে আরব-অশ্বের বিশেষ লক্ষণ-গুলি সংযুক্ত করিয়া আরব অশ্বের বিশেষত্ব অবধারণ করি; ইহারই নাম অন্বয়-পদ্ধতি। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, একরূপ স্থলে আমরা ব্যতিরেক-পদ্ধতি অবলম্বন করি—আর-একরূপ স্থলে অন্বয় পদ্ধতি অবলম্বন করি। বৈজ্ঞানিক সত্যের বেলায় তো এইরূপ—কিন্তু পারমার্থিক সত্যের বেলায় উভয়-পদ্ধতিই যুগপৎ (অর্থাৎ এক সঙ্গে) অবলম্বনীয়, যথা;—ব্যতিরেক-পদ্ধতি অনুসারে জ্ঞান

হইতে অজ্ঞানকে সমূলে বর্জ্জন করিয়া যখনই আমরা ধ্যানে পাই যে, পরমাত্মা জ্ঞান-স্বরূপ; তখনই অন্বয়-পদ্ধতি অনুসারে সেই জ্ঞানকে সমস্ত জগতের সহিত সংযুক্ত করিয়া প্রাপ্ত হই যে, পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ। এইরূপ করিয়াই আমরা পাই যে, পরমাত্মা অনু হইতেও অণু, অথচ মহৎ হইতেও মহৎ; তিনি নির্গুণ অথচ সর্ব্বগুণে গুণী; তিনি নির্লিপ্ত অথচ সর্ব্বাধ্যক্ষ; ইত্যাদি। ও-দুটি এমনি একাত্মা যে, পারমার্থিক সত্যের অনুসন্ধান-কালে কাণ্ট অন্বয়-পদ্ধতির ভক্ত হইয়াও প্রকারান্তরে ব্যতিরেক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন; এবং বেদান্ত দর্শন ব্যতিরেক পদ্ধতির ভক্ত হইয়াও প্রকারান্তরে অন্বয়-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন;—কেননা, পারমার্থিক রাজ্যে ও-দুইটি পদ্ধতি যমক সহোদর—এ পিট ও পট। পারমার্থিক অনুসন্ধান পদ্ধতির আর-একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, এখানে অন্বয় এবং ব্যতিরেক উভয়েরই ঐকান্তিক পরাকাষ্ঠা ভিন্ন অল্প কিছুতেই চলিতে পারে না;—ব্যতিরেক-পদ্ধতিরও যেমন পরাকাষ্ঠা, অন্বয়-পদ্ধতিরও তেমনি পরাকাষ্ঠা; অণুর বেলায় অণু হইতে অণুতম—মহতের বেলায় মহৎ হইতে মহত্তম। এই রূপ ঐকান্তিক অন্বয়-ব্যতিরেক বিশুদ্ধ জ্ঞানের একটি স্বহস্তের কার্য্য, এজন্য তাহার উপরে কাহারো কোন কথা চলিতে পারে না। কেননা, বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রমাণ বিশুদ্ধ জ্ঞান নিজেই—তা ভিন্ন তাহার অন্য কোন প্রমাণ সম্ভবে না; তাই শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে,

"মানং প্রবোধয়ন্তং বোধং যে মানেন বুভুৎসন্তে।
এধোভিরেব দহনং দগ্ধুং বাঞ্ছন্তি তে মহাসুধিয়ঃ।"

ইহার অর্থ এই যে, যে জ্ঞান প্রমাণের প্রমাণত্ব সাধন করে, তাহাকে যাঁহারা প্রমাণ দ্বারা বুঝিতে চা'ন, সেই সকল মহাপণ্ডিতেরা করেন আর কিছু নয়—যে অগ্নি কাষ্ঠকে দহন করে, সেই অগ্নিকে কাষ্ঠ দিয়া দহন করিতে চা'ন। বিশুদ্ধ জ্ঞানের ঐকান্তিক অন্বয়-ব্যতিরেক এমনি স্বতঃসিদ্ধ যে, তাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানের নিশ্বাস-প্রশ্বাস বলিলেই হয়। কাণ্ট ঐকান্তিক অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা বস্তু গুণের মূলতত্ত্ব শোধন করিয়া পাইয়াছেন যে, আত্মা নির্গুণ বস্তু-স্বরূপ অথচ সমস্ত মানসিক গুণের আধার; কার্য্য-কারণের মূল-তত্ত্বকে ঐরূপে শোধন করিয়া পাইয়াছেন যে, ঈশ্বর কালাতীত স্বয়ম্ভু অনাদি পুরুষ অথচ সমস্ত জগতের আদি-কারণ; ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মূল-তত্ত্বকে ঐরূপে শোধন করিয়া পাইয়াছেন যে পরমাত্মা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াময় সর্ব্বজগতেরই মূলাধার অথচ প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরেই অনুপ্রবিষ্ট।

এই তো গেল পথের বৃত্তান্ত—তা ছাড়া, পথের কোন্ স্থান হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া কোন স্থানে পৌঁছিতে হইবে, কাণ্ট তাহারও একটি ধারাবাহিক ক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা,—

"There is in the progression from our knowledge of ourselves (the soul) to a knowledge of the world and through it to a knowledge of the supreme being, something so natural that it looks like the logical progression of reason from premisses to a conclusion. ইহার অর্থ;—আত্মজ্ঞান হইতে বিশ্ব-জ্ঞানে এবং বিশ্ব-জ্ঞান হইতে পরমাত্ম-জ্ঞানে উপসংক্রমণের যে একটি পদ্ধতি, তাহা এমনি স্বাভাবিক যে, দেখিতে দেখায় ঠিক্ যেন—ন্যায় শাস্ত্রের যুক্তি-পদ্ধতি সাধন হইতে সিদ্ধির দিকে ক্রমে ক্রমে পা বাড়াইতেছে।

কিন্তু হইলে হইবে কি—কাণ্ট সংশয়ের ধূলি উড়াইয়া তাঁহার ঐ পথের আ-

দ্যোপান্ত সমস্তই তিমিরাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন—সেই ধূলি-রাশি অপসারিত করিয়া অনেক কষ্টে তবে আমরা পথটির অন্ধি-সন্ধি পাইয়াছি,—যাহা পাইয়াছি তাহা আমরা যত পারি সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

কাণ্টের অভিপ্রায় এই যে, প্রথমে বস্তু-গণ, তাহার পরে কার্য্য-কারণ, তাহার পরে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া—এই তিনটি তত্ত্ব উত্তরোত্তর ক্রমে অবলম্বন করিয়া আমরা অত্ম-তত্ত্ব হইতে প্রকৃতি-তত্ত্বে এবং প্রকৃতি-তত্ত্ব হইতে পরমাত্ম-তত্ত্বে উপনীত হই, যথা ;—মনে কর প্রথমে আমরা পৃথিবীকে একটি বস্তু বলিয়া অবধারণ করিলাম ; ক্রমে দেখিতে পাইলাম যে, পৃথিবী আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে—তাহা সূর্য্য হইতে উদ্ভূত এবং সূর্য্যের আকর্ষণে বিধৃত; অতএব, গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্য সমস্ত ধরিয়া তবেই তাহা একটি সমগ্র বস্তু; পৃথিবী কেবল তাহার একটি অঙ্গ—এই পর্য্যন্ত ; তা' ভিন্ন—সমগ্র বস্তুর ভাব পৃথিবীতে পাওয়া যাইতে পারে না। অতএব সমগ্র বস্তুর ভাব যাহা আমাদের অন্তরে আছে—তাহার মতো একটি সর্ব্বাঙ্গীন বস্তু আমরা প্রকৃতি-রাজ্যে কুত্রাপি দেখিতে পাই না ; যাহাকেই আমরা বস্তু বলিয়া ধরি—তাহারই নিকটে শুনি যে, "আমার বস্তু আমাতে নাই—আমি আমাতে নাই ;" পৃথিবী বলে যে, আমার বস্তু সূর্য্যে রহিয়াছে, সূর্য্য আবার আর-এক সূর্য্যকে দেখাইয়া দেয় ;—পেয়াদার নিকটে যাই সে পেক্ষারকে দেখাইয়া দেয়—পেক্ষারের নিকটে যাই সে নায়েবকে দেখাইয়া দেয়,—নায়েবের নিকটে যাই সে জমিদারকে দেখাইয়া দেয়—ক্রমাগতই এইরূপ ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে জিজ্ঞাসার চালান ইইতে থাকে, কোথাও আর কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। ইহাতে এইরূপ পাওয়া যাইতেছে যে, সমগ্র বস্তুর একটি ভাব আমাদের আত্মাতে আছে বটে কিন্তু তাহা ভাবমাত্র—সে ভাবের অনুরূপ একটিও বস্তু প্রকৃতি-রাজ্যের কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুর ভাব যাহা আমাদের অন্তরে আছে, তাহা অবশ্য বস্তুর সত্তাকে আকাঙ্ক্ষা করে ; এই জন্য প্রকৃত বস্তুকে কোথাও দেখিতে না পাইলেও আমরা আমাদের অন্তরস্থিত বস্তু-ভাবের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য—যাহাকে সম্মুখে পাই তাহাকেই বস্তু বলিয়া অবধারণ করি—দুধের সাধ ঘোলে মিটাই। বেদান্ত-দর্শনের মতে এটা এক প্রকার পুত্তলিকার বিবাহ দেওয়া ; পুত্তলিকার বিবাহ যেমন মিথ্যা বিবাহ—যাহাকে আমরা সচরাচর বস্তু বলিয়া অবধারণ করি তাহাও সেইরূপ মিথ্যা বস্তু। সত্য বস্তু তবে কি ? আপাততঃ পৃথিবীকেই সমগ্র একটি বস্তু বলিয়া অবধারণ করা যা'ক্ ; এখন, এই পৃথিবীর সঙ্গে অবশিষ্ট সমস্ত জগতেরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে—তাহা এরূপ যে, পৃথিবীর যদি একটি রেণু-কণা বিকম্পিত হয়—তবে সেই সূত্রে সমস্ত জগৎ ন্যূনাধিক পরিমাণে বিকম্পিত হইবেই হইবে। সমস্ত জগতের সহিত পৃথিবীর এই যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ইহা পৃথিবীর অভ্যন্তরেই চলিতেছে ; এইজন্য এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটিকে যদি হস্তের অভ্যন্তরে পাওয়া যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর অভ্যন্তরেই সমস্ত জগৎকে প্রাপ্ত হওয়া যায়—ও সমস্ত জগতের অভ্যন্তরে একই পরম বস্তুর উপলব্ধি হয় ; তাহা হইলে যে বস্তুকে আমরা অন্বেষণ করিতেছিলাম সেই বস্তু আমাদের হস্তগত হয়।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, আমাদের অন্তরে বস্তুর ভাব যাহা বিদ্যমান আছে—সমস্ত জগতের মূলাধারকে প্রাপ্ত হইলে তবেই তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে ; আর, তাহা হইলেই পাওয়া যায় যে, যিনি সমস্ত জগতের মূলাধার পরব্রহ্ম তিনিই প্রকৃতির মূল-কারণ পরমেশ্বর এবং তিনিই আত্মার অন্তরাত্মা পরমাত্মা। এখানকার প্রকৃত মর্ম্ম-কথাটি এই ;—প্রথমে বস্তু-জিজ্ঞাসা ; কাণ্ট্ বলেন যে, বস্তুর ভাব-একটি আমাদের আছে বটে কিন্তু তাহা বস্তুর জ্ঞান নহে ; "বস্তুর ভাব" না বলিয়া যদি "বস্তু-জিজ্ঞাসা" বলা যায়, তাহা হইলে কাণ্টের ঐ কথাটি সকলেরই সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে ; কেননা, "বস্তু জিজ্ঞাসা" বলিবা-মাত্রই বুঝায় যে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তির মনে বস্তুর ভাব একটি আছে কিন্তু বস্তু-জ্ঞান এখনো হয় নাই ; কেননা এক দিকে যেমন বস্তুর ভাব না থাকিলে বস্তু-জিজ্ঞাসা উদিত হইতে পারে না, আর-এক দিকে তেমনি বস্তু-জ্ঞানের অভাব না থাকিলেও বস্তু-জিজ্ঞাসার কোন অর্থ হইতে পারে না ; অতএব কাণ্টের এই যে একটি কথা—যে, বস্তুর ভাব এবং বস্তু-জ্ঞানের অভাব, ইহার ল্যাজা মুড়া একত্র করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা আর কিছু নয়—বস্তু-জিজ্ঞাসা। "বস্তু-জিজ্ঞাসা" বলিবা-মাত্রই জিজ্ঞাসুর অস্তিত্ব—জীবাত্মার অস্তিত্ব—প্রতিপন্ন হয় ; অতএব বস্তুর ভাব এবং বস্তু-জ্ঞানের অভাব যাহা আমাদের আছে, তাহাতেই জীবাত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। তাহার পরে বস্তু-ভ্রম ; যেমন, প্রথমে পৃথিবীকে বস্তু বলিয়া ভ্রম হয়—পৃথিবী সূর্য্যকে দেখাইয়া দেয় ;—সূর্য্য আবার আর-এক সূর্য্যকে দেখাইয়া দেয় ; ইত্যাদি ;—এইরূপ বিফল পরিভ্রমণকেই ভ্রম বলে—ভ্রান্তি বলে ; ইহাতেই কার্য্যের কারণ, তাহার কারণ, তস্য কারণ, এইরূপ কার্য্য-কারণময় প্রকৃতির আপেক্ষিক অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। তাহার পরে বস্তু-জ্ঞান ; ইহাতে প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে সমস্ত বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সেই সূত্রে সমস্ত জগতের ঐক্য-বন্ধন প্রতীয়মান হয় ; আর, তাহাতেই প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে সর্ব্বজগতের মূলাধারকে পাইয়া আমাদের অন্তরস্থিত বস্তু-ভাবের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়। এইরূপে, একদিকে আমরা বস্তুর ভাব হইতে কার্য্য-কারণময় নানা বস্তুতে এবং নানা বস্তু হইতে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াময় সমস্ত জগতে এবং সেই সূত্রে সর্ব্ব-মূলাধার পরম পুরুষে উপনীত হই; আর-এক দিকে বস্তু-জিজ্ঞাসা হইতে বস্তু-ভ্রমে এবং বস্তু-ভ্রম হইতে বস্তু-জ্ঞানে উপনীত হই; জীবাত্মা হইতে প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি হইতে পরমাত্মাতে উপনীত হই।

কাণ্টের পথ অনুসরণ করিয়া চরমে আমরা এইরূপ পাইতেছি যে, সত্য জিজ্ঞাসা—জীবাত্মার অস্তিত্বের সাক্ষাৎ পরিচায়ক ; সত্য-ভ্রম প্রকৃতির অস্তিত্বের সাক্ষাৎ পরিচায়ক ; এবং সত্যজ্ঞান পরমাত্মার অস্তিত্বের সাক্ষাৎ পরিচায়ক। আরো এই যে, সত্য জিজ্ঞাসার আড়ালে সত্য-জ্ঞান লুকাইয়া রহিয়াছে এবং লুকাইয়া থাকিয়া সত্য জিজ্ঞাসাকে উস্কাইয়া দিতেছে। সত্য-জিজ্ঞাসা একটি হরিণ; তাহার নাভিতেই কস্তূরি (সত্যজ্ঞান) রহিয়াছে; হরিণটি সেই কস্তূরির গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া সমস্ত বনময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—ভ্রমারণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; যখন কোথাও তাহার সন্ধান না পাইয়া অবশেষে হতাশ

হইয়া বসিয়া পড়ে—তখন সত্যজ্ঞান তাহার তৃষিত নয়নে আবির্ভূত হয়; মেদিনী গ্রীষ্মতাপে উত্তপ্ত হইলে, তবেই বর্ষার বারিধারা আসিয়া তাহার সমস্ত তাপ দূর করিয়া দেয়। কাণ্টের দর্শন-গ্রন্থ ইহার একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ;—কাণ্টের দর্শনের গোড়ার কথাটিতেই বেদান্তের এই তত্ত্বটি বীজ-ভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে যে, সর্ব্ব-মূলাধার পরমাত্মাই পরাকাষ্ঠা পারমার্থিক সত্য, অথচ—কাণ্ট তাহা দেখিয়াও দেখেন নাই; এই জন্য তাঁহার গ্রন্থের শেষ-ভাগে যখন তিনি ঐ তত্ত্বটিকে প্রকাশ্যে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিলেন, তখন তিনি তাহার মূল খুঁজিয়া না পাইয়া বিষম এক ধন্দচক্রে নিপতিত হইলেন,—তাঁহার নাভিতেই যে কস্তুরি রহিয়াছে ইহা তিনি একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গেলেন। কাণ্টের দর্শন যদি তেমন একজন পাকা বারিষ্টারের আড় প্রশ্নোত্তরের (Cross examination এর) পাল্লায় পড়ে, তবে তাহার সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়, যথা;—

বারিষ্টারের প্রশ্ন। তুমি এ কথা বলিয়াছ—যে, ইন্দ্রিয়াভ্যন্তরে কোন একটা বহির্বস্তুর গুণ-সঞ্চার হইলে ধীশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া সেই বহির্বস্তুকে আপনার আয়ত্তাভ্যন্তরে আনিতে যায়?

কাণ্টের উত্তর। হাঁ উহা আমারই কথা বটে।

প্রশ্ন। তুমি আর-এক স্থানে এ কথা বলিয়াছ যে, আমরা যাহাকে বহির্বস্তু বলি তাহা জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার—জ্ঞান-ছাড়া তাহা কিছুই নহে? এরূপ কথা বলিয়াছ কি না?

উত্তর। আমি এই বলিয়াছি যে, আমরা যাহাকে বস্তু বলি তাহা আমাদের জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার। বাহির হইতে গুণ-পরম্পরা একটি-একটি করিয়া ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়—আমাদের ধীশক্তি জাগ্রত হইয়া সেই-সমস্ত বিচ্ছিন্ন গুণ-পরম্পরার মোট বাঁধিয়া সমস্তটা এক যোগে গ্রহণ করে, আর এইরূপ স্থির করে যে, সে-যাহা সে গ্রহণ করিল তাহা শুদ্ধ কেবল গুণ-সমষ্টি, কিন্তু তাহার মূলে বস্তু কোন-না-কোন অবশ্যই আছে,—কিন্তু সেই যে,বস্তু,তাহা ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে অনুপস্থিত,—ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে গুণই কেবল উপস্থিত; বস্তু ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে অনুপস্থিত—অথচ আমাদের জ্ঞানের ইহা একটি ধ্রুব তত্ত্ব যে, তাহা আছেই আছে—তাহা না থাকিলেই নয়। তাই বলি যে, বস্তু-তত্ত্ব শুদ্ধ কেবল আমাদের জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার, প্রত্যয়েরই ব্যাপার, তাহা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নহে—বহির্ব্যাপার নহে। ইহার একটি উদাহরণ;—মনে কর "ঈ" এই ধ্বনিটি উচ্চারণ করিতে ঠিক্ দুই মুহূর্ত্ত সময় লাগে; আর, মনে কর সেই ঈ-ধ্বনিটি আমার কর্ণে উপস্থিত হইল। দুই মুহূর্ত্ত ধরিয়া ঈ ধ্বনিত হইল; সুতরাং প্রথম মুহূর্ত্তে সমস্ত ঈ-ধ্বনি নহে—তখন শুদ্ধ কেবল "ই" এইটুকু উপস্থিত হইয়াই চলিয়া গেল এবং দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে সেইরূপ আর একটি "ই" উপস্থিত হইল; অতএব আমাদের ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে কোন মুহূর্ত্তেই সমগ্র ঈ-ধ্বনি (দীর্ঘঈ) উপস্থিত হয় নাই—দুই মুহূর্ত্তে দুইটি "ই" (হ্রস্বই) পরে পরে উপস্থিত হইল—এই পর্য্যন্ত। ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে যখন দুই মুহূর্ত্তে দুইটি হ্রস্ব ই ক্রমান্বয়ে উপস্থিত হইল—জ্ঞান তখন কি করিল? না সেই দুইটি হ্রস্বই'র মোট বাঁধিয়া একটি দীর্ঘ ঈ গড়িয়া তুলিল; এই রূপ দেখা যাইতেছে যে ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে

একটি হ্রস্ব ই উপস্থিত হইয়াই চলিয়া গেল এবং তথায় আর একটি হ্রস্ব ই উপস্থিত হইল—এই মাত্র; সমগ্র দীর্ঘ ঈ কোন কালেই ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় নাই; সুতরাং সমগ্র দীর্ঘ ঈ জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার—তাহা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নহে। তা শুধু নয়—ধরিতে গেলে হ্রস্ব ই দুইটিও জ্ঞানেরই গড়িয়া-তোলা জিনিস্। কেননা, দুই মুহূর্ত্তে যেমন দীর্ঘ ঈ বাহির হইয়াছে, এক মুহূর্ত্তে তেমনি হ্রস্ব ই বাহির হইয়াছে; অর্দ্ধ-মুহূর্ত্তে হ্রস্ব ই অপেক্ষাও হ্রস্বতর ই বাহির হইয়াছে—সন্দেহ নাই; অতএব, জ্ঞান যেমন দুই হ্রস্বই'র মোট বাঁধিয়া এক দীর্ঘ ঈ গড়িয়া তুলিয়াছে—তেমনি দুই হ্রস্বতর ই জুড়িয়া এক হ্রস্ব ই গড়িয়া তুলিয়াছে। এইরূপ উত্তরোত্তর ক্রমে, দীর্ঘ ঈ ধরিতে গেলে হ্রস্ব ই আইসে—হ্রস্ব ই ধরিতে গেলে হ্রস্বতর ই আইসে—হ্রস্বতর ই ধরিতে গেলে আরো হ্রস্বতর ই আইসে—ঈ-ধ্বনির মূলান্বেষণ অবশেষে হ্রস্বতম ই'তে গিয়া ঠেকে; কিন্তু হ্রস্বতম ই ধরিতে ছুঁইতে পাইবার বস্তু নহে—জ্যামিতিক বিন্দুর ন্যায় তাহা শুদ্ধ কেবল জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার। ব্যাপারটি ঠিক্—"ছিল টেঁকি হ'ল তুল, কাটিতে কাটিতে নির্ম্মূল!" অতএব নিছক যাহা ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, তাহা কিছুই না বলিলেই হয়; ঐন্দ্রিয়ক গুণ-পরম্পরাকে জ্ঞান যখন নিজ-গুণে—হ্রস্ব ই বা দীর্ঘ ঈ বা একটা কোন কিছু করিয়া গড়িয়া তোলে তখনই তাহা জ্ঞানের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু জ্ঞানের সেই যে বিষয় (যেমন ঈধ্বনি) তাহা ঐন্দ্রিয়ক গুণ-পরম্পরারই সমষ্টি-বন্ধন; ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে কেবল গুণই উপস্থিত হইয়াছে (যেমন হ ই) তাহা ছাড়া আর কিছুই উপস্থিত হয় নাই; অতএব ইহা নিঃসংশয় যে, ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের অভ্যন্তরে "বস্তু" যাহা আমরা অবধারন করি, তাহাতে ইন্দ্রিয়ের আদবেই কোন হস্ত নাই—তাহা নিছক জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার।

প্রশ্ন। তুমি বলিতেছ যে, আমরা যাহাকে বস্তু বলি তাহা আমাদের জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার; এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে, সেরূপ জ্ঞান-গত বস্তু ছাড়া জ্ঞানাতীত বস্তু আছে কি না? ইহার তুমি কি উত্তর দেও?

উত্তর। জ্ঞানাতীত বস্তু আছে কি না তাহা আমি জানি না; কেন না, মনে কর যেন তাহা বাস্তবিকই আছে—কিন্তু তাহা আমার জ্ঞানাতীত, সুতরাং তাহার থাকা-না-থাকা বিষয়ে আমি হাঁ কি না কোন কথাই বলিতে পারি না।

প্রশ্ন। জ্ঞানাতীত বস্তু আছে কি না তাহাই যেন তুমি জান না, কিন্তু জ্ঞানাতীত বস্তু কার্য্য করে—এটা অবশ্য তুমি জান?

কাণ্ট। এ আবার কিরূপ প্রশ্ন! আছে কি নাই—তাহাই যখন আমি জানি না, তখন তাহা কার্য্য করে কি করে না তাহা আমি কিরূপে জানিব? তোমার সন্তোষের জন্যই হউক্, বা আমার আপনার মনকে প্রবোধ দিবার জন্যই হউক—আমি যেন বলিলাম যে, তাহা কার্য্য করে; কিন্তু তাহা আছে কি নাই তাহা আমি জানি না—সম্ভবতঃ এমনও হইতে পারে যে, তাহা মূলেই নাই, তাহা যদি হয় তবে আমার সে কথা কোথায় রহিল? যে—কার্য্য করিবে সে নাই অথচ আমি বলিতেছি যে, সে কার্য্য করিতেছে! ইহা অপেক্ষা হাস্য জনক ব্যাপার আর কি

আছে? অতএব আমি যখন বলিলাম যে, আছে কি নাই তাহা আমি জানি না, তখন তাহাতেই তোমার বুঝা উচিত ছিল যে, কার্য্য করে কি করে না তাহাও আমি জানি না।

প্রশ্ন। জ্ঞানাতীত বস্তু আছে কি নাই তাহাও তুমি জান না, কার্য্য করে কি করে না তাহাও তুমি জান না; কিন্তু এটা তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, বহির্বস্তু কার্য্য করে; কেন না তুমি গোড়াতেই বলিয়াছ যে, বহির্বস্তু ইন্দ্রিয়ের উপর কার্য্য করিয়া তোমার জ্ঞানকে জাগাইয়া তোলে। জ্ঞানাতীত বস্তু কার্য্য করে কি করে না—এইটিই তুমি জান না; কিন্তু বহির্বস্তু কার্য্য করে—এটা তুমি বিলক্ষণই জান;—তবেই হইতেছে যে, তুমি যাহাকে বহির্বস্তু বলিতেছ তাহা জ্ঞানাতীত বস্তু নহে। আবার, ইহাও তুমি বলিয়াছ যে, সেই যে বহির্বস্তু, যাহা তোমার ইন্দ্রিয়ের উপরে কার্য্য-করে, তাহা তোমার ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় না; সুতরাং তাহা তোমার ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নহে; তাহা জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার। কেননা তুমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছ যে, ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে বস্তু উপস্থিত হয় না—গুণই উপস্থিত হয়। তা শুধু নয়—তোমার কথা অনুসারে আরো এইরূপ দাঁড়ায় যে, গুণের মোট-বন্ধন-কার্য্যেও জ্ঞানের বিলক্ষণ হস্ত রহিয়াছে, অতএব ধরিতে গেলে—গুণও জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার; কিন্তু সে কথা এখন যাইতে দেও। এখন কেবল বস্তুর কথা হইতেছে। তোমার চরম সিদ্ধান্ত তবে এই;—বহির্বস্তু ইন্দ্রিয়ের উপরে কার্য্য করে; আর, সেই যে বহির্বস্তু যাহা ইন্দ্রিয়ের উপরে কার্য্য করে, তাহা জ্ঞানের নিজেরই একটি ব্যাপার। তবেই হইতেছে যে, সেই যে বহির্বস্তু যাহা তোমার জ্ঞানের নিজেরই একটি ব্যাপার তাহাই তোমার ইন্দ্রিয়ের উপরে কার্য্য করিয়া তোমার প্রসুপ্ত জ্ঞানকে জাগ্রত করিয়া তুলে। এখন কথা হচ্চে এই যে, তোমার জ্ঞান যদি গোড়াগুড়িই জাগ্রত থাকে, তবে তাহাকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য অন্য কিছুর সাহায্য আবশ্যক হয় না; আর, তোমার জ্ঞান যদি প্রসুপ্ত থাকে, তবে তাহার নিজেরই একটি ব্যাপার কিরূপে তাহাকে জাগাইবে? প্রসুপ্ত জ্ঞানের "ব্যাপার" আবার কি? ব্যাপার বন্ধ থাকা'র নামই তো প্রসুপ্তি। প্রসুপ্ত জ্ঞান (ব্যাপার খরচ করিয়া) কিরূপেই বা আপনাকে আপনি জাগাইবে? তুমি যখন নিদ্রায় অভিভূত, তখন কি তুমি আপনাকে আপনি জাগাইতে পার—না তুমি পড়িয়া গেলে আপনাকে আপনি স্কন্ধে করিয়া উঠাইতে পার? ইহা সুনিশ্চিত যে, প্রসুপ্ত ব্যক্তি নিজের কোন ব্যাপার দ্বারা আপনাকে আপনি জাগাইয়া তুলিতে পারে না। কিন্তু তুমি বলিতেছ যে, বহির্বস্তু—যাহা তোমার জ্ঞানের (প্রসুপ্ত জ্ঞানের) নিজেরই একটি ব্যাপার, তাহাই তোমার প্রসুপ্ত জ্ঞানকে জাগাইয়া তোলে! এটা কিরূপে সম্ভবে?

কাণ্ট যে ইহার কি উত্তর দিবেন—আমরা তো তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমরা বেদান্তের কূলে নিরাপদে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতেছি যে, কাণ্ট এত কিনারায় আসিয়াছেন যে, ডাঙায় উঠিলেই হয়; তাহা না করিয়া তিনি শুধু শুধু অনর্থক-সাধ করিয়া—সংশয়ের তুমুল তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছেন। গোড়াতে কাণ্ট এই কথা বলিলেই সমস্ত বিবাদ মিটিয়া যাইত যে, বস্তুতত্ত্ব সর্ব্ববাদি সম্মত—অতএব তাহা যে,

শুধু কেবল তোমার জ্ঞানের একটি ব্যাপার বা আমার জ্ঞানের একটি ব্যাপার—তাহা নহে, তবে কি? না তাহা সর্ব্বসাধারণতঃ জ্ঞানের একটি ব্যাপার, তাহা সর্ব্বজ্ঞানের ব্যাপার; প্রত্যেক জ্ঞানের অভ্যন্তরেই সর্ব্বজ্ঞানের কার্য্য চলিতেছে; প্রসুপ্ত জ্ঞানের অভ্যন্তরেও সর্ব্বজ্ঞান জাগ্রত রহিয়াছে—অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ জাগ্রত আছেন।

"য এষ সুপ্তেষু সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃত মুচ্যতে তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।"—কঠোপনিষদ্।

ইহার অর্থ;—সুপ্তেতে সুপ্তেতে জাগ্রত থাকিয়া যিনি সকলেরই প্রয়োজনীয় বিষয়-সকল নির্ম্মাণ করেন তিনিই শুক্র তিনিই ব্রহ্ম তিনিই অমৃত বলিয়া উক্ত হ'ন; সর্ব্বজগৎই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব যেখানে যত বস্তু আছে সমস্তই সেই সর্ব্বজ্ঞানেরই ব্যাপার; সর্ব্বজ্ঞানই প্রসুপ্ত ব্যষ্টি-জ্ঞানকে (জীবাত্মার পরিমিত জ্ঞানকে) জাগাইয়া তুলিবার মূলাধার। যদি বল যে, তুমি সর্ব্বজ্ঞানকে কিরূপে জানিলে? তবে তাহার উত্তর এই যে, আমি এই যে ব্যষ্টি জ্ঞান—আমি সর্ব্বজ্ঞানেরই অংশ,—এই সম্পর্ক-সূত্রে আমি সর্ব্বজ্ঞানকে জানিতেছি। যেমন খণ্ড আকাশ দেখিবা-মাত্র আমি অসীম মহাকাশকে সেই সূত্রে উপলব্ধি করি,—সেইরূপ, ব্যষ্টি জ্ঞানের অভ্যন্তরে সর্ব্বজ্ঞান উপলব্ধি করি। আমাদের ব্যষ্টি-জ্ঞানের অভ্যন্তরেই যে, সর্ব্বজ্ঞান জাগ্রত রহিয়াছে—ব্যক্তিগত জ্ঞানের (limited experienceএর) অভ্যন্তরেই যে, সার্ব্বভৌমিক নির্ব্বিকল্প জ্ঞান ভিতরে ভিতরে জাগিতেছে,—কাণ্টের সমস্ত গ্রন্থ আদ্যোপান্ত জুড়িয়া তাহার একটি অকাট্য প্রমাণ। কেননা, কাণ্টের সমস্ত মূলতত্ত্ব-গুলিই সার্ব্বভৌমিক এবং নির্ব্বিকল্প—একটিও ব্যক্তিগত নহে। ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জীবের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের অভ্যন্তরে সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম—জাগ্রত রহিয়াছেন। ইহাই বেদান্ত। আমাদের এখানকার মন্তব্য কথাটি সংক্ষেপে এই;—

প্রথমে, সত্য-জিজ্ঞাসা; মূল-সত্য কি—ইহার অন্বেষণ। জিজ্ঞাসা কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? জ্ঞানের অভাব-বোধ হইতে। জিজ্ঞাসা হয় না কাহার? না প্রথমতঃ যাহার মূলেই জ্ঞান নাই তাহার; দ্বিতীয়তঃ যাহার জ্ঞানের অভাব-বোধ নাই তাহার। জিজ্ঞাসাতে কি প্রকাশ পায়? এই প্রকাশ পায় যে, জ্ঞানও আছে—জ্ঞানের অভাব-বোধও আছে; জিজ্ঞাসাতে জ্ঞানাজ্ঞান প্রকাশ পায়—অল্প-জ্ঞান প্রকাশ পায়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সত্য-জিজ্ঞাসা অল্পজ্ঞ জীবের অস্তিত্বের পরিচায়ক।

তাহার পরে সত্য ভ্রম;—জিজ্ঞাসার প্রথম উদ্যমে আমরা যাহাকে তাহাকে মূল সত্য বলিয়া অবধারণ করি; সদ্দারের উপরেও যে সদ্দার রহিয়াছে—এটা আমরা ভুলিয়া যাই। কেহ বলেন যে, যান্ত্রিক বলই মূল সত্য; কেহ বলেন তাড়িত পদার্থই মূল সত্য; কেহ বলেন প্রাণই মূল সত্য; ইত্যাদি। বৈদান্তিক ভাষায় ইহারই নাম রজ্জুতে সর্প-ভ্রম, অসত্যে সত্য-ভ্রম—অবিদ্যা। অবিদ্যাতে কি প্রকাশ পায়? এই প্রকাশ পায় যে, জগতের মধ্যস্থিত কোন বস্তুরই সত্তা আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে—সমস্তই আপেক্ষিক; বৈদান্তিক ভাষায়—জগতের

সমস্ত বস্তুই সদসদাত্মক, কোন বস্তুই বিশুদ্ধ সৎ পদার্থ নহে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সত্যভ্রম সদসদাত্মক প্রকৃতির অস্তিত্বের পরিচায়ক।

তাহার পরে সত্য জ্ঞান; মূল সত্য কি—সর্ব্ব জগতের মূলাধার কি—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সময়েও এটা আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে, মূল সত্য আছেই আছে—আপেক্ষিক সত্যের মূলে নিরবলম্ব স্বয়ম্ভূ সত্য না থাকিলেই নয়। এইরূপ অভ্রান্ত নিশ্চয়তাতে কি প্রকাশ পায়? না জ্ঞানের নিজ মাহাত্ম্য।—জিজ্ঞাসা কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? জ্ঞানের অভাব-বোধ হইতে; অভ্রান্ত নিশ্চয়তা ঠিক্ তাহার উল্টা দিক্ হইতে—জ্ঞানের প্রভাব-বোধ হইতে—উৎপন্ন হয়। অভ্রান্ত নিশ্চয়তাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, জীবের অল্প জ্ঞানের অভ্যন্তরে সর্ব্বজ্ঞান জাগিতেছে—এবং সেই সর্ব্বজ্ঞানের প্রভাবেই জীবের অল্প জ্ঞান এবং প্রকৃতির সদসদাত্মক আপেক্ষিক সত্তা উভয়ই প্রাণ ধারণ করিতেছে। কাজেই বলিতে হইতেছে যে, অভ্রান্ত সত্য-জ্ঞান সত্যং জ্ঞানমনন্তং পরব্রহ্মের অস্তিত্ব-সূচক। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, কাণ্টের দর্শন-গ্রন্থের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত বৈদান্তিক সত্যের একটি অন্তঃশিলা সরস্বতী নদী তলে তলে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে; কিন্তু হইলে হইবে কি—এক সর্ব্বগ্রাসী সংশয় আসিয়া তাঁহার সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। পারমার্থিক সত্য ঐ যাহা দেখা গেল তাহা বাস্তবিক সত্য—বস্তুগত সত্য—না শুদ্ধ কেবল আমাদের জ্ঞানগত সত্য, এইটির মীমাংসা করিতে গিয়া কাণ্ট অতলস্পর্শ সংশয়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। যদি এমন হইত যে, আমাদের জ্ঞান একটা সৃষ্টিছাড়া বস্তু—আমাদের জ্ঞানের সহিত কোন বস্তুরই কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই—তাহা হইলে কাণ্টের ঐরূপ সংশয়ের অর্থ থাকিত। কিন্তু আমাদের জ্ঞান যখন ভিতরে ভিতরে সমস্ত প্রকৃতির সহিত এবং সমস্ত জ্ঞানের সহিত যোগ-সূত্রে আবদ্ধ—জ্ঞানই যখন সমস্ত জগতের সারাংশ এবং সমস্ত বাস্তবিকতার মূল, তখন জ্ঞান-গত পারমার্থিক সত্য কিসে যে অবাস্তবিক তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। উল্টা আরো দেখা যায় যে, যাঁহারা বাস্তবিক সত্যের প্রয়াসী তাঁহারা ঐন্দ্রিয়ক অবভাসকে তুচ্ছ করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানেরই শরণাপন্ন হ'ন;—অবিদ্যার পথই অবাস্তবিক মৃগতৃষ্ণার পথ, জ্ঞানের পথই বাস্তবিক সত্যের পথ। বিশুদ্ধ জ্ঞানের সত্য ঐন্দ্রিয়ক সত্য নহে বলিয়াই কি তাহাকে অবাস্তবিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে? তাহা যদি করিতে হয়, তবে শুধু তত্ত্বজ্ঞান কেন—বিজ্ঞানও এক-মুহূর্ত্ত-কাল টেকেন না। তাহা হইলে দাঁড়ায় যে, পৃথিবীকে কেহ ঘুরিতে দেখে নাই—অতএব পৃথিবী ঘুরিতেছে ইহা সত্য নহে। এইরূপ আপেক্ষিক জ্ঞানের (মিশ্র জ্ঞানের) কথাতেই যখন আমরা বিশ্বাস না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না, তখন বিশুদ্ধ জ্ঞানের কথা তাহা অপেক্ষা আরো কত না শ্রদ্ধেয়। কাণ্টের দর্শন হইতে সংশয়ের আবরণটি অপসারিত করিলেই আমরা অমূল্য সত্য-রত্নের দর্শন পাই—নচেৎ এমনি এক বিষম পাকচক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া যাই যে, সেখান হইতে উদ্ধার পাওয়া দেবতারও অসাধ্য। বেদান্ত-দর্শনে ঠিক্ ইহার বিপরীত দেখা যায়; বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতি সংশয় দূরে থাকুক—তাহার প্রতি শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠাই বেদান্ত-দর্শনের ভিত্তি-ভূমি। কাণ্ট বিশুদ্ধ জ্ঞানের নিজ-মূর্ত্তি হইতে মুখ ফিরাইয়া বিজ্ঞানের অভ্যন্তরে তাহার ছায়া যাহা দেখিতে পাইলেন তাহাকেই সর্ব্বস্ব করিলেন। একজন ছুতার মিস্ত্রী একটা হীরক অন্বেষণ করিয়া পাইয়াছে; কিন্তু তাহা হীরক কি না তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিল যে, ইহাতে তো কাচ কাটিতে পারা যায়—আপাততঃ এই ঢের! একজন জহরী সেই হীরকটি পাইয়া তাহাকে আপনার কণ্ঠাভরণ করিয়া রাখিল। কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত-দর্শন দুয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, কাণ্টের দর্শন ছুতার মিস্ত্রী, বেদান্ত-দর্শন জহরী; আর, দুয়ের মধ্যে ঐক্য এই যে, কাণ্টের দর্শনও হীরক (পারমার্থিক সত্য) হস্তে পাইয়াছে, বেদান্ত দর্শনও তাহা হস্তে পাইয়াছে। কাণ্ট বিশুদ্ধ জ্ঞানকে দিয়া বিজ্ঞানের ভিত্তিমূল দৃঢ় করিয়া গাঁথাইলেন—বেদান্ত দর্শন বিশুদ্ধ জ্ঞানকে সিংহাসনে বসাইয়া তাহাকে আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিলেন। এক যাত্রায় কত না পৃথক ফল! বেদান্ত দর্শনের সকল কথা সবিস্তরে বলিতে গেলে বৃহৎ এক পুস্তক হইয়া দাঁড়ায়, তাহা না করিয়া আমরা যত সংক্ষেপে পারি তাহার সার সিদ্ধান্তটি বিবৃত করিয়াই এবারকার মতো ক্ষান্ত হইব।

বেদান্তের পথ-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে এই;—এপারে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা, ওপারে ব্রহ্ম-জ্ঞান, মাঝখানে ভ্রম-নদী। ভ্রম-নদী একই নদী—ও-পার হইতে দেখিলে তাহা ঈশ্বরের ঐশী-শক্তি, এ-পার হইতে দেখিলে তাহাই জীবের অবিদ্যা। ভ্রম নদী পার হইয়া ও-পারে যাইতে হইবে—তাহার উপায় অবলম্বন করাই সাধন। ভ্রম-নদীর ও-পারে পৌঁছিলেই ব্রহ্ম-জ্ঞানের উদয় হয় এবং ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয়; ইহাই মুক্তি।

বেদান্তের এই যে, পথ-বৃত্তান্ত—বিবেচনা করিয়া দেখিলে—ইহা এক দিনের পথ-বৃত্তান্ত;—অবশ্য ব্রহ্মার এক দিন। এ কেবল সঙ্গীতের নীচের সা হইতে যাত্রা-রম্ভ করিয়া এক সপ্তক পার হইয়া উপরের সা'য়ে যাওয়া; কিন্তু সপ্তকের উপর সপ্তক রহিয়াছে—জিজ্ঞাসা'র উপর জিজ্ঞাসা রহিয়াছে—ব্রহ্ম-জ্ঞানের উপর ব্রহ্মজ্ঞান রহিয়াছে—মুক্তির উপর মুক্তি রহিয়াছে; তবে কি না—এক সপ্তকের সন্ধান জানিতে পারিলেই সামান্যতঃ সকল সপ্তকেরই সন্ধান জানিতে পারা যায়—সৌর-জগতের সন্ধান জানিতে পারিলেই সামান্যতঃ সকল জগতেরই সন্ধান জানিতে পারা যায়। অতএব, বিজ্ঞানকে কম্‌টি এই যে একটি কথা বলিয়াছেন যে, সৌর-জগতের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন নাই—সৌর-জগতের বৃত্তান্তটিই ভাল করিয়া জান, এটি অতি সৎপরামর্শ তাহাতে আর ভুল নাই। আমরা তাই বলি যে, বেদান্ত এক সপ্তকের বৃত্তান্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন—ভালই করিয়াছেন, কেননা সাধনের পক্ষে সেইটুকুই কেবল প্রয়োজন,—তাঁহার অধিক আপাততঃ কাহারো কোন কাজে লাগিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই জীবের মুক্তি হইবে—এইটি বুঝিলেই মনুষ্য ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলনে যত্নবান্ হইতে পারে; ইহার উপরে অধিকন্তু এইটুকু কেবল টীকা করা আবশ্যক যে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার প্রথম উদ্যমেই যে, সমগ্র ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জিত হইবে ইহা অসম্ভব। প্রথম উদ্যমের জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রথম উদ্যমেরই ব্রহ্মজ্ঞান—প্রথম উদ্যমেরই মুক্তি—উপার্জ্জিত হইতে পারে। তাহার পরে দ্বিতীয় উদ্যমের জিজ্ঞাসার পর দ্বিতীয় উদ্যমের মুক্তি—

এইরূপ তৃতীয়—চতুর্থ—ইত্যাদি অনন্ত ব্যাপার প্রসারিত রহিয়াছে। জীবাত্মা সাধন-দ্বারা অবিদ্যা হইতে প্রথম-ধাপের মুক্তি লাভ করিলে পরমাত্মা যে তাহাকে কতখানি কৃতার্থ-করিবেন, তাহা পরমাত্মারই হস্তে। সুতরাং তাহা বলিবার কহিবার কথা নহে—তাহা বলিবার কহিবার অধিকার কাহারো নাই—ক্ষমতাও কাহারো নাই। তাহা সাধনের ব্যাপার নহে যে, তাহার কেহ উপদেশ দিবেন! তাহা উচ্ছ্বাসেরই ব্যাপার—পরমাত্মার স্বহস্তের ব্যাপার—প্রসাদামৃত-বর্ষণ! তাহা উপদেশের কোন ধারই ধারে না। ব্যাকরণ শিখিবার সময় কালিদাস অবশ্য আচার্য্যের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শকুন্তলা লিখিবার সময় তিনি কাহারো উপদেশ গ্রহণ করেন নাই—তাহা যদি করিতেন তবে তাঁহার শকুন্তলা মহাভারতের শকুন্তলার দ্বিতীয় সংস্করন-মাত্র হইত, তাহার অধিক আর কিছুই হইত না। উচ্ছ্বাসের ব্যাপার উপদেশের বিষয় নহে, তাই বেদান্ত দর্শন এই বলিয়াই এক কথায় সংক্ষেপে সারিয়াছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই—জীব-ব্রহ্মের ঐক্য উপলব্ধি হইলেই—মুক্তি হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া উচ্ছ্বাসের ব্যাপার-টি কাহারো উপেক্ষনীয় হইতে পারে না। মনে কর যেন জীবাত্মা অবিদ্যার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে—তাহা হইলে সে কোথায় যাইবে? অবশ্য পরমাত্মার ক্রোড়ে। এ অবস্থায়, জীবাত্মা যাঁহার প্রসাদে মুক্তি লাভ করিয়াছে তাঁহাকে কত না প্রীতি সমর্পণ করিবে—আর, তখনও কি পরমাত্মার অমৃত ভাণ্ডার ফুরাইয়া যাইতে পারে? জীবাত্মা যখন পরমাত্মাতে প্রীতি সমর্পণ করিতেছে, তখন পরমাত্মার ভাণ্ডারে কি প্রীতি-ধনের এতই অনটন যে, জীবাত্মার প্রীতির তিনি প্রত্যুত্তর-দানে অসমর্থ হইবেন? কখনই না! পরমাত্মার প্রেম-ভাণ্ডার অপরিসীম; তিনি আপনার সমস্ত ঐশ্বর্য্যই জীবাত্মাকে মুক্ত হস্তে ঢালিয়া দিবেন—জীবাত্মা তাহা গ্রহণ করিতে পারিলে হয়! তিনি আপনাকে পর্য্যন্ত ঢালিয়া দিবেন—অথচ তাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডার কোন কালেই ফুরাইবে না—"আর কিছুই দিবার নাই" এরূপ হইবে না, জীবাত্মারও "আর কিছুই গ্রহণ করিবার নাই" এরূপ হইবে না। তাই আমরা বলি যে, জীবাত্মার উত্তরোত্তর সাধনের পরিপাকাবস্থায় অবিদ্যার উত্তরোত্তর বন্ধনচ্ছেদ হয়; আর যখন যখন বন্ধন-চ্ছেদ হয় তখন তখনই জীবাত্মাতে পরমাত্মার প্রভাব বিকসিত হয় এবং প্রসাদ অবতীর্ণ হয়; এইরূপ—পরমাত্মার উত্তরোত্তর প্রসাদ-বর্ষণই জীবাত্মার উত্তরোত্তর মুক্তি।

সমস্ত বেদান্তের এবং কাণ্টের আদ্যোপান্ত সমন্বয় করিয়া দেখিয়া আমরা পাইতেছি যে,

প্রথমতঃ সত্য জিজ্ঞাসা জীবাত্মারই জিজ্ঞাসা—পরমাত্মার নহে; এইখানটিতে জীবাত্মা পরমাত্মার মধ্যে ছায়াতপের প্রভেদ।

দ্বিতীয়তঃ সত্যজ্ঞান জীবাত্মার এবং পরমাত্মার উভয়েরই—মূলে তাহা পরমাত্মার এবং তাঁহার প্রসাদে তাহা জীবাত্মার। এই খানটিতে জীবাত্মা-পরমাত্মার ঐক্য।

তৃতীয়তঃ জীবের সত্য জিজ্ঞাসার অভ্যন্তরে যেমন সত্য জ্ঞান বীজ-ভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তেমনি তাহার সত্য-জ্ঞানের অভ্যন্তরেও উচ্চতর সত্যের জিজ্ঞাসা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; পরমাত্মার সত্য জ্ঞান পরিপূর্ণ, জীবাত্মার সত্য জ্ঞান আংশিক; পরমাত্মার সত্য-জ্ঞান স্বরূপ-জ্ঞান, জীবাত্মার সত্য জ্ঞান তাহার আভাস মাত্র; এইটি ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়েই বেদান্ত-দর্শন বলেন যে, পরমাত্মা স্বরূপ-চৈতন্য—জীবাত্মা আভাস চৈতন্য। এইখানটিতেই জীবাত্মা-পরমাত্মার ভেদাভেদ;—জীবাত্মা পরমাত্মারই প্রতিবিম্ব—এইটিই উভয়ের অভেদ; আর প্রতিবিম্ব অবশ্য মূল-জ্যোতি হইতে ভিন্ন—এইটিই উভয়ের প্রভেদ। অতঃপর বেদান্তের মতে জীবাত্মা পরমাত্মা এবং প্রকৃতির মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ এবং জীবাত্মার সাধন-পদ্ধতিই বা কিরূপ, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

ক্রমশঃ।

বেহালা পঞ্চত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

৩০ কার্ত্তিক বুধবার ১৮১০ শক।

আজকাল অনেকের এইরূপ বিশ্বাস যে গৃহস্থের ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার নাই। তাঁহারা বলেন শাস্ত্রকারেরা অরণ্যবাসী ও সন্ন্যাসীদিগের পক্ষেই একমাত্র ব্রহ্মের উপাসনা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। আর সংসারী গৃহস্থের পক্ষে দেবদেবীর অর্চ্চনা ও পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠানই পর্য্যাপ্ত। বর্ত্তমানে লোকের এইরূপ সংস্কার। কিন্তু এইটি বড় ভ্রান্ত সংস্কার। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত জীবের মুক্তি নাই, পরম কারুণিক প্রাচীন ঋষিরা যে সেই মুক্তির নিদান ব্রহ্মজ্ঞানে সংসারী গৃহস্থকে অনধিকারী করিয়াছেন ইহা নিতান্ত উন্মত্ত-প্রলাপ। মহর্ষি মনু এই ভারতভূমির ধর্ম্মসংস্থাপক ও সমাজ-সংস্কারক। বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতং। মনু বেদোক্ত পথ হইতে রেখা মাত্রও পরিভ্রষ্ট হন নাই এই জন্যই স্মৃতিকারদিগের মধ্যে তাঁহার সর্ব্বপ্রাধান্য। সেই মনু কহিয়াছেন—

জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্তোতৈর্মখৈঃ সদা।
জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা।

গৃহস্থের প্রতি যে পঞ্চযজ্ঞ বিহিত আছে অপর ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণেরা তৎসমুদায় কেবল জ্ঞান দ্বারা নিষ্পন্ন করেন। সেই জ্ঞান এই যে, তাঁহারা জ্ঞানচক্ষু উপনিষৎ, প্রমাণে জানেন যে একমাত্র পরব্রহ্মই পঞ্চযজ্ঞাদি তাবৎ বস্তুর আশ্রয়। মনুর যে প্রকরণে এই কথার উল্লেখ তাহার সমাপ্তিতে টীকাকার অতি পরিষ্কাররূপে কহিয়াছেন—

শ্লোকত্রয়েণ ব্রহ্মনিষ্ঠানাং বেদসন্ন্যাসিনাং গৃহস্থানামনী বিধয়ঃ।

বেদসন্ন্যাসী অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ম্মত্যাগী ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থগণের প্রতি ইহাই বিধি। এক মনু প্রমাণেই প্রতিপন্ন হয় যে বেদবিহিত কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া গৃহস্থেরই ধর্ম্ম। তবে যে ইহার প্রতি ঔদাস্য তাহার কারণ আছে। ইন্দ্রিয়-দমন, ব্রহ্মে মতি ও রতি হইবার প্রধান কারণ। অবশ্য বাহ্য পূজায় ইহা উপেক্ষিত নয়। তাহাতেও সংযমের বিধি আছে। বলিতে কি, ব্যবহারত সেই বিধির উপর লোকের ততটা নির্ভর দেখা যায় না। কিন্তু যিনি ব্রহ্মলিপ্সু ইন্দ্রিয়দমন তাঁহার পক্ষে একান্তই অপরিহার্য্য। এমন কি ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ব্যতীত কাহারই ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার জন্মে না। মনুষ্য প্রাণের তৃপ্তি লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। এইটী তাহার অধীনতা। তাহার প্রতিস্রোতে যাওয়াই তাহার স্বাধীনতা। প্রাণের তৃপ্তির হেতু একমাত্র প্রকৃতি। বেদান্ত শাস্ত্র ইহাকে অবিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জ্ঞানের মুখ্য কার্য্যই

এই অবিদ্যানাশ অথবা প্রকৃতির বন্ধনচ্ছেদ। যতদিন অবিদ্যার অধীনতা তাবৎ আত্মা পরিস্ফুট হয় না। আত্মাকে পরিস্ফুট করাই প্রকৃত স্বাধীনতা। ইন্দ্রিয় ইহার ব্যাঘাতক। ইন্দ্রিয়ই প্রকৃতির অতীত প্রদেশে মনুষ্যকে যাইতে দেয় না। এই জন্যই দেহে আমাদের আত্মবুদ্ধি। ইহাই প্রকৃত অধীনতা বা বদ্ধভাব। ইহার প্রতিস্রোতে চল, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া দেহবন্ধন বা প্রকৃতির বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত কর তোমার আত্মা পরিস্ফুট হইবে। ফলতঃ অবিদ্যার আবরণ হইতে মুক্ত হওয়াই স্বাধীনতা। ইহার প্রথম কার্য্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। এইটী না হইলে ব্রহ্মে রতি ও মতি হয় না। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অতি কঠিন কার্য্য। এই জন্য বেদাদি শাস্ত্রে গৃহস্থের ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবার বিধি থাকিলেও বাহ্য পূজায় সহজে তৃপ্তি পায় বলিয়া সে তাহাতে প্রাণমন সমর্পণ করে। কিন্তু প্রত্যেকের এই বেদবাক্যটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য নহ্যকৃতঃ কৃতেন, কৃত যে বাহ্য পূজা তদ্দ্বারা অকৃত ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্লবা-হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ। এই যে যাগ-যজ্ঞরূপ ভেলা তাহা নিতান্ত অদৃঢ়। ফলত যাবৎ তুমি অবিদ্যা বা প্রকৃতির বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত না করিবে তাবৎ তোমার রজতভ্রমে শুক্তিসংগ্রহই সার। তুমি প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে বহুদূর।

কিন্তু নিরাশ হইবার কথা নয়। ঋষিরা গৃহস্থের ব্রাহ্মী মতি হইবার জন্য উপায়ও করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রধান ব্রহ্মচর্য্য। এই সম্বন্ধে ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যের এক-স্থলে এইরূপ আছে

অনেক জন্ম বিষায়াভ্যাসজনিতা বিষয়বিষয়া তৃষ্ণা ন সহসা নিবর্ত্তয়িতুং শক্যতে ইত্যতো ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনবিশেষোবিধাতব্যঃ।

যে বিষয়বাসনা আমাদের মনপ্রাণ সমস্ত অধিকার করিয়া আছে তাহা সহসা দূর করা সহজ নয় এ জন্য ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা। ফলত ব্রহ্মচর্য্য একটী কঠোর ও কষ্টসাধ্য কার্য্য। সকল শাস্ত্রই কহিতেছে এতদ্ব্যতীত কেহ ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মধ্যানে অধিকারী হইতে পারে না। মনুষ্য যৌবনে প্রমাথী ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনায় ঘোর বিষয়ী হইয়া পড়ে। বিষয়ীর আত্মজ্ঞান ও তদভাবে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। এই জন্য পূর্ব্বতন নিয়মে বাল্য হইতে অর্থাৎ শিক্ষাকাল হইতে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হইত। এখনও প্রতি গৃহস্থের তাহাই করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সকল নিয়মেরই দেশকালভেদে একটু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্বে যে প্রণালীতে ইহা অনুষ্ঠিত হইত বর্ত্তমানে তাহা একরূপ অসম্ভব, তথাচ তাহার মূল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চল অবশ্যই ফল পাইবে। ব্রহ্মচর্য্যে শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ শিক্ষা অনুস্যূত। পূর্ব্বকালে ভিক্ষাটন, গুরুর কাষ্ঠভার আহরণ, শিলাতলে একাকী শয়ন প্রভৃতি শারীরিক শিক্ষার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। এখন সেই অতীতের কথায় কেহ কর্ণপাত করিবে না কিন্তু ঋষিরা কহিতেন, তৈলপাত্রমিবাত্মানং দিধারয়িষেৎ, তৈল পাত্রকে যেমন যত্নে রক্ষা কর সেইরূপ যত্নে দেহকে রক্ষা কর। সুতরাং বাল্যাবধি ব্যায়ামাদি দ্বারা শরীর সবল করা আবশ্যক। মানসিক শিক্ষার সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে কি দেশীয় কি বিদেশীয় যাহা সৎ শাস্ত্র যাহা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা তাহার অনুশীলন কর। আর যেরূপ শক্তি তদনুসারে অল্পে অল্পে অধ্যাত্মিক শিক্ষালাভে যত্নবান হও। এতদ্ব্যতীত মধুমাংস

এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর কুৎসিত নৃত্যগীতাদি হইতে আপনাকে দূরে রাখ। স্ত্রীলোকের প্রতি মাতৃভাবে দৃষ্টিপাত কর। সকল প্রকার লোভ সম্বরণ ও মিতাহার অভ্যাস কর। বেশভূষায় দীনভাব ও বিনয় রক্ষায় যত্নবান হও। ইহাই ব্রহ্মচর্য্য। বাল্যাবধি এই মহাব্রত পালনে দৃঢ়তা থাকিলে তুমি যখন সংসারে প্রবেশ করিবে, যখন সংসারের নানারূপ বাসনা তোমাকে প্রলোভিত করিতে থাকিবে তখন এই ব্রহ্মচর্য্যের উচ্চ শিক্ষাই তোমার এক মাত্র রক্ষক। বিষয় অবশ্যই আসিবে, কিন্তু এই শিক্ষার বলে অনাসক্তি তাহার দাসত্ব হইতে তোমায় মুক্ত রাখিবে। এই অনাসক্তের বিষয়ভোগই ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মলাভের পূর্ব্ব সোপান, এই প্রসঙ্গে ধম্মপদ নামে এক খানি বৌদ্ধ গ্রন্থ বড় সুন্দর উপদেশ দিয়াছে।

অপ্পমাদো মতপদং পমাদো মচ্চুনো পদং।
অপ্পমত্তা ন মীযন্তি যে পমত্তা যথা মতা।

সংসারাবর্ত্তে পড়িয়া ইন্দ্রিয়ের ক্রীড়ামৃগ হইয়া থাকাই প্রমাদ। ইহা মৃত্যুর পদ। ফলত প্রমাদী যেরূপ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয় অপ্রমাদী সেরূপ হয় না। তুমি যদি প্রকৃতি বা অবিদ্যার বশীভূত হইয়া আত্মাকে পরিস্ফুট করিতে না পার তবে ইহাই তোমার অধ্যাত্মিক মৃত্যু। ব্রহ্ম এই মহা মৃত্যু হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

এই তো শিক্ষাকালের ব্রহ্মচর্য্য। ইহা গার্হস্থে ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সম্পূর্ণ উপযোগী। ইহা ব্যতীত গার্হস্থের যাহা বিধান আছে তাহাও বর্ত্তমানে অপরিহার্য্য, প্রত্যেক মনুষ্য পাঁচটী ঋণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। দেবঋণ পিতৃঋণ ঋষিঋণ মনুষ্যঋণ ও ভূতঋণ। আশৈশব যে শিক্ষা চলিতে ছিল তৎপ্রভাবে শরীর গার্হস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালনের উপযোগী বল লাভ করিয়াছে। জ্ঞানাগ্নি দ্বারা মন বুদ্ধির শুদ্ধি সম্পাদিত হইয়াছে এবং আত্মা স্বাধীন। পূর্ব্ব শিক্ষা গার্হস্থ বিধান রক্ষায় তোমায় সক্ষম করিয়াছে। এখন তুমি ঐ পাঁচটী ঋণ হইতে মুক্ত হও। তোমার উপাস্য সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম। দিন দিন এই পাঁচটি ঋণ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিলে, তুমি তাঁহাকেই পাইবে। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে সর্ব্বদা রত থাক ইহা জ্ঞানযোগে আত্মপ্রসারণ। পূর্ব্ব পিতামহগণ যে সকল সদাচার ও সুনিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন বংশপরম্পরায় তাহা প্রচারিত কর ইহা শ্রদ্ধাযোগে লোকান্তরে আত্মপ্রসারণ। যে সকল লোক নিরন্ন জাতি ও বর্ণনির্বিশেষে তাহাদিগকে আশ্রয় দেও ইহা মৈত্রীযোগে আত্মপ্রসারণ। যে সকল পশু পক্ষী তোমার দয়ার একান্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকে তাহাদিগকে আহার দেও ইহা প্রীতিযোগে আত্মপ্রসারণ। আর যে দেবতা সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত তাঁহাকে আত্মায় দেখিয়া জগতের সহিত আপনার যোগ নিবদ্ধ কর ইহা ধ্যানযোগে আত্মপ্রসারণ। উপাস্যের ধর্ম্ম প্রাপ্তির চেষ্টাতেই প্রীতির পরাকাষ্ঠা। এই পাঁচ ঋণমুক্তি তাহাই সাধন করিয়া দেয়। যাহা অবশ্য দেয় তাহাই ঋণ, তুমি জন্মগ্রহণ করিয়া এই পাঁচ ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব স্বীকার করিয়াছ। এক মাত্র ব্রহ্মকে ইহার অধিষ্ঠাতা জানিয়া এবং ইহাতে আপনাকে প্রতিবিম্বিত না দেখিয়া প্রতিদিন শ্রদ্ধার সহিত ইহার অনুষ্ঠান কর ক্রমশ তোমার ব্রহ্মলাভের পথ পরিস্কার হইয়া আসিবে। কে বলে গার্হস্থে ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নাই। ইহা

কি কখন বিশ্বাস করিতে পার পরম কারুণিক ঋষিরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৃহস্থাশ্রমে মুক্তি পথ রোধ করিয়াছেন? ইহা নিতান্ত নির্বোধের কথা। ব্রহ্মজ্ঞান কোন অবস্থায় কাহারই পক্ষে সপ্রতিবন্ধ নয়। তবে ইহার জন্য আপনার অধিকার স্থাপন করা চাই। বাল্য হইতে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া যত্ন পূর্ব্বক গার্হস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালনে চেষ্টা কর অবশ্যই অধিকারী হইবে। চিত্তশুদ্ধির অনুরোধে বাহ্য পূজায় বৃথা কালক্ষেপ করিও না। ঋষিরা যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা চিত্তশুদ্ধির ব্যাঘাতক নয়। ইহা নিশ্চয় জানিও অনধিকারেই উপধর্ম্মের সৃষ্টি। প্রাণপণে তাহা হইতে আপনকে রক্ষা কর ইহাই ঋষিগণের আদেশ ও উপদেশ।

প্রকৃত সময়েই এদেশে ব্রহ্মের পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন আমরা পরাধীন আমাদের যা কিছু ছিল সমস্তই অন্যে বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছে। দেশাবচ্ছিন্নে যে ধর্ম্ম প্রচলিত তাহাতে শাস্ত্রত না হৌক কিন্তু ব্যবহারত দেহ মন আত্মা এক প্রকার উপেক্ষিত। কিন্তু এই ঋষিসেবিত প্রাচীন ধর্ম্মের মর্ম্মই ঐ তিনের উন্নতি ও মুক্তি লাভ। এই সার্ব্বজনীন নিত্য ধর্ম্ম ব্যতীত এ দেশের দুরবস্থা দূর হইবার উপায় নাই। তাই বুঝি ঈশ্বর কৃপা করিয়া যথা সময়ে এই দেশে এই ধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন। নিশ্চয় জানিও দেহ মন আত্মা এই তিনের সমান ভাবে উন্নতিতেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব না পাইলে দেশের দুরবস্থা দূর হইবার নয়। এক্ষণে সকলে উত্থান কর জাগ্রত হও। এই ধর্ম্ম নিজের গার্হস্থ জীবনে আনিতে চেষ্টা পাও, এবং এই দেশের দ্বারে দ্বারে ইহা প্রচার কর। ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ঈশ্বরই এই কার্য্যে তোমার সহায় হইবেন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বিজ্ঞাপন।

ঊনষষ্টি সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ বুধবার প্রাতঃকালের ব্রহ্মোপাসনা আদি ব্রাহ্মসমাজের তৃতলগৃহে না হইয়া শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে হইবে। ঐ দিন সর্ব্বসাধারণে প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আগামী ৫ পৌষ বুধবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার পর বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজের একত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজ
সরস্বতী তীর
১৮১০ শক।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বাদশ কল্প।
দ্বিতীয় ভাগ
মাঘ ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯।

৫৪৮ সংখ্যা ১৮১০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃসর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন।

ঊনষষ্টি সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ বুধবার প্রাতঃকালের ব্রহ্মোপাসনা আদি ব্রাহ্মসমাজের তৃতলগৃহে না হইয়া শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে হইবে। ঐ দিন সর্ব্বসাধারণে প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত দর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইতিপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, সত্য-জিজ্ঞাসাই জীবাত্মার বিশেষ পরিচয়-লক্ষণ। জীবাত্মা চায়—ঠিক সত্যটি জানিবে; কিন্তু প্রকৃতি তাহার পরিবর্ত্তে মোটা-মোটি একটা সত্য দিয়া তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করে—তৃষিত জীবাত্মার সম্মুখে জলের পরিবর্ত্তে মরীচিকা আনিয়া উপস্থিত করে। আত্মা বারম্বার প্রতারিত হইয়া অবশেষে প্রকৃতির প্রলোভনে যখন কিছুতেই আর ভুলে না, তখন প্রকৃতি আত্মার উপরে চড়াও হইয়া আক্রমণ করে। বিড়াল-শিশুকে যেমন তাহার মাতা ক্রীড়াচ্ছলে আক্রমণ করে (তাহার তাৎপর্য্য শুদ্ধ কেবল এই যে, আমার শাবকটি যুদ্ধ-বিদ্যা শিখুক)—প্রকৃতি-মাতা আত্মার সহিত ঠিক্ সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে প্রকৃতির ক্রীড়া বিপর্য্যয় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আত্মার সহ্য-গুণকে একেবারেই ধরাশায়ী করিয়া দেয়; তাহার কিছুকাল পরেই প্রকৃতি-

মাতা হাস্যময়ী অভয়-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আত্মার ক্রন্দনোদ্যত মুখে হাস্য ডাকিয়া আনেন। যতক্ষণ না আত্মা ঠেকিয়া ঠেকিয়া শিখিয়া শিখিয়া এরূপ শক্ত সমর্থ হয় যে, আর সে বিভীষিকাতেও ভয় পায় না—ছলনাতেও ভুলে না, ততক্ষণ প্রকৃতি-মাতা তাহাকে ভয় দেখাইতেও ছাড়েন না—ছলনা করিতেও ছাড়েন না। প্রকৃতি আত্মার "মাতা পরমকো গুরুঃ।" বিড়াল-শিশুকে তাহার মাতা বাস্তবিক কিছু আর বধ করিতে পারে না—যেন বধ করিতে যাইতেছে এইরূপ একটা ভান করে—এই পর্য্যন্ত; প্রকৃতি মাতা আত্মাকে কিছু আর বিনষ্ট করিতে পারেন না—"নায়ং হন্তি ন হন্যতে,"—কেবল আত্মাতে ঐরূপ একটা ভ্রান্তির সঞ্চার করেন। প্রকৃতি-মাতার মর্ম্মগত অভিপ্রায় এই যে, আত্মা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুক—আমার বিরুদ্ধে আপনার প্রভাব ব্যক্ত করুক—এইরূপে ক্রমে শক্ত সমর্থ হউক। ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যুদ্ধের পরে শান্তি লাভ করিলে তবেই আত্মা শান্তির প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবে—ভ্রমের পরে সত্য লাভ করিলে তবেই আত্মা সত্যের প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবে। অতএব প্রকৃতির বিভীষিকাও অমঙ্গল নহে, ছলনাও অমঙ্গল নহে, প্রত্যুত তাহা মঙ্গলেরই অব্যর্থ সোপান।

বেদান্ত-দর্শনের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, তাহা ঈশ্বরেরই ঐশী-শক্তি—মায়া। পরমাত্মাই সৎ-স্বরূপ—অর্থাৎ অনন্য-সাপেক্ষ নিরবলম্ব স্বয়ম্ভূ সত্য; প্রকৃতি সদসদাত্মক—অর্থাৎ আপেক্ষিক সত্য—ছায়া-সত্য। সাংখ্য-দর্শনের মতে প্রকৃতি সত্ত্ব-রজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা। আমরা অতঃপর দেখাইতেছি যে, সদসদাত্মক এবং ত্রিগুণাত্মক এ দুইটি বাক্যের অর্থ একই—কি? না আপেক্ষিক সত্য।

সত্ত্বরজস্তমোগুণ আমাদের দেশের আপামর সাধারণ সকলেরই মুখে অনর্গল শুনিতে পাওয়া যায়। কথায় কথায় লোকে বলে—অমুকের বড় তমো হইয়াছে; সাত্ত্বিক আহারে শরীর বড় ভাল থাকে; রাজসিক আচার ব্যবহার যোদ্ধাদেরই মানায় ভাল; ইত্যাদি। কিন্তু বড় বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি—সত্ত্বরজস্তমোগুণ যে ব্যাপারটা কি, কেহই তাহা আমাদিগকে আজ পর্য্যন্ত বুঝাইয়া দিতে পারিলেন না। আমরা প্রামাণিক রকমে বুঝিতে চাই, তাঁহারা আমাদিগকে শাস্ত্রীয় রকমে বুঝা'ন;—অমুক টীকাকার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, অমুক ভাষ্যকার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—কেহ বলেন উহা আর কিছু নয়—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, কেহ বলেন—জল বায়ু অগ্নি,—এই পর্য্যন্তই সার। ভাগ্যে কাণ্ট্ এবং তাঁহার পরে হেগেল্ জন্মিয়াছিলেন—তাই রক্ষা। লোকে বলে শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি, আমরা আজ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি—আমরা দেখিতেছি যে, হেগেলে কপিলে কোলাকুলি! হেগেলের এবং কপিলের দোঁহার দুইটি মূল কথার মধ্যে পরমাশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখিয়া আমাদের চক্ষু ফুটিয়াছে—সত্ত্ব রজস্তমো যে, ব্যাপারটা কি, এখন তাহা আমাদের নিকট জলের ন্যায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে—তাহা এই;—

হেগেল্ তাঁহার প্রসিদ্ধ 'দর্শন-পুস্তকের গুণ-শিরস্ক প্রথম অধ্যায়ে অতীব নিপুণরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, সত্তা (Being) অসত্তা (nothing) এবং বুভূষা (হইবার চেষ্টা (Becoming) এই তিনটি গুণ

সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মূল উপাদান। যাঁহার চক্ষু আছে তিনি এক মুহূর্ত্তেই দেখিতে পা'ন যে, হেগেলের সত্তাগুণ এবং রুপিলের সত্ত্ব-গুণ—হেগেলের অসত্তা-গুণ এবং এবং কপিলের তমোগুণ—হেগেলের বুভূষা গুণ এবং কপিলের রজোগুণ—একই ব্যাপার। যদি জিজ্ঞাসা কর যে, সত্ত্ব-রজস্তমো গুণ বস্তুটা কি, তবে নিম্নে তাহা ভাঙিয়া বলিতেছি;—

বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণ আছে; যেমন মনুষ্যের মনুষ্যত্ব গুণ, পশুর পশুত্ব গুণ, কীটের কীটত্ব গুণ, ইত্যাদি। কিন্তু পশুত্ব-গুণের ভিতর মনুষ্যত্ব-গুণের অভাব রহিয়াছে, কীটত্ব-গুণের ভিতর পশুত্ব-গুণের অভাব রহিয়াছে; প্রত্যেক বস্তুতেই একদিকে যেমন গুণ-বিশেষের সত্তা আছে, আর এক দিকে তেমনি গুণ-বিশেষের অভাব আছে; আবার যাহারই অভাব আছে, তাহারই অভাব-পূরণের একটা-না-একটা চেষ্টা আছে (উদ্ভিদের যেমন—মৃত্তিকা ভেদ করিয়া আলোকে উত্থান করিবার চেষ্টা); এইরূপে পাওয়া যাইতেছে যে, নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বস্তুতেই সত্তা, সত্তার অভাব এবং অভাব-পূরণের চেষ্টা তিনই পরিমাণ-বিশেষে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সত্তাই সত্ত্ব-গুণ, সত্তার অভাবই তমোগুণ এবং অভাব-পূরণের চেষ্টাই রজোগুণ। দীর্ঘ-প্রস্থ-বেধ যেমন পরস্পর-সাপেক্ষ, সাংখ্য-মতে সত্ত্ব রজ স্তমো গুণ সেইরূপ পরস্পর-সাপেক্ষ। পুষ্করিণী কত হাত দীর্ঘ, ইহা মাপিয়া দেখিলেই কিছু আর পুষ্করিণী মাপা হয় না; তা ছাড়া—তাহা কত হাত চওড়া ও কত হাত গভীর তাহাও মাপিয়া দেখা আবশ্যক। তেমনি, কোন-একটি বস্তুকে জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে হইলে তাহাতে সত্তা (সত্ত্বগুণ) কতটুকু তাহা শুধু জানিলে চলিতে পারে না; তা ছাড়া—তাহাতে সত্তার অভাব (তমোগুণ) কতটুকু এবং সেই অভাব-পূরণের চেষ্টাই বা কতটুকু, তাহাও জানা চাই। যেমন;—মনুষ্যে সত্তার ভাগ—সত্ত্ব-গুণের অংশ—পশু-অপেক্ষা বেশী; কেননা, পশুতে মনুষ্যত্ব নাই; কিন্তু মনুষ্যে পশুত্বও আছে এবং তা ছাড়া পশুত্বের নিয়ামক মনুষ্যত্বও আছে; সুতরাং সত্তার ভাগ পশু অপেক্ষা মনুষ্যে দ্বিগুণ বেশী। মনুষ্যে, যেমন, পশু অপেক্ষা সত্তার ভাগ বেশী, তেমনি, দেবতা-অপেক্ষা সত্তার ভাগ কম; কেননা, পশুতে যেমন মনুষ্যত্বের অভাব রহিয়াছে, মনুষ্যে তেমনি দেবত্বের অভাব রহিয়াছে; এই জন্য বলা যাইতে পারে যে, পশুর তুলনায় মনুষ্য সত্ত্ব-গুণাত্মক, দেবতার তুলনায় তমোগুণাত্মক। আবার, মনুষ্যেতে দেবত্বের সেই যে অভাব, তাহার পূরণ-চেষ্টা বিষয়ী লোক অপেক্ষা সাধকমণ্ডলীতে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়; এই জন্য বলা যাইতে পারে যে, দেবতার তুলনায় সাধক রজোগুণাক্রান্ত—বিষয়ী তমোগুণাক্রান্ত। মনুষ্যের সম্বন্ধে এ যেমন দেখা গেল, তেমনি—জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই সত্ত্ব-রজো এবং তমোগুণ অপেক্ষাকৃত ন্যূনাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সাংখ্যের মতানুযায়ী মূল প্রকৃতি এবং দৃশ্যমান জগৎ দুয়ের মধ্যে ভেদাভেদ বুঝিতে হইলে নিম্ন-লিখিত উপমাটির প্রতি প্রণিধান করিলেই তাহা পরিষ্কার-রূপে বোধায়ত্ত হইতে পারিবে;—

মনে কর একটি জ্যোতির্ব্বিন্দু হইতে তিন বর্ণের তিনটি কিরণ-পুচ্ছ ত্রিধা বিকীর্ণ হইয়া দেয়ালের গাত্রে নিপতিত হইয়াছে;—একটি পুচ্ছ পীত-প্রধান,

WORM EATEN.

দ্বিতীয়টি লোহিত-প্রধান, তৃতীয়টি নীল-প্রধান। আবার, যে-টি পীত-প্রধান তাহার মুখ্য অংশ সুপীত, মধ্যম অংশ রক্তিম পীত, শেষাংশ নীলিম পীত; যেটি লোহিত-প্রধান, তাহার মুখ্য অংশ সুলোহিত, মধ্যম অংশ পীতিম লোহিত, শেষাংশ নীলিম লোহিত; যেটি নীল-প্রধান তাহার মুখ্য অংশ সুনীল, মধ্যম অংশ রক্তিম নীল, শেষাংশ পীতিম নীল। আবার সুপীতের মধ্যেও মুখ্য সুপীত, রক্তিম সুপীত, এবং নীলিম সুপীত রহিয়াছে; সুলোহিতের মধ্যেও মুখ্য সুলোহিত, পীতিম সুলোহিত, নীলিম সুলোহিত রহিয়াছে; সুনীলের মধ্যেও মুখ্য সুনীল, রক্তিম সুনীল, এবং পীতিম সুনীল, রহিয়াছে। অতএব সুনীলও ঐকান্তিক নীল নহে, সুপীতও ঐকান্তিক পীত নহে, সুলোহিতও ঐকান্তিক লোহিত নহে,—সমস্তই আপেক্ষিক ব্যাপার। সংক্ষিপ্ত নাম-করণের অনুরোধে আমরা পীত-প্রধান পুচ্ছটিকে পীত বর্ণ বলি, সত্ত্ব-প্রধান গুণকে সত্ত্বগুণ বলি; নীল-প্রধান বর্ণকে নীল-বর্ণ ও তমঃপ্রধান গুণকে তমোগুণ বলি; লোহিত-প্রধান বর্ণকে লোহিত বর্ণ এবং রজঃপ্রধান গুণকে রজোগুণ বলি। জ্যোতির্বিন্দু হইতে যেমন তিন বর্ণের তিনটি কিরণ পুচ্ছ বিকীর্ণ হইয়া কোথাও বা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ভাবে কোথাও বা অপেক্ষাকৃত বিমিশ্র-ভাবে দেয়ালের গায়ে নিপতিত হইয়াছে; মূল প্রকৃতি হইতে তেমনি সত্ত্বরজস্তমো গুণ বিকীর্ণ হইয়া কোথাও বা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ-ভাবে কোথাও বা অপেক্ষাকৃত বিমিশ্র ভাবে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ঐ যে তিন বর্ণের তিনটি কিরণ-পুচ্ছ, যাহা দেয়ালে নিপতিত হইয়াছে, তাহা জ্যোতির্বিন্দুর অভ্যন্তর হইতেই তিন-রঙা হইয়া বাহির হইয়াছে; সুতরাং জ্যোতির্বিন্দুর অভ্যন্তরেও বিভিন্ন বর্ণত্রয় বর্ত্তমান রহিয়াছে—বলিতে হইবে; কিন্তু সেখানে কি ভাবে বর্ত্তমান—বিকীর্ণ ভাবে না সংকীর্ণ ভাবে? বিভিন্ন বর্ণত্রয় সেখানে অবশ্য অতীব সংকীর্ণ-ভাবে—সমাহিত ভাবে—অবস্থিতি করিতেছে; কাজেই সেখানে বর্ণ-ত্রয় মিলিয়া মিশিয়া শ্বেত বর্ণে একাকার। এইরূপ ন্যায়ে, দৃশ্যমান জগতে গুণত্রয় বিকীর্ণ ভাবে অবস্থিতি করিতেছে; মূল প্রকৃতিতে গুণত্রয় একাকারে সমাহিত রহিয়াছে। সাংখ্যকার তাই বলেন যে, মূল-প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা অর্থাৎ একাকার ভাব। হেগেল্‌ও তাঁহার দর্শন-গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, বুদ্ধির মূল-প্রদেশে সত্তা এবং অসত্তা একীভূত।

সাংখ্য যেমন বলেন যে, প্রকৃতি সত্ত্ব-রজস্তমোগুণাত্মক, বেদান্ত তেমনি বলেন যে, মায়া সদসদাত্মক; সদসদাত্মক—অর্থাৎ প্রাকৃতিক সত্তা অসত্তা-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন—সত্ত্বগুণ তমোগুণ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। অতএব সাংখ্য এবং বেদান্ত উভয়েরই এক বাক্য এই যে, প্রাকৃতিক সত্তা আপেক্ষিক সত্তা—স্বতন্ত্র সত্তা নহে। বেদান্তের মতে পরমাত্মাই বিশুদ্ধ সৎ পদার্থ—তিনিই সৎ স্বরূপ। যেমন মনুষ্য এবং মনুষ্যত্ব, তেমনি সৎ এবং সত্ত্ব; একটি বস্তু—আর-একটি গুণ। অসত্তার প্রতিযোগিতা (Contrast) ব্যতিরেকে কোন গুণই প্রকাশ পাইতে পারে না;—অন্ধকারের প্রতিযোগেই আলোক অভিব্যক্ত হয়, পশুত্বের প্রতিযোগেই মনুষ্যত্ব অভিব্যক্ত হয়, ইত্যাদি। এই জন্য, প্রাকৃতিক সত্তার মধ্যে—সত্ত্বগুণের মধ্যে—রজস্তমোগুণের প্রতিযোগিতা অন্তর্ভূত। সাংখ্য ভাষায়—প্রাকৃতিক সত্তা ত্রিগুণাত্মক; বৈদান্তিক ভাষায়—প্রাকৃতিক সত্তা সদসদাত্মক; আধুনিক ভাষায়—প্রাকৃতিক সত্তা আপেক্ষিক সত্য।

কিন্তু জীবাত্মার অন্তরে সমগ্র সত্যের ভাব রহিয়াছে—পরিপূর্ণ সত্যের ভাব রহিয়াছে, এই জন্য কোন আপেক্ষিক সত্যেই তাহার সত্য-জিজ্ঞাসার আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না; আধ পেটা অন্নে কাহারো পেট ভরে না। জীবাত্মা তাই তৃষিত নয়নে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির যবনিকা ভেদ করিয়া পরমাত্মার মুখাবলোকন করিতে সচেষ্ট হয়; ইহারই জন্য জীবাত্মার তপজপাদি যত কিছু সাধন। অতঃপর সাধন কিরূপ এবং মুক্তিই বা কিরূপ তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যা'ক।

সাধনের প্রথম সংকল্প চিত্ত-শুদ্ধি; এবং চরম সংকল্প ঈশ্বরের সহিত আনন্দ উপভোগ। প্রকৃতিকে সঙ্গ্রামে পরাস্ত করাই সাধনের প্রথম সংকল্প। প্রকৃতির সহিত সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রকৃতিকে ভাল করিয়া চেনা আবশ্যক। আমাদের স্বদেশীয় শাস্ত্র-মতে শুদ্ধ যে কেবল পঞ্চভূতই প্রকৃতি, তাহা নহে; আমাদের অন্তরস্থিত মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কারও প্রকৃতিরই অন্তঃপাতী।

সাংখ্য-দর্শনের মতে মূল-প্রকৃতি হইতে সর্ব্ব প্রথমে "মহৎ" উৎপন্ন হয়। মহৎ এই শব্দটি শুনিবা-মাত্রই অপরিচ্ছিন্ন অনিরুদ্ধ সর্ব্বগত সত্তার ভাব মনে উদিত হয়; কিন্তু প্রকৃতির অভ্যন্তরে সেরূপ সত্তা কোথায়? প্রকৃতির সকল সত্তাই তো পরিচ্ছিন্ন সত্তা। এমন কি সমস্ত জগতের মূলে যে এক সর্ব্বময়ী প্রাকৃত সত্তা বর্ত্তমান রহিয়াছে, সংখ্য-শাস্ত্রে যাহার নাম মূল-প্রকৃতি, বেদান্ত-মতে তাহাও সদসদাত্মিকা আপেক্ষিক সত্তা—এই জন্য তাহাও সৎশব্দের বাচ্য নহে। বেদান্ত-শাস্ত্রে প্রকৃতি রূপকচ্ছলে পরমাত্মার চতুর্থাংশের একাংশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যথা,—"একাংশেন স্থিতো জগৎ;" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পরমাত্মার অসীম শক্তির কণাংশ মাত্র জগৎ কার্য্যে ব্যয়িত হয়। অতএব প্রকৃতি হইতে "মহৎ" যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে অপরিচ্ছিন্ন সত্তা নহে—তবে কি? না তাহা অপেক্ষাকৃত অপরিচ্ছিন্ন সত্তা অর্থাৎ তাহা প্রকৃতি-জাত আর আর সত্তা অপেক্ষা অপরিচ্ছিন্ন; যেমন—মৃত্তিকা অপেক্ষা জলের সত্তা অপরিচ্ছিন্ন, জল অপেক্ষা বায়ুর সত্তা অপরিচ্ছিন্ন, সেইরূপ প্রকৃতি-জাত আর আর সকল বস্তু অপেক্ষা মহতের সত্তা অপরিচ্ছিন্ন, এই পর্য্যন্ত। মহৎ সত্ত্ব-গুণ প্রধান—অর্থাৎ তাহাতে সত্তার ভাগই অধিক; কিন্তু সে যে তাহার সত্ত্বগুণ—তাহাও রজস্তমোগুণের সহিত কতক না কতক্ অংশে জড়িত। এই মহত্তত্ত্বটির আর এক নাম বুদ্ধি। পাঠক হয় তো বলিবেন যে, এ আবার কিরূপ কথা! পাঠক একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি—সন্দেহ নাই; তিনি অবশ্য লাপ্লাসের আভ্রিক-সিদ্ধান্ত (Nebular theory) অবগত আছেন; তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন যে, "প্রথমে অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বময় সত্তা—মোটা মুটি ধর যেন একটা ধূমাকার সত্তা—এটা বেস্ বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু তাহা যে, বুদ্ধি, এ কথার তো কোন অর্থই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না!" তাঁহার এ বোধ নাই যে, তিনি তাঁহার আপনার প্রশ্নের আপনিই উত্তর দিয়া বসিয়া আছেন! তিনি বলিয়াছেন "প্রথমেই অপরিচ্ছিন্ন সত্তা—এটা বেস্ বুঝিতে পারা যায়" তবেই হইল যে, অপরিচ্ছিন্ন

WORM EATEN.

সত্তা বুদ্ধিতে প্রকাশ পায়, এখন দেখিতে হইবে যে, অপরিচ্ছিন্ন সত্তা শুদ্ধ কেবল বুদ্ধিতেই প্রকাশ পায়—তা' ভিন্ন—পরিচ্ছিন্ন সত্তার ন্যায় তাহা ইন্দ্রিয়-সন্নিধানে প্রকাশ পায় না। বর্ণ-গুণ বলিবা-মাত্রই বুঝায়—দৃষ্টিগোচর বর্ণ; সত্ত্বগুণ (বা সত্তা গুণ) বলিবা-মাত্রই বুঝায়—বুদ্ধি-গোচর সত্তা। বর্ণ দৃশ্য-বস্তুর দৃষ্টি-গ্রাহ্য গুণ, সত্তা বস্তু-মাত্রেরই বুদ্ধি-গ্রাহ্য গুণ। অদৃশ্য বর্ণের যেমন কোন অর্থ হয় না, অবোধ্য সত্তারও তেমনি কোন অর্থ হয় না। অতএব সত্ত্ব-গুণ-প্রধান মহৎ—যাহা ঈশ্বরের তুলনায় পরিচ্ছিন্ন কিন্তু প্রকৃতি-জাত সমস্ত বস্তুর তুলনায় অপরিচ্ছিন্ন—সেই অপেক্ষাকৃত অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বময়ী প্রাকৃত সত্তা—বুদ্ধিরই অন্তর্ভূত। সকল প্রাকৃত বস্তুই বুদ্ধি-দ্বারা ব্যাপ্য কিন্তু বুদ্ধি আর কোন প্রাকৃত বস্তু-দ্বারা ব্যাপ্য নহে; সুতরাং আর আর সমস্ত প্রাকৃত সত্তা অপেক্ষা বুদ্ধির সত্তা অপরিচ্ছিন্ন; এই জন্যই বুদ্ধি মহৎ শব্দে সংজ্ঞিত হইয়াছে। কিন্তু ছায়া বা বর্ণ-বৈচিত্র্যের প্রতিযোগিতা (Contrast) ব্যতিরেকে আলোক অভিব্যক্ত হইতে পারে না; তেমনি অসত্তার (তমোগুণের) প্রতিযোগিতা ব্যতিরেকে সত্তা (সত্ত্বগুণ) অভিব্যক্ত হইতে পারে না। অতএব, সত্ত্ব-গুণ-প্রধান মহতের অভিব্যক্তির জন্য তমোগুণ-প্রধান একটা কিছু আবির্ভূত হওয়া আবশ্যক;—সাংখ্য-দর্শনের মতে সত্ত্বগুণ-প্রধান মহৎ (কি না বুদ্ধি) হইতে তমঃপ্রধান অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। চলিত ভাষাতেও—তমো বলিতে অহঙ্কার বুঝায়। বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে সত্তার ভাগ এত অধিক যে, তাহাতে তমো নাই বলিলেই হয়, আর, অহঙ্কারে অসত্তার ভাগ এত অধিক যে, তাহাতে সত্ত্ব নাই বলিলেই হয়। অভাব না থাকার নামই আনন্দ; এই জন্য সকল শাস্ত্রেই সত্ত্ব-গুণ আনন্দাত্মক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বেদান্ত-দর্শনের মতে—জগতের মূলস্থিত সেই যে, আনন্দাত্মক সত্ত্ব-গুণ-প্রধান মহৎ, তাহা ঈশ্বরেরই প্রভাব—ঐশীশক্তি বা মায়া; আর, বিষাদাত্মক তমোগুণ-প্রধান সেই যে অহঙ্কার, তাহা জীবের মর্ম্ম-গত অভাব—অবিদ্যা। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, বেদান্ত মতে মায়া এবং অবিদ্যার মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, সাংখ্য মতে মহৎ এবং অহংকারের মধ্যে সেইরূপ সম্বন্ধ; যথা; সাংখ্য মতে—প্রকৃতির মধ্যে যাহা অপেক্ষাকৃত অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বময় সত্তা তাহাই মহৎ কি না বুদ্ধি; আর, যাহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পরিচ্ছিন্ন তাহাই অহংকার; বেদান্ত মতে—মায়া সমষ্টি-উপাধি, অবিদ্যা ব্যষ্টি উপাধি—অর্থাৎ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পরিচ্ছিন্ন। বুদ্ধিতে তমোগুণ সত্ত্বগুণের উদরস্থ হইয়া রহিয়াছে—অহঙ্কারে সত্ত্বগুণ তমোগুণের উদরস্থ হইয়া রহিয়াছে; অর্থাৎ অহঙ্কারে তমোগুণেরই (অভাবেরই) সবিশেষ প্রাবল্য। অভাবের প্রাবল্য হইতে অভাব পূরণের চেষ্টা উৎপন্ন হয়,—সাংখ্যদর্শন তাই বলেন যে, তমঃপ্রধান অহংকার হইতে রজঃপ্রধান মন উৎপন্ন হয়; মন আর কিছু নয়—অভাব পূরণের জন্য আঁকবাঁকু—অধীর কামনা—সংকল্প বিকল্প—ছট্‌ফটানি। অহঙ্কার বুদ্ধির আলোক হইতে অবসৃত হইয়া আপনাটি এবং আপনারটি লইয়া, বিষাক্ত ফণীর ন্যায় গর্ত্তে ঢুকিয়া, অন্ধকারে জড়সড় হইয়া, চুপ করিয়া অবস্থিতি করে; আর, যখনই আলোকে বাহির হয়, তখনই সকলকে শত্রু জ্ঞান করে, ও অল্প কিছুতেই ফণা ধরিয়া উঠিয়া ফোঁস্ ফোঁস্ আরম্ভ করে। মন নীড়-স্থিত পক্ষি শাবক—

আলোকে উড্ডয়ন করিবার জন্য সর্ব্বদাই পক্ষ বিস্তার করিতে থাকে—কিন্তু বারবার ভূতলে আছাড় খায়। আর অধিক চরিত্র বর্ণনা আবশ্যক করে না—ফল কথা এই যে, অভাব হইতে অভাবের পূরণ চেষ্টা উৎপন্ন হয়—অহঙ্কার হইতে মন উৎপন্ন হয়; সর্প হইতে পক্ষী উৎপন্ন হয়। মন অভাব-পূরণের জন্য অধীর; আর, তাহার প্রণালী পদ্ধতি এইরূপ; যথা;—পরিচ্ছিন্ন সত্তা-সকলের—একের যাহা আছে—অন্যের তাহা নাই; আবার, একের যাহা নাই অন্যের তাহা আছে;—সকলে যদি সদ্ভাবে সম্মিলিত হয়, তবে পরস্পরের সাহায্যে সকলেরই অভাব পূরিত হইতে পারে; অতএব অভাব পূরণের পদ্ধতি দুইরূপ (১) পরিচ্ছিন্ন সত্তা-সকলের মধ্যে যোগ-বন্ধন—ইহাতে করিয়া সমষ্টির প্রভাব-দ্বারা ব্যষ্টির অভাব-পূরণ হয়; এবং (২) মূল সত্তার প্রভাব স্ফুরণ—ইহাতে করিয়া সমষ্টির অভাব-পূরণ হয়। নীচে যোগ-বন্ধন হয় এবং উপর হইতে প্রভাব-স্ফুরণ হয়—দুইই এক সঙ্গে হয়—ইহাতেই ক্রমে ক্রমে অভাবের পূরণ হয়। অহঙ্কার আত্ম-পরের মধ্যস্থলে প্রাচীর সংস্থাপন করিয়া অভাবে আক্রান্ত হয়; মন আত্ম-পরের মধ্যে যোগাযোগ সংঘটন করিয়া অভাব পূরণের জন্য ব্যস্ত হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সাংখ্য দর্শনের মতে বুদ্ধি অহঙ্কার এবং মন প্রকৃতি হইতে উত্তরোত্তর-ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং সকলেই তাহারা প্রাকৃত পদার্থ। বেদান্ত দর্শনের মতেও, শরীর, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, আনন্দ, সমস্তই প্রাকৃত ব্যাপার; ঐ পাঁচটি ক্রমান্বয়ে বেদান্তের অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষ; ও-গুলি আত্মার উত্তরোত্তর উপাধি মাত্র—তা ভিন্ন স্বতন্ত্র কিছুই নহে। এ বিষয়ে কাণ্ট্ কি বলেন—দেখা যা'ক্।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ঈ-ধ্বনি যখন আমাদের কর্ণ-গোচর হয়, তখন সর্ব্ব প্রথমে হ্রস্বতম মুহূর্ত্তে হ্রস্বতম ই-ধ্বনি উপস্থিত হয়। কিন্তু সেই হ্রস্বতম ই-ধ্বনিটি জ্যোতির্মিতিক বিন্দুর ন্যায় অনির্বচনীয়; তাহা আছে এবং নাই এই দুই নৌকায় পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে—এই জন্য তাহা সদসদাত্মক; তাহাকে জ্ঞানে ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না—এই জন্য তাহা জ্ঞান-বিরোধী; তাহাতে ঈ-ধ্বনির সত্তা, অসত্তা, এবং চেষ্টা তিনই বীজ-ভাবে অন্তর্ভূত রহিয়াছে এই জন্য তাহা ত্রিগুণাত্মক। এইরূপ বীজভূত হ্রস্বতম ই-ধ্বনি পরম্পরার অভ্যন্তরে জ্ঞান আপনার ঐক্য সূত্র সঞ্চালন করিয়া বিশেষ একটি বিষয়—ঈ-ধ্বনি—গড়িয়া তুলে;—অবিদ্যাকে বিদ্যা করিয়া গড়িয়া তুলে। কিন্তু সেই যে অবিদ্যা-নির্বিশেষ হ্রস্বতম ই ধ্বনি, যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে বিন্দু বিন্দু করিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে কাহার কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়? আমাদের নিজের কর্তৃত্ব নহে,—বহির্বস্তুরই কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়। কিসে তবে আমাদের বুদ্ধির কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়? না ব্যভ্যাগত অবিদ্যাকে যখন আমরা বিদ্যা করিয়া গড়িয়া তুলি—হ্রস্বতম ই-ধ্বনি-গুলির মধ্যে ঐক্য-বন্ধন করিয়া ঈ-ধ্বনি গড়িয়া তুলি—তখন সেইরূপ ঐক্য বন্ধন-কার্য্যেই আমাদের বুদ্ধির কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়। এইরূপে পাওয়া যাইতেছে যে, বহির্বস্তুর কর্তৃত্বে অবিদ্যা ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়; বুদ্ধির কর্তৃত্বে তাহা বিদ্যারূপে পরিগঠিত হয়। বেদান্ত-মতে, ঐ যে বহির্বস্তুর কর্তৃত্ব উহা

ঐশী-শক্তিরই প্রভাব—উহাই মায়া। অগ্রে ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে অবিদ্যা উপস্থিত হইলে, তবেই বুদ্ধি তাহাকে বিদ্যা করিয়া গড়িয়া তোলে; অবিদ্যার উপস্থিত হ-ওয়া-টি ঐশ্বরিক কার্য্য—তাহাতে বুদ্ধির আদবেই কোন হস্ত নাই; অবিদ্যা উপস্থিত হইলে পর—তখন বুদ্ধি তাহাকে বিদ্যা করিয়া গড়িয়া তোলে—এইখানটিতেই বুদ্ধির যাহা কিছু হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব বুদ্ধির যত কিছু কার্য্য সমস্তই ঐশ্বরিক কার্য্যেরই প্রতিক্রিয়া—তাহা মূল-ক্রিয়া নহে। বুদ্ধির ক্রিয়া যেহেতু মূল-ক্রিয়া নহে—শুদ্ধ কেবল প্রতিক্রিয়া মাত্র; এই জন্য বলা যাইতে পারে যে, বুদ্ধির ক্রিয়া প্রকৃতির ক্রিয়ারই প্রতিধ্বনি—সুতরাং তাহা প্রকৃতিরই অন্তঃপাতী। এইরূপ দেখিয়া শুনিয়াই কাণ্ট্—তাঁহার প্রথম গ্রন্থে—আত্মতত্ত্বকে যে, কোথায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তাহার স্থান অন্বেষণ করিয়া পা'ন নাই। তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থে তিনি শুদ্ধ কেবল ধর্ম্মতত্ত্বের উপরে আত্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বুদ্ধি-তত্ত্বের উপরে কাণ্ট্ আত্মতত্ত্বকে দাঁড় করাইতে পিছ্‌পাও হইলেন কেন? তাহার কারণ শুদ্ধ কেবল এই যে, আত্মা প্রকৃতির বিরোধী পক্ষ—বুদ্ধি প্রকৃতির দলের লোক; কাজেই বুদ্ধির সাহায্যে আত্মা স্বরাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না; ধর্ম্ম কিন্তু প্রকৃতির বিরোধী পক্ষ—এই জন্য ধর্ম্মের সাহায্যেই আত্মা স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অতএব, আত্মা যে—অপ্রাকৃত বস্তু, এ বিষয়ে আমাদের স্বদেশীয় শাস্ত্রসমূহের সহিত কাণ্টের—ভিতরে ভিতরে পরমাশ্চর্য্য মিল রহিয়াছে।

আত্মা অপ্রাকৃত বস্তু—ত্রিগুণাতীত সদ্বস্তু; এক কথায়—পুরুষ; এবং জগতের আর সমস্তই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি। আত্মা পদ্মপত্রের ন্যায় নির্লিপ্ত হইয়া—সুখ দুঃখে অবিচলিত হইয়া—সাক্ষীরূপে স্বপদে অবস্থিতি করিয়া—প্রকৃতির নাট্য লীলা দর্শন করিতে অধিকারী। আত্মা কূলে দাঁড়াইয়া দেখেন যে, প্রকৃতির যত কিছু ব্যাপার সমস্তই শুদ্ধ কেবল—ঈশ্বরের প্রভাব স্ফুরণ এবং জগতের অভাব পূরণ। প্রথমে ঈশ্বর-প্রভাব আকর্ষণ রূপে অবতীর্ণ হইয়া সাধারণতঃ সকল বস্তুর প্রভেদের মধ্যে অভেদ সংস্থাপন করে—এইটি প্রথম অভাব পূরণ;

তাহার পরে—প্রাণরূপে অবতীর্ণ হইয়া শাখা পত্রাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে ঐক্য সূত্র সঞ্চালন করে—ইহাতে স্বগত ভেদের মধ্যে প্রভেদ সংস্থাপিত হয়;—কেননা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ তাহা স্বগত ভেদ। ইহাই দ্বিতীয় অভাব-পূরণ;

তাহার পরে—মনোরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বজাতীয় ভেদের মধ্যে অভেদ সংস্থাপন করে; কেননা, মাতা শাবকের মধ্যে, দম্পতির মধ্যে, যূথের মধ্যে, যেরূপ প্রভেদ তাহা স্বজাতীয় ভেদ; প্রাণ যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি স্বগত ভেদের মধ্যে ঐক্য-বন্ধন করে, মন সেইরূপ স্ত্রীপুত্রাদি স্বজাতীয় ভেদের মধ্যে ঐক্য-বন্ধন করে;—ইহাই তৃতীয় অভাব পূরণ।

তাহার পরে ঈশ্বরের প্রভাব বুদ্ধিরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিজাতীয় ভেদের মধ্যে অভেদ সংস্থাপন করে;—বাহ্য জগতের সহিত অন্তর্জগতের যেরূপ বিজাতীয় ভেদ, সেই বিজাতীয় ভেদের মধ্যে ঐক্য বন্ধন করে; বুদ্ধির নিকটে "বসুধৈব কুটুম্বকং!" ইহাই চতুর্থ অভাব-পূরণ!

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতির

সমস্ত ব্যাপারই—(১) অভাব—তমোগুণ, (২) অভাব-পূরণের জন্য আঁকুবাঁকু—রজোগুণ, (৩) অভাব পূরণ—সত্ত্বগুণ; আবার (১) উচ্চতর অভাব, (২) তাহার পূরণ চেষ্টা এবং (৩) তাহার পূরণ; আবার ততোধিক উচ্চতর অভাব—ইত্যাদি। এইরূপ করিয়া প্রকৃতির ত্রিগুণ-চক্র নিয়তই ঘূর্ণিত হইতেছে। আমাদের বুদ্ধি প্রকৃতির অন্তর্ভূত সুতরাং তাহাও গুণ-চক্রে ঘূর্ণিত হইতেছে; জাগ্রৎকালে অভিব্যক্ত হইতেছে—নিদ্রাকালে বিলীন হইতেছে। কেবল, বুদ্ধির সাক্ষী-স্বরূপ যে, আত্মা, সেই আত্মাই কেবল গুণ-চক্রের বাহিরের বস্তু; আত্মা গুণ-চক্রে ঘূর্ণিত হয় না—পরন্তু স্থির ভাবে স্বপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া ত্রিগুণের নাট্যলীলা নিরীক্ষণ করে। আত্মা ত্রিগুণের অতীত অপ্রাকৃত বস্তু বলিয়াই শাস্ত্রে তাহা নির্গুণ শব্দে অভিহিত হয়। শাস্ত্র-অনুসারে, বুদ্ধি হ'চ্চে সত্ত্ব-গুণ—আত্মা হ'চ্চে সদ্‌বস্তু। আত্মা এবং বুদ্ধির মধ্যে এইরূপ ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর প্রভেদ। সত্ত্বগুণ অবশ্য অসত্ত্ব-গুণ দ্বারা (তমোগুণ দ্বারা) কোন-না-কোন অংশে পরিচ্ছিন্ন; কিন্তু সদ্‌বস্তু সত্ত্বাসত্ত্ব উভয়েরই মূলস্থিত—সুতরাং অসত্তা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। সমস্ত প্রকৃতিই ত্রিগুণাত্মক—আত্মা ত্রিগুণাতীত অথবা যাহা একই কথা—নির্গুণ। সমস্ত প্রকৃতিই সদসদাত্মক গুণচক্র—আত্মা সদ্‌বস্তু। ত্রিগুণাত্মক প্রাকৃত বস্তু হইতে ত্রিগুণাতীত সদ্বস্তুকে পৃথক্ রাখিবার অভিপ্রায়ে আত্মা বস্তুর পরিবর্ত্তে পুরুষ বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। ত্রিগুণাতীত সদ্‌বস্তুই (আত্মাই) পুরুষ শব্দের বাচ্য।

এই স্থানটিতে কাণ্টের সহিত বেদান্তের অনৈক্য-একটি দেখা দিতেছে। কাণ্ট্ যেখানে আত্মাকে নির্গুণ বলিয়াছেন, সেখানে তাহার সঙ্গে এই একটি টিপ্‌পনী জুড়িয়া দিয়াছেন যে, নির্গুণ কিনা X—অর্থাৎ নিতান্তই অনির্দ্দেশ্য, কি যে তাহা বলিতে পারা যায় না। তাহা বলিতে পারা যায় না—সত্য, কিন্তু বেদান্ত বলেন যে, তাহা ভিতরে ভিতরে জানিতে পারা যায়। ইচ্ছা দ্বারা কেমন করিয়া হস্ত-চালনা করিতে হয়—তাহা সকলেই জানে, অথচ কেহই তাহা অন্যকে বলিয়া, বুঝাইতে পারে না। অনেক বিষয় এরূপ আছে, যাহা শুদ্ধ কেবল আপনি মনে মনে বুঝিবারই কথা—অন্যকে বুঝাইবার কথা নহে। বেদান্ত নির্গুণ আত্মাকে X না বলিয়া উল্টা আরো বলেন—স্বপ্রকাশ। আত্মা বুদ্ধি-দ্বারা প্রকাশিত নহে কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানে আপনাতে আপনি প্রকাশিত। এই ভাবটি আপনার মনের অভ্যন্তরে অতীব সহজে বুঝিতে পারা যায় কিন্তু অন্যকে বলিয়া বুঝানো বড়ই শক্ত-ঠিন; কাজেই নিম্ন-লিখিত দৃষ্টান্তটির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল;—

ভূতল-শায়ী সূর্য্য-রশ্মি-ছায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন—কিন্তু সূর্য্যের নিজের গাত্রে লেশমাত্রও ছায়া স্থান পাইতে পারে না। ভূতল-শায়ী সূর্য্য-রশ্মি যেমন আলোক ছায়া এবং বর্ণ-বৈচিত্র্যে জড়িত—বুদ্ধির প্রকাশ সেইরূপ সত্ত্ব তমো এবং রজোগুণে জড়িত। কিন্তু সূর্য্যের নিজ-গাত্রে যেমন ছায়া, বর্ণ বৈচিত্র্য বা ছায়াবচ্ছিন্ন আলোক স্থান পাইতে পারে না, তেমনি আত্মার আত্ম-প্রকাশে তমোগুণ বা রজোগুণ বা সত্ত্বগুণ স্থান পাইতে পারে না। যে আলোক সূর্য্যের গাত্রে তন্ময়ীভূত তাহা সূর্য্যকে ছাড়িয়া বাহিরে বিনির্গত হয় না—এই জন্য তাহা রশ্মি-শব্দের

BLEED THROUGH.

বাচ্য হইতে পারে না। তবে কি? না যে আলোক সূর্য্য হইতে বিনির্গত হইয়া ছায়া এবং বর্ণ-বৈচিত্র্যের যোগে পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়, তাহাই রশ্মি শব্দের বাচ্য। তেমনি, বুদ্ধি-প্রকাশিত পরিচ্ছিন্ন সত্তাই সত্ত্বগুণ-শব্দের বাচ্য; ভূতলশায়ী সূর্য্যালোক যেমন ছায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন—সত্ত্বগুণও তেমনি তমোগুণ-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু আত্মার স্বপ্রকাশ সত্তা যেহেতু তমোগুণ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে এই জন্য তাহা সত্ত্বগুণ শব্দের বাচ্য নহে। সূর্য্যের গাত্রে যে আলোক তন্ময়ীভূত তাহা রশ্মি-শব্দের বাচ্য নহে—তাহা স্বয়ংই সূর্য্য; তাহা হইতে যে আলোক বাহিরে বিনির্গত হয়—তাহাই রশ্মি; তেমনি, আত্মাতে যে স্বপ্রকাশ জ্যোতি তন্ময়ীভূত আছে, তাহা সত্ত্বগুণ নহে—তাহা স্বয়ংই আত্মা; কেবল, যে জ্ঞান-জ্যোতি আত্মা হইতে বুদ্ধিতে বিনির্গত হয় তাহাই সত্ত্বগুণ—তাহাই রজস্তমোগুণ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন; যেমন—ভূতলশায়ী সূর্য্য-রশ্মি বর্ণ বৈচিত্র্য এবং ছায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। এখন কথা হ'চ্চে এই যে, সূর্য্যের নিজের গাত্রে তাহার রশ্মিপাত হয় না বলিয়া সূর্য্যকে কি আলোক-শূন্য তমঃপদার্থ বলিতে হইবে? আত্মা বহির্মুখী বুদ্ধির গম্য নহে বলিয়াই কি আত্মাকে জ্ঞান-শূন্য অচেতন বলিতে হইবে? কখনই না। রশ্মিই যদি জ্যোতিষ্মান হইল, তবে রশ্মির আকর যে, সূর্য্য, তাহা নিজে কত না জ্যোতিষ্মান্! রশ্মির আকর সূর্য্য যেমন জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ—বুদ্ধির আকর আত্মা তেমনি জ্ঞানময় পদার্থ; সূর্য্যও অদৃশ্য নহে—আত্মাও অজ্ঞেয় নহে। সূর্য্য আপনার গাত্রে রশ্মি-প্রয়োগ না করিয়াও জ্যোতিষ্মান্—আত্মা আপনার প্রতি বুদ্ধি-প্রয়োগ না করিয়াও স্বপ্রকাশ; তবে আর এ কথা কোথায় রহিল যে নির্গুণ আত্মা= X! আমাদের দেশের কোন শাস্ত্রই এরূপ কথা বলে না। সকল শাস্ত্রই একবাক্যে বলে যে, আত্মা বিশুদ্ধ জ্ঞানে প্রকাশমান—আত্মা স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃস্বরূপ; কোন শাস্ত্রই বলে না যে, আত্মা অপ্রকাশ তমঃস্বরূপ।

আত্মা কি অর্থে নির্গুণ এখন তাহা জলের ন্যায় স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। পৃথিবীতে সূর্য্যের রশ্মি-পতনই দিবা—রশ্মি-অপহরণই রাত্রি এবং উভয়ের সন্ধি-স্থলই সন্ধ্যা। সূর্য্যের নিজের গাত্রে রশ্মি-পতনও হয় না, রশ্মি-অপহরণও হয় না; অতএব সূর্য্য দিবা-রাত্রি-সন্ধ্যা তিনের মূলাধার হইয়াও নিজে দিবা-রাত্রি-সন্ধ্যা বিবর্জ্জিত। সেই রূপ প্রকৃতিতে আত্মার জ্যোতিঃপতন সত্ত্বগুণ, জ্যোতিঃসংহার তমোগুণ, এবং উভয়ের সন্ধি-স্থল রজোগুণ; সুতরাং জ্ঞানময় আত্মা সত্ত্বরজস্তমোগুণের মূলাধার হইয়াও নিজে সত্ত্বরজস্তমোগুণ-বিবর্জিত।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, শাস্ত্র এবং যুক্তি অনুসারে নির্গুণ আত্মা বলিতে ত্রিগুণাতীত স্বপ্রকাশ সদ্‌বস্তু বুঝায়—অপ্রাকৃত পুরুষ বুঝায়, তা ভিন্ন—অনির্দ্দেশ্য X বুঝায় না।

সাধনের চরম সংকল্প পরমাত্মাকে আত্মার অভ্যন্তরে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত বিমল আনন্দ উপভোগ করা; কিন্তু তাহার জন্য চিত্ত-শুদ্ধি সর্ব্বপ্রথমেই আবশ্যক। চিত্ত-শুদ্ধি আর কিছু নয়—প্রকৃতির আকর্ষণ হইতে—বিষয়ের মায়াজাল হইতে—অবিদ্যা হইতে—আত্মাকে নির্মুক্ত করা। এখন কথা হ'চ্চে এই যে, আত্মা যদি বিষয়াকর্ষণ হইতে—অবিদ্যার

হস্ত হইতে—একেবারেই পরিত্রাণ পায়, তবে তাহার কোন প্রকার অভাব থাকে না;—আত্মা শরীরাদির সহিত অকাট্য শৃঙ্খলে নিবদ্ধ বলিয়াই, তাহার যত কিছু অভাব—শরীরাদি হইতে নির্লিপ্ত হইলে তাহার কোন অভাবই থাকে না; অভাব যদি না থাকিল, তবে কার্য্য কিরূপে থাকিবে? কেন না, অভাব-পূরণের জন্যই কার্য্যের যাহা কিছু প্রয়োজন। অভাবই যদি নাই—তবে কার্য্য কিসের জন্য? ইহার উত্তর এই যে, অবিদ্যা-মুক্ত আত্মা অভাবের উত্তেজনায় কার্য্য করে না—প্রভাবের উচ্ছ্বাসেই কার্য্য করে। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, সদসদাত্মক প্রকৃতি অভাব-পূরণের জন্য কার্য্য করে—অভাবের উত্তেজনাতেই কার্য্য করে; কিন্তু অবিদ্যা-মুক্ত বিশুদ্ধ আত্মার কোন অভাব নাই—তাহার কার্য্য তবে কি রূপ? ইহার উত্তর এই যে, প্রকৃতি সদসদাত্মক; প্রকৃতির সত্তা আপেক্ষিক সত্তা; কোন প্রাকৃত সত্তাই আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে—কাজেই কোন প্রাকৃত বস্তুই ভিন্ন বস্তু-দ্বারা চালিত না হইয়া কার্য্য করিতে পারে না,—সূর্য্যের আকর্ষণ ব্যতিরেকে পৃথিবী ঘুরিতে পারে না। প্রকৃতি সদসদাত্মক আপেক্ষিক সত্য বলিয়াই তাহার কার্য্যের দশা এইরূপ। প্রকৃতি নিজে যেমন সদাসদাত্মক; তাহাকে যেমন সৎও বলিতে পারা যায় না—অসৎও বলিতে পারা যায় না; প্রকৃতির কার্য্যও তেমনি সদাসদাত্মক অর্থাৎ সৎও নহে অসৎও নহে। তেমনি আবার, অবিদ্যা-নির্মুক্ত আত্মা নিজে যেমন সদ্‌বস্তু—তাঁহার কার্য্যও তেমনি সৎকার্য্য। আত্মার স্বধর্ম্মোচিত কার্য্যে আত্মার সদ্ভাবই ব্যক্ত হয়—প্রভাবই ব্যক্ত হয়—অভাব ব্যক্ত হয় না। "আমার কোন অভাব নাই—আমি স্থির আছি" এইভাবে আত্মা আপনার অটল কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিয়া কার্য্য করে—আপনার কার্য্যে আপনার প্রভাব সমর্থন করে। প্রকৃতির কার্য্য আর এক-রূপ;—"অন্যে আমাকে চালাইতেছে—আমি আপনি কিছুই নহি" এইভাবে প্রকৃতি আপনার কর্ত্তৃত্বে জলাঞ্জলি দিয়া কার্য্য করে—আপনার কার্য্যে আপনার অভাব ব্যক্ত করে। অতএব এরূপ আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক যে, আত্মা অবিদ্যার ক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইলেই তাহা জড়বৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকিবে। তাহা দূরে থাকুক্—বিবেচনা করিয়া দেখিলে উল্টা আরো এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে-আত্মার নিজের কোন অভাব নাই—নিদ্রা নাই তন্দ্রা নাই জরা নাই ব্যাধি নাই পাপ নাই তাপ নাই, সে আত্মার—জগতের অভাব-মোচনের জন্য শত গুণ উৎসাহের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবারই কথা। এই টুকুই কেবল বলা যাইতে পারে যে, সে আত্মা অভাবের উত্তেজনায় কোন কার্য্য করিতে পারে না—অবিদ্যা-দ্বারা চালিত হইয়া কোন কার্য্য করিতে পারে না; তা ভিন্ন—এরূপ বলা যাইতে পারে না যে, সে আত্মার আদবেই কোন কার্য্য নাই। অবিদ্যা-নির্মুক্ত বিশুদ্ধ আত্মা যদি জগতের অভাব মোচনের জন্য আপনার প্রভাব ব্যক্ত না করিবেন—তবে কে তাহা করিবে? সূর্য্য যদি জগতের অন্ধকার অপহরণ করিবার জন্য কর-প্রসারণ না করিবেন তবে কে তাহা করিবে? অতএব আপনার অভাব ব্যক্ত করা যেমন প্রকৃতির স্বধর্ম্মোচিত কার্য্য, আপনার প্রভাব ব্যক্ত করা সেইরূপ আত্মার স্বধর্ম্মোচিত কার্য্য। প্রকৃ-

তির কার্য্যেতেই প্রকাশ পায় যে, প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক আপেক্ষিক সত্য; এবং আত্মার কার্য্যেতেই প্রকাশ পায় যে, আত্মা ত্রিগুণের উপরের বস্তু, অপ্রাকৃত সদ্‌বস্তু; এক কথায়—পুরুষ। কিন্তু তাহার মধ্যে বিশেষ একটি মন্তব্য কথা আছে;—বলিলাম বটে যে, অবিদ্যামুক্ত আত্মার কোন অভাব নাই কিন্তু—কিসের অভাব নাই? সদসদাত্মক—ত্রিগুণাত্মক—প্রাকৃত কোন কিছুর অভাব নাই। প্রাকৃত অভাব নাই বটে কিন্তু পারমার্থিক অভাব রহিয়াছে; ত্রিগুণাত্মক ভৌতিক অভাব নাই বটে কিন্তু গুণাতীত আধ্যাত্মিক অভাব রহিয়াছে—জ্ঞান-প্রেমের অভাব রহিয়াছে; যে অভাব দ্বারা সমস্ত প্রকৃতি চালিত হইতেছে—সে অভাব নাই; কিন্তু সে অভাব কোন প্রাকৃত বস্তুরই নাই—সে অভাব কেবল আত্মাতেই দেখিতে পাওয়া যায়—কি? না ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা এবং ভগবৎ-প্রেম-পিপাসা। যদি বল যে, ত্রিগুণাত্মক প্রাকৃত অভাব হইতে আধ্যাত্মিক অভাব—গুণেই না-হয় বড় কিন্তু জাতিতে তো অভিন্ন; তবে তাহার উত্তর এই যে,—না তাহা নহে—জাতিতেও তাহা বিভিন্ন। প্রাকৃত অভাব—থাকে এক স্থানে—এবং তাহার পূরণ হয় আর এক স্থান হইতে; ক্ষুধা উদরে, ধান্য—ক্ষেত্রে বা গোলায়। কিন্তু ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অভ্যন্তরেই ব্রহ্মজ্ঞান জাগিতেছে—ভগবৎ-প্রেমপিপাসার অভ্যন্তরেই ভগবৎ প্রেমানন্দ জাগিতেছে;—এখানে অভাব এবং প্রভাবের মধ্যে দেশকালের একটুও ব্যবধান নাই। পরমাত্মা যখন আত্মার অভ্যন্তরে বর্ত্তমান আছেন—তখন সাধকের প্রেম-পিপাসা পরিতৃপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহা পরিতৃপ্ত হইয়া বসিয়া আছে; শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছিলেন যে, দুর্য্যোধনাদি শত্রু-সকল মরিবার পূর্ব্বেই মরিয়া বসিয়া আছে। আধ্যাত্মিক অভাবের বিশেষ লক্ষণ এই যে, তাহা তাহার আপনার বাঞ্ছিত ধনের আপনিই ভাণ্ডার; আত্মা নিজেই পরমাত্মা-রূপ পরম ধনের ভাণ্ডার। এই কারণবশতঃ আধ্যাত্মিক অভাব অভাব-নামেরই অযোগ্য। আধ্যাত্মিক অভাব নহে—শুদ্ধ কেবল প্রাকৃত অভাবই তমোগুণ শব্দের বাচ্য। পারমার্থিক সম্বন্ধ প্রাকৃত সম্বন্ধের ঠিক্ উল্টা দিকে অবস্থিতি করে; মুক্ত আত্মা যখন প্রকৃতিকে বলে যে, তোমাকে আমার কোন আবশ্যক নাই তখন তাহার অর্থই এই যে, তোমার পর্দ্দার আড়ালে পরম পুরুষ যিনি বিরাজমান তাঁহাকেই আমার প্রয়োজন। প্রকৃতি হইতে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইবার অর্থই হ'চ্চে—অন্তরতম পরমাত্মার প্রতি মুখ ফিরানো। বিবেক এবং বৈরাগ্য দ্বারা আত্মাকে মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিলে—আত্মাকে অবিদ্যা হইতে নির্মুক্ত করিলে—আত্মা এমনি ভাস্বর হইয়া উঠে যে, তাহা হইতে জ্যোতিষ্কণা বিনিষ্ক্রান্ত হইতে থাকে—তাহাই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা; আত্মা এমনি রসার্দ্র হয় যে, তাহা হইতে অমৃত ধারা উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে—তাহাই ভগবদ্ভক্তি এবং ভগবৎ প্রীতি। সে জ্যোতিকেও প্রকৃতি আঁটিয়া উঠিতে পারে না—সে উচ্ছ্বাসকেও প্রকৃতি আঁটিয়া উঠিতে পারে না—পরমাত্মা স্বয়ং আসিয়া দেখা দিলে তবেই মুক্ত আত্মার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। মুক্ত জীবের সহিতই বা পরমাত্মার সম্বন্ধ কিরূপ, আর, বদ্ধ জীবের সহিতই বা তাঁহার সম্বন্ধ কিরূপ, এখন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। সংক্ষেপে এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, বদ্ধ জীবের সহিত পরমাত্মার আশ্রয়-আশ্রিত সম্বন্ধ; মুক্ত জীবের সহিত প্রীতি-ভক্তির সম্বন্ধ। অথবা যাহা আরো ঠিক্—মনুষ্য যে অংশে বদ্ধ জীব অর্থাৎ শরীরী জীব, সেই অংশে পরমাত্মার সহিত তাহার আশ্রয়-আশ্রিত সম্বন্ধ; আর, মনুষ্য যে অংশে মুক্ত জীব অর্থাৎ অশরীরী আত্মা, সেই অংশে পরমাত্মার সহিত তাহার প্রীতিভক্তির সম্বন্ধ। পরমাত্মার আশ্রয়-নিকেতনে আমাদের ত্রিগুণাত্মক প্রাকৃত জন্ম হয়, এবং তাঁহার প্রেম-নিকেতনে আমাদের ত্রিগুণাতীত আধ্যাত্মিক জন্ম হয়। এই আধ্যাত্মিক জন্মেরই নাম মুক্তি।

প্রকৃতির দিক্ দিয়া পরমাত্মা আমাদের সাংসারিক নানা প্রকার অভাব পূরণ করিতেছেন, এবং মুক্তির দিক্ দিয়া তিনি আমাদের প্রীতি আকর্ষণ করিতেছেন। কেননা বন্ধন-ক্ষেত্রে প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না—মুক্তি-ক্ষেত্রেই (স্বাধীনতা ক্ষেত্রেই) প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত এবং বর্দ্ধিত হইতে পারে। এক জন ক্রীতদাসকে বন্ধন করিয়া তাহার নিকট হইতে বল পূর্ব্বক প্রীতি আদায় করিতে যাও দেখি—কখনই তাহা পারিবে না; কিন্তু তাহার বন্ধন মোচন করিয়া তাহাকে মুক্তি প্রদান কর তাহা হইলে সে তোমাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিবে। এমন কি, স্বাধীন-শব্দের অর্থই হ'চ্চে প্রেমের বাধ্য; পরাধীন শব্দের অর্থই হ'চ্চে বলের বাধ্য। অতএব মুক্তি-ক্ষেত্রই প্রেমের উর্ব্বরা ভূমি। জীবাত্মা অবিদ্যা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরমাত্মাকে হৃদয়াভ্যন্তরে প্রীতির সহিত আলিঙ্গন করিবে—এইটিই জীবাত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার। শাস্ত্রের যাঁহারা খোসা চর্ব্বন করেন তাঁহাদের অনেকেরই এইরূপ একটি ভ্রম জন্মে যে, জীবাত্মা মুক্ত হইয়া আপনাতে আপনি জড়সড়ো হইয়া অজ্ঞানান্ধকারের অতলস্পর্শ গর্ত্তের অভ্যন্তরে নিঝুম হইয়া পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু প্রকৃত শাস্ত্রানুসারে এটি মুক্তির লক্ষণ নহে—প্রত্যুত ঘোরতর তমোগুণের লক্ষণ। মৃগের প্রতি ব্যাঘ্রের দৃষ্টি একরূপ, শিশুর প্রতি মাতার দৃষ্টি আর-একরূপ; ব্যাঘ্রের দৃষ্টিতে মৃগের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়া যায়, মাতার দৃষ্টিতে শিশুর বুদ্ধির কলিকা বিকসিত হইয়া উঠে। পরমাত্মার অনির্ব্বচনীয় প্রেম-দৃষ্টিতে জীবাত্মার হৃদয়-কপাট উন্মুক্ত হয়—জীবাত্মার অন্তরতম ভাব সকল বিকসিত হইয়া উঠে—সুবিমল আনন্দের অভ্যুদয়ে জীবাত্মার সমস্ত কামনা চরিতার্থ হয়; ইহারই নাম মুক্তি। যে মুক্তি হইতে ঈশ্বরাভিমুখে প্রীতি উৎসারিত হইয়া সমস্ত জগৎকে অমৃত ধারায় প্লাবিত করে, যে মুক্তিতে নিত্য নিত্য ঈশ্বরের নব নব কল্যাণ, নব নব করুণা, নব নব আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইতে থাকে, এবং ঈশ্বরের নব নব শোভা এবং সৌন্দর্য্যের কপাট উন্মোচিত হইতে থাকে; যে মুক্তিতে ঈশ্বর-প্রীতি কখনই পুরাতন হয় না—কিন্তু নব নব রাগে রঞ্জিত হইয়া, নব নব রসে পরিপূরিত হইয়া, নব নব আনন্দে উৎসারিত হইয়া, মুক্ত জীবকে মঙ্গল হইতে মঙ্গলতর—অন্তর হইতে অন্তরতর—ধামের জন্য প্রস্তুত করিতে থাকে, সেই মুক্তিই প্রকৃত মুক্তি।

সাধকের সাধন কেবল মুক্তি-পথের বিঘ্ন অপসারণ করিবারই জন্য; সাক্ষাৎ সম্বন্ধে—শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপই মুক্তির প্রদাতা। কি প্রকারে পরমাত্মা জীবাত্মাকে মুক্তি প্রদান করেন—ইহা শুদ্ধ কেবল অন্তরে অনুভব করিবারই কথা,

মুখে বলিয়া বুঝাইবার কথা নহে ; ইঙ্গিতচ্ছলে কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, বীর নেপোলিয়ন যখন ভীরুকে বীর করিয়া তুলিতে পারেন, ভক্ত চৈতন্য যখন ডাকাতকে ভক্ত করিয়া তুলিতে পারেন, তখন মুক্ত স্বরূপ পরমাত্মা যে, বদ্ধ জীবকে মুক্ত করিয়া তুলিবেন, —ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। অগ্নিই অঙ্গারকে অগ্নি করিয়া দেয়, কাচ-পোকাই আর্সুলাকে কাচ-পোকা করিয়া দেয়, আনন্দেই আনন্দ উদ্দীপন করিয়া দেয় ; মুক্ত-স্বরূপই আত্মাকে মুক্ত করিয়া দেন।

প্রকৃত কথা এই যে, গৃহকে সুসজ্জিত এবং সুপরিষ্কৃত করা অতীব কর্ত্তব্য ; কিন্তু তাহা করিলেও গৃহ উজ্জ্বল হয় না—প্রিয়তমের আগমনেই গৃহ উজ্জ্বল হয় ; আত্মাকে অবিদ্যা হইতে নির্ম্মুক্ত করা অতাব কর্ত্তব্য ; কিন্তু তাহা করিলেও আত্মা মুক্ত হয় না—পরম প্রেমাস্পদের আগমনেই আত্মা মুক্ত হয়—রোগ-মুক্ত শোক-মুক্ত ব্যাধি-মুক্ত জরা-মুক্ত পাপ-মুক্ত তাপ-মুক্ত। ইহারই নাম মুক্তি।

মুক্ত জীব ঈশ্বরের সহিত উত্তরোত্তর নব নব আনন্দ উপভোগ করিয়া উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে উন্নতিতে পদার্পন করে। বেদান্ত-শাস্ত্রের মতানুসারে মুক্ত জীব যে, ঈশ্বর হইয়া যা'ন না তাহার প্রমাণ—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-ভাষ্যের উপসংহার-ভাগে বলিয়াছেন

"জগদুৎপত্ত্যাদি ব্যাপারং বর্জ্জয়িত্বা অন্যদ্ অণিমাদ্যাত্মকং ঐশ্বর্য্যং মুক্তানাং ভবিতুমর্হতি। জগদ্ব্যাপারস্তু নিত্য সিদ্ধস্যৈবেশ্বরস্য।"

ইহার অর্থ ;—জগদুৎপত্ত্যাদি ব্যাপার ব্যতীত 'অণিমা'-আদি আর যত প্রকার ঐশ্বর্য্য আছে সমস্তই মুক্ত পুরুষের অধিকারায়ত্ত ; জগদ্ব্যাপার কিন্তু নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরেরই কেবল অধিকারায়ত্ত। এইরূপ, বেদান্ত নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের সহিত সাধনসিদ্ধ মুক্ত জীবের প্রভেদ স্বীকার করেন ; কোন্ অংশে তবে ঈশ্বরের সহিত মুক্ত পুরুষের অভেদ ? বেদান্ত বলেন—"ভোগসাম্যে।" অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ ঈশ্বরের সহিত কামনার সমস্ত ফল উপভোগ করে—আনন্দ হইতে আনন্দ—মঙ্গল হইতে মঙ্গল উপভোগ করে—এইখানেই ঈশ্বরের সহিত মুক্ত জীবের অভেদ। এইরূপ, অভেদের মধ্যে প্রভেদ এবং প্রভেদের মধ্যে অভেদ, ইহাই স্বদেশীয় বিদেশীয় সকল শাস্ত্রেরই মর্ম্মগত অভিপ্রায়। যাঁহারা ভেদাভেদের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন তাঁহারা এক-পক্ষের হইয়া আর-এক পক্ষের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন না ; যাঁহারা প্রভেদ-শূন্য অভেদের অথবা অভেদ-শূন্য প্রভেদের পক্ষপাতী তাঁহারাই পরস্পরের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করেন।

উপদেশ।

(বলুহাটী সাম্বৎসরিক উৎসব)

নশ্বর পৃথিবীর অন্নপানে প্রতিপালিত হইয়া, অস্থায়ী যশোমান খ্যাতি প্রতিপত্তির ভিখারী হইয়া, ধন ঐশ্বর্য্য স্ত্রী পুত্র পরিবারের মায়ায় মুগ্ধ হইয়াও আজ আমরা কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম ! এখানে কেন বিষয়ের দুশ্চিন্তা, বিষয়ীর সদর্প তীব্র কটাক্ষ আমারদের মর্ম্মস্থল প্রকম্পিত করিতে পারিতেছে না ! কেন বা আমরা মান-অভিমান সম্পদ-বিভব বিস্মৃত হইয়া ধনী দরিদ্রে একাসনে আসীন হইয়া মহেশের যশঘোষণায় স্বরস্বতীতীর প্রতিধ্বনিত করিতেছি ! বিষয়ের কীট হইয়াও কেন বা শ্মশানবৈরাগ্য

আমারদের অন্তরে জাগ্রত হইয়া উঠিল ! অজস্র কামনার বিষয়ের মধ্যে ডুবিয়াও কেন বা দুরপনেয় গভীর শূন্য, হৃদয়-মধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া পড়িল ! আজন্মকাল বিষয়মদিরা পানে যে দিশাহারা হইয়া পড়িয়া ছিলাম, অতি সন্তর্পণে আপনাকে ধর্ম্ম ঈশ্বর হইতে বহুদূরে রক্ষা করিয়াছিলাম, কে হৃদয়দেশ আলোড়িত করিয়া মোহ-যবনিকা আমারদের সম্মুখ হইতে অপসারিত করিয়া দিল ! কে হৃদয়ের মত্ততা বিদূরিত করিয়া দিয়া বিষয় ভোগের চিরপরিচিত বর্ত্ম হইতে আমাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিল, পথহারা দেখিয়া কল্যাণের পথে কে আমাদিগকে আহ্বান করিল ! কে বলিয়া দিল যে ধরাপৃষ্ঠকে সর্ব্বস্ব জানিয়া জীবনের অর্দ্ধাঙ্ক সমাপিত করিলাম, উহা আমারদের তাবৎ নহে !

সকল মনুষ্যেরই ক্ষুদ্র জীবনে এমন একটি সময় উপস্থিত হয়, যখন বিষয়ের চির অভ্যস্ত আমোদ প্রমোদ তাহাকে আর আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না। যখন ঘোরতর ঝটিকা প্রবল বেগে উত্থিত হইয়া পৃথিবীর উচ্ছেদদশা আনয়ন করে, মৃত্যুর করাল মুখব্যাদনে আত্মীয় স্বজন আমারদের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন, যখন আপনার বলিয়া কাহাকেও গাঢ় আলিঙ্গনে সংবদ্ধ করিতে পারি না, যখন আপনাকে নিতান্ত অসহায় ও নিরাশ্রয় জানিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকি, তখন বুঝিতে পারি যে পৃথিবী আমারদের সর্ব্বস্ব নহে, এখানকার সুখশান্তি আমোদ-প্রমোদ আমারদের অন্তরের পিপাসা শান্ত করিতে সক্ষম নহে। সাংসারিক সুখের এই চির অতৃপ্তিই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র হেতু। মনুষ্য ধ্রুব সত্যের ভিখারী। সংসার তাহার হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে না বলিয়াই সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পরিপূর্ণ আনন্দের দিকে ধাবমান হয়। যে আনন্দের ক্ষয় নাই, যে আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইলে আর তাহা হইতে কোন কালে বিচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, দেবতারা যে আনন্দের ভিখারী সেই দেব-উপভোগ্য আনন্দ লাভ করিবার জন্য মর্ত্ত্যের কীট ক্ষুদ্র মনুষ্যের আন্তরিক পিপাসা। সেই জন্যই আমরা পরিদৃশ্যমান অনায়াস-লব্ধ পার্থিব-সুখে বিসর্জ্জন দিয়া সাধন-লব্ধ কৃচ্ছ্র সাধ্য ভবিষ্যৎ-গর্ত্ত-নিহিত সুখের আশায় ইহকালের আমোদ প্রমোদকে আহুতি দিয়া অনন্তের দিকে ধাবমান হইতেছি, অবিদ্যার বিনাশে ধ্রুব অমৃতত্বকে জানিতে দৃঢ়ব্রত হইয়াছি। যে জ্ঞান ঈশ্বরের পথের নিয়ামক তাহা লাভ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি।

পার্থিব ও অপার্থিব উপাদানে মনুষ্য শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে। রক্তমাংসঅস্থি-সমন্বিত স্থূলদেহ ধূলিকণিকায় পরিনির্ম্মিত, পৃথিবীর রসে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উহাকেই তাবৎ জানিয়া পরিশেষে জলবুদ্বুদের ন্যায় উহাতেই লীন হইয়া যাইতেছে। অপার্থিব উপাদান সমুদ্ভূত জীবাত্মা ক্ষুদ্র হইয়াও অপরিসীম ক্ষমতা ধারণ করে। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্রসমন্বিত বিশাল পৃথিবী যেমন জড়শরীরস্থ ক্ষুদ্র চক্ষুর একমাত্র লক্ষ্যস্থল, সেইরূপ যিনি চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রের অন্তরাত্মা, যিনি চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রের নিয়ন্তা, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র যাঁহাকে জানে না তিনিই জীবাত্মার একমাত্র গ্রাহ্য। চক্ষু আবশ্যক বল লাভ করিলে যেরূপ জড় পৃথিবীকে আপনার সম্মুখে দর্শন করে ; জীবাত্মার অসাড়তা বিদূরিত হইলে—সংসারের নশ্বরতা তাহার নিকট প্রতিভাত হইলে উহা সাধন

BLEED THROUGH.

তপস্যা বলে জ্বলন্ত ঈশ্বরকে আপনার সম্মুখে দেদীপ্যমান দেখে ও পবিত্র পরিশুদ্ধ পরমাত্মাকে আপনার নিজস্ব ধন ও চরমগতি জানিয়া আপ্তকাম হয়। যদি সমুদায় সংসার বিনষ্ট হইয়া যায়, যদি সূর্য্য চন্দ্র গগন হইতে অন্তর্হিত হয় তথাপি তাহার চক্ষু ঈশ্বর হইতে পরিচ্যুত হয় না।

যিনি সমুদয় জগতের অধিপতি, যাঁহার অসীম রাজ্যে একই কৌশল কার্য্য করিতেছে, তিনি চান যে তাঁহার প্রত্যেক সন্তান তাঁহার দিকে অগ্রসর হয়। তিনি সেই জন্য তাঁহার অনন্ত উদার ক্রোড় সকলেরই জন্য আগ্রহের সহিত উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। বিমল আত্মপ্রসাদ বিধান করিয়া তাঁহার প্রত্যেক দুর্ব্বল সন্তানকে তাঁহার দিকে অল্পে অল্পে আহ্বান করিয়া লইতেছেন। আমারদের বিপদ সম্পদেও তিনি আমাদিগকে বিস্মৃত নহেন। প্রতি বিপদের দারুণ কশাঘাতে আমাদিগকে তাঁহার দিকে লইয়া যাইতেছেন। অণ্ড নিহিত শিশুকে পরিপুষ্ট জানিয়া যেমন পক্ষী, চঞ্চুর আঘাতে সেই অণ্ড ভেদ করিয়া দিয়া শাবককে মুক্তবায়ুতে আনয়ন করে, তেমনি যখনি আমরা সম্পদের আগারে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করি, আপনার আশা ভরসা এখানেই সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলি, তখনই বিশ্বজননী বিপদের তীব্র কুঠারাঘাতে ক্ষণ তৃপ্তিপ্রদ সুখের পার্থিব উপাদানগুলিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেন, আমারদের সম্মুখে নূতন রাজ্যের নূতন ভাবের নূতন কল্যাণের যবনিকা ক্রমে ক্রমে উন্মোচন করেন ও ধর্ম্মক্ষেত্রের বিশাল গগনে সঞ্চরণ করিবার শক্তি সামর্থ্য প্রদান করিতে থাকেন। রজনীর ঘোর অন্ধকার বিদূরিত হইলে যখন রক্তিম পূর্ব্বগগনে আরক্ত সূর্য্য স্বীয় কিরণ জাল বিস্তার করে, তখন আশু-প্রবুদ্ধ ব্যক্তি যেমন একেবারে নয়ন উন্মীলন করিয়া আলোকমালার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারেন না, প্রত্যুত ধীরে ধীরে অভ্যাস করিয়া লন, তেমনি আজন্ম-সহচর বিষয় হইতে মনুষ্য-হৃদয়কে আপনার দিকে আকৃষ্ট করিবার সময়ে সেই পরমপিতা বিষয়ের অসারতা ক্রমশঃ দেখাইয়া দিয়া পরিশেষে তাহাকে আপনার পথের পথিক করেন। এ পৃথিবীতে যে না তাঁহার প্রেমের প্রেমিক হইল, তাঁহার অবিশ্রান্ত করুণা পরজগতে তাহার অনুসরণ করিবে। তাঁহার রাজ্যে ঘোর বিষয়ীরও নিস্তার নাই। বিষয়ী আর কতদিন তাহার অতুল্য সম্পদে আপনাকে বিস্মৃত হইয়া থাকিবে। তাঁহার দ্বার চির উন্মুক্ত, তাঁহার হস্ত চিরকার্য্যকর!

তাঁহার রাজ্যের চির-বিচিত্রতা দেখিয়া তাঁহার গুণগানে দিক্‌বিদিক্ প্রতিধ্বনিত কর। তিনি মনুষ্যের সুখের জন্য পৃথিবীকে সুচিত্র ভূষণে অলঙ্কৃত করিলেন, আনন্দের কতশত উৎস উৎসারিত করিলেন। উপরে নক্ষত্রখচিত চন্দ্রাতপে পৃথিবীর মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন, নিম্নে ওষধি বনস্পতির লাবণ্যে ফলপুষ্পের মাধুরীতে, ইতস্ততঃ সঞ্চরমান পশুপক্ষীদিগের কলনিনাদে নিত্য বিশাল উৎসবে মর্ত্ত্যলোক উৎসবান্বিত করিয়া দিলেন! কিন্তু মনুষ্যের জন্য বৈরাগ্যের বীজ রোপণ করিতে বিস্মৃত হইলেন না। মনুষ্য তাঁহার নিত্য-উদার-সদাব্রতে অন্নপান লাভ করিয়াও চঞ্চল ঘটনার মধ্যে অস্থির অবস্থাচক্রে পতিত হইয়া তাঁহাকে না পাইয়া চিরশান্তি লাভ করিতে পারিল না। সেই জন্যই আমরা অগণ্য সুখে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও হৃদয়ের অপূর্ণতা পরিহারের জন্য তাঁহার দ্বারে তাঁহার আদেশে আগমন করিয়া প্রসাদ-বারির আশে তৃষিত চাতকের ন্যায় ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া রহিয়াছি।

আমরা সংসারের অনিত্যতা বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। আজ দিগন্ত-বিশ্রান্ত উত্তাল তরঙ্গ-মালা-সমাকীর্ণ স্বরস্বতীর প্রখর তেজের অবসান হইয়াছে, তাহার সুগভীর ভীষণ গর্ত্ত বিশুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে, উহার তলদেশে এই ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত রহিল। ইহার প্রাণদাতা কালের করাল কুক্ষির মধ্যে স্থান পাইয়া অপার ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেছেন। হয়ত আমাদের মধ্যে অনেকেই সংসারের আশা ভরসায় বিসর্জ্জন দিয়া প্রান্তর মধ্যস্থ তরুর ন্যায় এককীই পৃথিবীর ঝঞ্ঝা তরঙ্গের আলোড়ন সহ্য করিতেছেন। হয়ত রোগ শোকের প্রবল আক্রমণে অনেকের দেহযষ্টি ক্ষীণ হইয়া ইহকালের পরপারের অব্যাহত যোগানন্দ প্রেমানন্দ সম্ভোগের উপযুক্ত হইতেছে। হয়ত বৈষয়িক বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়া অনেকের প্রাণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়া ব্রাহ্মসমাজের সুশীতল ছায়ার মধ্যে তাঁহাকে আনয়ন করিয়াছে। যাঁহারা ঈদৃশ বিপৎপাতের হস্ত হইতে বহুদূরে আছেন, তাঁহারা দুর্নিবার্য্য ঝটিকার কঠোরতা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য সহজে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হউন। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" এখানে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। তিনি ভিন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার কেহ নাই।

যতদিন শরীরের সঙ্গে আমারদের আত্মার যোগ ততকাল বিষয়ের নিকট হইতে আমরা চিরবিদায় গ্রহণ করিতে পারিব না; শরীরের দাসত্ব স্বীকার করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিষয়ের অধীন হইয়াছি। আমরা প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসমান না হইয়া যাই, ইহারই জন্য আমাদিগকে নিয়ত সাবধান থাকিতে হইবে। চরিত্রকে বিশুদ্ধ রাখিতে হইবে, ঈশ্বরকে হৃদয়ের প্রভু জানিয়া নিত্যনিয়মে তাঁহাকে প্রীতি উপহার প্রদান করিতে হইবে। তাঁহার আদিষ্ট কর্ম্ম বলিয়া সংসারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ব্রহ্মযোজিতচিত্তে ফলকামনাশূন্য হইয়া অনাসক্ত ভাবে বিষয় উপভোগেই জীবনকাল অতিবাহিত করিতে হইবে। পৃথিবীর সুখশান্তি অনিত্য জানিয়া এখানকার প্রতি পরিবর্ত্তনে বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে হইবে।

আমারদের চারিদিকে অনিত্য বিষয়ের গণ্ডী। চারিদিকে বিষয় কোলাহল, নিরাশার ক্রন্দন, সম্পদের অট্টহাস্য! ইহার মধ্যে যোজিতচিত্ত হইয়া অনন্ত ব্রহ্মধামের দিকে অল্পে অল্পে অগ্রসর হওয়াই আমারদের লক্ষ্য। যখন আপনার ক্ষুদ্র বলের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, তখন আর কোন আশা থাকে না। জীবনের অধিকাংশ কাল বিষয়ের সেবাতেই পর্য্যবসিত হইল। তিনি আমারদের ইহ-জীবনের নেতা, আমারদের অমর আত্মার চিরসঙ্গী। সে সঙ্গ ছাড়িয়া কুৎসিত আমোদ প্রমোদে দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম কলঙ্কিত করিলাম। তিনি যে আত্মার উন্নতি সাধনের গুরুভার আমারদের মস্তকের উপর অর্পণ করিয়াছেন, আজ সাশ্রু নয়নে কম্পিত কলেবরে নিজ নিজ জীবন পুস্তক উৎঘাটনে আপনার হীনতা ও মলিনতা অনুভব করিয়া মৃতপ্রায় হইয়া যাইতেছি। অনন্ত আকাশ যাঁর গুরুভার ধারণ করিতে পারে না, এই সমাজ মন্দিরে তাঁহার উজ্জ্বল-মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া সকলে হৃদয়ের প্রজ্বলিত হুতাশন নির্ব্বাণ করিয়া দাও, কৃত অপ-

রাধের জন্য অনুতাপের সহিত তাঁহার নিকট যোড়করে প্রার্থনা কর, দৈববলে বলী হইবার জন্য তাঁহার দেবপ্রসাদ ভিক্ষা কর, তাঁহার অভয় হস্ত দেখিয়া নির্ভয় হও।

আজ আমারদের সাম্বৎসরিক মহোৎসব। আজ আনন্দের তরঙ্গ এখানে প্রবাহিত হইতেছে। মর্ত্ত্যের নীচ কামনা আমারদের মন হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া গিয়াছে। আজ আমরা বন্ধুবান্ধব সহ সম্মিলিত হইয়া বিষয়ের উপরিতন স্তরে মুক্ত বায়ুতে সঞ্চরণ করিয়া তাঁহার মঙ্গল মূর্ত্তি সন্দর্শনে বিমল আনন্দলাভের অধিকারী হইয়াছি। আকাশমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণকারী জ্যোতির্ব্বেত্তা জ্যোতিষ্কমণ্ডল সন্দর্শন করিবার সময় যেমন উচ্চমঞ্চে আরোহণ করেন, তেমনি আমরা আজ আকাশের অতীত দেবদেব মহাদেবের পূর্ণ মহিমা সন্দর্শন করিবার জন্য বিষয় রাজ্যের সীমার বহির্দেশে—পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে আগমন করিয়াছি। ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর ভাবের পূতিগন্ধ আমাদের মস্তককে বিকৃত করিতে পারিতেছে না।

হে পরমাত্মন্! এই উৎসব-আমোদের দিবসে তোমার নিকট আর কি প্রার্থনা করিব। তোমার অনিমিষ চক্ষু আমারদের উপরে দিনযামিনী সমভাবে নিপতিত রহিয়াছে। আমারদের জীবন তোমার করুণার প্রবাহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমারদের কি সাধ্য যে তোমার অতুলন মুখচ্ছবি সকল সময়ে সন্দর্শন করিয়া সাংসারিক অভ্যুদয় ও বিপর্য্যয়ের মধ্যে অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারি। আমরা মর্ত্ত্যের কীট হইয়া সংসার জলধির পরপারে তোমার অক্ষয় অনন্ত ব্রহ্মধাম দেখিতে পাইব এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। বিষয় চিন্তা ক্ষণকালের জন্য অস্তমিত হইয়াছে। তুমি এই অবকাশে আমারদের শূন্য হৃদয়কে অধিকার কর। যেখানে শত শত সূর্য্যের বিমল কিরণে দিক্‌বিদিক্ জ্যোতিষ্মান রহিয়াছে, যেখানে রাত্রি নাই, জরা মৃত্যুর আধিপত্য নাই, কেবলই উৎসবানন্দ প্রেমানন্দের মনোহর তান অনবরত উত্থিত হইতেছে, যেখানে দেবতাদিগের স্তুতিগানে দিক্‌বিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যেখানে তোমার প্রেমের কুসুম চারিদিকে একে একে বিকসিত হইতেছে, যেখানে চিরবসন্ত বিরাজমান রহিয়াছে, যেখানে সকল সাধকে পরিবৃত হইয়া তোমার যশঘোষণা করিতেছে, যেখানে তোমার আলোকে সাধকের হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইতেছে, তুমি সেই ছবি একবার দূর হইতে আমারদিগের নয়নের সম্মুখে ধারণ কর, তোমার প্রেমের প্রেমিক কর, যে আমরা সংসারকে একেবারে ভুলিয়া যাই, তোমার প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া উদাসীনের ন্যায় নশ্বর সুখের ঘোর পিপাসা হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করি। "আবিরাবীর্ম্মএধি" তুমি আমারদের সম্মুখে চির বিরাজিত থাক, যেন আর পথহারা হইয়া তোমার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না হয়। তুমি যে অকৃত অমৃত পুরুষ, আমরা যে অমরত্ব লাভের একমাত্র অধিকারী, আমরা যেন তাহা সম্যক অবধারণ করিয়া তোমার পূজার্চ্চনায় অমর আত্মার পাথেয় সম্যকরূপে সংগ্রহ করিয়া লইতে পারি। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এ আশীর্ব্বাদ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্যাখ্যানমঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্যের ব্যাখ্যান মূলক পদ্য।

চতুর্ব্বিংশ ব্যাখ্যান।

(বিগত কার্ত্তিক মাসের পত্রিকার ১৪৩ পৃষ্ঠার পর)

মোরা মূঢ় মতি, বিষয়ের প্রতি
অমৃত আশয়ে ধাই।
আশায় বিফল, শুধু হলাহল,
লঙ্ঘনা কতই পাই॥
অমৃত সাগর, হয়েন ঈশ্বর,
জীবনের আস্বাদন।
তিনি শান্তি ধাম, তিনিই আরাম,
দুখে সুখ তিনি হ'ন॥
করুণা তাঁহার, গম্ভীর অপার,
অনুক্ষণ হৃদি স্মর।
তাঁর পথে যাও, তাঁর নাম গাও,
তাঁহার বচন ধর॥

বিষয় বাসনা ছাড়ি, তাঁহারে ভজিব,
তাঁর প্রেমেতে গলিব।
তাঁর পানে চাহি, মোহ পাশ পাশরিব,
তাঁরে পরাণ সঁপিব॥
এই চান তিনি—হ'ব তাঁহারি বলিয়া—
দিতেছেন দিব্য জ্ঞান।
মলিন কামনা হ'তে শোধিছেন হিয়া,
দেন অমৃত সোপান॥
বিগত জীবন লাগি না করিহ ভয়,
ডাক তাঁরে সকাতরে।
দুঃখের প্রেমের অশ্রু হেরি দয়াময়,
কাছে ডাকেন সাদরে॥
তাঁহার সহিত প্রেমে জীবন যাপিতে—
তাঁরে করি দরশন!
যত করিয়াছ আশ, তাঁহারে লভিতে,
সব হইবে পূরণ॥
যাঁর বলে চলিতেছে সকল সংসার,
তাঁরে চাও ধর্ম্ম বল।
প্রেয় পরিহরি কর তাঁর পথ সার,
হবে জীবন সফল॥
তাঁর প্রেম যদি আসে তোমার হৃদয়ে—
সেই প্রেমের লক্ষণ।
পুরাতন চলি যা'বে মলিনতা লয়ে
হবে নূতন জীবন॥
ভাতিলে সে প্রেম-সূর্য্য হৃদয়-গগনে—
কি বা আনন্দ অপার।
ক্ষুদ্রভাব খদ্যোতিকা পলায় সঘনে,
দূরে যায় অন্ধকার॥
হৃদয়-কমল ফুটে সে সূর্য্য কিরণে,
গন্ধ তাঁরে দান করে।
প্রাণ-পাখী গায় তবে প্রেমানন্দ মনে।
তাঁর বায়ুতে বিহরে॥
স্বর্গীয় সে জ্যোতিঃ হৃদি হইলে নির্ব্বাণ,
ঘেরে অজ্ঞান নিশায়।
রিপু অবসর পেয়ে হয় তেজীয়ান্,
ঘোর বিপদ ঘটায়॥
আপনার নাম—তবে আপনার মান,
কিসে হইবে বিস্তার।
বাসনা পুরাতে হয় আকুল পরাণ,
তাহা বাড়ে অনিবার॥
হেন দশা নাহি হো'ক—ভুলিব তা হ'লে,
কেন জীবন ধারণ।
দেব-ভাব হৃদয়ের সব যা'বে চলে,
হবে অধোতে পতন॥
না রহিবে তাঁর দ্বারে কাঁদিয়া প্রার্থনা,
যদি তারেন পামরে।
যদি পাপ রাশি তিনি করেন মার্জ্জনা,
নিজ কৃপা গুণ তরে॥
যাবে—সেই ঊর্দ্ধ দৃষ্টি সে নয়ন পানে,
তাঁর সহবাস-আশ।
যাহা পেলে স্বর্গ ভোগ হয় এই খানে,
যার মিটেনা পিয়াস॥
ঈশ্বর করুণ তাঁর প্রেমেতে মজিয়া,
যেন ভুলি আপনারে।
তাঁহার চরণে ভক্তি একান্তে রাখিয়া,
যেন চলি এ সংসারে॥

BLEED THROUGH.

প্রচারিতে তাঁর নাম—পূজা—বিশ্বময়।
তাঁর ভাবে গলে যা'তে সবার হৃদয়॥
তাঁর কার্য্য—তাঁর সেবা—করে জগজন।
তাঁরে পায় লোকে; ইথে করহ যতন॥

প্রার্থনা।

হে নাথ! অজ্ঞান অন্ধ আমরা সবাই।
তোমার সত্যের পথ দেখিতে না পাই॥
কৃপা করি তুলে লও প্রেয় পথ হ'তে।
লয়ে যাও তব শুভ অমৃতের পথে॥
কেমনে তোমার নাম করিব প্রচার।
কেমনে তোমার ধর্ম্ম করিব বিস্তার॥
দুর্ব্বল—অধীন—লই তোমার শরণ।
করুণা কটাক্ষ তুমি কর বিতরণ॥
দুর্ব্বলে করহ বলী, সভয়ে অভয়।
তোমার কৃপায় নাথ! কিবা নাহি হয়॥
ইতি চতুর্বিংশ ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

পত্র।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে এখন হইতেই ১১ মাঘের উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এই উৎসবের প্রথম দিনে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের নামে এবং দ্বিতীয় দিনে ভক্তিভাজন প্রধানাচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে উৎসব করা হয়। ১৮০২ শকের ১৮ পৌষ তারিখে উৎসবের এই নিয়ম ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মমন্দিরে ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের দ্বারা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি তৎকালে বেদী হইতে যে সকল কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন আমরা এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। "আমাদিগের ধর্ম্মপিতা পরে আসিলেন। তিনি জীবিত আছেন। পিতামহকে বিস্মরণ হওয়া যেমন অসম্ভব পিতাকে বিস্মৃত হওয়া তেমনি অসম্ভব। তাঁহার ঋষি ভাব, যোগ ভাব, বিশুদ্ধ প্রীতির ভাবের নূতন সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হইলাম। তিনি তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের নিকট যাহা পাইয়াছিলেন তাহার তিনি নিয়মাদি স্থির করিলেন। একটি অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসক মণ্ডলীর রাজ্য স্থাপিত হইল। রামমোহন রায়ের সময়ে মণ্ডলী গঠিত হয় নাই। তাঁহার কার্য্যের অবশিষ্টাংশ যিনি পরে আসিলেন তিনি করিলেন। * * ইনি বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় ঋষি আত্মা। এই পবিত্র ঋষি আত্মা—দেবেন্দ্রনাথের আত্মা বঙ্গরাসীর মন সবল ও সুস্থ করিল। যখন ইনি স্বর্গ হইতে আইসেন তখন ঈশ্বর ইহাঁকে দীক্ষিত করিয়া দেন। ইনি ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিয়া দুই এক বৎসর নয়, কিন্তু যৌবন হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত ইহাঁর সমস্ত শরীর মন উদ্যম তোমার আমার ন্যায় জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মপিতার নাম দেবেন্দ্রনাথ।"

কেশব বাবু এখন স্বর্গারোহণ করিয়াছেন কিন্তু তিনি যে মণ্ডলীর প্রাণস্বরূপ ছিলেন সেই মণ্ডলীর ভগবদ্ভক্ত ও সাধুভক্ত মহাত্মারা পূর্ব্বধারা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। গত ১৯ পৌষ তারিখে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় প্রভৃতি চারি জন ভক্ত ১১ই মাঘের শুভ উৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ত্তমান আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন। যে লিখিত পত্রের সহিত তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

একান্ত বন্দনীয় ধর্ম্মপিতা
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহাশয় শ্রীচরণকমলে—

ভক্তিপূর্ণ প্রণাম পূর্ব্বক শ্রীচরণে নিবেদনমিদম্,

গত কল্য হইতে ঊনষষ্টিতম মাঘোৎসবের প্রাথমিক কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আমরা এই শুভ উৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছি, আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

নববিধান সমাজ
৭৮নং অপরসর্কুলর রোড
১৯ পৌষ ১৮১০ শক।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল
শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র
শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন
শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়
শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসু

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
ফাল্গুন ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯।

৫৪৭ সংখ্যা ১৮১০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্।
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বং নিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঊনষষ্টি সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ বুধবার ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯।

প্রাতঃকাল।

আমাদিগের শুভ ব্রহ্মোৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃকালে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সুসজ্জিত সুপ্রশস্ত বহিঃপ্রাঙ্গণে চন্দ্রাতপের নিম্নে ব্রহ্মোপাসনা হয়। দেশ বিদেশ লইয়া লোকসংখ্যা আশাতীত হইয়াছিল। যেমন জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারিত হইতেছে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মোৎসবের জন্য লোকের উৎসাহ ও অনুরাগ বাড়িতেছে। এই উৎসবে কোন রূপ বাহ্য আড়ম্বর নাই, তথাচ জনতা, ইহাতে বোধ হয় এক সময় এই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশের সকল জাতি ও সকল বর্ণের একমাত্র আশ্রয় হইবে। ফলত প্রাতের লোকসমাগম অতিশয় প্রীতিজনক হইয়াছিল, এই উপলক্ষে বহুদিনের পর অনেক সাধুর দর্শন পাইয়াছিলাম। একমাত্র ব্রহ্ম আমাদিগের উপাস্য। তাঁহার নামেই সকলে আসিয়াছিলেন। তিনিই এই উৎসবের অধিষ্ঠাতা, সুতরাং বাহ্য সৌন্দর্য্য না থাকিলেও ইহাতে চমৎকৃত হইবার পূর্ণ আয়োজন ছিল। যিনি একবার এই উৎসব ভোগ করিয়াছেন তিনি জীবদ্দশায় কিছুতেই ইহা বিস্মৃত হইতে পারেন না। এই জন্য ব্রহ্মোৎসবে এরূপ জনতা। বেলা ৮ ঘটিকার সময় উপাসনা আরম্ভ হয়। সভাস্থল নিবাত নিস্কম্প দীপের ন্যায় স্থির। ব্রহ্মজ্ঞেরা ব্রহ্মযোগে যুক্ত। সমবেত গায়কদিগের মধুর কণ্ঠ গগনাভোগ ভেদ করিয়া অনন্তে মিলিতেছে; সমস্ত সাধু হৃদয় সঙ্গীত সুধায় উন্মত্ত। ফলত প্রাতঃকালের উপাসনা জীবন্তভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। উপাসনার পর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী এই উপদেশ পাঠ করেন।

আবার সম্বৎসর পরে ১১ মাঘের প্রাতঃসূর্য্য একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মগণকে উদ্বোধিত করিয়া পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়াছে। সূর্য্যরশ্মি যেমন শতধা বিকীর্ণ হইয়া সৌর জগতের প্রত্যেক পদার্থকে রঞ্জিত করিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মের হৃদয়ে

ব্রহ্মানন্দ আবির্ভূত হইয়া তাঁহার মুখশ্রীকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। ভক্তের প্রাণে আজ স্বর্গীয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে, 'মঙ্গলের প্রতিদান—কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস হৃদয়ের প্রাচীর ভঙ্গ করিয়া ছুটিতে চায়, কে তাহা নিবারণ করিবে! আত্মার আত্মজ্ঞান উজ্জ্বল হইয়া, মনের পবিত্রতা পরিশুদ্ধ হইয়া এবং হৃদয়ের প্রেম প্রশস্ত হইয়া আজ একস্রোতে সেই ব্রহ্মপদের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে। ভক্তের চক্ষু আজ যে দিকে ফিরিতেছে সেইদিকেই কি এক অপূর্ব্ব শোভা, মঙ্গলের নিদর্শন এবং গূঢ় গভীর জ্ঞান প্রেমের আভাস নিরীক্ষণ করিয়া পুলকিত হইতেছে। ঊর্দ্ধে নির্ম্মল আকাশ, নিম্নে তরু নদী, ভূধর প্রান্তর সকলি আজ মধুময়, অমৃতময়। ব্রহ্মাণ্ডপতি পরমেশ্বরের "আনন্দরূপমমৃতং" অদ্যকার বিশেষ আরাধ্য বস্তু। আজ সেই আনন্দ-সাগরে অমৃত-সাগরে অবগাহন করিয়া, আজ সেই আনন্দ-সাগরের, অমৃত-সাগরের আনন্দামৃতবারি পান করিয়া এরূপ সুশীতল হইতে হইবে যাহাতে আমরা চিরদিন আত্মতৃপ্ত হইয়া থাকিতে পারি; সংসারের কোন শোক, কোন তাপ যাহাতে আর আমাদিগের আত্মাকে বিক্ষোভিত করিতে না পারে। পাপ করিয়া সংশোধিত হইবার জন্য আমরা যাঁহার রুদ্র মুখ অবলোকন করি, পুণ্যে উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য যাঁহার প্রসন্ন মঙ্গল মূর্ত্তি দেখিতে পাই, অদ্যকার এই মাঘোৎসবের পবিত্র দিবসে তাঁহারই "আনন্দরূপমমৃতং" সর্ব্বত্র সন্দর্শন করিতেছি। তিনি আনন্দরূপে অমৃত রূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যেমন এই উৎসবের মূলে প্রাণ সঞ্চার করিতেছেন, আবার আমাদের উপভোগের জন্য আমাদের হৃদয়েও আনন্দধারা, অমৃতধারা প্রবাহিত করিতেছেন। এই উৎসব দিনে এই অমৃতানন্দ হইতে যে জ্ঞানানন্দ আমরা লাভ করিতেছি তাহা আমাদের অনন্তকালের সম্বল—তাহা আমাদের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালের নিঃসংশয় নির্ভর। ইহা হইতে এই জ্ঞান সহজেই আমাদের মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হইতেছে যে, যে দিন এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এই বিবিধ বিচিত্র বস্তুজাত কিছুই ছিল না, কোথাও এক বিন্দু পরমাণুও ছিল না, তখনকার সেই অসীম শূন্য পরিপূর্ণ করিয়া যে এক মহাপ্রাণ, যে এক আদিকারণ জাগ্রৎ ছিলেন তাহা আনন্দেরই রূপ। আর সেই আনন্দস্বরূপ আদিকারণে স্বধা নাম্নী প্রকাশোন্মুখী যে এক মহা শক্তি নিহিত ছিল যাহাতে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন কাল ও ভুঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোক অব্যক্ত ছিল, তাহা আনন্দই অব্যক্ত ছিল। সেই আনন্দের মঙ্গলময়ী ইচ্ছা হইতে এই যে বিশ্বব্যাপার উৎপাদিত হইতেছে ইহাও এই আনন্দের আবহ। গুহাস্থ প্রস্রবণ হইতে নদী সকল প্রবাহিত হইয়া যে সমুদ্রের মহা আয়তন পূর্ণ করিতেছে তাহা সলিলই। প্রস্রবণের ঝর ঝর নিনাদ, বেগবতী নদীর কল কল শব্দ এবং মহাসাগরের গভীর নির্ঘোষ যেমন নিনাদই, সেইরূপ সেই আদি কারণ প্রাণ স্বরূপ মহেশ্বরের অব্যক্ত মহিমা তখনকার সেই আত্মজ্যোতি, ব্যক্ত মহিমা বহির্জ্যোতি এই গ্রহনক্ষত্রখচিত বিশাল বিশ্ব এবং পারকালিক অনন্ত মঙ্গলের প্রতি আমাদের আত্মার এই যে নিঃসংশয় বিশ্বাস এ সকলি সেই আনন্দই। তাই যখন তপঃপরায়ণ ভগবদ্ভক্ত পুরুষ আপনার আত্মার বিমল দর্পণে পরমাত্মার পরম সত্য জ্যোতি নিভৃতে সন্দর্শন করিতে থাকেন তখন তাঁহার মনে এত আনন্দ উৎসারিত হয়। তাই যখন মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গের সঙ্গীত এক প্রান্তরে বহির্গত হইয়া অন্যপ্রান্তরে অবসান পাইতে ধাবিত হয়, তখন পথিকের মনে এত আনন্দের উদয় হয়। তাই যখন কোমল লাবণ্যবতী লতিকার উপরে সুন্দর পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় তখন উদ্যান এত সুন্দর হইয়া উঠে। তাই যখন অঙ্কপূর্ণকারী সরল শিশুর মুখে মধুর হাস্য-রেখা অঙ্কিত হয় তখন জননীর হৃদয়ে এত আশা আনন্দের সঞ্চার হয়। তাই যখন অন্ধকার আকাশে চন্দ্র তারকার উদয় হয় তখন যামিনী এত মধুময় হয়, সূর্য্য উদিত হইলে দিবস এত শুভ্র হয়। তাই পরলোক-গমনোন্মুখ তাপস যখন আপনার অনন্ত জীবনের পথ পরিমুক্ত ও পরিশোভিত দেখেন তখন তাঁহার আত্মার এত শান্তি এত তৃপ্তি পরিলক্ষিত হয়। আনন্দেরই এই সকল প্রতিরূপ। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই তপঃপরিশুদ্ধ প্রাচীন ঋষি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সকলি একটি আনন্দের ধারা। আদিতে আনন্দ, বর্ত্তমানে আনন্দ এবং ভবিষ্যতে আনন্দ। কারণে আনন্দ, কার্য্যে আনন্দ এবং অবসানে আনন্দ। যিনি নিখিল জগতের একমাত্র সেব্য কূটস্থ পরব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপ ইহ জীবনে বুঝিতে পারিয়াছেন তিনি আর কাহা হইতে এবং কোথাও হইতে ভয় প্রাপ্ত হন না। তিনি সেই আনন্দ রস অহরহ পান করিয়া আত্মতৃপ্ত হয়েন। যদি সেই আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম এই আকাশে বিরাজিত না থাকিতেন তবে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ পদার্থ মৃত্যুর গভীর অন্ধকারময় ক্রোড়ে নিদ্রিত থাকিত। সেই আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মই এই সকলের পরম গতি, ইনিই সকলের পরম সম্পদ, ইনিই সকলের পরম লোক, ইনিই সকলের পরমানন্দ। এই পরমানন্দ স্বরূপে যিনি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেন, সকল নির্ভরের সহিত তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহাকে আর কোন অনিত্য পরিমিত লোকের অস্থায়ী অপূর্ণ সুখের জন্য প্রার্থনা করিতে হয় না। তিনি শাশ্বত আনন্দনীয় পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়েন। তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন এবং হৃদয়গ্রন্থি সমুদায় হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন।

আমরা এই মর্ত্ত্যের কীট হইয়া এবং জন্ম জরা মৃত্যুর সতত পরিবর্ত্তনশীল চক্রে বিঘূর্ণিত রহিয়া এই যে সংশয়রহিত পরম অমৃতের আস্বাদন প্রাপ্ত হইতেছি ইহা সকল বিশ্বাসের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবকেই স্মরণ করিয়া দেয়। ব্রাহ্মেরই এই সৌভাগ্য যে তিনি জ্ঞান প্রেম ও পবিত্রতার বলে আনন্দময় পরব্রহ্মের সহবাসের যোগ্য হইয়াছেন। মধুমক্ষিকা যেমন আপনার সূক্ষ্ম চঞ্চুর বলেই পুষ্পের গুপ্ত মধু ভাণ্ডার হইতে মধুপান করিতে সক্ষম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্ম, জ্ঞান, ধর্ম্ম ও পবিত্রতার বলেই সেই সত্যের পরমনিধান অমৃতভাণ্ডার হইতে অমৃতানন্দ উপভোগ করিতে সক্ষম হয়েন। এক সম্প্রদায় মনুষ্য আছে, ব্রহ্মলাভের প্রতি যাহাদের কিছুমাত্র যত্ন ও শ্রদ্ধা দেখা যায় না। তাহারা এই ভূলোকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জনের প্রতি অবহেলা করিয়া পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পারিল না। মৃত্যুর পরে তাহাদের জ্ঞানময় আনন্দময় লোক হইতে বহুদূরে থাকিতে

হইবে। মৃত্যুর পূর্ব্বেও অজ্ঞানমেঘে আবৃত থাকিয়া তাহাদিগকে আত্মগ্লানির শিলাঘাত সহ্য করিতে হইতেছে। যে লোকে আত্মার যে অনুসারে জ্ঞান ধর্ম্ম প্রস্ফুটিত হয়, সেই অনুসারে সেই লোকে তাহার ব্রহ্মানন্দ উপভোগ হয়। সত্যপন্থানুগামী ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মেরই ব্রহ্মানন্দ লাভের অধিকার। তিনি কল্যাণ হইতে কল্যাণতর এবং আনন্দ হইতে আনন্দতর লোকে উত্থান করেন। ব্রাহ্মের এই অধিকার এই জন্য যে তিনি এখানে থাকিয়াই আনন্দ স্বরূপ অমৃত স্বরূপ পরব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছেন। ব্রাহ্ম ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছেন এই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, হে সমাগত ব্রাহ্মগণ! আইস, আজ আমরা এই ব্রহ্মোৎসবে ব্রহ্মের জয় ঘোষণা করি। আর সেই ঋষির সহিত এক স্বরে সেই বাক্য প্রতিধ্বনিত করি যে ঋষি জাহ্নবীতীরে বা হিমাচলের পাদমূলে দণ্ডায়মান হইয়া একদিন আকাশপূর্ণ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা আযে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণন্তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"

হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র সকল তোমরা শ্রবণ কর। আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি; সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তর ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীমৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদেশ পাঠ করেন।

সম্বৎসর পরে আবার আমরা ভ্রাতায় ভ্রাতায় পিতাপুত্রে বন্ধু বান্ধবে মিলিয়া দেবারাধ্য পরম পিতার সুপবিত্র কল্যাণ ছায়ায় সমুপবিষ্ট হইয়াছি। সূর্য্য উঠিতে না উঠিতে আজ আমরা আমাদের সকল উৎসবের অধিদেবতা—সকল সম্পদের মূলাধার—সকল বিপদের কাণ্ডারী পরম প্রভু পরমাত্মাকে স্মরণ করিয়া এই আনন্দে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছি যে, আজ আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার অনুপম আনন্দরসে, তাঁহার দেব-দুর্লভ প্রেম-সুধায়, তাঁহার অমোঘ মঙ্গল আশীর্ব্বাদে মনের সাধে আমাদের হৃদয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ করিব। কাঁহার ইচ্ছায় এখানে আমরা আজ সম্মিলিত হইয়াছি? যাঁহার ইচ্ছায় নৈশ নভোমণ্ডলে তারকা-জ্যোতি সম্মিলিত হয়, সরোবরে বিকসিত পঙ্কজ-শ্রেণী সম্মিলিত হয়, বনবিপিনে পুষ্পিত তরুরাজি সম্মিলিত হয়, তাঁহারই ইচ্ছায় অদ্য এখানে আমরা সম্মিলিত হইয়াছি। পিতা মাতা যেরূপ দৃষ্টিতে সন্তান-মণ্ডলীর প্রতি নিরীক্ষণ করেন, প্রাণ-সখা যেরূপ দৃষ্টিতে প্রাণ-সখার প্রতি নিরীক্ষণ করেন, গুরু যে রূপ দৃষ্টিতে প্রিয় শিষ্যের অর্দ্ধস্ফুট জ্ঞানালোকের প্রতি নিরীক্ষণ করেন সেইরূপ ইচ্ছা-পূর্ণ মঙ্গল দৃষ্টিতে ঈশ্বর সর্ব্বজগৎকে এবং আমাদের প্রত্যেককে নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার বিশ্ববিজয়ী মঙ্গল আশীর্ব্বাদ সূর্য্য কিরণের ন্যায় সর্ব্ব জগতে অনাবৃত রহিয়াছে; এবং ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় আমাদের প্রত্যেকেরই আত্মার অভ্যন্তরে গূঢ়রূপে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে; তাই আমরা আপনার আপনার অজ্ঞাতসারেও—এমন কি ইচ্ছার বিরুদ্ধেও—অনেক সময়ে এরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়ি যাহাতে পরিণামে সর্ব্বজগতের মঙ্গল

হয়। যাঁহার মঙ্গল-আশীর্ব্বাদ আমাদের সুষুপ্তির অভ্যন্তরেও আমাদের অজ্ঞাতসারে অতন্দ্রিত ভাবে কার্য্য করিতে থাকে, য এষ সুপ্তেষু সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ তাঁহারই মঙ্গল আশীর্ব্বাদে আমরা এখানে সমাগত হইয়া কৃত-পুণ্য হইয়াছি। মঙ্গল দুই নহে—মঙ্গল এক। সেই—এক মঙ্গলের সঙ্গে সমস্ত জগতের সমস্ত ব্যক্তির সমস্ত মঙ্গল অনির্ব্বচনীয় প্রেমসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে; সে মঙ্গল কি? না ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা। আমাদের আপনার আপনার প্রতি আপনার আপনার যত না মঙ্গল ইচ্ছা, ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা তাহা হইতেও অপরিসীম অধিক; কেন না আমরা তাঁহারই পুত্র কন্যা। অতএব তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার প্রতি বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করিও না—সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত, কৃতজ্ঞতার সহিত, শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত, সেই ঐকান্তিক মঙ্গল ইচ্ছাটি আপনার হৃদয়াভ্যন্তরে আত্মসাৎ করিয়া তদনুসারে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ কর এবং অনায়াসে অন্ধকারের পরপারে উত্তীর্ণ হও, "স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ" তোমাদের ইহকালে পরকালে মঙ্গল হউক্।

আমরা আজ আপনার আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করিয়া অদ্য যে এখানে সবান্ধবে সম্মিলিত হইয়াছি—আমাদের এ ইচ্ছা ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছারই প্রতিধ্বনি; কেননা, গোড়াতে ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল ইচ্ছা না করিলে, আমরা আপনারাও আমাদের মঙ্গল ইচ্ছা করিতাম না—করিতে পারিতামও না। এই তত্ত্বটি না বুঝিয়া বর্ত্তমান কালের কৃতবিদ্য লোকেরাও ফরাসীস দেশের নূতন-সৃষ্ট এই একটা কথায় নির্ব্বিবাদে ঘাড় পাতিয়া দেন যে, আপনার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি একেবারেই বিমুখ হইয়া শুদ্ধ কেবল পরের জন্য কার্য্য করাই ধর্ম্ম-কার্য্য; অন্ধ প্রকৃতি যেমন শুদ্ধ কেবল পরের জন্য কার্য্য করে—সেইরূপ পরার্থ-পরতাই ধর্ম্ম; যেন আপনার মঙ্গলের জন্য কোন কার্য্য করিলে সে কার্য্যের কোন পারমার্থিক মূল্য নাই। ইহাঁদের এ কথা যদি সত্য হয়, তবে আপনার স্ত্রী পুত্র ভ্রাতাভগিনীর মঙ্গলের জন্য কার্য্য করিলে তাহারও কোন পারমার্থিক মূল্য নাই—কেননা আপনার স্ত্রী পুত্রপরিবার আপনারই সামিল; তবে কি? না আমার আপনার সহিত মূলেই যাহার কোন সম্পর্ক নাই—নিতান্তই যে আমার পর—তাহার মঙ্গলের জন্য কার্য্য করিলে তবেই তাহা ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে! এ তো কেবল দেখিতেছি—উপস্থিত ছাড়িয়া অনুপস্থিতে হাত বাড়ানো। যে আপনার মঙ্গল বোঝে না সে অন্যের মঙ্গল কিরূপে বুঝিবে? যে আপনার মঙ্গলের প্রতি অযত্ন করে—সে অন্যের মঙ্গলের প্রতি কিরূপে যত্নবান্ হইবে? যে আপনার পুত্রকে খাওয়া পরা দিতে পারে না, সে কিরূপে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়া তাহাকে ভরণ-পোষণ করিবে? আপনার মঙ্গলকে যদি মঙ্গল বলিয়া বোধ না হয়—তবে পরের মঙ্গলকে কিরূপে মঙ্গল বলিয়া বোধ হইবে? যাঁহারা মনে করেন যে, আপনার মঙ্গলের প্রতি বিমুখ হইয়া পরের মঙ্গল সাধন করাই নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম—তাঁহারা নিঃস্বার্থ শব্দের প্রকৃত অর্থ এখনো পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই। "নিঃস্বার্থ"—শব্দ একটি বই নয়, কিন্তু তাহার অর্থ দুইরূপ হইতে পারে; নিঃস্বার্থ-শব্দের এক অর্থ পরার্থ—আর এক অর্থ পরমার্থ; পরার্থ কি? না আপনাকে আদবেই ধর্ত্তব্যের মধ্যে না ধরিয়া

WORM EATEN.

—আপনাকে জগৎ হইতে একেবারেই ছাঁটিয়া ফেলিয়া—পরের জন্য কার্য্য করা; ইহারই নাম পরার্থ। আমাদের স্বদেশীয় শাস্ত্রের মতানুসারে পরার্থ-পরতা অন্ধ প্রকৃতিরই ধর্ম্ম; অন্ধ প্রকৃতি আপনার জন্য কোন কার্য্যই করে না—যাহা কিছু করে সকলই অন্যের জন্য। পরমার্থ তবে কি? সংক্ষেপে বলিতে হইলে সর্ব্বজগতের মঙ্গল সাধন করা, ইহাই পরমার্থ। কিন্তু ইহার অর্থ ভাঙিয়া বলিতে হইলে এইরূপে তাহার টীকা করা আবশ্যক যে, সর্ব্বজগতের মধ্যে তুমিও আছ—আমিও আছি—সকলেই আমরা আছি। সর্ব্বজগতের মঙ্গল সাধন করা যদি আমার কর্ত্তব্য হয়, তবে আমার আপনার মঙ্গল সাধন করাও আমার কর্ত্তব্য; কেননা আমি সর্ব্বজগৎ ছাড়া কোন কিছু নহি—আমিও সর্ব্বজগতের অন্তর্ভূত একজন ব্যক্তি। এইরূপে আমরা পাইতেছি যে, অন্ধ প্রকৃতির ন্যায় আপনার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি বিমুখ হইয়া জগতের মঙ্গল সাধনে তৎপর হওয়াই পরার্থ-পরতা; আর, আপনাকে শুদ্ধ ধরিয়া জগতের মঙ্গল সাধনে তৎপর হওয়াই পরমার্থ-পরতা। স্বার্থের সঙ্গে পরার্থ এবং পরমার্থ এ দুয়ের কাহার কিরূপ সম্বন্ধ, তাহার প্রতি একবার প্রণিধান করিয়া দেখিলেই, পরার্থ এবং পরমার্থের মধ্যে প্রভেদ যে, কি, তাহা কাহারো নিকটে অব্যক্ত থাকিবে না। অতীব সংক্ষেপে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, স্বার্থ এবং পরার্থের মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় সম্বন্ধ; কিন্তু স্বার্থ এবং পরমার্থের মধ্যে এক দুই সম্বন্ধ; সে কেমন? না যদি বলি যে, প্রথম মুদ্রাটি গ্রহণ করিও না দ্বিতীয় মুদ্রাটি গ্রহণ কর, তবে প্রথম মুদ্রাটি বাদ পড়িয়া যায়; কিন্তু যদি বলি যে, একটি মুদ্রা গ্রহণ করিও না—দুইটি মুদ্রা গ্রহণ কর, তবে দুইটির কোনটিই বাদ পড়ে না। এ যেমন—তেমনি যদি বলি যে, স্বার্থের উদ্দেশে কার্য্য করিও না—পরার্থের উদ্দেশেই কার্য্য কর, তবে স্বার্থ একেবারেই বাদ পড়িয়া যায়; কিন্তু যদি বলি যে, স্বার্থের উদ্দেশে কার্য্য করিও না—পরমার্থের উদ্দেশে কার্য্য কর, তবে স্বার্থ এবং পরার্থ এ দুয়ের কোনটিই বাদ পড়িয়া যায় না; কেননা স্বার্থ এবং পরার্থ দুইই পরমার্থের অন্তর্ভূত। আমরা তাই বলি যে, "অনেক" যেমন এক হইতে ভিন্ন, নিঃস্বার্থ তেমনি স্বার্থ হইতে ভিন্ন; কিন্তু অনেক বলিতে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বুঝায় না—দুই তিন চা'র পাঁচই বুঝায়; তেমনি নিঃস্বার্থ বলিতে তোমার স্বার্থ, আমার স্বার্থ, সকলেরই স্বার্থ, এক-সঙ্গে বুঝায়—পরমার্থ বুঝায়; আমার স্বার্থ ছাড়িয়া তোমার স্বার্থ বুঝায় না—পরার্থ বুঝায় না; কেননা, প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয়ই যেমন দুয়ের অন্তর্ভূত, স্বার্থ এবং পরার্থ উভয়ই তেমনি পরমার্থের অন্তর্ভূত। অনেককে পাইলে যেমন এককেও সেই সঙ্গে পাওয়া হয়, নিঃস্বার্থকে পাইলে তেমনি স্বার্থকেও সেই সঙ্গে পাওয়া হয়। কেবল মাত্র প্রথমকেও দুই বলা যাইতে পারে না—কেবল-মাত্র দ্বিতীয়কেও দুই বলা যাইতে পারে না; তেমনি, কেবল মাত্র স্বার্থকেও পরমার্থ বলা যাইতে পারে না—কেবল-মাত্র পরার্থকেও পরমার্থ বলা যাইতে পারে না; তবে কি? না প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয়ের একীভূত ভাবই দুই; স্বার্থ এবং পরার্থ এ দুয়ের একীভূত ভাবই পরমার্থ।

পরমাত্মার ঐকান্তিক মঙ্গল ইচ্ছার অনুগত হইয়া তোমার স্বার্থ যখন আমার স্বার্থ হয় এবং আমার স্বার্থ যখন তোমার স্বার্থ হয়; অথবা যাহা একই কথা—পরমাত্মার ঐকান্তিক মঙ্গল ইচ্ছা যখন তোমার আমার এবং সকলেরই স্বার্থ হয়; তখনই স্বার্থ এবং পরার্থ দুইই একীভূত হইয়া পরমার্থে পরিণত হয়। পরমার্থকে পাইলে স্বার্থের কোন অভাবই থাকে না। পরমার্থ কি? না ঈশ্বরের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ। আমাদের প্রত্যেকেরই আপনার আপনার মঙ্গল ইচ্ছা ঈশ্বরেরই মঙ্গল ইচ্ছার অন্তর্ভূত; আমাদের প্রত্যেকেরই প্রকৃত স্বার্থ সেই পরমার্থেরই অন্তর্ভূত। তাই একজন লোক-প্রসিদ্ধ ভগবদ্ভক্ত সাধু মহাত্মা বলিয়াছেন—"প্রথমে ঈশ্বরের অমৃত নিকেতনের পথ অনুসরণ কর, আর আর যাহা কিছু তোমার প্রয়োজন সমস্তই তোমাতে অনুসংযোজিত হইবে।"

বিবেচনা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, শুদ্ধ কেবল পরের জন্যই কার্য্য করিব এরূপ প্রতিজ্ঞার গোড়াতেই দোষ। কেননা, পরমপিতা পরমেশ্বর যখন সকল আত্মারই অন্তরাত্মা, তখন কেহ কাহারো পর নহে—সকলেই সকলের আপনার। পরই যখন নাই, তখন পরের জন্য কার্য্য করা কিরূপ? শিরই যা'র নাই, তা'র আবার শিরঃপীড়া কিরূপ? লোকে যখন স্ত্রী-পুত্রের মঙ্গল সাধন করে, তখন কেহ আর এমন মনে করে না যে, স্ত্রী পুত্রের মঙ্গল আমার আপনার মঙ্গল নহে—তাহা শুদ্ধ কেবল পরেরই মঙ্গল। তেমনি ভগবদ্ভক্ত সাধু পুরুষ যখন কোন অজ্ঞাত অপরিচিত অতিথির পাতে অন্ন পরিবেশন করেন, তখন তিনি এরূপ মনে করেন না যে, সে তাঁহার মঙ্গল কার্য্য শুধু কেবল পরেরই মঙ্গল—তাহা তাঁহার আপনার মঙ্গল নহে। দক্ষিণ হস্তও বাম হস্তের পর নহে—বাম হস্তও দক্ষিণ হস্তের পর নহে, কেননা উভয়েই একই হৃদয়ের দুই পার্শ্ব হইতে রাহির হইয়াছে; তেমনি, তুমিও আমার পর নহ—আমিও তোমার পর নহি—কেননা উভয়েই আমরা একই পরমাত্মা হইতে আসিয়াছি। শাস্ত্রে আছে যে, শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে—পর ভাবিয়া যাহাকে যাহা দান করা যায়, সেরূপ দান'কে কিছু আর শ্রদ্ধার দান বলা যাইতে পারে না; আপনার ভাবিয়া যাহাকে যাহা দান করা যায় তাহাই শ্রদ্ধার দান। পরমেশ্বর সর্ব্বজগতের অধীশ্বর অথচ তিনি ভক্তজনের আপনার ঈশ্বর;—ভক্তজনের নিকটে তিনি অজ্ঞাত অপরিচিত পর নহেন—প্রত্যুত তিনি যেমন তাঁহার আপনার এমন আপনার আর কেহই নহে—

"স এষ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

ঈশ্বর যাঁহার আপনার সকলই তাঁহার আপনার; এই জন্য তিনি যখন জগতের মঙ্গলের জন্য কোন কার্য্য করেন, তখন তিনি মনে করেন যে, আমি আমার আপনারই মঙ্গলের জন্য কার্য্য করিতেছি; যখন তিনি আপনার মঙ্গলের জন্য কোন কার্য্য করেন তখন তিনি মনে করেন যে, আমি জগতের মঙ্গলের জন্য কার্য্য করিতেছি; কেননা তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বরের প্রেম-সূত্রে সকল মঙ্গলেরই সঙ্গে সকল মঙ্গল অবিচ্ছেদে গ্রথিত রহিয়াছে; কাজে কাজেই পরের মঙ্গলও আপনার মঙ্গল, আপনার মঙ্গলও পরের মঙ্গল। ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া যিনি পরের জন্য কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করেন, তিনি পরেরও মঙ্গল সাধন করেন আপনারও মঙ্গল সাধন করেন; সকলকে সুখী করিবার জন্য যিনি আপনার সুখ

WORM EATEN.

অগ্রাহ্য করেন, তিনি ঈশ্বরের সহবাস-লাভে স্বর্গাতীত স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পা'ন তাঁহার আবার অমঙ্গল কোথায়? অতএব ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছাকে আপনার হৃদয়ের অভ্যন্তরে আত্মসাৎ করিয়া তদনুসারে আপনার এবং অন্যের মঙ্গল সাধন করা এবং ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছা অতিক্রম করিয়া কোন প্রকার কার্য্য না করা—ইহাই এক মাত্র ধর্ম্ম।

ফরাসীস দেশীয় আর একটা অলীক মৃগতৃষ্ণা আমাদের দেশের আধুনিক কৃত-বিদ্য সমাজে বিষম এক মোহিনী মায়া বিস্তার করিতেছে; সেটা এই যে সমগ্র মনুষ্য-মণ্ডলীকে প্রীতি করিলে তাহাতেই প্রীতির যৎপরোনাস্তি চরিতার্থতা হইতে পারে—ঈশ্বর-প্রীতি কেবল একটা বা-ড়া'র ভাগ। ইহাঁদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, কোথায় গেলে আমি সমগ্র মনুষ্য-মণ্ডলীর দেখা পাইতে পারি—সমগ্র মনুষ্য-মণ্ডলী থাকে কোথায়? সকলেই তো আমরা আপনার আপনার পিতা মাতা স্ত্রীপুত্র আত্মীয় স্বজন সহচর অনুচর বন্ধু-বান্ধব, ইহাঁদিগকেই চক্ষে প্রত্যক্ষ করি, আর, ভাল বাসিবার মধ্যে তাঁহাদিগকেই ভাল বাসি। সমগ্র মনুষ্য-মণ্ডলীকে কে কবে আমরা চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি? যাহাকে আমি কোন জন্মে প্রত্যক্ষে উপলব্ধি করি নাই, তাহাকে আমি কিরূপে ভাল বাসিব? প্রকৃত কথা এই যে, মনুষ্য-মণ্ডলী বলিতে বাহিরের দৃশ্যমান মনুষ্য-মণ্ডলী ছাড়া আর একটি বিষয় বুঝায়—সেটি কেবল অন্তরে প্রত্যক্ষ করিবার সামগ্রী—কি? না মনুষ্যত্ব। যাহার গুণে মনুষ্য-মাত্রেই পশু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট—তাহাই মনুষ্যত্ব, সুতরাং তাহা মনুষ্য মাত্রেতেই আছে; তবে—কোন মনুষ্যে তাহার বীজ আটি-চাপা রহিয়াছে; কোন মনুষ্যে তাহার অঙ্কুর দেখা দিয়াছে; কোন মনুষ্যে তাহার পল্লব গজাইয়া উঠিয়াছে; কোন মনুষ্যে তাহার ফুল ফুটিয়াছে; কোন মনুষ্যে তাহার ফল ফলিয়াছে—কিন্তু আছে তাহা সকল মনুষ্যেতেই। প্রত্যেক মনুষ্যেরই অন্তঃকরণের দ্বারে কাণ পাতিলে মানুষ আর পশু দুয়েরই হাঁক ডাক শুনিতে পাওয়া যায়; মানুষটির নাম মনুষ্যত্ব—পশুটির নাম পশুত্ব। পশুটিকে বশীভূত করিলেই মনুষ্যটিকে জাগাইয়া তোলা হয়। অন্তরস্থিত মনুষ্যটিকে ভাল বাসিলেই সমগ্র মনুষ্য-মণ্ডলীকে ভালবাসা হয়; অন্তরস্থিত মনুষ্যটিকে পর ভাবিয়া অযত্ন করিলেই সমগ্র মনুষ্য মণ্ডলীকে পর করিয়া গড়িয়া তোলা হয়। আমাদের প্রতিজনের আপনার আপনার অন্তরস্থিত সেই যে মনুষ্যত্ব, তাহাই সমগ্র মনুষ্য-মণ্ডলীকে হাতাইয়া পাইবার টানা জাল। এ কথা খুবই সত্য যে, আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ মনুষ্যমণ্ডলীর সংসর্গ হইতে—বিশেষতঃ সাধুসঙ্গ হইতে—মনুষ্যত্ব সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আপনার আপনার অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে পুঁজি করি—এবং তাহাকেই সমগ্র মনুষ্য-মণ্ডলীর স্থলাভিষিক্ত করি; সত্য;—কিন্তু বাহির হইতে মনুষ্যত্ব-রত্ন সংগ্রহ করিতে হইলেও অন্তরে একজন জহরী আবশ্যক। পশু কিছু আর মনুষ্যের মধ্য হইতে তাহার মনুষ্যত্বটি চিনিয়া লইতে পারে না; জ্ঞানই জ্ঞানকে চিনিয়া লইতে পারে, প্রেমই প্রেমকে চিনিয়া লইতে পারে; মনুষ্যের অন্তরে মনুষ্যত্ব আছে বলিয়াই সে বাহিরে মনুষ্যত্ব দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহা চিনিয়া লইতে পারে। ঘরের হাতি দিয়া যেমন বনের হাতি ধরিয়া আনিয়া তাহাকে ঘরে পোষ মানাইতে হয়, তেমনি অন্তরের মনুষ্যত্ব দিয়া বাহিরের মনুষ্যত্ব ধরিয়া আনিয়া তাহাকে অন্তরে পোষণ করিতে হয়। অতএব ইহা স্থির-নিশ্চয় যে, মনুষ্য মাত্রেরই অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে মনুষ্যত্ব গোকুলে বাড়িতেছে;—এক দিন না এক দিন সাধুসঙ্গের পুণ্য বায়ুতে বা সদ্‌গুরুর জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় বা বিশেষ কোন ঘটনার গতিকে ঈশ্বরের কৃপায়, তাহার চক্ষু ফুটিলেই তাহা নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিবে। অতএব "সমগ্র মনুষ্য মণ্ডলীকে ভালবাসা" এই যে একটি কথা—এ কথাটির ভিতরের মর্ম্ম শুদ্ধ কেবল এই যে, আপনার আপনার অন্তরস্থিত মনুষ্যটিকে ভালবাসিয়া তাহার প্রতি যত্ন করা এবং অন্তরস্থিত পশু-গুলাকে তাহার বশে সংস্থাপন করা। কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তরস্থিত এই যে, মনুষ্যত্ব, ইহার মূল অন্বেষণ করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই যে, আত্মাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব; আত্মাকে ছাড়িয়া মনুষ্যত্ব শুধু কেবল একটা ফাঁকা আওয়াজ। আত্মা হইতেই মনুষ্যোচিত কার্য্য ফুটিয়া বাহির হয়, এবং সেই মনুষ্যোচিত কার্য্যের অভ্যন্তরেই আমরা মনুষ্যত্ব উপলব্ধি করি। আমরা আমাদের আপনার আপনার কৃত মনুষ্যোচিত কার্য্যের মধ্যেও মনুষ্যত্ব উপলব্ধি করি এবং অন্যের কৃত মনুষ্যোচিত কার্য্যের মধ্যেও মনুষ্যত্ব উপলব্ধি করি। সেই যে মনুষ্যোচিত কার্য্য তাহার কর্ত্তা কে—তাহার প্রবর্ত্তক কে? যদি আমরা কাহাকেও ঐরূপ দেখি যে, সে লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বিড়ালের ন্যায় চুরির পন্থায় ফিরিতেছে, তবে সে তাহার কার্য্যের কে প্রবর্ত্তক? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, তাহার প্রবর্ত্তক আর কেহ নয়—বহির্বস্তুর আকর্ষণ। আর এক ব্যক্তিকে যদি দেখি যে, তিনি ঈশ্বর-প্রেমে গদ্‌গদ হইয়া তাঁহার অনিষ্টকারীর প্রতি ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করিতেছেন, তবে সে তাঁহার কার্য্যের কে প্রবর্ত্তক? বহির্বস্তু নহে কিন্তু আত্মা। অতএব আত্মাই মনুষ্যোচিত কার্য্যের মূল প্রবর্ত্তক—এবং সেই মনুষ্যোচিত কার্য্যের অভ্যন্তরেই আমরা মনুষ্যত্ব উপলব্ধি করি। তবেই হইতেছে যে, আত্মার প্রবর্ত্তিত মনুষ্যোচিত কার্য্য হইতে ফল যাহা আমরা উপার্জ্জন করি তাহাই মনুষ্যত্ব। আত্মা মূল—মনুষ্যত্ব ফল। এতক্ষণ ধরিয়া আমরা করিলামই বা কি, আর, পাইলামই বা কি? আমরা বিস্তীর্ণ সাগর মন্থন করিয়া এক বিন্দু অমৃত পাইলাম। মনুষ্য-মণ্ডলী মন্থন করিয়া মনুষ্যত্ব পাইলাম—মনুষ্যত্ব মন্থন করিয়া জাগ্রত জীবন্ত আত্মা পাইলাম। প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে আত্মা মৃত্তিকাভ্যন্তর-স্থিত বীজের ন্যায় গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করিতেছে; কিন্তু বামন অবতারের যেরূপ গল্প শুনা যায়—শরীর-স্থিত সেই যে, আত্মা, তাহার অধিকার-বিস্তার স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ছাপাইয়া উঠিয়া অনন্তে গিয়া মিসিয়াছে। এক দিকে আত্মা এবং আর এক দিকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—আত্মার গুরুভারের নিকটে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নতশির। এইমাত্র বলিলাম যে, আত্মা মনুষ্যোচিত কার্য্যের প্রবর্ত্তক; কিন্তু মনুষ্যোচিত কার্য্য—বলে কাহাকে? কি উদ্দেশে কার্য্য করিলে মনুষ্যোচিত কার্য্য করা হয়? আত্মা মুক্তির ভিখারী—আত্মার লক্ষ কোন প্রকার প্রাচীরের অভ্যন্তরে বদ্ধ থাকিতে পারে না—আত্মার লক্ষ অন্তরের দিকে প্রসারিত। অতএব শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতি লক্ষ

করিয়া আত্মা যে কোন কার্য্য করে, তাহাই মনুষ্যোচিত কার্য্য; এবং সে কার্য্যের ফল অনন্ত এবং চিরস্থায়ী মঙ্গল। যদি কোন প্রকার ক্ষণস্থায়ী এবং পরিমিত ফল উৎপাদন করা আত্মার চরম লক্ষ্য হয়, তবে সেইটি করিয়া চুকিলেই আত্মার সমস্ত কার্য্য ফুরাইয়া যায়; পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিলেই তাহার কার্য্য যাহা তাহা শেষ হইয়া যায়, কাজেই তাহা শুষ্ক হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়। আমরা যে কোন গৃহে অবস্থিতি করিনা কেন, তাহারই এমন একটি দ্বার খুলিয়া রাখা আবশ্যক যাহার মধ্য দিয়া মুক্ত বায়ু যাতায়াত করিতে পারে; তেমনি, আমরা যে কোন অবস্থায় অবস্থিতি করি না কেন, তাহারই একটি না একটি দ্বার অনন্তের দিকে খুলিয়া রাখা আবশ্যক,—তাহা হইলে ক্ষুদ্র কুটীরের অভ্যন্তরেও স্বর্গের সোপান উন্মুক্ত হইয়া যায়। আমরা যাহা কিছু করি—সমগ্র মনুষ্যমণ্ডলীরই হিত-সাধন করি, আর আমাদের পরিবারবর্গেরই হিত সাধন করি—তাহা যদি আমরা ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ করিয়া করি, তবে তাহার ফল তাহাতেই পর্য্যাপ্ত না হইয়া অনন্তে গিয়া পৌঁছে। মনুষ্য অমৃতের অধিকারী—এইজন্য অমৃতধনের প্রতি লক্ষ করিয়া কার্য্য করাই মনুষ্যোচিত কার্য্য। অতএব অনন্ত মঙ্গল স্বরূপ পরমাত্মার প্রতি আত্মার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দেও—তিনিই অক্ষয় অমৃত ধন। অদ্য এই শুভ মাঘের একাদশ দিবসে সেই অক্ষয় অমৃত ধন ভিন্ন আর কোন কিছুই যেন আমাদের হৃদয়াভ্যন্তরে স্থান না পায়। এই শুভ মুহূর্ত্তে আইস আমরা সরল হৃদয়ে নির্ম্মল চিত্তে এবং তদ্‌গত প্রাণে আমাদের সমস্ত প্রীতিভক্তি সেই পরম প্রভু পরমাত্মার চরণে সমর্পণ করিয়া পাপতাপ দুঃখ শোক জরা মৃত্যুর পরপারে উত্তীর্ণ হই।

হে পরমাত্মন্! দীন হৃদয়ে কৃপাবিন্দু প্রদান কর—ব্যাকুল হৃদয়ে প্রেমসুধা প্রদান কর; আমরা আমাদের হৃদয়ের আসন পাতিয়া দিতেছি—তুমি দেখা দিয়া আমাদের জ্ঞান-নেত্র সফল কর। তোমার দর্শন পাইলে আমরা কি ধন না পাই; তোমার অভয় আনন্দমূর্ত্তি আমাদের মোহ-অন্ধকারের আলোক; তোমার প্রসাদবারি আমাদের মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ; তোমার স্নেহ করুণা আমাদের প্রাণের সম্বল; তোমার প্রেমমুখ-জ্যোতি আমাদের আনন্দের প্রাতঃসূর্য্য। আজ আমরা সকলে মিলিয়া তোমার পূজা করিতেছি—তুমি আমাদিগকে দর্শন দিতেছ—আজ আমাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই। দীন হীন দুর্ব্বল সন্তানের প্রতি কত তোমার করুণা! তোমার এইরূপ করুণাতেই মৃত শরীরে জীবন সঞ্চার হয়; এইরূপ করুণাতেই হৃদয়-গ্রন্থি-সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সকল সংশয় তিরোহিত হইয়া যায়; এইরূপ করুণাতেই সংসার-সাগরের তুমুল তরঙ্গরাশি প্রশান্ত হইয়া যায়—চতুর্দ্দিকে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়। দীন জনের প্রতি করুণা করিয়া তুমি যখন তাহাকে দর্শন দান কর, তখন সে তোমার প্রেমে মত্ত হইয়া তোমা ভিন্ন আর কোন কিছুই চাহে না—তোমার মুখজ্যোতিই তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব। চির দিনই যেন এইরূপ তোমার প্রেম-মুখজ্যোতি আমাদের পথের আলোক হয়—এই আশীর্ব্বাদ আমাদিগকে প্রদান কর, তাহা হইলেই আমাদের সকল দুঃখ—সকল অভাব—দূর হইয়া যায়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সায়ংকাল।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের গৃহ পত্র পুষ্পে সুসজ্জিত ও আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া অতি রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছিল। লোকের সমাগম এত হয় যে ঐরূপ প্রকাণ্ড গৃহে তিলার্দ্ধেরও স্থান ছিল না। সুবিখ্যাত বক্তা বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সর্ব্বপ্রথম একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। প্রতাপ বাবুর বিলক্ষণ জ্ঞান কবিত্ব ও ভাষায় অধিকার আছে। ফলত তিনি স্বীয় বাক্‌শক্তি দ্বারা সভাস্থ সকলেরই যে চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি বারান্তরে তাঁহার বক্তৃতা প্রকাশ করিরা পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্ত করিব।

প্রতাপ বাবুর বক্তৃতার পর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি নিম্নোক্তরূপ উদ্বোধন করিলেন।

আজি ব্রহ্মোৎসব। আজি আনন্দ মনে বিমল হৃদয়ে ভজরে ভবতারণে। আজি অন্তর বাহিরে তাঁহাকে দেখ। বাহিরে তাঁহার সেই মঙ্গল-হস্তের রচনার মধ্যে তাঁহাকে দেখ। "আসীন সেই বিশ্ব-শরণ তাঁর জগৎ-মন্দিরে" অন্তরে এই হিরণ্ময় কোষ মধ্যে তাঁহাকে উপলব্ধি কর। এই শরীরের মধ্যে যে শরীরী আত্মা, তাহার অভ্যন্তরে বিশুদ্ধ জ্ঞানালোকে শুদ্ধ বুদ্ধ অশরীর পরমাত্মাকে দেখ। "অনিমিষ আঁখি সেই কে দেখেছে, যে আঁখি জগৎ পানে চেয়ে রোয়েছে"। এমন অনিমিষ আঁখি আর কোথায় আছে? তিনি আমাদের প্রতি চাহিয়াই রহিয়াছেন, শুধু চাহিয়া রহিয়াছেন নহে, স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। আমরা কি তাঁহাকে একবার এমন সময়ে ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিব না? হৃদয়-মধ্যে উপলব্ধি করিব না? কেবল বৃথা কৌতূহল চরিতার্থ করিয়াই কি গৃহে ফিরিয়া যাইব? শরীরকে অচলের ন্যায় ও মনকে দিক্‌দর্শনের শলাকার ন্যায় স্থির করিয়া শ্রবণ কর—তিনি আত্মার গভীরতম প্রদেশ হইতে বলিতেছেন, "ভক্তিযোগে ডাকিলে পরে থাকিতে পারি কৈ?" একবার ভক্তিযোগে তাঁহাকে ডাক। স্বর্গের দেবতারা যাঁহাকে নিয়ত হৃদয়ে ধারণ করিয়া, অবিশ্রান্ত প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেছেন, যে প্রেমাশ্রুতে তাঁহার প্রেম-মুখ প্রতিবিম্বিত হইয়া শোভার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে, এস আমরা সকল সুহৃদে একবার উৎসবের সময় সেই প্রেম-মুখ ধ্যান করি—যাঁহার চরণ পূজা করিয়া দেবতারা অমৃতানন্দ লাভ করিতেছেন, এস আমরা সকলে মিলিয়া অনন্যমনে ভক্তি-পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার চরণ পূজায় প্রবৃত্ত হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় বেদী হইতে একটী উপদেশ দেন। ইনি বহুকাল দেশবিদেশের নানা-সৎশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন। এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশে তাহারই পরিচয়। আগামী বারে ইহাও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের

অন্তঃপুরে মহিলা-সমাজ

স্ত্রীলোকের পঠিত উপদেশ।

ঈশ্বর আমাদের পিতা, আমরা সকলে তাঁরই সন্তান। আজ আমাদের এত আনন্দ উৎসাহ কিসের? না, সারা বৎসরের পর সকল ভাই ভগিনীতে একত্রিত

হইয়া তাঁর পূজা করিতে, তাঁর গুণগান করিতে তাঁর কথা শ্রবণ করিতে আসিয়াছি।" আজ তাঁরই ডাকে আমরা মিলিত হইয়াছি, সংসারের কোলাহল হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া তিনি আমাদিগকে তাঁর প্রেমানন্দ উপভোগ করিতে আহ্বান করিতেছেন; এস আমরা হৃদয় খুলিয়া তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্ত হই, তাঁহার চরণে হৃদয়ের প্রীতি ভক্তি অর্পণ করিয়া জীবন সার্থক করি। বৎসরের মধ্যে এমন সুযোগ আর পাইব না, এমন শুভদিন আমাদের অদৃষ্টে আর আসিবে কি না কে জানে। তাঁহার সঙ্গে সংশ্রব যদিও আমাদের একদিনের জন্য নয়, চির দিনই তিনি আমাদের পিতা মাতা দেবতা, তাঁহাকে পূজা করা আমাদের প্রতিদিনের কর্ত্তব্য, তাঁহাকে প্রীতি করা আমাদের সমস্ত জীবনের কার্য্য, কিন্তু আজিকার দিন আমাদের বিশেষ আনন্দের দিন—তাঁহার পূজা করিবার জন্য আজ আমরা সম্মিলিত হইয়াছি। আমাদের যেন বিশেষ লক্ষ্য থাকে, এখান হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া না যাই, প্রতিদিন নির্জনে তাঁহার পূজা আরাধনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করি, এখানকার বাহ্যাড়ম্বরেই হৃদয় আকৃষ্ট হইয়া না থাকে, এই উৎসব কোলাহলের মধ্যে যে চিরনবীন স্নেহ আমাদিগকে পাপের পথ হইতে সত্যের পথে আহ্বান করিতেছে তাহা আমরা বিস্মৃত না হই।

আমাদের দেশের মহিলাদের মধ্যে অল্পে অল্পে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে দেখা যায়। তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞান-লাভ-স্পৃহা দিন দিন বলবতী হইতেছে, বিদ্যাচর্চ্চার প্রভাবে পরনিন্দা পরচর্চ্চার ভাব হ্রাস হইয়া আসিতেছে। গৃহে কলহ, বিবাদ ও পরনিন্দা লইয়া তাঁহাদের সময় কাটান আবশ্যক হয় না; লেখাপড়া প্রভৃতি সৎপ্রসঙ্গ লইয়া তাঁহাদের মধ্যে কথোপকথন হইতে পারে। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি হইলেও ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ভক্তির ভাব যদি মুছিয়া যায় তাহা হইলে আমাদের সমূহ বিপদ। বিদ্যাশিক্ষার প্রভাবে আমাদের মধ্যে পরের উপকার দেশের উপকার এই সকল ভাব যেমন আসিতেছে, সেইরূপ জ্ঞান ধর্ম্মের প্রতি টানও আবশ্যক। আমরা যেন সেই মূল কারণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া না পড়ি, সেই পূর্ণ মঙ্গলের মঙ্গল ভাবে অবিশ্বাস করিয়া হৃদয়ের সৌকুমার্য্য না হারাই। মানবেরা কতদিন হইতে তাঁহার সৃষ্টি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া সকল বিষয় জানিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এখনও এ বিশাল সৃষ্টির একটী ক্ষুদ্রতম পরমাণুকেও কেহ সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। যিনি এই সমুদায় সৃষ্টির কারণ, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র সকলেই যাঁহার নিয়মের অধীন, তাঁহাতে অনুরাগ ভিন্ন কে তাঁহাকে পাইতে পারে? তিনি আমাদিগকে প্রাণ মন ইন্দ্রিয় সকলই দিয়াছেন, আমরা যদি তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিব না, ভক্তিভরে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রণাম করিব না, তবে আমরা এমন শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ হইলাম কেন? ভক্তিভরে ডাকিলেই তিনি দেখা দিবেন। তিনি আমাদের হৃদয়ে চিরদিনই বর্ত্তমান—আমরাই তাঁহাকে হেলায় হারাই। জ্ঞানদ্বারা আমরা তাঁহাকে জানিতে পাই, কিন্তু প্রেম ভক্তি বিনা তাঁহার অপার আনন্দ অনুভব করা যায় না। তিনি আমাদের হৃদয়ে না চাহিতেই প্রেম দিয়া রাখিয়াছেন, প্রীতি ভক্তির ভাব আমাদের হৃদয়ে বিশেষ করিয়া অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, আপনার দোষে আমরা সেই প্রীতি-পুষ্প দিয়া তাঁহার চরণ পূজা হইতে বঞ্চিত হই কেন; সেই অপার্থিব অবিচ্ছিন্ন সুখের অধিকারিণী হইয়াও পার্থিব সুখে আমরা ডুবিয়া থাকি কেন? পৃথিবীর তুচ্ছ ভালবাসার প্রতিদান দিবার জন্য আমরা ব্যাকুল, আর যিনি আমাদিগকে চিরকাল প্রেম দিয়া আসিতেছেন তাঁহাকে কি হৃদয়ের প্রেম উপহার দিব না? বিদ্যাগৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া আমরা যতই কেন যাহা বলি না, এই প্রেমভক্তির ভাব অশিক্ষিতদিগের নিকট হইতেও আমরা যথেষ্ট শিক্ষা করিতে পারি। ভক্তিভরে তাহারা বুকে হাঁটিয়া কত দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করে, আমরা এত শিক্ষালাভ করিয়াও যদি দিনান্তে একবার সেই প্রেমদাতাকে স্মরণ না করি, তবে আমাদের কি দুর্ভাগ্য! যাহাতে আমাদের চিরকালের মঙ্গল হইবে, আত্মার উন্নতি হইবে, সে সকল বিষয়ে আমরা অন্ধ থাকিতে চাই। আপনার দোষে সন্তান সন্ততিদিগেরও হৃদয়ের ধর্ম্মভাব স্ফূর্ত্তি পায় না এবং মানবের ভবিষ্যৎ উন্নতি স্রোত কতকটা রুদ্ধ হইয়া আসে। আমাদের এ ভ্রম কবে দূর হইবে? এস, সব ভগিনীতে মিলিয়া পিতার নিকটে আশীর্ব্বাদ চাহি, যাহাতে ধৈর্য্য ক্ষমা অভ্যাস করিয়া চরিত্রকে উন্নত করিতে পারি, বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া পরস্পরের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিতে পারি, দীন দুঃখীকে দয়া ধর্ম্ম দ্বারা সুখী করিতে পারি, এবং যাহার প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্য তাহা পালন করিয়া তাঁরই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারি।

ঈশ্বর! আমরা দুর্ব্বল, এই দুর্ব্বল হৃদয়ে বল দাও যাহাতে তোমার প্রিয়কার্য্য-সাধন দ্বারা প্রতিদিন তোমার উপাসনা করিতে পারি। আমরা ক্ষুদ্র মনুষ্য তোমার অনুগ্রহ ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই। তুমি আমাদের পিতার পিতা পরমপিতা, তুমি আমাদের গুরুর গুরু পরমগুরু; তোমার চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করি গ্রহণ কর।

ভাই বোন সমিতি।

আচার্য্যের উপদেশ।

ভাই বো'নেরা এক সঙ্গে, মিলে-মিসে এই যে একটা সদনুষ্ঠানের গোড়া পত্তন করা হ'চ্চে—খুবই ভাল হ'চ্চে। ভালটা এই যে, উপস্থিত থেকে কাজ সুরু করা হ'চ্চে—উপস্থিত ছেড়ে অনুপস্থিতে হাত বাড়ানো হ'চ্চে না। টাট্‌কা টাট্‌কা নতুন—কালেজ থেকে ডিগ্রী নিয়ে বেরোলেই পোড়ো'দের নজর গুলো আত্যন্তিক ফালাও হ'য়ে ওঠে; তখন তাঁদের প্রতাপ, দেখে কে—"মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার!" তাঁদের—ভায়েদের সঙ্গে—বাপ মা'য়ের সঙ্গে—হয় তো আদা-কাঁচকলা; অথচ তাঁরা পৃথিবী-শুদ্ধ মনুষ্যকে প্রেম-পাশে আলিঙ্গন কর'বার জন্যে কোল পেতে দিয়ে দাঁড়য়ে আছেন! তাঁরা পৃথিবী-শুদ্ধ মনুষ্য জাতির কাঙ্গালী—ভাইবোনের কোন ধার ধারেন না! কিন্তু মনুষ্যজাতি তো আর গাছে ফলে না—মনুষ্য-থেকেই মনুষ্য জাতির গোড়া-পত্তন সুরু হয়। দশজন মিল্‌লেই একটা দল হয়, দশ দল মিল্‌লেই একটা সমাজ হয়, দশ সমাজ মিল্‌লেই একটা জাতি হয়। ভাই বো'ন থেকে অল্পে অল্পে পা বাড়া'তে সুরু ক'রে মনুষ্য জাতিতে পোঁছোতে হয়—তা গেল দূরে—আগেভাগেই মনুষ্য জাতি! গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁধি! আসল কথাটা কি তবে বলি শোনো;—প্রত্যেক মানুষেরই অন্তঃকরণের দুওরের গোড়ায় কাণ পাত'লে মানুষ আর পশু দুয়েরই হাঁক ডাক শুন্‌তে পাওয়া যায়। ভালুক নাচ দেকেছ তো—একবার, মানুষ ভালুককে নীচে ফেলে তার উপরে উঠ্‌চে, একবার ভালুক মানুষকে নীচে ফেলে তা'র উপরে উঠ্‌চে; প্রত্যেকের মনের ভিতর মানুষ আর পশুর মধ্যে অষ্ট প্রহর এইরূপ কোস্তাকুস্তি চল্‌চে; অন্তরের মানুষটি যদি অন্তরের পশুগুলোকে একবার বশ ক'রে ফেল্‌তে পারে—কা'উকে বা থাবড়া থুব্‌ড়ি দিয়ে—কা'রো বা গায়ে হাত বুল্‌য়ে—কাউকে বা ধমক ধামক দিয়ে—কারো উপরে বা চোক রাঙ্‌য়ে—কাউকে বা চাবুক মেরে—কা-

WORM EATEN.

উকে বা অঙ্কুশ মেরে—একবার যদি কোন রকম ক'রে পশুগুলোকে বশ ক'রে ফেল্‌তে পারে, তবে তাকে আর পায় কে? 'মনের বাঁদর তার কাচে এমনি পোষ মেনেচে—যে, আর সেটাকে দড়া-দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখ্‌তে হয় না; অহং-কারের বাঘ তার কাছে এমনি পোষ মেনেচে যে, আর তাকে পিঁজ্‌রের ভিতরে পুরে রাখ্‌তে হয় না; বুদ্ধির ঘোড়া তার কাছে এমনি পোষ মেনেচে যে, আর তা'র সইসের দরকার হয় না—আপনিই পথ চিনে চল্‌তে পারে;—এ যা'র হ'য়ে ঢুকেছে—সে-ই তো মহাপুরুষ! বাঘ যা'র ঘরের পোষা জন্তু, তা'র শত্রু তার কাছে এগো'তে সাহস পায় না—কি জানি যদি সে বাঘটাকে লেল্‌য়ে দেয়;—কিন্তু সে নিতান্ত উত্ত্যক্ত না হ'লে আর কারো উপরে বাঘ জারি করে না; কেন না, রক্তের আস্বাদ পে'লে পোষা বাঘ বুনো হ'য়ে বেঁকে দাঁড়াতে কতক্ষণ? অন্তর-স্থিত পশুগুলো যখন অন্তরস্থ মানুষটির অনুগত ভৃত্য হয়, তখনই মানুষটি মাথা তুলে দাঁড়ায়, ও হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। মানু-ষের অন্তরস্থিত মানুষটিকে আমরা বলি—'মনুষ্যত্ব, আর মানুষের অন্তরস্থিত পশু-গুলো'কে আমরা বলি—পশুত্ব। সেই যে অন্তরস্থিত মানুষ কিনা মনুষ্যত্ব, তা'রই দৌলতে মানুষ-মাত্রই পশু অপেক্ষা উৎ-কৃষ্ট। সকল মনুষ্যেই মনুষ্যত্ব আছে, তাই সকল মনুষ্যই পশু অপেক্ষা উৎ-কৃষ্ট; কারো বা অন্তঃকরণে মনুষ্যত্বের বীজ মাটি চাপা রয়্যেছে—যেমন বেলা'র মনে; কারো বা অন্তঃকরণে মনুষ্যত্বের অঙ্কুর দেখা দিয়েচে—যেমন দীনুর মনে; দীনু কোন খাবার জিনিস পেলে নলিনীকে তা'র ভাগ না দেওয়া কাপুরুষের কাজ মনে করে, কিন্তু সব সময়ে লোভ সাম্-লাতে পারে না। কারো বা অন্তঃকরণে মনুষ্যত্বের পাতা গজ্‌য়েচে বা গজাচ্চে—যেমন বর্ত্তমান সমিতির উদ্যোগী শ্রীমান্ বাবাজিদিগের অন্তঃকরণে; কে তাঁরা? না

হিতু নীতু ক্ষিতু কৃতু, সুরেন বিবি, বলু সুধী।
জ্যোৎস্না সরলা—কি আর বল্‌ব—সর্ব্বগুণে গুণাম্বুধি॥

কারো বা অন্তঃকরণে মনুষ্যত্বের ফুল ফুটেচে, বা ফুটচে; তাঁরা হ'চ্চেন এই সমিতির কর্ত্তৃপক্ষীয় গুরুলোক, তাঁদের গুণে গেঁথে নাম করাটা ভাল দেখায় না। কারো বা মনে মনুষ্যত্বের ফল ফলেচে বা ফল্‌চে; কিন্তু আছে সেটি সকল মানুষেরই অন্তঃ-করণে। তাই বলি যে, সমগ্র মনুষ্য জাতিকে প্রেমের টানাজালে হাৎয়্যে পা-বার জন্যে সহরময় দাপ্‌টে বেড়াবার প্রয়ো-জন করে না—সমগ্র মনুষ্য-মণ্ডলী প্রত্যেক মানুষেরই মনের অন্তঃপুরে গোকুলে বা-ড়্‌চে—সেটি আর কিছু নয় অন্তরস্থিত মানুষ—মনুষ্যত্ব। এক দিন না একদিন সে নিজ মূর্ত্তি ধারণ ক'রে উঠবেই উঠবে—তা যখন সে ক'রবে, তখন অন্তরস্থিত বাঘ ভাল্‌কগুলো একেবারেই তার পদানত দাস হ'য়ে প'ড়বে। সেই যে অন্তরস্থিত মনুষ্য কি না মনুষ্যত্ব—সেইটিই সমস্ত মনুষ্য-জাতিকে প্রেমে বাঁধবার টানা জাল। সেই ভিতরের মানুষটিকে ভাল বাসলেই পৃথিবী-শুদ্ধ সমস্ত মানুষকে ভাল বাসা হয়—পর ভেবে অযত্ন ক'রলেই পৃথিবী-শুদ্ধ সমস্ত মনুষ্যকে পর ক'রে গ'ড়ে তোলা হয়। একদিকে যেমন দেখা যায় যে, মনুষ্যত্ব আমাদের প্রত্যেকের ভিতর-মহলে বর্ত্তমান র'য়েচে; আর এক দিকে তেমনি দেখা যায় যে, বাইরের পাঁচ জন মানুষের—বিশেষতঃ সাধু সজ্জনের—ভাব এবং কাজ দেখে তা-থেকেই আমরা মনুষ্যত্ব সংগ্রহ ক'রে এনে আপনার আপনার অন্তঃকরণের ভিতরে পুঁজি করি। এখানে এইটি দেখা আবশ্যক যে, মনুষ্যত্ব ব'লে যে একটি রত্ন আছে, সেটি বাইরে-থেকে সংগ্রহ ক'রে আন্‌তে হ'লেও ভি-তরে একজন জহরী আবশ্যক। কেননা ভিতরের জ্ঞানই বাহিরের পাঁচজনের জ্ঞা-নকে চিন্‌তে পারে, ভিতরের প্রেমই বা-হিরের পাঁচ জনের প্রেমকে চিন্‌তে পারে, ভিতরের মনুষ্যই বাহিরের পাঁচ জন মানুষ-কে চিন্‌তে পারে; অজ্ঞান জ্ঞানকে চিন্‌তে পারে না, অপ্রেম প্রেমকে চিন্‌তে পারে না, পশু মানুষকে চিন্‌তে পারে না। ভিতরে যা'র মনুষ্যত্ব আছে সেই ব্যক্তিই মনু-

ষ্যত্ব দেখলে তৎক্ষণাৎ তা চিনে নিতে পারে। তাই বলি যে, মনুষ্য মাত্রেরই মনের ভিতরে মনুষ্যত্ব গোকুলে বাড়চে; পাঁচ জনের দেখে শুনেই হোক্—বা বি-পদে প'ড়ে ঠেকে শিখেই হো'ক—বা সদ্-গুরুর উপদেশেই হোক্—বা বই প'ড়েই হো'ক—কোন গতিকে সেই অন্তরস্থ মানুষটির চোক ফুটলেই সে নিজ মূর্ত্তি ধারণ ক'রে উঠবে। ঘরের হাতি দিয়ে যেমন বনের হাতি ধ'রে এনে তাকে ঘরে পোষ মানাতে হয়, তেমনি, অন্তরের মনুষ্যত্ব দিয়ে বাহিরের মনুষ্যত্ব ধ'রে এনে তাকে অন্তরে পুষতে হয়। অতএব, মনুষ্যত্ব সবা'রই অন্তরে বর্ত্তমান আছে—বাইরের পাঁচ জনের মনুষ্যত্ব সেই অন্তরের মনুষ্যত্বেরই রসদ যোগায়। কিন্তু সেই যে দুর্লভ রত্ন মনুষ্যত্ব তা'র খনি কোথায়? তা'র খনি হ'চ্চে আত্মা। আত্মাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব;—আত্মাকে ছেড়ে মনুষ্যত্ব শুধু কেবল একটা ফাঁকা আওয়াজ! আত্মা হ'তেই মনুষ্যোচিত কাজ ফুটে বেরোয়—আর, সেই মনুষ্যো-চিত কাজের মধ্যেই আমরা মনুষ্যত্বের পরিচয় লাভ করি। কাউকে যদি দেখি যে, সে টাকার লোভ সাম্‌লাতে না পেরে চুরির পন্থায় ফির্‌চে—তবে সে যে তা'র কাজ সেটা মনুষ্যোচিত কাজ নয়—সেটা বিড়ালোচিত কাজ; পষ্টই দেখা যা'চ্চে যে, সেরূপ কাজে আত্মার কোন হাত নেই—বাহিরের জিনিসের প্রবল আকর্ষণই সে কাজের মূল। যেরূপ কার্য্য যে যখন করে, তখন তা'কে বাহি-রের জিনিসের আকর্ষণ নাকে দড়ি দিয়ে চালায়। আর-এক ব্যক্তিকে যদি দেখি যে, সে ঈশ্বর-প্রেমে গদগদ হ'য়ে আপ-নার শত্রুর সঙ্গে ভায়ে'র মত ব্যবহার ক'চ্চে—তবে তার সে কাজটিতে বাহিরের জিনিসের কোন হাত নেই—অন্তরাত্মাই সে কাজের হাল ধ'রে ব'সে আছে। এইরূপ আমরা পাচ্চি যে, মনুষ্যোচিত কার্য্যেই মনুষ্যত্ব হয়—আর, আত্মাই মনুষ্যোচিত কার্য্যের কর্ণধার; তবেই হ'চ্চে যে, আত্মা মূল—মনুষ্যত্ব তা'র ফল। পৃথিবী-শুদ্ধ মনুষ্য-জাতির ভালবাসা থেকে আমরা চল্‌তে সুরু কল্লুম—চল্‌তে চল্‌তে শেষ-কালে আমরা আপনার আপনার ভিতর-মুলুকে আত্মাতে এসে পড়্‌লুম। মনুষ্য-জাতি খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে মনুষ্যত্ব বেরয়্যে পড়্‌লো—মনুষ্যত্ব খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে আত্মা বের্‌য়্যে পড়্‌লো—নির্জীব কেঁচো খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে জ্যান্ত সাপ বের্‌য়্যে প'ড়্‌লো; তোমরা দেখ্‌চি ভয়ে পিছোচ্চো—কিন্তু যদি তোমরা বীর-পুরুষ ও বীর-কন্যা হও তবে সাপের তর্জ্জন গর্জ্জনে ভয় না পেয়ে—তা'র মাথা থেকে সাত রাজার ধন মা-ণিক সংগ্রহ কর্‌বার জন্যে কোমর বেঁধে তাকে ঘিরে দাঁড়াও—তা'কে কোন মতেই পালাতে দিও না।

আমি চাই এই যে, তোমাদের এই ভাই বো'নের সমিতির মধ্যে-থেকে জা-গ্রত জীবন্ত আত্মার ভাব প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠুক্; সেই আত্মার ভাবটি প্রথমে জ্যান্ত সাপের মত ভয়ানক—কেননা প্রথমে সেটা প্রতি জনের স্বার্থের বিরোধে ফণা ধ'রে ওঠে। তুমি চাও যে, শুধু কেবল তোমা-রই ভাল হো'ক্, আর সকলের কারো কিছু হ'য়ে কাজ নেই; কিন্তু আত্মা বলে যে, সকলের ভালই তোমার ভাল; কে-ননা, সকল শরীরের পক্ষে যা ভাল—তা হাতেরও ভাল—পায়েরও ভাল—বুকেরও ভাল—মাথারও ভাল; কিন্তু যা শুধু কেবল জীভের পক্ষে ভাল কিন্তু পেটের পক্ষে এবং আর আর সমস্ত শরীরের পক্ষে খা-রাপ—তা সকলের পক্ষেই খারাপ—জী-ভের নিজের পক্ষেও খারাপ; কেননা, তাতে জীভেও ক্রমে ক্রমে এরূপ অরুচি ধরে—যে আগে যা তা'র কাছে মিষ্টি লাগ্‌তো, শেষে তাও তা'র কাছে তিতো হ'য়ে দাঁড়ায়। এই জন্য যাঁরা শুধু কে-বল আপনার ভালটিই চেনেন—তাঁদের কাছে আত্মার ভাব জ্যান্ত সাপের মত ভয়ানক। কিন্তু যাঁরা সকলের ভাল'র সঙ্গে সঙ্গে আপনার ভাল চা'ন্—তাঁদের কাছে সাপটি নত-শির হ'য়ে আপনার মা-থার মাণিকটি তাঁদের পদতলে ঢেলে দেয়। সে মাণিকটি সকল ঐশ্বর্য্যের